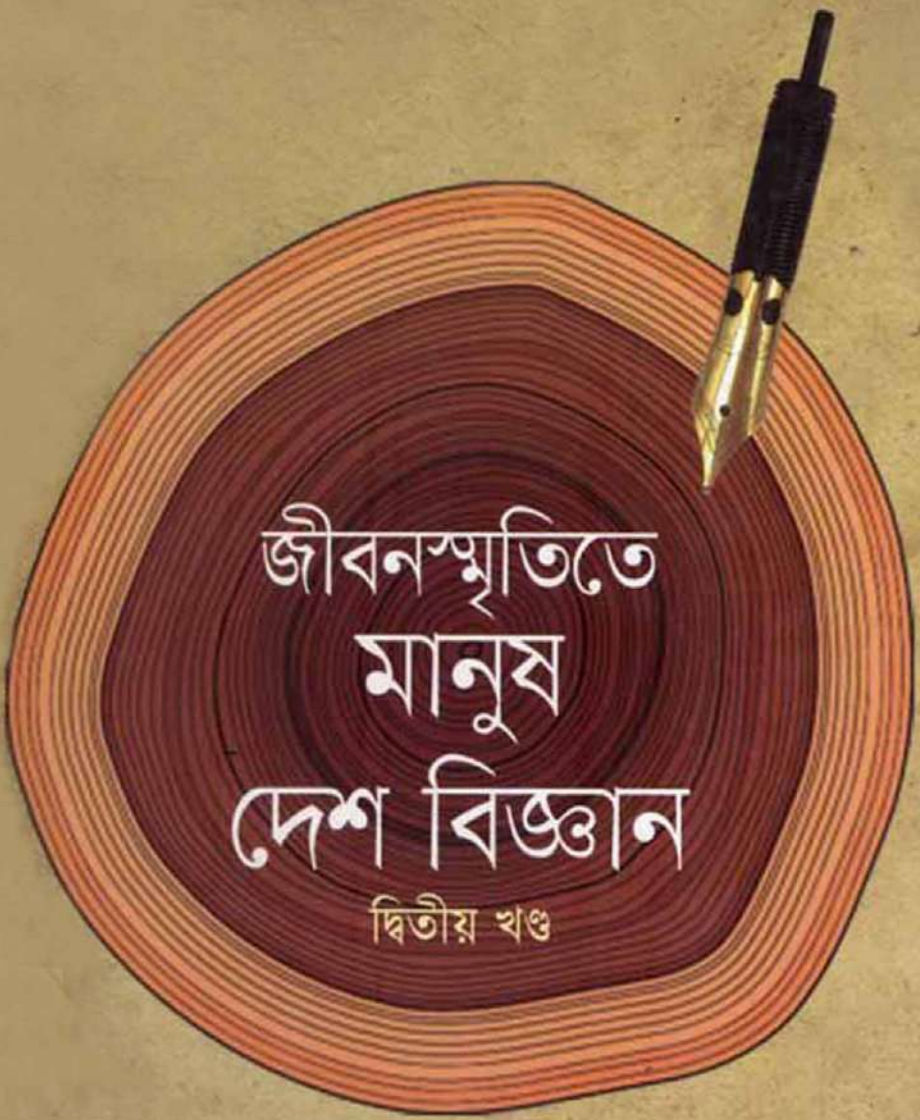
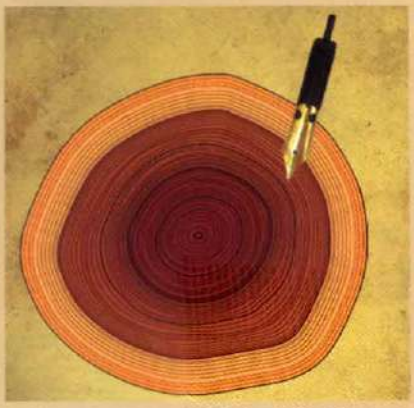
মুহাম্মদ ইব্রাহীম



জীবনস্মৃতিতে মানুষ দেশ বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড



এই আত্মজীবনীর ব্যাপ্তিকাল ১৯৪৯ থেকে শুরু করে নব্বই দশকের প্রথম দুএক বছর পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগ-পরবর্তী কালের রেশ থেকে শুরু করে জমজমাট একটি পারিবারিক পরিমণ্ডলে (পরবর্তী কালের নোবেলবিজয়ী কিশোর ইউনূসও যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ) শিশুর বালক হয়ে ওঠার মনকাড়া সব বর্ণ-গন্ধ-শব্দের অভিজ্ঞতা এতে এসেছে, স্কাউটিঙের সুবাদে ওই সময় দূরপ্রাচ্যের নানা দেশের অভিজ্ঞতাও। খুব রাজনীতি-সচেতন পারিবারিক আবহে সেদিনের দেশের ঘটনাবলি— চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, অবশেষে প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান, আইয়ুব খানের মার্শাল ল ইত্যাদি এখানে খুব জাজ্বল্যমানভাবে এসেছে। ওই বাল্যকালেই আপনমনে বই পড়ে লেখক টুকটাক জিনিস দিয়ে তাঁর নিজের গড়ে তোলা 'ল্যাবোরেটরি' নিয়ে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের কথা জানা আর অন্যকে জানানোতে তাঁর আনন্দ—তাই কলেজে গিয়েই সাহস করে প্রকাশ শুরু করে দেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। এখানেই আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের শেষ। দ্বিতীয় খণ্ডে ছাত্র আন্দোলন, ভিপিগিরি, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগ্রাম এসবে দেশের ভাবনার সঙ্গে অব্যাহত থাকে বিজ্ঞান ভাবনা— দেশে ও বিদেশে। আটাত্তর সনে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠা করে এ-ভাবনাকে তিনি সংগঠনে রূপ দেন। এসবের মধ্যে জাগরণী কাজের, লেখার, টেলিভিশন অনুষ্ঠানের নানা সৃজনশীল অভিজ্ঞতাকে লেখক জীবনস্মৃতিতে এমন বিস্তারিত আনন্দের কথায় এনেছেন যাতে সবকিছুর চমৎকার এক কথাচিত্র আঁকা হয়ে গেছে। এসবই সব সময় তাঁর অন্তরে বাঁশি বাজিয়েছে আর বিজ্ঞানমুখী এক নতুন তারুণ্য গড়াতে এর অবদান তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

জীবনস্মৃতিতে

মানুষ দেশ বিজ্ঞান

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

আমার মেজভাই ইউনূস ভাইকে (নোবেল বিজয়ী) একেবারে শৈশব থেকে আজ অবধি আমার জীবনে প্রধান রোল মডেল হিসেবে জেনেছি। আমার বোধ হবার পর থেকেই তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র দৃষ্টান্তগুলো কতভাবে যে আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা এই বইয়ের পাঠক পদে পদে নিজেই অনুভব করবেন। শুরু থেকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহ আমার জন্য মূল্যবান পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। আমার জীবনস্মৃতির এই বইটি তাই তাঁর প্রতি উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে যে কোন আত্মজীবনী পড়তে আমার কাছে ভাল লেগেছে—যখনই পেয়েছি পড়ে শেষ করেছি। বিখ্যাত-অখ্যাত নির্বিশেষে নানা মানুষের নিজের লেখা জীবন-কাহিনী আমার আগ্রহ জাগায়—যদিও অখ্যাতদের আত্মজীবনী পাই কালেভদ্রে। এমনকি কুখ্যাতরাও এর থেকে বাদ যায়না—যেমন হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ' (আমার সংগ্রাম)। এই ভাল লাগার কারণ কী তা কখনো খুব স্পষ্ট করে বুঝিনি। যাদের জীবনটাই খুব বর্ণিল, অথবা যাদের লেখায় সাহিত্য-গুণ রয়েছে তাদের আত্মজীবনীর আকর্ষণটি বোধগম্য। কিন্তু সাদামাটা ভাবে লেখা কম বর্ণিল জীবন-কাহিনীও তো আমার ভাল লাগে। হয়তো এজন্যই ভাল লাগে যে সব জীবনে প্রচুর গল্প আছে, আর এই সব সত্যিকার জীবন নিয়ে গল্প; আরো বড় কথা—গল্পগুলো শুনছি এর প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে অথবা এর প্রাথমিক শ্রোতার কাছ থেকে, এক রকম তরতাজা থাকা অবস্থায়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজে গল্পের কুশীলবদের একজন, প্রায়শ নিজেই নায়ক বা নায়িকা। তাছাড়া অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে, অথবা অন্য রকম এক জীবনের রোমান্সের ভেতর নিয়ে যেতে এর যে সক্ষমতা—তাও বা কম কিসের? নানা আত্মজীবনীর পাঠক হওয়াটাই আমাকে আত্মজীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভেবেছি হয়তো বা এধরনের কারণে অন্যদেরও ভাল লাগবে আমার স্মৃতির গল্প পড়তে, আমার নানা সময়ের অনুভূতির শরীক হতে।

নিজের জীবনস্মৃতি আমাকে সব সময় ভাল সঙ্গ দিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনন্দও দিয়েছে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো ভাইবোনদের আসরে স্মরণ করিয়ে প্রায়ই দারুণ মজা পাই—আরো পরের স্মৃতিগুলো বন্ধুদের আসরে। এসব অবশ্য খণ্ড খণ্ড স্মৃতি যা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। কিন্তু আরো ধারাবাহিক ভাবে মাথার মধ্যে যেন রয়েছে একটি গোটা সিনেমার রীল—লিখতে গিয়ে দেখলাম জীবন কাহিনীটি সিনেমার মতই যেন পর্দায় ভেসে ওঠছে। সিনেমার দর্শকের মতো যা

দেখেছি, সেদিনের নিজের মধ্যে যে সব চেতনার অনুরণন লক্ষ্য করেছি—তাই লিখেছি। এর নানা পর্যায়ে যাদের দেখেছি, যাদের সাথে মিশে বা যাদের কথা তখন শুনে মনে দাগ কেটেছিল; যে দেশকে নিয়ে কখনো উচ্ছসিত হয়েছি, উদ্বুদ্ধ হয়েছি, আবার কখনো নিরাশ হয়েছি; যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পড়ে অন্তরের বীণা বেজে ওঠেছে, আনন্দ অনুভব করেছি, কাজের প্রেরণা পেয়েছি; এ সবের পুনদর্শনটি খুব তৃপ্তিকর। পাঠকের জন্য তা মেলে ধরতে পেরে যে আনন্দ পেয়েছি তা অতুলনীয়।

সব গল্পের একটি মূল সুর থাকে, হয়তো সব জীবনেরও তা থাকে। যদি আমার জীবনের গল্পেও তা খুঁজতে চাই তা হলে হয়তো নানা বিচিত্র বিষয়ে জানতে চাওয়া আর জানাতে চাওয়ার একটি আকুলতা তাতে সব সময় একটি আবহ সংগীতের কাজ করেছে। এটিই খুব ছোটবেলায় আমাকে বড়দের কথা গেলার অভ্যাস করিয়েছে, এটি বইয়ের নেশা ধরিয়েছে, এটিই আবার দ্রুত বিজ্ঞানের দিকে নিয়ে গিয়েছে। তাই আমি ঘুরে-ফিরে এসবের মধ্যে মনের খোরাক খোঁজার চেষ্টা করেছি। তবে জানার বিষয়কে সংকীর্ণ ভাবে দেখিনি—নজর গেছে সব কিছুর দিকে; এমনকি বিজ্ঞানকেও ইতিহাসের সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, সমাজ-সেবার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই বরং বেশি আনন্দ হয়েছে। এ কারণেই আমার জীবনস্মৃতিতে মানুষ দেশ বিজ্ঞান একাকার হয়ে এক রকম মূল সুরের কাজ করছে—বইয়ের শিরোনামটিও তাই সেভাবে দিয়েছি।

হ্যাঁ, খুঁটিনাটির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে—কারণ আমার মনে হয়েছে আসল গল্প ওই খুঁটিনাটির মধ্যেই। বড় ব্রাশে যা আঁকা হয় তা হয়তো তথ্য হিসেবে অনেকেরই জানা রয়েছে—ইতিহাসের কথা, রাজনীতির কথা; স্কুল-কলেজের কথা, দেশ-বিদেশের কথা। কিন্তু মজাটি হলো ওই খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে, বর্ণ-গন্ধ-শব্দের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে। তাই এমনকি বেড়াতে যাওয়ার কথা আমার জন্য নেহাত বেড়ানো ছিলনা, বিদেশে থাকা নেহাত সেখানে বাস করা ছিলনা; মন বলতো—ওই নতুনকে বুঝবো, ওই বিদেশকেও বুঝবো। তাই সব সময় অল্প কথাতে গল্প শেষ করা হয়নি, কথাচিত্রের ক্যানভাসটি সাদা কালোতে সরল না হয়ে আলো-ছায়ার ছোপ-ছাপে অধিকতর বাঙময় হতে চেয়েছে। জীবন কাহিনীর নানা জায়গায় একটি মূল সুর হিসেবে বিজ্ঞান এসেছে বলে তারও কিছু খুঁটিনাটি বাদ দেয়ার কথা মনে হয়নি—কারণ বাদ দেয়া মানে বঞ্চিত করা। যেখান থেকে আমি মজা পেয়েছি তার থেকে অন্যকে বঞ্চিত করা কেন? গল্প চলেছে কালানুক্রমিক, কিন্তু তার মধ্যেও এক একটি বিষয়কে খুঁটিনাটিতে নেবার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে কারণ তা আমার অন্তরের বাঁশিকে বেশি বাজিয়েছে অথবা আমার জীবনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে। বিষয়গুলোকে তাই নানা অধ্যায়ের শিরোনামে বাঁধা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একেবারে শুরুতে 'সেই সব প্রথম অনুরণনে' ছোট্ট শিশুর আবছা স্মৃতিতে শৈশব-খেলাধুলায় দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের রেশের প্রবেশ ঘটেছে; 'চুয়ান্নোর রাজনীতির ছোঁয়াতে' ছোটদের কাছেও যুক্তফ্রন্ট একভাবে ধরা দিয়েছে; 'আমার ল্যাবোরেটরিতে' বালক-বিজ্ঞানীর যথেষ্ট মনোযোগে টুকিটাকিকে যন্ত্রে রূপ দেবার মজাটুকু ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে; স্কুল থেকে কলেজে যাওয়া সেদিন কত বড় পরিবর্তন ছিল তা কলেজগামী সেই কিশোরের মনস্তত্ত্ব 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেনে' বর্ণনা না করলে ঠিক বোঝানো যেতনা। বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-আন্দোলন, প্রবাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম, নতুন দেশ গড়ার আকাঙ্খা—এসব 'আইয়ুব-শাহী ধ্বংস হোক', 'ভিপির ডায়েরি', 'মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ' ইত্যাদি বেশ কিছু অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমার নিজের মত করে নিজস্ব বিনীত প্রচেষ্টাগুলোর কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওই সব কিছুতে কখনো দর্শক হিসেবে, কখনো নিজের ভুবনের কর্মী হিসেবে খুঁটিনাটিতেই গল্পের কথাগুলোকে আনার চেষ্টা করেছি।

মনে রাখতে হবে সব গল্প সেদিনের—সেদিনের কথা, সেদিনের ভাবা, সেদিনের চেতনা ও অনুভূতি; এমনকি যে থিওরিগুলো দিয়ে তখন তা বিশ্লেষণ করেছি সেগুলোও সেদিনের। পরে যদি নতুন ভাবে কিছু চিন্তা করেও থাকি সেজন্য পেছনে গিয়ে ওই সব অনুভূতিতে হাত দেবার কোন অধিকার আমার নেই; আজকের থিওরি খাটিয়ে সেদিনের ভাবনাকে পরিবর্তনেরও সুযোগ নেই। সেদিনের বর্ণ-গন্ধ-শব্দ যেভাবে ধরা দিয়েছে সেভাবেই চলেছে আমার জীবনের গল্প। এর বাইরে গিয়ে আমি বড় জোর যাত্রা পালার সূত্রধারের মত মাঝে মাঝে এর সঙ্গে কিছু পূর্ব-কথা যোগ করেছি—আজকের পাঠকের কাছে ঘটনার পটভূমি ধরিয়ে দেবার জন্য। একটি জিনিস হয়তো পাঠকের চোখে পড়বে একেবারে শৈশবের প্রসঙ্গে থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমি এতে প্রায়শই গানের কলি ব্যবহার করেছি—কখনো গানের বেশ কয়েক লাইন। এটি আমার অভ্যাসের কারণে করেছি। আমার স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে রয়েছে এই গান—যতটা না গান গাওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশি গুণ গুণ করে মনের মধ্যে বাজানোর জন্য। ওই ছন্দ, ওই সুর ছাড়া আমার স্মৃতির কথা এগোতে চায়না। যদি পারতাম তা হলে শুধু গানের কথাগুলো নয় সুরটুকুকেও অঙ্গীভূত করতাম এই স্মৃতিকথায়। আসলে যখন লিখছিলাম তখন বেশ শব্দ করেই প্রাসঙ্গিক গানগুলো গাইছিলাম—তাতে সব কিছু আমার সহজে মনে পড়ছিলো।

জীবনস্মৃতিটি আমার হলেও এর রঙ্গমঞ্চটি কিন্তু আমার নয়, আমার চেয়ে তা অনেক অনেক বড়। আমার ভূমিকা প্রধানত দর্শকের ও কথকের মাত্র। কখনো কখনো যে ছোটখাট ভূমিকা-অভিনয়ের সুযোগ এতে পেয়েছি আমার জন্য অবশ্য সেগুলোও ছিল মহা উৎসাহে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো—তরুণদের নিয়ে আমার কাজের সাফল্য দেখে মনে হয়েছে এই নিয়ে বিশ্ব জয় করতে চলেছি। এমনটি এখনো মনে হয়, তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে জীবন-পথে চলতে পারছি, আর এত খুঁটিনাটি সমেত আমার গল্পটি শোনাতে সাহস করছি। এ গল্প যদি কিছুক্ষণের জন্য

হলেও পাঠককে আনন্দ দিতে পারে, তাকে আমাদের ওই দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে পারে তাহলে এই শোনানো সার্থক হবে।

বই আকারে প্রকাশিত হবার বেশ কিছু দিন আগে এর বিভিন্ন অংশ বিশেষ বাংলাদেশের ছয়টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো—'কালের কণ্ঠ,' 'বাংলাদেশের প্রতিদিন', 'মানবজমিন', 'সকালের খবর', 'অন্যদিন' এবং 'সাপ্তাহিকে'। পরে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদীতে' প্রতি সপ্তাহে একবার সম্পাদকীয় পাতায় এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ। এভাবে প্রকাশিত হবার ফলে আংশিক ভাবে পড়েছেন এমন অনেক পাঠকের সাধুবাদ পেয়েছি, দু'একটি তথ্যগত সংশোধনও পেয়েছি যা শুধরে নিয়েছি। ভাল লেগেছে দুই ধরনের পাঠকের মধ্যে এর আদর দেখে। আমার কিছুটা সমসাময়িক যাঁরা, এ লেখার মাধ্যমে নিজেদেরও পুরানো দিনগুলোতে ফিরে যেতে পেরে তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন। আবার নতুন প্রজন্মের যাঁরা তাঁদের ভাল লেগেছে অতীতের অজানা জগতকে আবিষ্কার করে—কারণ বড় জোর মোটা দাগের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে কিছু কথা শুনে থাকলেও সে যুগের হাসি-কান্না, উচ্ছাস, প্রযুক্তি এ সব অনেক কিছু তাদের কাছে রহস্যময়। অনুজ প্রতিম প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক দারুণ উৎসাহে এটি প্রকাশনার কাজ তার হাতে নিয়ে সব সময়ের মতো তার সমর্থন জানিয়ে দিয়েছে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া ইকবাল দুই খণ্ড বইয়ের পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বানান ইত্যাদি মার্জনা করেছেন, ভাষা-রীতিতেও কিছু কিছু ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরো বড় কথা এটি নিয়ম করে পড়তে গিয়ে যেখানে যেখানে বিশেষ মজা পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে সেটি নিয়ে উচ্ছসিত আলাপ করেছেন। এরকম অনেক বার আমি তাঁর কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। এই পরিশ্রম, এই উৎসাহের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অন্য কয়েকজন বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা বইটি লিখতে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারি ২০১৬

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক' ১৩
রমনার পদাতিক ৪৯
ভিপির ডায়েরি ৮১
বিজ্ঞান গবেষণার স্বাদ ১২৪
নতুন পরিচয়ে একই জগত ১৩৭
অচিন দেশের ল্যাবোরেটরি ১৫৫
প্রতীচী-১ ১৭৯
মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ২১৮
বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব ২৫২
'সিএমইএস' এর শুরুর কথা ২৮০
মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা ৩০৩
কিশোরী শক্তি, বিজ্ঞানমুখী তারুণ্য ৩২৫
প্রতীচী-২ ৩৫২
স্মৃতিকথার ইতি ৩৮১
আলোকচিত্র ৪০৯

'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক'

সলিমুল্লাহ হলে গৃহ-প্রবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মানে বিভাগে নয়, বরং এর কোন একটি হলে ভর্তি হওয়া। সেভাবে নাম লিখিয়েই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক সদস্য হলাম; এবারই এখানে আমার সত্যিকারের আনুষ্ঠানিক 'গৃহ-প্রবেশ' ঘটলো। যে সময় এই হল সিষ্টেমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়েছিলো তখন অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্রাবাস 'কলেজ'গুলোর অনুকরণে হলগুলোতেও শিক্ষা দেবার আয়োজন ছিল—সেজন্য হাউস টিউটররা (গৃহ শিক্ষক) হলের মধ্যে থাকতেন ছাত্রদেরকে সত্যি সত্যি লেখাপড়ায় সহায়তা করার জন্য। সে রীতি বদলে গেছে অনেকদিন হলো, কিন্তু তবুও হলের অনেক ঐতিহ্য আগের মতই বজায় ছিল, বিশেষ করে সলিমুল্লাহ হলে। এটি নেহাত থাকার হোস্টেল মোটেই ছিলনা, সরাসরি শিক্ষা দানটি এখন আর হলের আওতায় না থাকলেও এখনো এখানে এত শিক্ষণীয় বিষয় ছিল যা ভবিষ্যৎ জীবন গড়ায় অনেক প্রভাব রাখতো।

যেমন হলের প্রভোস্টের কথাতেই যদি আসি তাঁর ব্যক্তিত্ব নানা ভাবে হলের ছাত্রদের উপর পড়তো—প্রশাসনিক বিষয়, হল সংসদের বিষয়, ছাত্র রাজনীতির বিষয়, আর হলের সার্বিক আবহের বিষয়—সব কিছুতে। তখন সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক মাজহারুল হক। সলিমুল্লাহ হলে আমার বন্ধুদের অনেকেই ছিল অর্থনীতির ছাত্র; তাদের কাছে ও তাদের পূর্বসূরিদের কাছে মাজহারুল হক সাহেবের মেলা গল্প শুনেছি। যেমন বিভাগের অনেকের কাছে তিনি 'মিজারেবল হক' নামে পরিচিত—বিষয়বস্তু সহজ করে বোঝাতে তাঁর চেষ্টার অভাবের কারণে। কিন্তু তাঁর কাছে ভর্তি-পূর্ব দেখা করতে যখন গেলাম তখন বেশ সপ্রতিভ একটি ব্যক্তিত্বকে দেখলাম—মনে হলো এই ঋজু-দেহী, স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষটির একটি চাপা রসবোধ আছে, এবং হলজীবনটিকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে সম্মানের চোখে দেখেন। আমাদের হলের বিখ্যাত দারোয়ান নাজুর মুখে শুনেছি

ছাত্রাবস্থায় এই হলেই হাউস টিউটরদের সঙ্গে তাঁর দুর্বিনীত ব্যবহারের কথা; কিন্তু সে কথা এখন তিনি মনে রেখেছেন বলে মনে হলোনা। এখন বরং তিনি হলের বনেদিয়ানা এবং ছাত্রদের সম্মিলিত সৃজনশীল উদ্যোগগুলোর কথা নবাগত আমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ঐ যে নাজ্জু দারোয়ান তারও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল এই বনেদিয়ানায়। বহু দিন ধরে ব্যাচের পর ব্যাচে ছাত্ররা সলিমুল্লাহ হলের সুন্দর প্রবেশ দ্বারের অঙ্গাঙ্গীক অংশ হিসেবে দেখে এসেছে ভারি পাকানো গোঁফ, আকর্ষণীয় পাগড়ি, ও ফিটফাট পোষাক পরা সদা উপস্থিত বিহারি নাজ্জু দারোয়ানকে। যতই কনিষ্ঠ ছাত্র হোক না কেন, এবং দিনের মধ্যে যত বারই তিনি হল থেকে আসা যাওয়া করুন না কেন, প্রবেশ দ্বারে যাওয়া মাত্রই নাজ্জু তার লম্বা সালামটি ঠুকবে, বলবে 'সালাম সাব'। নাজ্জু নিজেই ছিল একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ গুলি চালাবার পর থেকে কয়েক দিন হলে কী কী ঘটেছিলো তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নাজ্জুর কাছে শোনেনি এমন কোন ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবেনা; বিশেষ করে সেই ঘটনার কথা যখন সশস্ত্র পুলিশ ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য ও সলিমুল্লাহ হলে ফিট করা ঘোষণা দানকারী মাইকটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য হল আক্রমণ করেছিলো। তখন নাজ্জু হলের কলাপসিবল গেইটটি তালায় আটকে দিয়ে নিজে সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। পুলিশ ফিরে গিয়েছিলো। পাশ করে হল ছেড়ে যাবার পর অনেক ছাত্রের সঙ্গে নাজ্জুর অন্তত আর একবার দেখা হতো। কারণ প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকে তাঁদের বিয়ের পাগড়িটি নাজ্জুকে দিয়ে বাঁধাতেন। শুনেছি এই নাজ্জু মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মারা গিয়েছিলো।

হাউস টিউটরদের মধ্যে প্রথম পরিচিত হলাম ইতিহাসের শিক্ষক ড. গিয়াস উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে (পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী)—তাঁর সঙ্গেই আমাদের নিয়মিত প্রশাসনিক যোগাযোগগুলো ঘটতো। তরুণ সুদর্শন এই শিক্ষক সাধারণ আনুষ্ঠানিক কাজকর্মের ফাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে খুব মজা করে গল্প করতেন। যেমন সেই প্রথম দেখাতেই শোনলাম তিনি অপেক্ষমান ছাত্রদেরকে আন্দোলন সম্পর্কে বলছেন—'তোমরা তো দেশের মূল সমস্যাগুলোর দিকে তাকাচ্ছোনা—শুধু জপে যাচ্ছ "আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক", সমস্যাগুলো সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট বক্তব্য কই?' এই যে শ্লোগান 'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক', এটিই ছিল আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-থাকা কালীন সময়ের মূল সুর—নানা ভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছিলো।

১৯৬২ তে এখানে আমার প্রথম বছরে ছাত্র রাজনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেছিল; এবং সে কারণে ছাত্রদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনও। এদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল পুরোনো দল, কিছু কিছু সম্প্রতি গড়ে ওঠেছিলো। ছাত্র ইউনিয়ন (এপসু) বামপন্থী দল; ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে সমর্থনকারী দল,

ছাত্র শক্তি মধ্য-ডানপন্থী দল—পাকিস্তানের ইসলামী ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, আবার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ও অন্যান্য বিষয়েও ইসলামী আদর্শের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমুদ্দুন মজলিশের' অনুসরণে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার নিয়ে সচেতন; ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন এস এফ) নতুন গঠিত রক্ষণশীল দল, পরে আইয়ুব খানের খোলাখুলি সমর্থক হলেও তখন শুধু ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির উর্ধে থেকে লেখাপড়া ও নিজেদের বিকাশের উপর জোর দিতো এবং পাকিস্তান ও ইসলামের মৌলিক সংহতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে বলতো। পরে আর একটি দল আসরে এসেছিলো জামাত ইসলামীর ধ্যান ধারণা নিয়ে—ইসলামী ছাত্র সংঘ। একটি বিষয় খুব স্পষ্ট—এই দলগুলোর কেউ প্রকাশ্য ভাবে সামরিক শাসনের প্রতি কোন সমর্থন দিতে রাজি ছিলোনা, যদিও এনএসএফ আইয়ুব শাহী ধ্বংস হোক শ্লোগান তেমন জোরালো ভাবে তুলতোনা। নতুন ছাত্ররা এলে তাদেরকে নিজ নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করতেন প্রধান ছাত্র নেতারা, বিশেষ করে কোন দিক থেকে একটু ব্যতিক্রমী সম্ভাবনা যে সব ছেলে দেখাতো তাদেরকে তো বটেই।

সবার আগে যেই ছাত্র নেতার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো তিনি হলেন সলিমুল্লাহ হলের ভিপি খুরশিদ হামিদ (পরে ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তা, চীন সহ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত)—এনএসএফের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কায়সার ভাই (আতাউর রহমান খান কায়সার) বল্‌লেন তিনি আমাকে ভিপি'র কাছে নিয়ে যাবেন, কারণ নবাগতদের ভিপি'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা সলিমুল্লাহ হলের ঐতিহ্যের অংশ। কায়সার ভাই নিজে কিন্তু ছাত্র শক্তির নেতা ছিলেন; কিন্তু ভিপি মানেই সম্মানের পাত্র, কোন দলের সেটি কোন প্রশ্ন নয়। স্নেহ-ভাজন হিসেবে আমার জন্য তিনি এটি করেছিলেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, তাই ভিপি সাহেব তাঁর কামরায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভিপি একটি বিশেষ বড় কক্ষে থাকতেন যাতে পাখা লাগানো ছিল। ওখানে সোফা ছিল অভ্যাগতদের বসার জন্য। সে সময় ছাত্রদের কক্ষে পাখা ছিলোনা। খুরশিদ হামিদ সাহেবের মধ্যে ছাত্র নেতার ভাবসাব নয়, দেখলাম তখনই একজন পাক্কা সুপেরিয়র সার্ভিস অফিসারের কায়দাকানুন। তিনি বেশ কিছু উপদেশ দিলেন হল-জীবনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জীবন দক্ষতাগুলো বিকাশ করতে—যেমন সাংস্কৃতিক বিকাশ, একযোগে গঠনমূলক কাজের ক্ষমতার বিকাশ ইত্যাদি, কিন্তু ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বল্‌লেননা। খুরশিদ হামিদের ওরকম একটি আরামের কক্ষে থাকাটি পরে সমালোচিত হয়েছিলো। কক্ষটি নাকি আগে ছোট খাট তৈজস ইত্যাদি বিক্রয়ের শপ-কর্নার ছিল। এরপর থেকে ভিপি'রা একটি সাধারণ ছোট কক্ষে থাকতেন যা একটি প্ল্যাকার্ড দিয়ে ভিপি'র জন্য চিহ্নিত ছিল।

বিভিন্ন দলের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতাদের মধ্যে আমাদের হলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিলেন দলের

সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ (প্রয়াত ও এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন), আর ছিলেন রাশেদ খান মেনন (বর্তমানে আওয়ামী লীগ জোট সরকারের মন্ত্রী)—দু'জনেই অনাবাসিক ছাত্র। আমি তাঁদের দলে থাকবো সেটি তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, আমার ইউএসপিপি পটভূমি তাঁদের জানা ছিল। তাছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হায়দার আকবর খান রনো, সাইফুদ্দিন মানিক, মোস্তফা জামাল হায়দার (পরে মন্ত্রী)—তাঁদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়েছে সে সময়েই। তবে এর মানে এই নয় যে অন্যান্য দলের নেতারা আমার প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁরাও চাচ্ছিলেন আমি তাঁদের দল সম্পর্কে জানি ও তার প্রতি আকৃষ্ট হই। এন এস এফ প্রধান আবুল হাসনাতের (পরে রাজনীতিবিদ, ঢাকার মেয়র) সঙ্গে গোড়াতেই আলাপ হয়েছিলো হলে; অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ, মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেও দেখা হতো—সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করতাম দেখলেই তিনিই বরং রাস্তা পার হয়ে এসে আলাপ করতেন, এমনকি আগে সালামটিও দিয়ে দিতেন। এটি কি তাঁর পুরোনো ঢাকার বনেদি পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে না সলিমুল্লাহ হলের ঐতিহ্যের,তা কখনো বুঝতে পারিনি। একদিন এক বন্ধু জানালো ছাত্র লীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (পরে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি'র রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী) আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সে আমাকে শাহ মোয়াজ্জেমের বাসায় নিয়ে গেল। তিনি অনেক্ষণ ধরে আমাকে বোঝালেন কেন ছাত্র লীগই একমাত্র নেতৃত্ব দিতে পারে ছাত্র আন্দোলনে, কিন্তু এই দলের কোন গুণে আমার ছাত্র লীগ করা দরকার সে সম্পর্কে ভাল কোন যুক্তি দিতে পারলেন না। বল্লেন সবাই এ দলকে বলে মিডল ইস্ট, কারণ এটি মধ্যপন্থী—না রাইটিষ্ট না লেফটিষ্ট; এই মধ্যপন্থাটিই ছাত্র লীগের আদর্শ। তিনি সোহরাওয়ার্দীকে তাঁদের পথ প্রদর্শক বলে দাবি করলেন। ছাত্র শক্তির একটি চায়ের দাওয়াতে গেলে কেউ একজন আমাকে এ দলের বড় নেতা ফরমান উল্লাহ খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ফরমান উল্লাহ খান চাটগাঁর মানুষ—বহু আগে থেকেই তুখোড় ছাত্র নেতা, ছাত্র শক্তির সভাপতি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং আধুনিক ধারার ইসলামী তমুদ্দুন ভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র তখন ছাত্র শক্তির সমর্থক হয়েছিলেন সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মওদুদ আহমদ (পরে মন্ত্রী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিএনপি নেতা)। বেশ কয়েক বছর আগে দুর্ঘটনায় ফরমানউল্লাহ একটি পা হারিয়েছিলেন, ও সময় কৃত্রিম পায়ে চলছিলেন।

হলে আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে আমাদের ঠিক আগের বছরে ছাত্রদের কেউ কেউ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এভাবেই গোড়া থেকে ঘনিষ্ঠ ও গুণমুগ্ধ হই ছাত্র শক্তির আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী (পরে সচিব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা) ছাত্র ইউনিয়নের আকবর আলী খান (পরে ক্যাবিনেট সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা), জালাল উদ্দীন (পরে শিক্ষক, সচিব; দীর্ঘকাল গুরুতর অসুস্থ থেকে প্রয়াত) আবদুল মান্নান ভূঁইয়া (পরে বিএনপি মহাসচিব, মন্ত্রী),

এনএসএফের তৌফিক এলাহি চৌধুরী (পরে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা), আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (পরে অর্থনীতিবিদ)—প্রমুখের সঙ্গে। এরকম অনেকে খুব সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমার চোখে। মুয়ীদ ভাই খুবই ফুর্তিবাজ, সদালাপী মানুষ—রুমে তাসের আর আড্ডার আসর বসাতেন প্রায়ই। আকবর ভাই ছিলেন জ্ঞানী মানুষের প্রতীক—ইতিহাসের ছাত্র হয়ে সব বিষয়ে তুখোড় আলাপ করেন। মান্নান ভাই তখন থেকে পাকা রাজনৈতিক কর্মী—ছাত্র ইউনিয়নই তাঁর প্রাণ, তৌফিক ভাই ও আবদুল্লাহ ভাই দুজনেই হরিহর আত্মা, উভয়ে অর্থনীতির ছাত্র, সব সময় এক সঙ্গে চলেন; কিন্তু ব্যক্তিত্ব দু'য়ের সম্পূর্ণ আলাদা। তৌফিক ভাই সে সময় একেবারে আধুনিক স্মার্ট—পোষাকে পরিচ্ছদে যাকে তখন বলা হতো টেডি বয়। তবে মাত্র বছর খানেক পর একবার তাঁর কেন যেন ভাবান্তর হয়েছিলো—হঠাৎ খুউব ইসলামী হয়ে পড়েছিলেন, হলের মসজিদে আজান দিতেন। আবদুল্লাহ ভাই বরাবরই আত্মমগ্ন দার্শনিকের মত, কথা বলতেন স্বগতোক্তির মত—সব বোঝা যেতো না।

একটু বেশি সিনিয়র ছাত্রদের কারো কারো কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম সেই শুরু থেকেই। তাঁদের মধ্যে প্রায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহলেই ঢুকে গিয়েছিলাম—ছাত্র ইউনিয়নের মোস্তাফা কামাল ও জাকির আহমদের (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) সঙ্গে, প্রধানত শাকুর ভাইয়ের কারণে। শাকুর ভাই, কামাল ভাই আর জাকির ভাই মিলে ছিল একটি ত্রয়ী—তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল একেবারে নাকউঁচু ভঙ্গিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনের চর্চা করা, মাঝারি গোছের বোদ্ধাদের খুব একটি আমলে না নেয়া, বাংলা ও ইংরেজি কঠিন কঠিন কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা, সাধারণ বিষয়ের কথা এমনকি সাধারণ রাজনীতির কথাও তাঁদের মনোযোগের অযোগ্য বলে মনে করা। এর মধ্যে শাকুর ভাই কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন এই অর্থে যে তিনি ছাত্র রাজনীতির দৈনন্দিন বিষয়ে আগ্রহ নিতেন এবং গান রচনা, সে গান গাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়নের কাজে ভাল সহায়তা দিতেন। অন্যদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যার সিনিয়র ছাত্র চৌধুরী সফি সামি যিনি এ বছরের শেষের দিকে হলের নতুন ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন এনএসএফ থেকে। ছিলেন ছাত্র শক্তির সমর্থক মিজানুর রহমান শেলী (পরে রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমাজ কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী)। তাঁরা দু'জনেই ছাত্র মহলে খুবই গুণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে শেলী ভাই ইতোমধ্যেই সর্বত্র একজন বিদগ্ধজন ও ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষায় বাগ্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আর একজন ওয়ালিউল ইসলামকে (আগে বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রতিনিধি) সরাসরি ছাত্র রাজনীতির কাজে দেখা না গেলেও তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের একজন প্রাণ পুরুষ (পরে সরকারের সচিব)। এ কারণেই বোধ হয় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে 'গ্র্যান্ড মুফতি' বলতেন।

এই যে হলের বিভিন্ন বিশিষ্ট ছাত্রের সঙ্গে শুরু থেকেই আলাপ পরিচয়, কারো কারো সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠতা, এর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে একটি তুচ্ছ সাধারণ

বিষয় কাজ করেছে তা হলো যাঁরা হলের 'ওয়েস্ট হাউসে' ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনাটি বেশি ছিল আমি নিজেও সেখানে ছিলাম বলে। আমি নিজে যে ওয়েস্ট হাউসের, তার কারণ ইউনূস ভাই ও তাঁর অধিকাংশ বন্ধু আগে ওয়েস্ট হাউসের ছিলেন, আমার ঘনিষ্টতর বন্ধুদেরও অধিকাংশ ওয়েস্ট হাউসের, এমনি একটি ব্যাপার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মোগল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি সলিমুল্লাহ হলের বর্গাকৃতির যে দোতলা প্রাসাদতুল্য ভবন, তার মাঝখানটি ছিল একটি মোগল গার্ডেন। মূল ফটক থেকে বাগানের মধ্য দিয়ে সোজা ডাইনিং রুমের দিকে যে আচ্ছাদিত প্রশস্ত করিডর চলে গেছে সেটি পুরো হলকে ওয়েস্ট হাউস ও ইস্ট হাউস এই দুটি সমান অংশে ভাগ করে ফেলেছে একেবারে নিঁখুত প্রতিসাম্যে—একটি যেন অন্যটির হুবহু আয়নায় প্রতিবিম্ব। শুধু ডাইনিং রুম, কমন রুম, লাইব্রেরি ও প্রভোস্ট অফিস এসবই উভয় হাউসের জন্য সাধারণ ছিল, অন্য সবকিছু আলাদা। প্রশাসনিক ভাবে দুই হাউস আলাদা, ভিন্ন হাউস টিউটরদের অধীনে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো দুই হাউসের প্রত্যেকটিতে কেমন যেন একটি ভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ভিন্ন সংস্কৃতির ব্যাপারটি অবশ্য অনেকটা আমাদের কল্পিত একটি জিনিস ছিল, নেহাত একটি মনস্তাত্বিক ব্যাপার। ব্যাপারটি এমন ছিলো যে দুই হাউসের দু'জন হয়তো একসঙ্গে বাইরে থেকে এসে মাঝের করিডর দিয়ে সোজা ডাইনিং রুমের দিকে যাচ্ছে, ওখানে ঢোকার আগে কমন রুমকে ছাড়িয়ে যেতে হবে হয় একে বাম দিক থেকে অতিক্রম করে (ওয়েস্ট হাউসের দিক দিয়ে) অথবা ডান দিক থেকে অতিক্রম করে (ইস্ট হাউসের দিক দিয়ে)। যদিও একেবারে সমান দূরত্ব পাড়ি দিয়ে একই জায়গায় যাচ্ছে তবুও হয়তো দেখা যাবে ওয়েস্ট হাউসের জন বাম দিক দিয়ে তা করলো, অন্য জন ডান দিক দিয়ে। এ অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে হয়ে যাচ্ছে—যাকে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'হাউস বায়াস' (পক্ষপাতিত্ব)। স্বাভাবিক ভাবেই 'রুম মেইট', 'সিষ্টার রুম মেইট' এরা নিজের হাউসের হতো, আর হল জীবনের রুম মেইট মানে অনেক কিছু—শুধু তখনকার জন্য নয়, অনেকটা সারা জীবনের জন্য। আর 'সিষ্টার রুম মেইট' হলো নিজের রুমের পরের বা আরো পরের রুমের বাসিন্দারা—তারাও কম কিছু নয়।

আনুষ্ঠানিক গৃহ-প্রবেশের পর আমার ঠাঁই হলো একটি ডাবল সীটেড রুমে আহমদ উল্লাহর (চট্টগ্রাম কলেজের বন্ধু) সঙ্গে। এটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার কারণ পুরো হাউসে এররকম কয়েকটি মাত্র কক্ষ ছিল। মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার সুবাদে আমরা এর একটি পেলাম। বাকি সবাই চার বিছানার রুমে, পরের বছরে আমরা দু'জনও তাই। আমার বছরের অন্য কয়েক জনের সঙ্গে দ্রুত ঘনিষ্ঠতার দল গড়ে উঠলো; কেউ আগে থেকে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সহপাঠী ছিল বলে—যেমন ইফতেখার গণি চৌধুরি (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), রেজাউল করিম এবং আরো

কয়েকজন; কেউ একই ছাত্র রাজনীতির কারণে বা অন্যান্য নানা কারণে—যেমন আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। আহমদ উল্লাহকে একমাত্র রুমমেট হিসেবে নিয়ে ডাবল সীটেড রুমে থাকা একদিকে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। আগেই বলেছি সে কেমন তীব্র চিন্তাশীল মানুষ—অনেক বিষয়ে তার ভাবনার সীমা পরিসীমা ছিলনা, আর এসব ভাবনায় আমাকেও অংশীদার করার চেষ্টা করতো। বাংলা-ইংরেজি ফুলেল ভাষা প্রয়োগে তার বেশ মুনশিয়ানা ছিল। এ জন্যই ওই বছর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সে চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডাল পেয়েছিলো। অনেক সময় সে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতো আর ঘুম থেকে ওঠা মাত্র আমাকে জানিয়ে আমার পরামর্শ চাইতো স্বপ্নের ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য। যেমন কিউবান মিসাইল সংকট যখন চরমে তখন সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো। ওই সময় সোভিয়েত রাশিয়া ফিডেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবী কিউবায় পারমাণবিক অস্ত্রযুক্ত অনেক মিসাইল স্থাপন করেছিলো যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই হওয়াতে মার্কিন নিরাপত্তার জন্য ভীষণ হুমকি হয়ে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এর প্রতিবিধানে কিউবার চারদিকে সমুদ্রে মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে কোন জাহাজ (বিশেষ করে সোভিয়েত জাহাজ) ওখানে আসা যাওয়া করে তাকে রসদ যোগাতে না পারে; সেই সঙ্গে সোভিয়েতকে এই অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করলে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে সোভিয়েত প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে জানিয়েছিলেন যে সোভিয়েত নৌবাহিনীর জাহাজ অবরোধ উপেক্ষা করে কিউবার দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে সারা বিশ্ব কয়েকটি দিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে উৎকণ্ঠিত ছিল। এমন দিনে আহমদ উল্লাহ একদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে বল্লো সে স্বপ্ন দেখেছে যে তার শিয়রের এক পাশে কেনেডি ও অন্য পাশে ক্রুশ্চভ এসে বসেছেন; দু'জনেই নিজ নিজ পক্ষের কথা তাকে বোঝাচ্ছিলেন এবং তার পরামর্শ চাচ্ছিলেন এখন দুনিয়াকে কী ভাবে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে বাঁচানো যায়, নিজের হার স্বীকার না করে। আহমদ উল্লাহ তাঁদেরকে কোন পরামর্শ দিয়ে ওঠার আগেই তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সোভিয়েত জাহাজগুলো অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঘুরে গিয়েছিলো, এবং আমেরিকা কিউবায় ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করার চেষ্টা না করার শর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মিসাইলগুলোও প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো। স্পষ্টত এসব সমস্যা নিয়ে আহমদউল্লাহ খুব ভাবতো।

আইয়ুব খানের রাজনীতি

আমি যে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম সেই ১৯৬২ সালেই আইয়ুব খান মার্শাল ল' প্রত্যাহার করে এক রকম রাজনৈতিক শাসন চালু করেছিলেন, নতুন একটি শাসনতন্ত্র জারি করে। কিন্তু আইয়ুব খানের রাজনীতিটির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে। ১৯৫৯ থেকেই তিনি সামরিক বাহিনীকে দেশ শাসনের কাজ

থেকে একটু অদৃশ্যে রেখে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ওপরেই এ কাজ বেশি বেশি দিতে থাকেন, এবং একই সঙ্গে নিজের জন্য ব্যাপক জন-সংযোগ উদ্যোগ নিতে থাকেন। তাছাড়া এ সময় তিনি কিছু কিছু অত্যন্ত সাহসী সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেন। আগাগোড়া সময়ে অবশ্য সকল রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ থাকে। সংস্কার কাজগুলোর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার—যেখানে অত্যন্ত বিশাল ভূ-স্বামীদের ভূমির পরিমাণ কিছুটা সীমিত করে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদের মাধ্যমে এ কাজ বহু আগেই এখানকার প্রাদেশিক সরকারগুলো করে ফেলেছিলো। অন্য সংস্কারটি ছিল মুসলিম পারিবারিক আইন যার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসনের উদার ব্যাখ্যা করে বহুবিবাহ ও পুরুষের জন্য তালাক দেবার প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট কঠিন করে ফেলা হয়; এবং তালাকের পর পুনর্বার একই স্ত্রীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কুখ্যাত 'হিল্লা' বিয়ে ব্যবস্থা (মাঝখানে বাধ্যতামূলকভাবে অন্য একজনকে বিয়ে করা) বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানের নিরিখে পারিবারিক আইনের সংস্কারটি যে কী প্রচণ্ড সাহসিকতার কাজ ছিল আজো মানুষ সেটি অনুভব করে। আজো নারী ক্ষমতায়নের প্রশ্ন উঠলে ১৯৬১ সনের এই সাহসী পদক্ষেপটি সবাইকে স্মরণ করতে হয়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে খুশি করার জন্য যে সব প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি আইয়ুব খান দিলেন সেগুলো সেরকম কিছু ছিলনা। তিনি ইসলামাবাদে নতুন কেন্দ্রীয় রাজধানী তৈরির উদ্যোগ নিয়ে ঢাকাকে জাতীয় সংসদের রাজধানী বা 'দ্বিতীয় রাজধানী' ঘোষণা করেন। ব্যবস্থা থাকে যে সংসদের একটি অধিবেশন ইসলামাবাদে হলে পরেরটি ঢাকায় হবে; তা ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট, পরিকল্পনা কমিশন এগুলোও ঢাকায় মাঝে মাঝে অধিবেশন করবে। সরকারী বিনিয়োগও (বেসরকারী নয়) পূর্ব পাকিস্তানে কিছুটা বাড়ানো হলো।

আইয়ুব খান এরপর আসল রাজনৈতিক পদক্ষেপটি নিলেন। পাকিস্তানকে প্রচলিত গণতন্ত্রের জন্য 'অতিরিক্ত গরম' আখ্যায়িত করে তিনি এই দেশের নিজস্ব 'প্রতিভার' জন্য উপযুক্ত বলে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করলেন সেই ১৯৫৯ সালেই। এতে সরাসরি নির্বাচিত করা হলো শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে। ইউনিয়ন কাউন্সিল সহ পর পর পাঁচ স্তরের এ রকম স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হলো—থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ, বিভাগীয় পরিষদ এবং উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ—যেগুলোর প্রত্যেকটি আগের স্তরের সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্য এবং কিছু মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত; এর মধ্যে কোন কোনটি আবার আমলার সভাপতিত্বে। এই স্থানীয় পরিষদ সদস্যদের সবাইকে বলা হলো 'মৌলিক গণতন্ত্রী'; এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হলো একটি নির্বাচক মণ্ডলী যারা হবে আইয়ুব খানের রাজনীতির ভিত্তি। বলতে গেলে এদের নিয়েই চলবে তাঁর রাজনৈতিক ঘর-সংসার। ওই ৮০ হাজার মানুষই

নির্বাচন করবেন দেশের প্রেসিডেন্টকে, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে, এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যদেরকে। শুরু থেকেই মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হাসিঠাট্টা কম হয়নি; এমনকি সামন্ততন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানেও। ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত বাগ্মী প্রধান বিচারপতি (হাইকোর্টের) জাস্টিস কায়ানীর একটি মন্তব্য 'বার্ডস, বীস্টস অ্যান্ড বেসিক ডেমোক্রেটস' আমাদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছিলো। কিন্তু মৌলিক গণতন্ত্রী নামের রাজনৈতিক ওই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত; এমনকি পরে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনের সময় সহপাঠীদের সঙ্গে আমি নিজেও ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাছে ধরনা দিয়েছি। তবে এর বহু আগে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর প্রথম কাজ হলো প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইয়ুব খানকে প্রথম বারের মতে নির্বাচিত করে নেয়া, তাঁদের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে ১৯৬০ সালে ওই মার্শাল ল'র মধ্যেই। ওটি ছিল একটি হ্যাঁ-না ভোট, এবং প্রত্যাশিত ভাবেই হ্যাঁ ভোট পড়েছিল শত ভাগের প্রায় কাছাকাছি।

১৯৬০ সনে সুপ্রিম কোর্টের জাষ্টিস শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে এবং দুই প্রদেশ থেকে পাঁচ জন করে সদস্য নিয়ে আইয়ুব খান একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ দেন। তাঁরা এর যে খসড়া দেন প্রেসিডেন্ট এর উপর নানা সম্পাদনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সনের মার্চ মাসে দেশের নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রইলো—নির্বাহী বিভাগ সম্পূর্ণ তাঁর হাতে রইলো। মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা একচ্ছত্র ভাবে তাঁর। প্রাদেশিক প্রধান নির্বাহী গভর্নরও তিনিই নিয়োগ করবেন। তাঁর হাতে অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা রইলো, বাজেট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রইলো এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণারও ক্ষমতা রইলো। একই নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ১৫৬ সদস্যের জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদ দুটি আইন প্রণয়নের কাজে থাকবে, তবে নির্বাহী বিভাগের উপর তাদের কার্যত কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা। ওই মার্চে সংসদগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন হলো; এবং সেটি হলো রাজনৈতিক দলগুলো এখনো নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায়। জুন মাসে নতুন শাসনতন্ত্রটি জারি হয় এবং মার্শাল ল' প্রত্যাহার করা হয়। আরো পরে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ইসলামাবাদে নতুন নির্মিত 'আইয়ুব হলে' নিয়মিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনগুলোতে আইয়ুব বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অর্থহীন বিতর্কও হতে থাকলো।

এবার আইয়ুব খান সরাসরি রাজনীতিতে নামলেন এবং মুসলিম লীগের মধ্য থেকেই নিজের একটি দল গড়ে তুল্লেন। অন্যান্য দলগুলো যার যার মত পুনরজ্জীবিত হলো এবং ক্রমে আন্দোলনের জন্য একটি আইয়ুব বিরোধী মোর্চা গড়ে তুললো। আইয়ুব খানের মুসলিম লীগকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারটি একেবারে নির্বিঘ্ন হলো না। এর জন্য একটি কনভেনশনের আয়োজন করা

হয়েছিলো, কিন্তু মুসলিম লীগের অনেক পুরোনো ও প্রভাবশালী নেতা এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। কার্যত এভাবে মুসলিম লীগ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। যারা আইয়ুব খানের সঙ্গে গেলেন তাঁদের দলকে মানুষ কনভেনশন মুসলিম লীগ হিসেবে চিনতো। অন্য ভাগটিকে বলা হতো কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কারণ এর নেতারা যথারীতি দলের কাউন্সিল ডেকে আদি মুসলিম লীগের উত্তরাধিকার দাবি করছিলেন। প্রথম যখন কনভেনশনে যোগ দিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে যাচ্ছিলেন বিমান বন্দরে তাঁদেরকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছিলো, এমন কি নানা জিনিস ছুঁড়েও মারা হয়েছিলো তাঁদের লক্ষ্য করে, যার ফলে মোনেম খানের টুপি পড়ে গিয়েছিল এসব দৃশ্যের কথা তখন পত্রিকায় বড় খবর হয়েছিলো। এই ভাবে হেনস্থা হবার দলে ছিলেন মোনেম খান ছাড়াও ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুস সবুর খান প্রমুখ। অন্য একজনের জন্য সেদিন আমার একটু দুঃখ লেগেছিল—তিনি হলেন প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খান। আমার কাছে তাঁর পরিচয় রাজনীতির মানুষ হিসেবে মোটেই ছিলনা, ছিল সুসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে। তাঁর দুটি ভ্রমণ কাহিনী 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' এবং 'পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে' আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিলো। অথচ আইয়ুব খানের কনভেনশনে যেতে গিয়ে এমন মানুষকেও হেনস্থা হতে হয়েছিলো। কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে রইলেন মুসলিম লীগের বনেদি ওল্ড গার্ডদের মধ্যেই কেউ কেউ—খাজা নাজিম উদ্দিন, নুরুল আমিন প্রমুখ। পশ্চিম পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছে, তবে সেখানে আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক নীতির কথা বলা হলেও মুসলিম লীগ কনভেনশন ও কাউন্সিলে ভাগ হলো মূলত বিভিন্ন বড় নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষির ভিত্তিতে। সরকারী অনুগ্রহ পেয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগ ক্রমে ফুলে ফেঁপে ওঠে। ফলে মৌলিক গণতন্ত্রীরাতো বটেই জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদগুলোর সদস্যরা ব্যাপক হারে এতে শামিল হয়ে যান।

মার্শাল ল'র সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে লেফটেন্যান্টে জেনারেল আজম খান এখানে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। এখন আইয়ুব খানের রাজনীতির সঙ্গে তিনি আর খুব একটি সঙ্গতিপূর্ণ রইলেননা। কাজেই ১৯৬২ এর মে মাসে এই পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে একজন প্রাক্তন সচিব ও শিল্পবিশেষজ্ঞ গোলাম ফারুককে গভর্নর নিয়োগ করা হয় অল্প সময়ের জন্য। ইতোমধ্যে আইয়ুব খানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোনেম খান নানা ভাবে তাঁর প্রিয় ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ওই বছরেই কয়েক মাস পর তাঁকেই দীর্ঘস্থায়ী রূপে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আইয়ুব শাসনের পরবর্তী অধ্যায় প্রধানত আইয়ুব-মোনেমেরই শাসন—যাতে মোনেম খানের প্রভুভক্তি কোন রকম সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল। তিনি একমনে সকল নিষ্ঠা দিয়ে আইয়ুবের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে গেছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেকখানিই এই আইয়ুব-মোনেমের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে কেটেছে।

মে' মাসে জেনারেল আজম খান যখন ঢাকা ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন পদার্থবিদ্যা বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেছি অল্প কিছুদিন হলো। কিন্তু আজম খান ম্যাজিকটি তখনো কাজ করছিলো। ওই যে কলেজের শুরুতে তাঁর কল্যাণে বিশেষ ট্রেনে ঘুরে ঘুরে দেশ দেখতে পেরেছিলাম, এখানেও শুরুতেই সে রকম একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম, সেই একই উদ্যোগের অংশ হিসেবে। তবে এখন আমরা পদার্থবিদ্যার ছাত্র—তাই আমাদের দেশ দেখা হবে দেশের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি সরেজমিনে দেখার উছিলায়। আমরা মূলত ওয়াপদা অর্থাৎ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থার অতিথি হিসেবে দেশের নানা জায়গায় গেলাম। আমাদের নেতৃত্ব দিলেন রফিকুল্লাহ স্যার (পরে বিজ্ঞানের ডীন, কৃতী পদার্থবিদ, অকাল প্রয়াত)। মেধা তালিকায় থাকার সুবাদে এবারও নেহাত প্রথম বর্ষের ছাত্র হয়েও আমরা ক'জন এই ভ্রমণের দলে স্থান পেয়ে গেলাম। বাকিদের অনেকে পদার্থবিদ্যার সিনিয়র ও পাকা ছাত্র। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এর মাধ্যমে পেয়ে গেলাম। দলেবলে চট্টগ্রাম হয়ে আমরা কাপ্তাই গেলাম, পুরো একটি লঞ্চ ভাড়া করে কর্ণফুলির উজানে গিয়ে। কিন্তু এবার ছোট বেলায় আব্বার সঙ্গে ভ্রমণের মতো শুধু নবীন প্রকৌশলীর হাতের নীলনক্সায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখতে হলোনা—এটার যারা মালিক সেই খোদ ওয়াপদার মেহমান হিসেবে চোখ ধাঁধানো চলমান জ্বলজ্যান্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হতে দেখলাম তার সম্পূর্ণ গরিমায়।

ঢাকার এত জন ছাত্র যখন চট্টগ্রামে এসেছে বেড়াবার নেশা নিয়ে, তারা কি কক্সবাজারে না গিয়ে ছাড়বে? কক্সবাজারে যাওয়া ততদিনে আর এতটা অ্যাডভেঞ্চার থাকেনি—মোটামুটি সুগম হয়ে গিয়েছিলো সড়ক পথেই। আজম খানের স্কীমের মধ্যেই যেন সেখানে যাওয়া যায় সে জন্য নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র ক'জন ঠিক করেছিলেন যে ওখানে গিয়ে সাগর তীরে মহাজাগতিক রশ্মির পটভূমি বিকিরণ মাপবেন। দেশের বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলে এই বিকিরণের জরিপ করা প্রয়োজন ছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদের দলের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। সিনিয়র ছাত্ররা যখন এসব করছিলেন আমরা কয়েকজন একদিন কক্সবাজার বিমান বন্দরে চলে গেলাম, কারণ শুনেছি ওখানে ঢাকা থেকে বিমানে গভর্নর আজম খান আসছেন কক্সবাজারের জনগণ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য। বিদায়ের আগে তিনি ওরকম আরো নানা জায়গায় গেছেন—তবে কক্সবাজারের ব্যাপারটি একটু আলাদা। কিছুদিন আগে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়ে গেছে এই অঞ্চলে, আজম খান সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ কাজ পরিচালনা করছেন দুস্থ মানুষের পাশে গিয়ে। তিনি যাবার আগে তাঁদেরকে দেখে যেতে এসেছেন। কক্সবাজার বিমান বন্দরটি একটি খোলা বিশাল মাঠের মত; দেখলাম সেখানে এলাহি কাণ্ড, অসংখ্য মানুষ—প্রায় সবাই গরীব মানুষ; যথারীতি তাদের হাতে লাউ, কুমড়া, মুরগি, ডিম ইত্যাদি নানা জিনিস। বিমান থেকে আজম

খানকে নামতে দেখলাম, অভ্যর্থনা করলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবু জাফর ওবায়েদ উল্লাহ (কবি, পরে সচিব), আর কক্সবাজারের তরুণ এসডিও। নামার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার 'জেলে ভাইয়ো আর চাষি ভাইয়োরা' ছুটে গিয়ে আজম খানকে অদৃশ্য করে দিলো। পরে মাঝে মাঝে দেখলাম এর হাত ধরে, ওর কাঁধে হাত দিয়ে, কোন রকমে এক পা দু'পা করে এগুচ্ছেন তিনি। এমনিই ছিল আজম খানের ম্যাজিক। ১৯৬২ এর এই মে' মাসে আইয়ুব খান প্রশাসনের এই কিছুটা জন-নন্দিত পর্বটির ইতি ঘটতে যাচ্ছিল।

ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিনগুলো

১৯৬২ সালটি ছিল আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরুর বছর, আর সে আন্দোলন শুরু করেছিল ঢাকার ছাত্ররা। এটি দুই দফায় হয়েছে—ফেব্রুয়ারিতে এবং আগস্ট-সেপ্টম্বরে। ফেব্রুয়ারির আন্দোলন আমি দেখিনি, কিন্তু এপ্রিলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর প্রচুর শুনেছি এর সম্পর্কে। আর আমাদের প্রথম দিককার বিশ্ববিদ্যালয় দিনগুলো ঝড়ের মুখে পড়েছিল আগস্ট-সেপ্টম্বরের আন্দোলনে—যেটি শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত। এর প্রত্যেকটি ঝাপটা আমরা সরাসরি অনুভব করেছি, যদিও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে খুব বেশি শরিক হয়েছি একথা বলতে পারবো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা মাত্রই অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন নয় তরুণ মহলে যা হৈচৈ তুলতে দেখলাম তাকে বলা যায় একটি 'সাংস্কৃতিক' আন্দোলন। এটি রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণদের বিরুদ্ধে অল্প কিছু সাহসী অতি-আধুনিক তরুণের এক রকম বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহ দমনের হৈচৈ বলা যায়। ওই আধুনিক তরুণরা তাদের আধুনিকতা প্রকাশ করতো খুব আটসাঁট জামা আর চোঙা আঁটসাট প্যান্ট পরে; অন্যরা তাদেরকে বলতো টেডি বয় (ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সময় এরকম পোষাকের চলন ছিল বলে)। অন্য তরুণরা তাদের প্রতি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাই হলের আশপাশে, নিউ মার্কেটে টেডি বয়দের দেখলে তাদেরকে আক্রমণ করা ছিল নিত্য ঘটনা। বিশ্ববিদ্যলয় ছাত্ররা এতে অগ্রণী না হলেও তারাও যোগ দিতো। যুক্তিবাদী হবার কথা যেই ছাত্রদের তাদের এরকম অসহনশীল আচরণ আমাকে ব্যথিত করতো। টেডি পেটানোর এই সাইড শো' টি অবশ্য বেশিদিন দেখতে হয়নি। সে সময় রঙিন ও চিত্রিত গেঞ্জি 'টি-শার্ট' রূপে কেউ কেউ ঘরোয়াভাবে পরতে শুরু করেছিলো। 'টি-শার্ট' পরে হলের ক্যান্টিনে বা ডাইনিং রুমে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, ক্লাসে তো বটেই; সে যুগের ছাত্রদের কাছে এটি ঘরে পরবার গেঞ্জি বই অন্য কিছু ছিলনা। এসব নিষেধাজ্ঞা অবশ্য কর্তৃপক্ষের নয়, ছাত্রদের নিজেদের।

হলে আমার দেখা প্রথম রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলনের ঠিক আগের পটভূমি ছিল বাষট্টির ফেব্রুয়ারির আন্দোলন। ১৯৬২ এর ৩০ জানুয়ারি মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ

সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করেছিলো। এই ঘটনাটি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভের একটি ট্রিগার হিসেবে কাজ করেছিল ছাত্রদের মধ্যে। তখন পর্যন্ত আইয়ুব খানের শাসন এমন দোর্দন্ড প্রতাপে চলছিল যে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হতে পারে সেটি অকল্পনীয় ছিল, এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পহেলা ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলো, তখন কর্তৃপক্ষ থ' হয়ে গিয়েছিলো। আগের রাতে সেক্রেটারিয়েট এলাকা ইডেন বিল্ডিংসের সুউচ্চ দেয়ালের গায়ে দশাসই এক একটি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা হয়ে গিয়েছিল 'ডাউন উইথ মার্শাল ল'। পহেলা ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানো হয়েছিল; পুলিশের লাঠিচার্জে অনেক ছাত্র আহত হযেছিল। কিন্তু যেটি আশঙ্কা করা হয়েছিলো সেটি হয়নি—গুলি চলেনি। পরে জোর গুজব ছিল গভর্নর আজম খানকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছিল গুলি করে ভবিষ্যতের জন্য ভীতির সঞ্চার করতে। তিনি নাকি ছাত্রদের উপর গুলি করতে সোজা অস্বীকার করেছিলেন। এটিও হয়তো আইয়ুব খানের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি ঘটার একটি কারণ ছিল। সরকার যথারীতি শেষ রক্ষা করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং হল খালির নির্দেশ দিয়ে। তারপরও আন্দোলন থিতিয়ে যেতে সময় লেগেছিলো।

এ বছরের (১৯৬২) শেষের দিকে হলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের সময় ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে কে কী করেছে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হতে শোনেছি। সলিমুল্লাহ হলের ভিপির কাছ থেকে আন্দোলনে একটি সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল, অথচ এনএসএফ সমর্থক (বাংলায় কেন জানি অনেকটা তুচ্ছার্থে বলা হতো নসফ) ভিপি খুরশিদ হামিদ গা বাঁচিয়ে চলেছেন, তবে তাঁর দলের গোপন আইয়ুব সমর্থন ও তাঁর নির্লিপ্ত জীবন যাপন সত্ত্বেও পুলিশি হেনস্থা থেকে রক্ষা পাননি—সেই সমালোচনা ছাত্র ইউনিয়নের শাকুর ভাইয়ের রচিত নির্বাচনী গান শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। জনপ্রিয় গান 'চুপ চুপ লক্ষ্মীটি, এক যে ছিলো তোমার মতই ছোট্ট রাজকুমার' গানটির অনুকরণে তিনি গাইতেন :

'চুপ চুপ বন্ধুগণ, গল্প মজার বলবোখন
এস এম হলের ভিপি ছিলেন নসফ রাজকুমার;
শপ-কর্নারের পাখা খুলে, টেবিলে দুই চরণ তুলে
ফেব্রুয়ারির আন্দোলনটি করে দিলো পার।'

এর পরের করুণ ঘটনাটিও ওই গানের ছন্দিত কথার চেয়ে ভাল কোন ভাবে বর্ণনা করতে পারবো না। 'এক দিন এক দুপুর সময়, লাঞ্চ খাচ্ছেন নসফ তনয়; দ্বারে এসে হাঁকলো পুলিশ "শুনছেন ভিপি স্যার"। ডাইনিং হলের দ্বার ছাড়িয়ে, ইকবাল হলের গেইট পেরিয়ে, থামলো এসে, ব্যারাক (নীলক্ষেত ব্যারাক) ঘেঁষে, শ্রান্ত কদম তাঁর। আহা গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি সাজে, দুই হাঁটুতে করতাল বাজে, আইয়ুব জপে ভিপি মোদের ঘামে একাকার।'

বাষট্টির আগস্ট-সেপ্টম্বরে শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনটি আমাদের চোখের সামনেই হয়েছিলো। এর স্ফুলিঙ্গটি শুরু করেছিলো ১০ আগস্ট ঢাকা কলেজের ছাত্ররা—শরীফ কমিশনের সুপারিশে স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়টি বাধ্যতামূলক করাটাই ছিল বিক্ষোভের তাৎক্ষণিক কারণ, পরে কমিশনের অন্যান্য সুপারিশগুলোর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ এসেছে। ঢাকা কলেজের বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য কলেজে, এবং শিগ্‌গীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৫ আগস্ট সারা প্রদেশের ছাত্ররা হরতাল ঘোষণা করে, সেক্রেটারিয়েট অবরোধ করে সেখানে ধরনা দিয়ে বসে থাকে। ওই ১৫ আগস্টের পর থেকে এক মাসেরও বেশি সময় এক দিনের জন্যও আমাদের জীবন স্বাভাবিক থাকেনি—হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাসে, প্রতিদিন ছোট ছোট বিক্ষোভ সভা হয়ে চল্‌ছিল, আর খন্ড খন্ড মিছিল। অঘোষিত একরকম ধারাবাহিক ধর্মঘট চলছিল। আমরা নতুন ছাত্র, প্রত্যেক দিন কার্জন হলে ক্লাস শুরু করতাম, কিন্তু তা শেষ করা হতো না। কারণ ইতোমধ্যে বারান্দায় কিছু ছাত্র এসে অধ্যাপকের কণ্ঠ ছাপিয়ে উচ্চ কণ্ঠে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শুরু করতো, আমরা সাগ্রহে বেরিয়ে যেতাম। সাধারণত বের হয়ে আমতলায় চলে যেতাম—মেডিক্যাল হাসপাতাল সংলগ্ন পুরাতন কলা ভবনের সামনে সেই ঐতিহাসিক আমতলায়। ওখানে প্রায়ই সর্বদলীয় একটি সভা থাকতোই। মজার ব্যাপার হলো তখন সর্বদলীয় মানে সব দল, এনএসএফও থাকতো,—হাসনাত প্রমুখও বক্তৃতা দিতেন। এই প্রথম সেদিনের সব ছাত্র নেতাকে এক সঙ্গে কাছে থেকে দেখেছি—তাদের বক্তৃতা শোনেছি। তাদের মধ্যে একজনকে 'বন্ধু সভাপতি' বানিয়ে একটি চেয়ারে বসতে দেয়া হতো—চেয়ারটি আসতো পাশে মধুর ক্যান্টিন থেকে। এখানেই প্রথম ছাত্র নেতাদের যার যার বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হলাম—জাফর ভাই, মেনন ভাই, রনো ভাই নিত্য থাকতেন—তাঁদেরকে আগে থেকে ভাল চেনা। নতুন দেখলাম ছাত্র লীগের ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, কে এম ওবায়দুর রহমান; ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া চৌধুরী, নুরুল ইসলাম (পরে গণতন্ত্রী পার্টি-প্রধান, ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় নিহত); এনএসএফের মাহবুবুল হক দোলন। সভা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না, কিন্তু সব সভাতেই কিছু না কিছু প্রস্তাব পাশ করা হতো—যদ্দুর মনে পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবগুলো পড়তেন ছাত্র লীগের সিরাজুল আলম খান—তখন গণিতের তরুণ ছাত্র। প্রস্তাব পাশের ভাষাটি আমার অদ্ভুত ঠেকতো—'অদ্যকার সভা প্রস্তাব করিতেছে যে...' এই বলে শুরু হতো এবং তারপর অনেক বার এটি করতঃ ওটি করতঃ বলে বলে এক একটি বাক্য অনেক লম্বা হতো। সিরাজুল আলম খান লিখে আনা প্রস্তাবের কাগজটি খুব দ্রুত পড়ে শেষ করতেন; কারণ সভার শেষেই মিছিল নিয়ে বের হবার তাড়া থাকতো।

ও ভাবেই চল্‌লো ১০ সেপ্টম্বর পর্যন্ত, তারপর আন্দোলন আরো তীব্র হলো, এর মধ্যে বিভিন্ন কয়েকদিন হরতাল দেয়া হলো। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরাম'

গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কাফেটেরিয়ায় এর উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ করা হয়েছিল যেখানে স্কুল কলেজের ছাত্রসহ অসংখ্য ছাত্রের এক বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। এর মধ্যে এক হরতালের দিনে বোরহানকে বিমান বন্দরে পৌঁছিয়ে লাহোরের উদ্দেশ্যে বিদায় দিতে হয়েছিলো। সে আমার সঙ্গে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলো, সলিমুল্লাহ হলে থাকতো। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল ইন্টার-উইং স্কলারশিপ নিয়ে লাহোরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাওয়া। দুই প্রদেশের মধ্যে সংহতি বাড়াতে আইয়ুব খান এক প্রদেশের ছাত্রকে ভাল বৃত্তি নিয়ে অন্য প্রদেশে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নতুন পরিবেশে পড়াশোনা, উচ্চ হারে বৃত্তি ইত্যাদি কারণে অনেকে এই সুযোগটি নিত। পরে আমাদের দিক থেকে আর একটি বড় কারণ যোগ হয়েছিলো—পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতির আধিক্য না থাকাতে সেখানে আন্দোলন জনিত কারণে পরীক্ষা বিলম্বিত হতো না; ফলে এক সেশন আগেই খুবই আরাধ্য সেন্ট্রাল সুপেরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা (সি এস এস) দেয়া যেতো। বোরহান ইন্টার-উইং বৃত্তি নিয়ে লাহোরের ভূ-তত্ত্বে পড়াশোনা করেছে এরপর। হরতালে তেজগাঁয় বিমান বন্দরে যেতে হলো রিক্সা করে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে—পথে পথে ছাত্রদের পিকেটিং, মিছিল ইত্যাদি চলছিল, চলছিলো পুলিশি তৎপরতাও। ওকে বিমান বন্দরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওভাবেই উত্তাল শহরের মধ্য দিয়ে হলে ফিরে আসার একটু খানি পর মহা-শব্দে হলের সামান্য কিছু ওপর দিয়ে চলে গেল লাহোরগামী সুপার কনষ্টিলেশন বিমানটি। হরতালে ওই পথচলার উত্তেজনা ভুলে গিয়ে হঠাৎ মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। ছোটবেলা থেকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে সব সময় এক সঙ্গেই ছিলাম; সে এখন দূর শহরে চলে গেলো। সে সময় ঢাকা বিমান বন্দরে সারা দিন মাত্র কয়েকটি বড় বিমান আসা যাওয়া করতো, আর এগুলোর ওড়ার পথটি ছিল সলিমুল্লাহ হলের ঠিক ওপর দিয়ে, খুব অল্প উচ্চতায় কারণ একটু দূরেই তেজগাঁ। কখন করাচি ফ্লাইট গেলো বা লাহোর ফ্লাইট এলো এসব আমাদের এমনিতেই লক্ষ্য না করে উপায় ছিলনা—বিকট শব্দের কারণে।

আন্দোলনের এই পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসেছিলেন—এর ফলে ছাত্রদের সাহস আরো বেড়ে গিয়েছিলো। নেতাকে ঘিরে তারা আরো বড় বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সোহরাওয়ার্দী এ নিয়ে গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ওভাবেই এসে গেলো আন্দোলনের তুঙ্গের দিন ১৭ সেপ্টম্বর। সেদিনও হরতাল ছিলো। ছাত্রদের অনেক মিছিল বের হয়েছিলো বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে। এগুলো সব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল সমাবেশ করতে আসছিলো। পুরোনো ঢাকার কিছু ছাত্র মিছিল করে নবাবপুর রোড দিয়ে আসার সময় তাদের ওপর গুলি হয়েছে এমন একটি খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমাবেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিরাট মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের পাশে আবদুল গণি রোড দিয়ে তারা এগোয়, এখানে প্রাদেশিক মন্ত্রী নবাব হাসান

আসকারির গাড়ি পুড়ে দেয়। পুলিশ গুলি করলে নব কুমার ইনস্টিটিউশন স্কুলের এক ছাত্র নিহত হয়। আন্দোলন হাতের বাইরে চলে গেল। গভর্নর গোলাম ফারুক দ্রুত শরীফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এই সফল আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির মনোবল খুবই বাড়িয়ে দিয়েছিলো। আপাতত উত্তাল আন্দোলন থামলো বটে, কিন্তু পরের বছরগুলোতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলতেই থেকেছে কখনো উচ্চকিত, কখনো অবদমিত হয়ে। পরবর্তী বছরগুলোর সব আন্দোলনের সব উপাদান আর সব কুশীলব বাষট্টির এই আন্দোলনে ছিল। পরে চৌষট্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে মোনেম খানের সঙ্গে ছাত্রদের লড়াই, পঁয়ষট্টিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব বিরোধী প্রবল প্রচার কার্য, ষেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, এসব ধারাবাহিক ভাবে ছাত্রদেরকে উনসত্তর আর একাত্তরের পথে নিয়ে গিয়েছিলো।

সলিমুল্লাহ হলের নির্বাচন

বাষট্টি সন যতই এগোলো ততই আমি ছাত্র ইউনিয়নে সক্রিয় হয়ে পড়লাম—ছাত্র ইউনিয়ন তখন ইংরেজি আদ্যাক্ষরে 'এপসু' বলেই বেশি পরিচিত ছিল (ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন)। হলের বাইরে এর সঙ্গে প্রথম জড়িত হলাম এর সংস্কৃতি সংসদের কিছু সভা ও অনুষ্ঠানে গিয়ে। সেখানে দেখেছি একজন তরুণী সংগঠিকা মাহবুব আরা হককে, খুব সম্ভব আমার এক বছর সিনিয়র ছিলেন। এই মাহবুব আর হক হঠাৎ উইমেনস হলের (আজকের রোকেয়া হল) সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকে চাপা পড়ে মারা গেলেন। তাঁর মৃতদেহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে নিয়ে ট্রেনে তুলে দেবার বিরাট দলে শামিল হবার মাধ্যমেই এপসুর প্রথম একটি দলীয় কাজে যোগ দিই। ওখানে নেতারা অনেকে ছিলেন—জাফর ভাই, মেনন ভাই, সাইফুদ্দিন মানিক ভাই; তাছাড়া আমাদের হলের ও অন্যান্য হলের এপসুর অনেকে। পরিচিত জনপ্রিয় একজন ছাত্রীর করুণ মৃত্যুতে সবাই খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মাহমুদ হোসেন আমাদের সঙ্গেই স্টেশনে গেলেন, ট্রেন না আসা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই প্লাটফরমে বসে রইলেন খুবই বিমর্ষ ভাবে। মনে হলো একজন ছাত্রীর ওভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে তিনি একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হিসেবে নিয়েছেন। আফ্রিদি পাঠান বংশোদ্ভূত মাহমুদ হোসেন ভারতের উত্তর প্রদেশের মানুষ। খ্যাতনামা উর্দু লেখক, ১৯৩৩ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তারপর পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে লিয়াকত আলী মন্ত্রীসভায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, ও নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তারপর রাজনীতি ছেড়ে আবার অধ্যাপনা, ১৯৬০ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। তাঁর ভাই ডক্টর জাকির হোসেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সেনানী, দিল্লির জামেয়া

মিল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘকালীন উপাচার্য, পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি। মাহমুদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়কে ও ছাত্রদেরকে সরকারের সঙ্গে ওই সময়ের ঝড় ঝাপটার মধ্যে সস্নেহে আগ্‌লে রেখেছিলেন। বেশি দিন তা অবশ্য পারেননি কারণ বাষট্টির আন্দোলন পরবর্তী অবস্থায় সরকার তাঁকে ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যাপারে এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে বলেছিলো, যা তিনি না করে বরং পদত্যাগ করেছিলেন ১৯৬৩ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে নীরবে ও প্রকাশ্যে এ রকম রুখে দাঁড়ানোর আর কোন উদাহরণ এর পর কোন ভিসি থেকে পাইনি।

বাষট্টির আগের কয়েক বছরের রাজনৈতিক ভাবে নিষ্ক্রিয়তার সময় সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র সংসদের সঙ্গে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের যোগাযোগ কমে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন আবার এই সংসদ অতীতের মত বলতে গেলে দেশের রাজনীতির একেবারে কেন্দ্রীয় মনোযোগে চলে এলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোড়া থেকেই ছাত্র সংসদের যা নিয়ম ছিল তাতে কেন্দ্রীয় সংসদ ডাকসুর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিলো, কারণ তার নির্বাচন হতো পরোক্ষভাবে। পালাক্রমে কোন হল থেকে ডাকসুর ভিপি ও অন্য কোন হল থেকে জিএস হবার ব্যাপারটি নির্ধারিত থাকতো—কাজেই ওই হলের ডাকসু প্রতিনিধি থেকেই পদাধিকার বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁরা ডাকসুর ভিপি-জিএস হয়ে যেতেন—এ জন্য সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রের ভোট লাগতোনা। আর ওভাবে ওই দুই পদের উপযুক্ত ব্যক্তিত্বদেরকেও সব সময় পাওয়া যেতোনা। ডাকসুতে সরাসরি নির্বাচনের নিয়মটি এসেছিলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পর। এর আগে পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হলের সংসদকে বিশেষ করে এর ভিপিকে ছাত্র রাজনীতিতে এবং সার্বিক ভাবে ছাত্র মহলের সব কর্মকাণ্ডে একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেয়া হতো, নিঃসন্দেহে অন্যান্য হলগুলো থেকে অনেকটা বেশি। এ হলের ভিপি'র কাছে আশা করা হতো একটি সুডোল ব্যক্তিত্বের উপযোগী গুণাবলী এবং ওই অর্থেই মেধা ও নেতৃত্বগুণ। সব দলই নমিনেশন দেয়ার সময়, এবং ছাত্ররাও নির্বাচিত করার সময় এটি খেয়াল করতো বলে মনে হয়েছে। এসবের ভিত্তিতেই জমে ওঠতো সলিমুল্লাহ হলের সংসদ নির্বাচন, আর আমার প্রথম বছর থেকেই আমি এতে ভাল মতই যুক্ত হয়েছি এবং খুবই উপভোগ করেছি। আমার সময়ের এই প্রথম নির্বাচনটি থেকেই এখানে রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো খুবই সোচ্চার হয়ে ওঠেছিল। কারা কীভাবে ইংরেজি ও বাংলায় বাগ্মিতার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য ভাল তুলে ধরতে পারছে, কারা ছাত্রদেরকে শুধু হল বা বিশ্ববিদ্যালয় নয় একটি আদর্শ দেশ ও জাতির স্বপ্ন দেখাতে পারছে, কারা তাদের যুক্তিগুলোকে অকাট্য করে তুলে ধরতে পারছে—এ যেন ছিল তারই একটি প্রতিযোগিতা। এই মুহূর্তে সব চেয়ে মুখ্য বিষয় হয়েছিল ফেব্রুয়ারি আন্দোলন এবং আগস্ট-সেপ্টম্বর আন্দোলনের পর কোন দল এর জন্য কতখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে তা,

অন্যদের ঢিলেমি অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত সরকারী দালালী ধরিয়ে দিতে পারে কিনা তাও। কোন ভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে থাকা, বা তাতে নিষ্ক্রিয় থাকার সুযোগ কোন দলেরই ছিলোনা। যেই এনএসএফ পরবর্তী কালে আইয়ুব-মোনেমের পেটোয়া বাহিনী হিসেবে কুখ্যাতি পেয়েছিলো সেই দলও তখন অন্তত ওপরে ওপরে খুব আইয়ুব বিরোধী কথা বলতো। কিন্তু সেটি তখনই এত মেকি ছিল যে আমতলায় তাদের এক নেতার এক ভাষণ নিয়ে তখন বেশ হাসাহাসি হয়েছিলো—'আইয়ুব শাহীর পতনের জন্য আমরা প্রয়োজনে গ্যালনে গ্যালনে রক্ত ঢেলে দেব।' ও সময়কার ছাত্র শক্তির এক নেতার ভাষণও বেশ কৌতুক সৃষ্টি করেছিলো—'আমি বলি বন্ধু আইয়ুব ইতিহাস পড়ো, তুমি ইতিহাস পড়ো'। এই দুই দলকেই আন্দোলনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা প্রমাণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল।

নির্বাচন যখন ঘনিয়ে এসেছে, দু'চারদিন পরপর এপসুর কয়েকটি নীতি-নির্ধারণী সভা হয়েছে—রাত্রি বেলায় হলের বিভিন্ন অঞ্চলে কারো কারো কক্ষে এই সভাগুলো হতো। জাফর ভাই, মেনন ভাই অনাবাসিক নেতা, তাঁরাই এতে মূল ভূমিকা নিতেন, কিন্তু বাকিদের মতামত চাওয়া হতো, অনেকেই বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেতো। অধিকাংশ বক্তৃতাই বেশ আনুষ্ঠানিক ধরনের হতো। এসব সভাতেই প্রথম জাফর ভাইয়ের বক্তৃতার বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হলাম—অত্যন্ত আবেগ দিয়ে অতি ধীরে ধীরে সমস্ত বিশদ বর্ণনা দিয়ে ছাত্রদের উপর আইয়ুবী অত্যাচারের এক একটি কাহিনী তুলে ধরতেন—সেটি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেরও বটে। বিশেষ করে লাহোরে এক বিরোধী মাদ্রাসা ছাত্রের গায়ে তুলা দিয়ে কী ভাবে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো, কীভাবে ধীরে ধীরে ছেলেটি পুড়ে মরেছে, তার বর্ণনা আমি তাঁর বহু বক্তৃতায় শুনেছি। তিনি আমাদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করতেন এই বলে যে এটিই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে এনএসএফের শেষ বছর হবে। আসলেই বেশ কিছু দিন ধরে এই হল এনএসএফের বড় শক্তি ছিল, এবং ছাত্র সংসদে ধারাবাহিক ভাবে তারাই জিতে এসেছিলো। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের মতো এক গুচ্ছ নতুন এপসু সমর্থক আসাতে মনে করা হচ্ছিল যে এবার এপসু ভাল করবে।

হয়তো সেটি এনএসএফ নিজেও বুঝতে পারছিলো। তাই তারা ছাত্র লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করলো নির্বাচনে। ছাত্র লীগের বেশি শক্তি এখানে কখনো ছিলো না (অন্য কিছু হলে ছিল, বিশেষ করে ফজলুল হক হলে); কিন্তু যেটুকু ছিল তা এনএসএফ নিজের সঙ্গে যোগ করতে চাইলো। এসব সভায় বিভিন্ন পদে নমিনেশনগুলো চূড়ান্ত করা হলো। নমিনেশন অনেকটা কেন্দ্রীয় ভাবে চূড়ান্ত হয়েই আসতো—তবে তার আগে নানা জনের মতামত নেবার একটি রেওয়াজ ছিল। এ নিয়ে বেশ মতান্তর ও বাকযুদ্ধও চলেছিল কিছুদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাই কমান্ডই নিজের সিদ্ধান্তটি অটুট রাখতে পেরেছিলো নানা যুক্তি দেখিয়ে। ভিপি দেয়া হলো

উর্দুভাষী জামিল আখতারকে—ইতোমধ্যে তিনি তুখোড় বামপন্থী সক্রিয় সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জিএস সৈয়দ আবদুস সামাদ (পরে মুখ্য সচিব, বিনিয়োগ বোর্ড প্রধান); শাকুর ভাই সংস্কৃতি সম্পাদক। আমিও একটি পদে নমিনেশন পেলাম—পাঠাগার সম্পাদক। এরপর থেকে আমরা প্রচার চালিয়েছি জামিল-সামাদ ক্যাবিনেটের জন্য। এবার লড়াই হবে ত্রিমুখী। এনএসএফ-লীগ কোয়ালিশনের শফি-মোহাম্মদ ক্যাবিনেটের এবং ছাত্র শক্তির শেলী ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে। শফি হলেন চৌধুরী শফি সামি এবং শেলী—মিজানুর রহমান শেলী। জাফর ভাই আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন 'কোন পরোয়া নেই, আমার কাছে "বাঘের বাচ্চা" আছে'।

বাঘের বাচ্চাটি দেখতে পেয়েছিলাম নির্বাচনের দু'তিন সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া আনুষ্ঠানিক প্রচার কার্যের একেবারে শেষের দিকে গিয়ে। তার আগে এক রাতে হলের রুমে রুমে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হলো। 'ভক্স পপুলি'র (জনগণের কণ্ঠ) বক্তব্য হিসেবে এই প্রচারপত্রে বর্ণনা ছিল এনএসএফ কী কী ভাবে আইয়ুব সরকারের সঙ্গে আঁতাত করছে তার। বিশেষ করে অভিযোগ আনা হলো যে এনএসএফ সভাপতি আবুল হাসনাত সম্প্রতি রাওয়ালপিণ্ডি গিয়ে সেখানে সরকারের উপরিওয়ালাদের সঙ্গে দহরম মহরম করে এসেছেন। তা ছাড়া ছাত্র শক্তির ক্ষেত্রেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে কিছুদিন আগে ছাত্র শক্তির দু'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা আইয়ুব সরকারের প্রশস্তি গাওয়া কিছু কাগজ গভীর রাতে হলের রুমে রুমে বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। পরে অবশ্য ওই দুই নেতাকে ছাত্র শক্তি বহিষ্কার করেছিলো—কিন্তু ভক্স পপুলি'র মতে ওটি ছিল নেহাত লোক দেখানো। 'বাঘের বাচ্চা'টি এলো আরো নাটকীয় ভাবে। এটি হলো অক্ষত রাখার জন্য কাচের ফ্রেমে বাঁধানো একটি চিঠি। টাইপ করা এই চিঠিটি রাওয়ালপিণ্ডির হোটেল কামরানের প্যাডে লেখা এবং ওই হোটেলের ম্যানেজারের স্বাক্ষর করা। এতে বলা আছে যে ঢাকার জনাব আবুল হাসনাত এবং আর দু'জন অতিথি এত তারিখ থেকে এত তারিখ এই হোটেলে অবস্থান করেছেন। এটি বাঘের বাচ্চা হবার কারণ হাসনাত ভাই অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি ওই সময় আদৌ রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছিলেন; উল্লেখযোগ্য যে ওই সময়টিতে ওখানে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিলো। জাফর ভাইয়ের পরিকল্পনা মত রাত আটটা-ন'টার দিকে যখন অধিকাংশ ছাত্র রুমে থাকে তখন ওই বাঁধানো চিঠিটি এপসুর বেশ কয়েক জন ছাত্র বেশ নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে প্রত্যেক রুমে রুমে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে এলো। পুরো হলে এটি করতে দু'তিন দিন সময় লেগেছিলো। স্বভাবতই এনএসএফ সমর্থকরা একে জালিয়াতি বলছিলো—কিন্তু তাতে বাঘের বাচ্চা দেখানোতে কোন বিরতি ঘটেনি।

এই সব নানা বিষয় আরো অনেক বিশদ হয়ে এলো প্রতি রাতে হলের নির্দিষ্ট জায়গায় অনুষ্ঠিত প্রচার সভাগুলোর সব জ্বালাময়ী ভাষণে; এবং তার চেয়েও বেশি

শাকুর ভাইয়ের রচিত প্যারোডি গান সমূহের মাধ্যমে। দিনের বেলায় আর্টস বিল্ডিঙে একই রকম সভা হতো; ক্লাসে ক্লাসে গিয়েও সংক্ষিপ্ত সভা হতো—প্রার্থীদের পরিচিত করার নাম করে। আমাদের ক্ষেত্রে শুধু আর্টস বিল্ডিঙে হতো কারণ সলিমুল্লাহ হলের অধিকাংশ ছাত্র এখানেই পড়ে। আমাদের প্যারোডি গানগুলো এতই অনবদ্য এবং এতই বক্তব্য সম্পন্ন হয়েছিলো যে শিগ্‌গীর এগুলো হলে ও হলের বাইরে অনেকের মুখে মুখে চলে গিয়েছিলো।

ভিপি খুরশিদ হামিদের আন্দোলন বিমুখতা নিয়ে সেই নসফ রাজকুমারের গানটির কথা তো আগেই বলেছি। এর থেকেও বেশি এনএসএফ বিরোধী যে গান জনপ্রিয় হলো :

ধিন্ কেটে দিন ধিন কেটে দিন ইলেকশানের ঢাক
এনএসএফের গোমর যত সব হয়েছে ফাঁক।
মুসলিম হলের ছাত্র কেন আইয়ুব হলে যায়
রাওয়ালপিণ্ডির হোটেলেতে গোশত পরোটা খায়
ও ভাই গোশত পরোটা খায়।
এম এন এ'দের বলে বেড়ায়
পিটো ভাই খান সাহেবের ঢাক
ধিন কেটে দিন ধিন কেটে দিন।

এমনি ভাবে ছাত্র শক্তির সেই ঘটনাও গানে নিয়ে আসা হয়েছে আর একটি প্যারোডিতে—যা 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে জাগোরে' গানটির প্যারোডি।

ওহ দালাল ছাত্র শক্তি ভাগো ভাগোরে
কোন মুখে তুমি ফের গদি মাগোরে

এরপর রাতের অন্ধকারে আইয়ুব খানের প্রচার পত্র বিলি করতে গিয়ে দু'জনের ধরা পড়ার কাহিনী বর্ণনার পর :

ছাত্র শক্তির নেতারা বুদ্ধি রাখেন
তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ক্ষমা চাহেন।
দু'জন নেতা সরান, তাঁদের বোরখা পরান
কিন্তু গোপন পীরিত চলে তলে তলে।

এনএসএফ ও ছাত্র লীগের কোয়ালিশনের 'অশুভ আঁতাতের' দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্যারোডি গানে এনএসএফ নেতা আবুল হাসনাতের নাম সরাসরি ব্যবহার করা হলো :

শোন ভাই, গদির লোভে নসফ-লীগে হলো যে আঁতাত
লোভে পাপ, আর পাপে কী হয় জানেন হাসনাত।'

সব চেয়ে জমে ওঠেছিল নির্বাচনের ঠিক আগে আগে রাতের প্লাটফরম সভাগুলো। প্রত্যেক দলের জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা ছিল হলের প্রশস্ত বারান্দা ও করিডরগুলোর মিলন স্থলে বেশ বিস্তৃত চত্বরগুলোতে—কোনটিতে এই দল,

কোনটিতে ওই দল—সাধারণত এত দূরত্বে যে একটির কোলাহল অন্যটিতে তেমন শোনা যেতোনা, যদি না খুব বড় ধরনের হতো সেই কোলাহল। ছাত্রদের অনেকেই এই প্লাটফরম সভাগুলো খুব উপভোগ করতো, এমনকি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও। বিশেষ করে প্রায় প্রতিদিন ভিপি প্রার্থীরা যেই বক্তৃতা দিতেন সে সম্পর্কে সবারই কৌতূহল থাকতো—কে বেশি ভাল বক্তৃতা দেন, বিশেষ করে ইংরেজিতে। সেই বছর জামিল ভাই, শফি ভাই, এবং শেলী ভাই প্রত্যেককে রীতিমত বাগ্মী বলতে হয়। আমি যদিও বেশির ভাগ সময় এপসু'র সভাতে থাকতাম, অন্য ভিপি প্রার্থীর বক্তৃতার সময় খবর চলে আসতো—আস্তে ওদের সভায় গিয়ে সেটি শোনতাম। এরকম কেউ না কেউ সব সময় গিয়ে অন্যদের কথা শোনাটা দরকারও ছিল, কারণ প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দেয়াটা জরুরি। শেলী ভাই একটি কথা প্রায় বক্তৃতায় বলতেন মনে পড়ে। ইসলামের তাহযীব তমুদ্দুন নিয়ে ছাত্র শক্তির বেশি আগ্রহের কথা সত্ত্বেও একই বক্তব্য দেয়া এনএসএফের সঙ্গে যেন নীতিগত দূরত্ব বজায় রাখা যায় সে চেষ্টায় তিনি বলতেন 'ফর দেম, ইট ইস থারটিন হানড্রেড ইয়ারস অব কনজারভেটিভ ট্র্যাডিশন, ফর আস ইট ইস এ প্রোগ্রেসিভ ফিউচার'। এনএসএফের কয়েকজন বক্তা এপসু'র সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের সমর্থকদের একটি তুলনা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলো—সেটি খুব মজা লাগলো। তাদের মতে 'উশ্‌খো চুল, খোঁচা দাঁড়ি, চিমসানো গাল, দুর্ভিক্ষ চেহারা ও বস্ত্র নিয়ে কাউকে দেখলে বুঝবেন তারা এপসু, আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে ওঠে এসেছে, সবকিছু সাবোটেজ করা তাদের লক্ষ্য। অন্য দিকে এনএসএফ হচ্ছে সুস্থ দেহ মন নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার সৈনিক'।

এসব বক্তৃতার মজা হলো পুরাতন কেউকেটারাও আসতেন—যাঁরা সদ্য পাশ করে গেছেন, আগে এখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা। নুরুদ্দীন আল মাসুদের কথা মনে আছে—তিনি বোধ হয় তখন সিএসএস পরীক্ষায় পাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু এসে আমাদের প্লাটফরমে দারুণ দৃশ্য সৃষ্টি করতেন—চটকদার বক্তৃতা দিয়ে, শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নেচে। শাহেদ লতীফ সাহেবও বোধ হয় সে সময় যাওয়ার পথে ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দুর্দান্ত ইংরেজি বক্তৃতায় প্রায়ই যখন হাত চাপড়ে গর্জে উঠতেন 'উই আর গোয়িং টু উইন উইদ অ্যা থাম্পিং মেজরিটি' তখন সবাই নড়ে চড়ে উঠতো। আমরা উপস্থিত মত সিনিয়র নেতা একজনকে সভাপতি বানিয়ে রাখতাম এই প্লাটফরম সভায়। জাফর ভাই নানা দিকে ব্যস্ত থাকতেন, হাতের কাছে মেনন ভাইকে বেশি পাওয়া যেত। প্লাটফরম সভাগুলো জমার একটি কারণ ছিলো যে ওসময় ওই রাত বিরেতেই হলের অনাবাসিক অনেক ছাত্রও এসে এতে যোগ দিত।

ওই প্রথম নির্বাচনে অবশ্য আমার ভূমিকা বক্তা হিসেবে ছিলোনা। আমার বক্তৃতা দানের অভ্যাসটি গড়ে ওঠেছিল আরো দু'এক বছর পর, এবং তা তুঙ্গে

ওঠেছিল যে বছর আমি নিজে ভিপি প্রার্থী হই সেবার। কিন্তু প্রথম থেকেই দুটি কাজে আমি জড়িত হয়ে ছিলাম, একটি হলো গলা ফাটিয়ে শ্লোগান শুরু করা, অন্যটি হচ্ছে গণ সংগীতে নেতৃত্ব দেয়া। দ্বিতীয় কাজটি জাফর ভাইয়ের কারণে কেন জানি আমার ওপর এসে পড়েছিল—এসব কাজে স্বীকৃত গায়কদের বড় একটি পাওয়া যেতো না। আমাদের মূল শ্লোগান ছিল 'আইয়ুবশাহী—ধ্বংস হোক'। এরই নানা রকম বৈচিত্র সৃষ্টি করা হতো। কতগুলো বেশ অদ্ভুত শ্লোগান সেবার দেয়া হয়েছিলো, যেমন একটি হলে 'মান কি তাংরি—ভোম ভোম'। এটি নাকি চেঙ্গিস খানের রণ-ধ্বনি (ওয়ার ক্রাই) ছিল। এপসুর নিজস্ব আদর্শের শ্লোগানগুলোও ছিল : যেমন যুদ্ধ না শান্তি—শান্তি শান্তি'; 'ইনকিলাব—জিন্দাবাদ'; বিপ্লব অর্থে উর্দু ইনকিলাব, কথাটি তখন প্রায়ই ব্যবহৃত হতো, যেমন হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। একবার নিজেদের মধ্যেই গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এরকম একটি শ্লোগান নিয়ে। কেউ একজন শ্লোগান দিলো 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়—লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'; সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ আপত্তি তুল্‌লো আজাদী ঝুটা হওয়ার এই শ্লোগান এখন আর সঠিক নয়, কাজেই এটি দেয়া উচিত হবেনা। পরবর্তী বছরগুলোতে আমার একটি প্রধান মজা ছিল নতুন নতুন শ্লোগান বানানো—বিশেষ করে বক্তা যখন যে প্রসঙ্গে কথা বলতেন সে প্রসঙ্গে। তাৎক্ষণিক ভাবে শ্লোগান বানানোতে আমার বেশ একটু কদরই হয়ে গিয়েছিলো। যেমন ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ এলে 'ইতিহাসের একটি নাম—ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম' অথবা 'ভিয়েতনামের বীর জনতা—জিন্দাবাদ'। এপসুর এই সভাগুলোতে বক্তৃতার মধ্যে প্রায়ই ব্যক্ত হতো 'আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। আইয়ুবশাহী ধ্বংস করার প্রশ্নেও সে সময় এপসুর প্ল্যাটফরম থেকে দেয়া একটি শ্লোগান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল—'সেরগালি সরকার কো—এক ধাক্কা আউর দো'।

গণসংগীতের বিশেষ ডাক আসতো গভীর রাতে—একটা-দেড়টার দিকে সভার সমাপ্তি টেনে লম্বা সারিতে গান গাইতে গাইতে যখন পলাশীতে যেতাম। পলাশী রেল গেটের কাছে বেশ ক'টি চায়ের দোকান তখনো খোলা থাকতো। ওখানে দলের ফান্ড থেকে এক কাপ চা সবার জন্য চলে আসতো। চা টি ছিল উপলক্ষ—আসলে যা হতো তা হলো গল্পের শেষটুকু, সারা দিনের প্রচার কাজের একটি ব্যবচ্ছেদ করা হতো। এই সব আসরে বেশ কয়েক বছর সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে অনেকের সঙ্গে জানা-শোনা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেছিলো—তার অনেকগুলো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিলো। ভুল্‌লে চলবেনা সেদিনের এই তরুণগুলোর অনেকেই পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের জবরদস্ত কেউকেটা হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে যখনই দেখা হয়েছে, তাৎক্ষণিক বিষয়ের চেয়েও বেশি কথা হয়েছে আমাদের হলের সেই দিনগুলো, আন্দোলন, নির্বাচন, গান গেয়ে গভীর রাতে পলাশীতে চা খাওয়া, এসব বিষয়ে।

গণসংগীতের আর একটি ব্যবহার ছিল নির্বাচনের আগের দিনে যখন একটি ফাইনাল প্রসেশন হতো পুরো হল প্রদক্ষিণ করার জন্য। কোন্ দলের এই মিছিল কত বড় হলো এতেই নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নাকি কিছুটা আঁচ করা যেতো। লোক বেশি দেখাবার জন্য গণসংগীতের ফাঁকে ফাঁকে আমরা শ্লোগানে হল প্রকম্পিত করতাম। প্রচুর অনাবাসিক ছাত্র সমর্থকদের এসময়ে হলে আসার ফলে এই ফাইনাল প্রসেশনটি দেখার মত ব্যাপার হতো। আমার কোরাস ধরা গণসংগীতের মধ্যে সবার প্রিয় ছিল :

'মানুষের মাঝে জাগ্রত হোক উদ্যত হোক সত্য
রূপেরসে ভরা ধরণীতে হোক শান্তির আধিপত্য।'

অথবা

'নওজোয়ান নওজোয়ান, বিশ্বে জেগেছে নওজোয়ান
এক প্রাণ কোটি প্রাণ এক স্বপনে মহীয়ান'।

সলিমুল্লাহ হলের নির্বাচন প্রচারণা শুধু হলের মধ্যে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকতো না। এ হলের অনাবাসিক ছাত্র ছিল প্রচুর—সারা ঢাকা শহরে তাদের বাস। কাজেই ছোট ছোট দলে আমাদেরকে এই 'অ্যাটাচ্ড কনটাক্টে' (অনাবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ) যেতে হয়েছে—পুরোনো ঢাকা, নতুন ঢাকার অলিতে-গলিতে। ওই প্রথম নির্বাচনে জুনিয়র সদস্য হিসেবে এ দায়িত্ব আমার কম থাকলেও, পরে সেটি অনেক বেড়েছে। আসলে হলগুলোর এই নির্বাচন ছিল এক রকম 'টক অব দি টাউন'। ঢাকার পত্র-পত্রিকাগুলোতে এ প্রচারণার সংবাদ, ছবি ও চুটকি নিয়মিত থাকতো।

নির্বাচনের দিন ভোট দেবার হৈচৈ যখন তুঙ্গে, তখন হঠাৎ ঘটলো আর একটি নাটকীয়তা; এটিও সেই 'বাঘের বাচ্চা' নিয়ে, তবে এবার সেটি করলো এনএসএফ। হাতে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম নিয়ে সেটি দেখিয়ে তারা ভোটারদের সামনে একটি চলমান সভা ও শ্লোগানবাজি শুরু করলো। টেলিগ্রামটি বার বার পড়ে শোনানো হচ্ছিল, এটি এসেছে রাওয়ালপিণ্ডির হোটেল কামরানের ম্যানেজারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন যে আবুল হাসনাতের এই হোটেলে থাকার ব্যাপারে কোন চিঠি তিনি কাউকে দেননি। এনএসএফ এখন এপসুর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও মানহানির অভিযোগ আনছিল, আর আমাদের তরফ থেকে শ্লোগান দিয়ে চিৎকার করে বলা হচ্ছিল—'ফল্স টেলিগ্রাম, ফল্স টেলিগ্রাম' ইত্যাদি। এ নিয়ে দারুণ উত্তেজনা—সেটি থামাতে নেতাদের সচেষ্ট হতে হলো। ভোটারদের অবশ্য নিজেদেরকেই যার যার মতো করে ঠিক করতে হলো কোনটি আসল, কোনটি নকল।

নির্বাচন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ভিপি প্রার্থীদের পরীক্ষা দেবার কাজ তখনো শেষ হয়নি। হলের ঐতিহ্য অনুযায়ী সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রত্যেককে

একটি সমাপনী বক্তৃতা দিতে হলো—নানা বিভেদ, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের পর মিলনের সুর বাজাবার জন্য; সবার মূল বক্তব্য হলো এই নির্বাচনে যিনি ভিপি নির্বাচিত হবেন তিনি হবেন পুরো হলের প্রতিনিধি সবার ভিপি, এবং পুরো ছাত্র সমাজে তিনিই হবেন আন্দোলনের ঐক্যের প্রতীক—জামিল ভাই, শফি সামি ভাই, কিংবা শেলী ভাই। সবাই তাঁকে হলের নেতা মেনে নেবেন।

এই নির্বাচনে এপসু হেরে গিয়েছিল—দেখা গেল এনএসএফ এখনো সলিমুল্লাহ হলে যথেষ্ট শক্তিশালী, একাক্রমে বেশ কিছু নির্বাচন জিতে চলেছিল। কিন্তু এও বোঝা গেল সাম্প্রতিক আন্দোলনের একটি প্রভাব ইতোমধ্যেই দেখা গিয়েছে—এই হলে এপসু এখন একটি উদীয়মান তারা। কিন্তু এবারকার মত এপসু অন্যান্য বিভিন্ন হলেও পরাজিত হয়েছে, এমনকি যেখানে তার অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভাল, গত বছর জিতেছিলো সেখানেও—যেমন ঢাকা হল, ইকবাল হল ও উইমেনস্ হলেও। পরাজয়েও যে এপসু খুবই সংস্কৃত-মনা সে প্রমাণ সে দিলো পরাজয়ের দুঃখ কিছুটা ভোলার জন্য একটি সম্মিলিত নৌ-বিহার পিকনিক আয়োজন করে। বড়সড় একটি লঞ্চে করে বিভিন্ন হলের কয়েক শ ছাত্র প্রায় সারাদিন নদীপথে ঘুরে বেড়ালাম। ওখানেই প্রথম ভালভাবে সাক্ষাত হলো অন্যান্য হলে দলের কেউকেটাদের সঙ্গে। এপসুর সভাপতি বিখ্যাত ফরহাদকেও (পরে বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান) এই প্রথম দেখলাম—তিনি ইতোমধ্যেই যতটা না ছাত্র নেতা ফরহাদ, তার চেয়ে বেশি কমরেড ফরহাদ। খ্যাতনামা অন্যান্য নেতাদেরকেও এক সঙ্গে পেলাম, ভাল পরিচয়ও হল প্রায় সবার সঙ্গে, লঞ্চের সীমিত পরিসরে দিনব্যাপী থাকার কারণে। পরাজয়কে কৌতুক করে সহনীয় করতে একটি নাটক অভিনীত হলো যাকে বলা যায় সিরাজুদৌল্লাহ নাটকের একটি প্যারোডি। ঢাকা হল, ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, উইমেন্স হলের (যে সব হলে এপসু ক্যাবিনেট রয়েছে) একচ্ছত্র অধিপতি মুকুট বিহীন সম্রাট ফরহাদ-উদ-দৌল্লাহ এবার 'পলাশীতে' পর্যুদস্ত হয়েছেন। দূতরা এসে একে একে কূর্ণিশ করে দুঃসংবাদ জানাচ্ছেন, আর সম্রাট হাহাকার করে উঠছেন। 'জাঁহাপনা সলিমুল্লাহ দুর্গের পতন হয়েছে'; 'জাঁহাপনা এই মাত্র খবর এসেছে পতন হয়েছে ইকবাল দুর্গের'। সব শেষে ঢাকা দুর্গের পতন সংবাদ যখন এলো সম্রাট আর্তনাদ করলেন 'হায় হায় এই দুর্গ নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি'—এই প্রসঙ্গে তিনি ঢাকা হলের বিভিন্ন পরাক্রমশীল ছাত্র নেতা সেনাপতিদের নাম উল্লেখ করলেন—'কী হলো এই বীরদের আজ।' তারপরও সম্রাট পারিষদদেরকে সান্ত্বনা দিলেন—'সব শেষ হয়ে যায়নি, এখনো যুদ্ধ বিজয়ী বীর মতিলাল আছেন (জগন্নাথ হলের এপসুর বিজয়ী ভিপি—তাঁকে সহজেই মোহনলালের সঙ্গে তুলনীয় মনে হলো)। একেবারে শেষে সিরাজুদ্দৌল্লার সেই বিখ্যাত ভাষণের একটি চমৎকার প্যারোডি—'ভাইসব, তোমাদের সেই সমর্থন আমি ভুলিনি...বিশ্ববিদ্যালয়ের গগনে এপসু-সূর্য আবার উদয় হবে...'।

আমরা যখন নির্বাচন পরাজয়ের এই ট্র্যাজেডি নাটকে মগ্ন ছিলেন, তখন আর একটি ট্র্যাজেডি ঘটতে গিয়ে ঘটলোনা—তা হলো বিপরীত দিক থেকে আসা আর একটি লঞ্চের প্রায় মুখোমুখী সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা। সংঘর্ষ হলো, তবে সেটি কিছুটা কোনাকুনি করে দেয়া সম্ভব হলো বলে এই যাত্রা বেঁচে গেলাম; নইলে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারতো।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা

১৯৬৩ সালে ভিসি অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন পদত্যাগ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক এম ও গণি। এর আগে নতুন প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তিনি, তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে এবং বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা সংগঠক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়ে সরকারী রাজনীতির সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে তিনি এখানে একটি খারাপ সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিলেন, যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কখনো ছিলনা, মাহমুদ হোসেনের সময়তো নয়ই। বিভিন্ন ভাবে সেটি প্রকাশ পেলেও আমাদের কাছে সেটি প্রথম খুব প্রকট হয়ে ধরা পড়লো অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. আবু মাহমুদের সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে।

ড. মাহমুদ বামপন্থী মতামতের জন্য পরিচিত ছিলেন। সিনিয়রিটি হিসেবে তাঁর সে সময় বিভাগীয় প্রধান হবার কথা থাকলেও, তাঁকে না দেবার জন্য এই পদটি দেয়া হয় ড. কে টি হোসেনকে। এটি মেনে নিতে না পেরে ড. মাহমুদ এই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রীট করেন। ওই মামলার কারণে বিষয়টি ছাত্রমহলে ও সারা দেশে বিরাট প্রচার পায়। অর্থনীতি বিভাগের এসব বিষয়ের সঙ্গে আমার বিস্তারিত জানাশোনা ঘটার কারণ হলো সলিমুল্লাহ হলে আমার অধিকাংশ বন্ধু এই বিভাগের ছাত্র। এ সময় আর এক গুচ্ছ প্রতিভাবান ছাত্র নতুন এসে ওদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের অনেকেই ইতোমধ্যেই এপসু'তে দারুণ সক্রিয় ছিল। তাদের মধ্যে মাহবুবউল্লাহ (পরে ছাত্র নেতা, রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক) একজন তাত্ত্বিক রাজনীতি-বিশ্লেষক হিসেবে তখনই বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। আর একজন সা'দত হোসাইন (পরে মন্ত্রী পরিষদ সচিব, পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রধান) তত্ত্বের চেয়েও বেশি বাস্তবতা দিয়ে এবং রসিকতা দিয়ে রাজনীতি বিশ্লেষণে বেশি উৎসুক ছিল। ভিন্ন মেজাজের জিশান হোসেন (উর্দু ভাষী, পরে অর্থনীতিবিদ) অতি নম্র কিন্তু ক্ষুরধার মন্তব্যে অভ্যস্ত ছিল। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলো আবদুল কাদের ভূঁইয়া (পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ডীন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি) যার নেতৃত্বের গুণাগুণ তখনই স্পষ্ট। তখন থেকেই তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আমার জীবনকে অনেক সমৃদ্ধ করেছিলো। ওরা ড. মাহমুদের খুব ভক্ত ছিল। তাদের কয়েকজনের

সঙ্গে হাইকোর্টে ওই মামলার একটি শুনানীও শুনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম জজদের মধ্যে বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ খুব কড়া ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় সমালোচনা করছেন, নিজেই নানা পশ্ন করে নাস্তানাবুদ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীকে। যদ্দূর মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ছেলে ও জুনিয়র আইনজীবী তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হাদি তালুকদার কেন স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত নেই এ জন্য ভর্ৎসনা করছিলেন বিচারপতি মোরশেদ। যেটুকু শোনলাম মনে হলো ড. মাহমুদের অভিযোগে সারবত্তা রয়েছে। এর আগে আর একবার হাইকোর্টে শুনানী শুনতে গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনেক আগে। সেবার গিয়েছিলাম খোন্দকার ইলিয়াসের লেখা 'ভাসানী যখন ইউরোপে' বইটির কোন কোন অংশের জন্য লেখকের বিরুদ্ধে যে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিলো, তার শুনানী শুনতে। যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ শুধু আইনজীবীকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই থেকে পড়ে যেতে শুনেছি, এবং জজকে মাঝে মাঝে তাঁকে প্রশ্ন করতে শুনেছি।

বড় ঘটনাটি ঘটলো ড. মাহমুদের মামলার রায় প্রকাশের দিন। রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে হুকুম দেয়া হয়েছিলো তাঁকে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের। এই আইনী বিজয়ের পর তিনি যখন সলিমুল্লাহ হলের কাছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় হেঁটে ফিরছিলেন হঠাৎ করে ঢাকা হলের এনএসএফের কয়েক জন ছাত্র হকি স্টিক দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে গুরুতর ভাবে জখম করে। এই ছাত্ররা তাদের মারমুখী কথা ও কাজের জন্য ইতোমধ্যেই বেশ কুখ্যাত ছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খুব অনুগত বলেও তাদেরকে মনে করা হতো। এই ঘটনার পর থেকে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এনএসএফের কিছু হিংসাশ্রয়ী ছাত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলে জোর ধারণার সৃষ্টি হয়। এর পর যত দিন গিয়েছে এই গোষ্ঠীটির উৎপাত ও সহিংসতা তত বেড়ে যেতে থাকে, এবং ততই মনে হয়েছে যে এরা কর্তৃপক্ষের এক রকম আশ্রয় প্রশ্রয়ে রয়েছে। তবে সেদিনের সহিংসতা ছিল মারপিট, হকিস্টিক চালনা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ, পরে এর চেয়ে এগিয়ে দু'একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনাও ঘটলেও আজকের ছাত্র সহিংসতার তুলনায় সেগুলো নস্যি। এর কয়েক দিন পর ড. মাহমুদকে দেখতে মাহবুবউল্লার সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়েছি, দেখলাম তিনি এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর এবং আপোষহীন; রাজনীতিতেও তাঁর মতামত খুবই তীক্ষ্ণ। তাঁর বাসায় একটি মজার ইংরেজি লেখা দেয়ালে টাঙ্গানো দেখলাম, যার মানে হচ্ছে 'আলী বাবা সৌভাগ্যবান ছিলেন, কারণ তাঁকে মাত্র চল্লিশ জন চোরের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।'

এনএসএফের ওই মারকুটে গোষ্ঠী ঢাকা হলেই বেশি বেশি প্রভাব বিস্তারের কারণে ঢাকা হলের (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) পুরোনো ঐতিহ্যে একটি ছায়া পড়ে

গেল। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষের খুব বেশি উদ্বেগ ছিল বলে মনে হয়নি। ঢাকা হল বৃটিশ আমলে এক সময় হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত হল ছিল। পরে এটিই একমাত্র হল যেটি হিন্দু-মুসলিম নির্বেশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল, এই দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক কৃতী ছাত্র ও অনেক গর্বিত হবার মত ঐতিহ্য এটি সৃষ্টি করেছিল; এখন সেটি একটি দুর্নামের মধ্যে পড়ে গেল। আমাদের সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের এক ধরনের আত্মম্ভরী ভাব ছিল যেন একমাত্র এটিই সবগুণের সমন্বয়ে আদর্শ হল। তাদের সেই আত্মম্ভরী বচনে এখন ঢাকা হল হয়ে পড়লো 'ঢাকা আখড়া'। অন্যান্য হলগুলো আগে থেকেই ছিল নানা ঈষৎ নেতিবাচক বিশেষণে আখ্যায়িত—'ফজলুল হক পাঠাগার', 'নারী কারাগার', 'জগন্নাথ আশ্রম', 'ইকবাল মেস', এবং একমাত্র ব্যতিক্রম 'সলিমুল্লাহ হল'। তাদের মতে ফজলুল হক পাঠাগার (এও যেন নেতিবাচক) হবার কারণ সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞান ছাত্ররা সব সময় নিজেদের বিষয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে। 'নারী কারগার' হওয়ার কারণ উইমেন হলে (তখনো রোকেয়া হল নাম হয়নি) ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর বাইরে না থাকতে পারার ও অন্য কেউ আসা যাওয়া করতে না পারার জন্য অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়ম কানুন। জগন্নাথ হলের 'আশ্রম' হবার কারণ এখানকার ছাত্রদের সাত্ত্বিক ও অতি নিয়মানুবর্তী জীবন। আর ইকবাল 'মেস' হবার কারণ হলো এখানে বেশি বয়সের আইনের ছাত্ররা যারা আগে হয়তো স্নাতক ডিগ্রি ইত্যাদির কাজ সেরে ফেলেছেন তাঁরাই থাকতেন বেশি, অনেকে একই সঙ্গে চাকরি বাকরিও করতেন, অনেকে বন্ধুবান্ধব অনাবাসিকদের নিয়েই থাকতেন বলে জনশ্রুতি ছিল। এ সম্পর্কে একটি হাসির কথা প্রচলিত ছিল যে ইকবাল হলের সব ছাত্রের প্রতি একটি সাবধান বাণী হলো রাতে ঘুমাতে সব সময় অবশ্যই চিৎ হয়ে শোয়া, কারণ কাৎ হয়ে শুলে আর কেউ এসে বিছানার বাকি জায়গা বেদখল করে ফেলবে। এসব কথার সবই অতিরঞ্জিত হলেও এটি সত্য যে প্রত্যেক হলের এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্য হলের ছাত্ররা হয়তো একই রকম কৌতুক আমার হল সম্পর্কে করতো।

এ সময় ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসলে একবার সেটি দেখতে গেলাম। এখন যেটি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সেখানেই তখন ছিল ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবন। পাস যোগাড় করে অধিবেশন দেখতে গেলাম। আগাগোড়া অধিবেশনে আমাকে মুগ্ধ করেছিল একটি ব্যক্তিত্ব—তা স্পীকার মৌলভি তমিজউদ্দিন খানের। এই সেই তমিজউদ্দীন খান যিনি পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার হিসেবে ছিলেন, ১৯৫৫ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এই গণপরিষদ ভেঙ্গে দেবার আগে পর্যন্ত। তখন তিনি বীরের মত গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে লড়ে এক পর্যায়ে জিতে অন্য পর্যায়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এটি গণতন্ত্র রক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেদিন জাতীয় সংসদে গিয়ে দেখলাম ঘোষণাকারী রাজকীয় ভঙ্গিতে 'লে-

ডি-জ অ্যা-ন্ড জে-ন্টে-ল-মেন, মিস্টার স্পীকার স্যার' ঘোষণাটি চিৎকার করে বলার সঙ্গে সঙ্গে আচকান-পাজামা পরা একজন দীর্ঘদেহী সৌম্য দর্শন মানুষ এগিয়ে এসে স্পীকারের চেয়ারে বসলেন। তিয়াত্তর বছর বয়সে এমন ঋজু ও বলিষ্ঠভাবে এলেন এবং অধিবেশন পরিচালনা করলেন ফরিদপুরে জন্ম গ্রহণকারী এই বঙ্গ সন্তান—মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিলনা (এই বছরের শেষের দিকে তিনি মারা যান)। ইংরেজি, উর্দু এবং বাংলা তিন ভাষাতেই তিনি সমানে সংসদকে সামলাচ্ছিলেন, যখন যেটি দরকার—তিনটাতেই দক্ষতা একেবারে মাতৃভাষার মত মনে হলো। এক দশাসই পাঠান সদস্য বসে যেতে বলা সত্ত্বেও বার বার হৈচৈ করে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন—তমিজুদ্দিন খান দৃপ্ত কণ্ঠে তাঁকে বলতে থাকলেন 'আপ বয়েঠ যাইয়ে, বয়েঠ যাইয়ে, বয়েঠ যাইয়ে—ক্রমে তাঁর কণ্ঠ জোরালো হাচ্ছিল—না বসে একটি কথাও বলার সুযোগ সেই পাঠান পেলোনা। একজন সদস্য বাংলায় বলা শুরু করলে অনেকে হৈচৈ করে গোলমাল সৃষ্টি করলো। স্পীকার একজন তেজী হেডমাস্টারের মত গর্জে উঠে সবাইকে থামিয়ে বললেন 'না বুঝলে অনুবাদের ইয়ারফোন লাগান'।

ড. আবু মাহমুদের যে রকম রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে নিজস্ব জোরালো অবস্থান ছিল, তেমনি দেখতে পেলাম ক্রমে বেশি বেশি শিক্ষকরা এদিকে বা ওদিকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছেন। অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন প্রতিভাবান শিক্ষক সে সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্য নিয়ে সোচ্চার হয়ে বিভাগে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। আমরা দলে দলে গিয়ে এই প্রদর্শনী দেখি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমানের মত তরুণ অর্থনীতিবিদরা। এই উদ্যোগ যে কর্তৃপক্ষ মোটেই ভাল চোখে দেখেনি তা বলাই বাহুল্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে নিযুক্তদের কেউ কেউ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে বরং ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে চলে গিয়েছেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমাদের প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী ইকবাল হলে প্রভোস্ট ছিলেন। ইকবাল হল ওই সময় খুব সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল ধীরে ধীরে—প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের (এপসু) প্রাধান্যে, এবং পরে ছাত্র লীগের প্রাধান্যে। প্রভোস্ট মতিন চৌধুরীর সঙ্গে ছাত্র নেতাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এ বিবেচনায় তাঁকে প্রভোস্ট পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে গণিতের প্রফেসর আজিজুল হককে প্রভোস্ট নিয়োগ করা হয়। নতুন প্রভোস্টকে অভ্যর্থনা জানানোর অনুষ্ঠানে ছাত্র সংসদের নেতারা মঞ্চে প্রভোস্টের চেয়ারের পাশে একটি খালি চেয়ার রেখে তা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় পূর্বতন প্রভোস্টের স্মরণে। ছাত্রদের সব কটি বক্তৃতায় অনুপস্থিত পূর্বতন প্রভোস্টের কথাই ঘুরে ফিরে এলো। সংসদের ভিপি আলী হায়দার তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট বল্লেন যে প্রফেসর মতিন চৌধুরীর মত তাঁদের ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনে সহমর্মী

হতে পারলেই শুধু নতুন প্রভোস্টকে হলে সহযোগিতা দেয়া হবে, নইলে তিনি এখানে অবাঞ্ছিত হবেন। এই সভায় উপস্থিত না থাকলেও বন্ধুদের কাছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনেছি সে রাতেই। স্পষ্টত ভিসি এম ও গণি বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট বিভাজিত করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু এত সবের মধ্যেও সলিমুল্লাহ হলের সহ-অবস্থানের ঐতিহ্য কিন্তু বার বার টিকে গেছে। আমাদেরও প্রভোস্ট বদল হয়েছে—কিন্তু সেটি স্বাভাবিক নিয়মে। আমাদের নতুন প্রভোস্ট রসায়নের প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদ নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পছন্দের মানুষ ছিলেন, এবং স্বভাবতই ছাত্রদের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতিই ছিলনা। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটিকে সলিমুল্লাহ হলের ঐতিহ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব সবার প্রতি সমান আচরণ করা ও সহ-অবস্থান বজায় রাখার পথে কোন অন্তরায় হতে দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এদিক থেকে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ না থাকলেও পরে আমাকে ভিপি হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধেও কাজ করতে হয়েছে। ওই ব্যক্তিত্বের কারণে তাতে কখনো বড় অসুবিধা বোধ করিনি।

আমাদের হলের ছাত্রদের মধ্যেও ওই বিভাজনের ফলে এখন মাঝে মাঝে সহিষ্ণুতার অভাব দেখা দিচ্ছিল। ছোটখাট ঘটনা বড় হয়ে ওঠছিলো। এমনি একটি ঘটনায় হলের অডিটোরিয়ামে মঞ্চের উপর বহু কাল ধরে টাঙ্গানো জিন্নাহর বাঁধানো ছবিটি কে বা কারা গোপনে রাতে ভেঙ্গে ফেললো। সকালে কাচের ভাঙ্গা টুকরা ছবির কাগজ, ফ্রেম ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হলে রীতিমত মোহরমের মাতম শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া এক সঙ্গে দেখা গেল। শোনলাম আমার চেনা কয়েকজন মোহাজের উর্দুভাষী ছাত্র (দেশ বিভাগের সময় বা পরে ভারত থেকে আসা) ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, কেউ তাদেরকে শান্ত করতে পারছেনা। অন্যদিকে একটু বেশি জঙ্গি এনএসএফের ছাত্ররা বলছে এটি নিশ্চয়ই ওই কম্যুনিস্ট এপসুর ছেলেদের কাজ, তাদেরকে হল থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এপসুর যাদের ঝুঁকি বেশি তাদের কেউ কেউ আপাতত হল থেকে দূরে রইলো। এনএসএফের কেউ কেউ উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে শুরু করলো 'রাষ্ট্রদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে, তাৎক্ষণিক ভাবে ছোটখাট সভার আয়োজন করে। আমাদের ভিপি চৌধুরী শফি সামি বিপদ ঠেকাতে এগিয়ে এলেন। তিনি নিজের দলের আয়োজিত ওই সভায় গিয়ে শান্তির কথা বল্‌লেন, আসলে কে কেন এই জঘন্য কাজ করেছে সেটি জানার চেষ্টা না করে উত্তেজনা সৃষ্টি করা ঠিক হবেনা বলে বোঝালেন। তিনি কাউকে ভয় না পাওয়ার জন্যও অনুরোধ করলেন—এপসুর সমর্থক বা অন্য কাউকে। সিদ্ধান্ত দিলেন যে আজ বিকেলে সব ছাত্রের একটি সভা অডিটোরিয়ামে ডাকবেন এই ঘৃণ্য কাজের প্রতিবাদ করার ও এ সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য।

হল মোটামুটি শান্ত হয়ে এলো—সবাই ওই সভার অপেক্ষা করলো। ওই সভায় শফি ভাই একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন ইংরেজিতে। ইংরেজি ভাষায় চোখা চোখা নিন্দাবাক্যগুলো ব্যবহার করে তিনি এই কুলাঙ্গার দুষ্কৃতকারীদের নিন্দা জানালেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে তার উদ্ঘাটন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে আহবান জানালেন। কায়দে আজম (মহান নেতা) জিন্নাহ এবং আমাদের দেশ ও রাষ্ট্র যে অভিন্ন, তাঁকে অপমান যে দেশকে অপমান ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাও ব্যাখ্যা করতে ভুল্‌লেননা। তবে এজন্য অহেতুক কোন দল বা গোষ্ঠীর দিকে আঙুল দেখানো ওই দুষ্কৃতকারীদের উদ্দেশ্যই পূরণ করবে সে ব্যাপারেও সতর্ক করলেন।

বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে একজন করে বলতে দেয়া হলো। এপসুর প্রতিনিধিত্ব করে বল্‌লেন হলের অনাবাসিক ছাত্র গিয়াস কামাল চৌধুরী (পরে বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাংবাদিক নেতা)। তিনি খুবই ঘরোয়া ভঙ্গিতে একটি অনবদ্য বক্তৃতা দিলেন—যাতে মনে হলো জিন্নাহর নানা গুণাবলী ও গুরুত্ব তিনি যত জানেন ও অনুধাবন করেন এখানে উপস্থিত যে কারো চেয়ে তা বেশি। বিশেষ করে জিন্নাহর নো-ননসেন্স মনোভঙ্গি এবং সব কিছুতে শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রতি কঠোর মনোভাবটি তুলে ধরার জন্য তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। জিন্নাহ বোম্বাইতে বাস করা কালীন মুসলিম লীগের সমর্থক দু'জন ছাত্র তাঁর বাসায় এসেছিলো দেখা করতে। ওরা কথা প্রসঙ্গে গান্ধী সম্পর্কে নানা রকম খারাপ কথা বলছিলো, এই ভেবে যে এগুলো জিন্নাহকে খুশি করবে। জিন্নাহ কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন ওখানে একটা মাত্র সাইকেল দেখা যাচ্ছে, তারা একই সাইকেলে চড়ে এসেছে কিনা। যখন শুনলেন তাই করেছে তখন তিনি তখুনি তাদেরকে বেরিয়ে যেতে বল্‌লেন। বোম্বাইতে সাইকেলে ডাবল রাইডিং করা যে বেআইনী তারা এই সাধারণ আইনটি মানবেনা অথচ গান্ধীর মত একজন মহৎ মানুষের নামে কুৎসা রটাবার দুঃসাহস রাখে, এটি তিনি সহ্য করবেন না। গল্পের প্রাসঙ্গিকতা হলো শৃঙ্খলার বাইরে কাজ করে জিন্নাহকে অপমান করার শোধ নেয়া সম্ভব নয়। এভাবে আপাতত উত্তেজনা থামিয়ে পরদিন ভিপি'র নেতৃত্বে সবাই মিলে পুনরায় নতুন করে ধাঁধাই করা ছবিটি খুবই আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনরায় স্থাপন করা হলো। কখনো কখনো সহিষ্ণুতার সাময়িক অভাব দেখা যেতো বটে তবে সলিমুল্লাহ হলের শান্তির ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছাত্র নেতাদের কারণে এটি কখনো সীমা লঙ্ঘন করতোনা।

১৯৬৩তে হল নির্বাচনের সময় যখন এলো তখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আর ওভাবে ঐক্যবদ্ধ নয়। এনএসএফ এখন আর গোপনে নয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং অনেক সময় হিংসাশ্রয়ী ভাবে আইয়ুব খান আর তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রদেশে মোনেম খান সরকারের দমন নীতি

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহায়তা নিয়েই। এরকম অবস্থায় আইয়ুব বিরোধিতার প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়ন (এপসু) এবং ছাত্র লীগ কাছাকাছি এলো, এবং সেই সুবাদে সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনে এই দুইয়ে কোয়ালিশন হলো, আর এনএসএফ কোয়ালিশন করলো ছাত্র শক্তির সঙ্গে। এপসুর কোয়ালিশনের ভিপি প্রার্থী ফরাস উদ্দীন (পরে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য) এবং এনএসএফ কোয়ালিশনের ভিপি প্রার্থী শামসুল হুদা (পরে বাংলাদেশের চীফ ইলেকশন কমিশনার)। এপসু এখন আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিশেষ করে এই বছর প্রতিভাদীপ্ত অনেক ছাত্র যারা হলে ভর্তি হয়েছিল তাদের বড় অংশই এপসুতে যোগ দিয়েছে। এই নতুনদের মধ্যে মাহবুবউল্লাহ, সা'দত, কাদের ভূঁইয়া, হায়াৎ হোসেন (পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক) এরা নির্বাচনী প্রচারে বড় ভূমিকা রাখলো। এবার আমিও প্রচার সভাগুলোতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস করলাম—এবং নিজের জন্য বলার একটি বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম। অনেকটা এ সময়েই আমার সেই অ্যাটমের ছবি আঁকা সবুজ ব্লেজারটি (ফিলিপাইন জাম্বুরীতে ম্যানুয়েলের দেয়া কোট অনুসরণে তৈরি) এপসুর প্লাটফরম সভায় বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল—কখনো আমার গায়ে, কখনো মাহবুবউল্লার, কখনো অন্য কারো।

সলিমুল্লাহ হলের এ বছরের নির্বাচনের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল এ জন্য যে এ বছর ডাকসুর ভিপি এই হল থেকে হবার কথা। তাই মেনন ভাইকে হলের দু'জন ডাকসু প্রতিনিধির প্রার্থীর অন্যতম হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিলো—হলের নির্বাচনে এপসুর দু'জন প্রতিনিধি জিতলে তিনিই হবেন ডাকসুর ভিপি। কাজেই মেনন ভাইয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নেতাকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে ডাকসু ভিপি হিসেবে পাওয়ার চাবিকাঠি আমাদের হল নির্বাচনেই চলে এলো। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছিল ১৯৬৩ এর এই নির্বাচন। প্লাটফরম বক্তৃতাকে মজার মজার উপমা ইত্যাদি দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা হতো। একদিন বিপক্ষের প্লাটফরম সভা শুনতে গিয়ে এনএসএফ নেতা মাহবুবুল হক দোলনকে পলাশীর যুদ্ধের কাহিনীর উপমা ব্যবহার করে বলতে শোনলাম 'ফরাস পেতে আমরা মীরজাফর আর মনি বেগমকে বসতে দিতে পারিনা। যে কোন মূল্যে এদেরকে প্রতিহত করতেই হবে।' ফরাস এখানে আমাদের ভিপি প্রার্থী ফরাস উদ্দীনকে ইঙ্গিত করছে, মীরজাফর মানে এপসু নেতা কাজী জাফর আহমদ। পুরো বক্তব্যের ইঙ্গিত হলো এই এপসু-ছাত্র লীগ কোয়ালিশন ফরাস উদ্দিনকে উছিলা করে জয়ী হতে পারলে তারা দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেবে, যেমন করে পলাশীতে বিকিয়ে দিয়েছিল আসল মীরজাফর ও মনি বেগম গং।

যথারীতি প্রচুর উত্তেজনা ও উৎসবের মধ্যে চল্‌লো নির্বাচনের দিনটি। সন্ধ্যার একটু আগে নির্বাচন সবে শেষ হয়েছে তখনো হৈচৈ চলছে, এমন সময় খবর এলো বৈরুতে প্রবাসে সোহরাওয়ার্দী মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের কথা যেন সবাই ভুলে গেল। নির্বাচনী ডামাডোলে এতক্ষণ আমরা যারা ওখানে ছিলাম তাদেরকে তো বটেই, হলে যে যেখানে ছিল সবাইকে খবর দেয়া হলো। সবাই ছুটে এলো সামনের চত্বরে। প্রায় সব ছাত্রই মনে হলো স্তম্ভিত, এমন একটি খবরের জন্য কেউ তৈরি ছিলনা। অনেকে বলাবলি করছিলো এত বড় দুর্ভাগ্য জাতির আর হতে পারেনা, গণতন্ত্রের কবর দেয়ার জন্য যাবতীয় আয়োজন যখন সম্পন্ন, তখন গণতন্ত্রের শেষ আশার বাতিটিও যেন ফুৎকারে নিভে গেল। সবার পক্ষ থেকে আমাদের ভিপি শফি ভাই মনে হলো এই কথাটাকেই তুলে ধরলেন। চত্বরে এক রাশ বিষাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশ' ছাত্রের উদ্দেশে হলের প্রবেশ দ্বারের সিড়ির ওপর থেকে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগময় ইংরেজিতে বললেন—'ঐ যে সূর্যটি ডুবে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সেই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছে আমাদের জাতির আলোক বার্তিকাটি। হঠাৎ আমরা নেতাহীন হয়ে পড়লাম, নেতাহীন জাতির উপর একটি অন্ধকার যেন নেমে আসছে।' আমরা যাঁরা শুনছিলাম, সবাই তাঁর কথার মর্মটি অন্তর থেকে অনুভব করতে পারছিলাম—তা এপসু, লীগ, এন এস এফ, ছাত্র শক্তি যেই দলের ছাত্রই হই না কেন।

সেই দিনটি ছিল ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩। শফি ভাইয়ের কথাটিকেই যেন সত্য প্রমাণ করার জন্য ডিসেম্বর শেষ হয়ে বছর না ঘুরতেই ঢাকার বুকে নেমে এসেছিল এক অভাবনীয় কাল রাত্রি—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভারত বিভাগ পূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যুগের এতকাল পর এটি আমাদের ঢাকায় আবার ঘটবে এমন কথা ভাবতেই পারিনি, আর স্পষ্টত এর পেছনে ইন্ধন ছিল আইয়ুব-মোনেমী রাজনীতির। ইতোমধ্যে অবশ্য এপসু ভাল ভাবে নির্বাচন জিতেছে—ফরাস ভাই হলের ভিপি হয়েছেন, মেনন ভাই ডাকসুর ভিপি; অন্যান্য হলগুলোতেও এপসু ভাল করেছে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু সারা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে শোকের দুঃখের বন্যা এনেছিল। যেদিন তাঁর মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছলো কফিন বহনকারী শোকার্ত মানুষের বিশাল মিছিলের ছবির উপরে পাকিস্তান অবজাভার পত্রিকা বিরাট হরফে শিরোনাম দিয়েছিলো ইংরেজি কবিতার সেই অমর ছত্রটি 'হোম দে ব্রট দি ওয়ারিয়র ডেড।' সবাই বুঝতে পারছিলো নেতাহীন দেশে আমাদের সংগ্রাম কঠিনতর হবে।

দাঙ্গাটি বেধেছিল ভারতের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে, ২৭ ডিসেম্বর কাশ্মীরের শ্রীনগরে হযরত বাল মসজিদ থেকে সেখানে রক্ষিত হযরতের পবিত্র চুল চুরি হয়ে গিয়েছিল—এতে ভারতে ও পাকিস্তানে মুসলিমদের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তারই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে এই দাঙ্গা। ওই সময় ঢাকা সফরে থাকা আইয়ুব খান ইসলামাবাদে ফিরে ঘোষণা করেছিলেন যে পবিত্র চুল

চুরির মত এরকম ঘৃণ্য কাজ যদি এদেশে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তবে তিনি দায়ী থাকবেননা। তাঁর দল কনভেনশন মুসলিম লীগ 'কাশ্মীর দিবস' ঘোষণা করেছিল ওই সময় একটি দিনকে। কয়েক দিন পর চুরি যাওয়া পবিত্র চুল ফিরে পাওয়া গেলেও রেডিয়ো পাকিস্তান থেকে বলা হয় ওটি আসল চুল নয়। মোট কথা দাঙ্গা শুরু করার সব উপাদান সরকারের কাজের মধ্যে ছিল। প্রথমে খুলনা থেকে শুরু হয়ে ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে ঢাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয়। শহরে নানা স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ নিহত হয়—বিশেষ করে পুরোনো ঢাকায় এবং শিল্প অঞ্চলে। হিন্দু মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও প্রচুর ধ্বংস হয়—চেনা ঢাকা শহর একটি আতঙ্কপুরীতে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এত মানুষ ভয়ে বাস্তুহারা হয় যে তাদের জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টির মত ত্রাণ শিবির খুলতে হয়। আমাদের কাছেই জগন্নাথ হলে স্থাপিত হয়েছিল এমনি একটি ত্রাণ শিবির। আমাদের হল থেকে এপসুর স্বেচ্ছাসেবকরা পালাক্রমে সেখানে কাজ করেছে রাত দিন। শিগ্‌গীর দেখা গেল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উর্দুভাষী মোহাজের আর কারখানার শ্রমিকদেরকে খেপিয়ে তোলা হয়েছে। হিন্দুদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ভারত যেতে বাধ্য করে তাদের সম্পত্তি দখলও একটি উদ্দেশ্য ছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধে সরকারী ব্যবস্থা খুব অপ্রতুল হলে নাগরিক সমাজের এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম দেয়া হয়েছিল—'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। একই সঙ্গে গোড়াতেই কতগুলো অবিস্মরণীয় ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল আক্রান্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে। গুলিস্তানের কাছে গভর্নর হাউসের বাইরের গেটের সামনেই দাঙ্গাবাজরা হত্যা করে পুরোনো ঢাকার সম্মানিত সমাজকর্মী আমীর হোসেন চৌধুরীকে। তিনি নবাবপুর অঞ্চলে আক্রান্তদের রক্ষার চেষ্টা করছিলেন—তাঁকে তাড়িয়ে এখানে এনে হত্যা করা হয়। নটারডাম কলেজের অধ্যাপক ফাদার রিচার্ড নোভাক নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিলেন সেখানে আক্রান্তদের বাঁচাবার চেষ্টায়, দাঙ্গাবাজরা তাঁকেও খুন করে। পরে নটারডাম কলেজ থেকে আসা সহপাঠীদের কাছে এদেশের মানুষের প্রতি ফাদার নোভাকের ভালবাসার কথা অনেক শুনেছি। একটি নাগরিক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হলো ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' এই আহ্বানটি পোস্টারের আকারেও ছড়িয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এবং বামপন্থী দলগুলো সহ অসম্প্রদায়িক আদর্শের সব দল এতে শামিল হয়েছিলো, ছাত্রদের দলগুলোতো বটেই। সরকার এই নাগরিক প্রতিরোধকেও ব্যাখ্যা করতে চাইলো পাকিস্তানের সংহতি ও অখন্ডতার ওপর একটি আক্রমণ হিসেবে। দাঙ্গার পরিস্থিতি ও এর গণপ্রতিরোধ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আমরা গুজব শোনলাম যে এটি শিগ্‌গীর বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় রূপ পেতে পারে। সরকারও বোধ হয়

তেমনটি উপলব্ধি করে দাঙ্গার রাশ টেনে ধরেছিল, জানুয়ারির মধ্যে দাঙ্গার অবসান হয়েছিল। বোঝা গেল অগণতান্ত্রিক সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামনে বহু রকমের বহু কসরত করা হবে; তাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলতে হবে, আর এ আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকবে যথারীতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিরোধ যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসবে, সেটি বোধ হয় তখন মোনেম খানও বুঝতে পারছিলেন, কাজেই তিনি আরো প্রত্যক্ষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেন—একেবারে সশরীরেই ঢুকলেন, বহুদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাবর্তন (কনভোকেশন) আয়োজন করতে বলে। ২২ শে মার্চ কার্জন হলের সামনে বিরাট প্যান্ডেল বানিয়ে সমাবর্তনের আয়োজন করা হলো; এতে পৌরহিত্য করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আবদুল মোনেম খান।

ওসময় আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ প্রায় শেষ হতে চলেছে এবং সামনে তৃতীয় বর্ষ শুরু হলে অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে সিঙ্গেল সীটেড রুমে যেতে পারবো। এই মধ্যবর্তী সময়ে আমার ঠাঁই হয়েছিল 'ফেডারেল এরিয়াতে' সিনিয়র তিন জনের সঙ্গে যাঁরা এই কনভোকেশনে ডিগ্রি নেবেন। তার মধ্যে একজন হলেন জাকির ভাই। সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনায় অত্যন্ত উন্নাসিক হলেও, খুবই সদালাপী মুক্ত মনের মানুষ। বয়োকনিষ্ঠ হয়েও তাঁর সঙ্গে চুটিয়ে তর্ক করা যেতো। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হয়েছিলেন। আর ছিলেন রসায়নের ছাত্র নুরুল আমিন ভাই (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), খুবই রসিক মানুষ—যেন হাসির অ্যাটম বোম। হাসাতে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে দিতেন। কয়েকটি টিউশনি করতেন বলে একেবারে ঘড়ি ধরে চলতেন। টিউশনির উদ্দেশে যাওয়ার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শেষ হাসির কথাটি বলার সময়ও হাতঘড়িটি চোখের সামনে ধরে রাখতেন। দিন রাত তাঁদের কাছে কনভোকেশনের নানা আয়োজনের কথা শুনছি। সমাবর্তনের দিন আমাদের কার্জন হল এলাকায় প্রবেশ নিষেধ, অসম্ভব নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। শুধু জাকির ভাইদেরকে যাঁরা ডিগ্রি নেবেন তাঁদেরকেই সব নথিপত্র দেখে যাচাই করে ঢুকতে দেয়া হবে। পুরো বিষয়টিকে ছাত্ররা দেখছিলো মোনেম খানের বিশ্ববিদ্যালয় জয় করতে আসার কৌশল হিসেবে, কাজেই তারা যে চুপ করে থাকবেনা তা বলাই বাহুল্য। কোন কিছু তাদের করতেই হবে, আর তা করতে হবে ডিগ্রি নিতে যারা গাউন পরে ভেতরে যাচ্ছেন তাদের মাধ্যমেই। আশা করছিলাম কিছু প্রতিবাদ হবে, কিন্তু যা ঘটলো তার জন্য আমরাও প্রস্তুত ছিলামনা।

ঘটনার পর কনভোকেশন ফেরত ছাত্রদের কাছ থেকে এর পূর্ণ বিবরণ পেলাম। শুরুতে সুন্দর ভাবে এটি শুরু হয়েছিলো। প্যান্ডেলটি গাউনপরা ডিগ্রি নেবার ছাত্রদের দ্বারা কানায় কানায় ভর্তি। সামনে রয়েছেন আরো নানা জমকালো গাউনে শিক্ষকরা, আর আছেন অভ্যাগতরা। গভর্নর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন—কাজেই অভ্যাগতদের মধ্যে রথী-মহারথী কেউ বাদ ছিলেন না। মঞ্চে

লাল গাউনের ডীনরাসহ ভাইস চ্যান্সেলর এম ও গণি এবং চ্যান্সেলর মোনেম খান আপাদমস্তক জমকালো গাউনে ঢাকা—খুবই ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ডিগ্রি প্রদান শুরু হলো। প্রথমেই ডিগ্রি দেয়া হবে ব্যাচেলর অব আর্টসদের—যারা কনভোকেশনের একটি বড় অংশ; ওরা উঠে দাঁড়ালো। এখন চ্যান্সেলর সেই চিরাচরিত ইংরেজি বাক্যটি উচ্চারণ করে তাদেরকে ডিগ্রি প্রদান করবেন বাংলায় যা দাঁড়ায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি প্রদান করছি...'; এর পরের কথাটি হলো 'আই চার্জ ইউ টু প্রুভ ইয়োরসেলফ বাই ইউর কনডাক্ট অ্যান্ড কারেক্টার ওয়ারর্দি অফ দি সেইম'। ওই 'আই চার্জ ইউ' কথাটিই ছিল সিগন্যাল। মোনেম খান 'চার্জ ইউ' বলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের একটি বড় অংশ এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো 'লাঠি চার্জ!' আর তাদের গাউনধারী ছোট একটি অংশ সোজা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গভর্নরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘটনাগুলো এত আচমকা ঘটলো যে কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী, পুলিশ কেউ এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা। অবিন্যস্ত গাউনে গভর্নরকে কোন রকমের রক্ষা করে গাড়িতে তুলে দেয়া হলো। কনভোকেশন নিমেষে পণ্ড হয়ে গেলো। পর দিন সব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা গেল ওই অদ্ভুত ছবিটি—গাউন পরা তরুণদের আক্রমণে গাউন পরা চ্যান্সেলরের এবং মঞ্চের লন্ড ভন্ড অবস্থা।

ছাত্ররা আইয়্যুব-মোনেমের শাসনকে কী চোখে দেখে তার একটি বার্তা এই কনভোকেশন পণ্ড করার ঘটনা দিলো বটে, কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর দিক থেকে এর প্রতিক্রিয়াটিও হলো খুব তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। এ ঘটনায় নেতৃত্ব দানকারীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো। তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজা হতে লাগলো—কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েও গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনেকের ডিগ্রি বাতিল করলো, জাকির ভাই তাঁদের মধ্যে একজন। ছাত্র লীগ সাধারণ সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর ডিগ্রিও বাতিল হলো, তেমনি নেতৃস্থানীয় আরো অনেকের। কনভোকেশন পণ্ড করার কাজে অগ্রণী গাউনধারী সবাই যে ডিগ্রির হকদার ছিল তা নয়, এপসু এবং ছাত্রলীগের বেশ কিছু কনিষ্ঠ ছাত্রও কেমন করে জানি গাউন ও প্রবেশ পত্র যোগাড় করে তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল—তাদের মধ্যে আমাদের হায়াৎ হোসেনও ছিল—প্রথম বর্ষের ছাত্র হয়েও হলে সে হিরোতে পরিণত হলো; কিন্তু তাদের ধরা পড়তে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হতে দেরি হলোনা।

সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলো এই প্রক্রিয়া বজায় রইলো এর পর দীর্ঘকাল। ওদিকে নানা ভাবে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতেই থাকে, গ্রেপ্তারও হতে থাকে কেউ কেউ, কিছুদিন পর আবার ছেড়েও দেয়া হয়। কনভোকেশন উপলক্ষে যাঁদের ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়েছিল হাইকোর্টের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় তা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিলো। যারা

বহিষ্কৃত হয়েছিলো তাদের বহিষ্কারাদেশও প্রত্যাহার করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের হলে বিশেষ করে এপসুর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই তখন জেলের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, অনেকেরই বার বার সেখানে ফেরত যাওয়ারও। জেলের খাবার, জেলের কম্বল, জেলের আড্ডা ইত্যাদি নিয়ে গল্প তখন বন্ধুদের মুখে সমানে শুনতে লাগলাম। আমি এ গল্প বেশি শুনেছি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর কাছে, বেশ রসিয়ে রসিয়ে তা বলার কারণে। মোনেম খান বিজয়ীর বেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারেন নি বটে, কিন্তু তিনি অনেক ছাত্রের জীবনকে যথেষ্ট উল্‌টে পাল্টে দিতে পেরেছিলেন। আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রাম চলতেই থাকলো—এবং তাতে যুক্ত হলো নতুন নতুন অধ্যায়।

রমনার পদাতিক

ঢাকা থেকে বিজ্ঞান সাময়িকী

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর বিজ্ঞান সাময়িকীর মূল কেন্দ্র ঢাকায় চলে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-ছাত্রের কর্মদিন বেশ দীর্ঘই ছিল—ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল ইত্যাদি মিলিয়ে; আমার ক্ষেত্রে তাও নিয়মিত সলিমুল্লাহ হল-কার্জন হল করে। ছাত্র রাজনীতির মোহটাও কম নয়। কিন্তু এর মধ্যে এক মনে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য কাজ করতে হচ্ছে—কারণ সেটিই আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ।

আমাকে রোজ সন্ধ্যার দিকে সবাই রুমে কর্মরত অবস্থায় দেখতো। সবাই যখন ক্যান্টিনে নাশতা সেরে ওখানে গল্প করে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে যেতো, হলের রুমগুলো যখন একেবারে খালি, তখন আমি সমানে লেখালেখি করছি—যার প্রায় সবই বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজ। সময়ের টানাটানির কিছুটা সুরাহা করতে আমার এই অভ্যাস—বন্ধু মহলে মোটামুটি জানা ছিল ব্যাপারটি। ঢাকায় আসার পর এর জন্য ম্যাগাজিন ইত্যাদি উৎসগুলো আরো হাতের কাছে এসেছিলো। সলিমুল্লাহ হলের একেবারে সংলগ্নই বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি—সেও একটি বড় সুবিধা। কাজেই আমি রীতিমত একটি ওয়ান-ম্যান পাবলিকেশন অফিস চালিয়ে যেতে লাগলাম হলের রুম থেকেই। আগের মতই পত্রিকার একটি বড় অংশ নিজেকে লিখতে হতো—প্রায় সব ফিচার, এবং অন্তত একটি প্রবন্ধ। খুব গুরুত্ব দিতাম প্রত্যেক সংখ্যার একটি যুৎসই সম্পাদকীয় লেখার ওপর—কখনো দেশীয় কোন বিষয়ে, কখনো বিশ্ব বিজ্ঞানের।

প্রথম দিকে ঢাকায় বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রেস ছিল পাইওনিয়ার প্রেস, রমাকান্ত দাস লেইন—শহরের অন্য প্রান্তে। ওখানে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে হতো। মুদ্রণ শিল্পে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মোহাইমেন সাহেবের মালিকানায় পাইওনিয়ার প্রেস সেকালে আসলেই ছিল এই বিষয়ে পাইওনিয়ার। লাইনো টাইপ, অফসেট ইত্যাদি অনেক কিছু প্রবর্তন তাঁরা প্রথম করেছিলেন। চট্টগ্রামে আমার কেনা টাইপগুলো

যখন ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ে গিয়েছিল তখন এখান থেকেই সেগুলো গলিয়ে নতুন টাইপ করে নিয়েছিলাম। শিগ্‌গীর বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে আমার একাকীত্ব ঘুচলো। বাহাদুর (শামসুল হোসাইন, কলেজিয়েট স্কুলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কাজের সহযোগী) নটারডাম কলেজে পড়ছিলো। সে প্রকাশনার কাজে হাত লাগালো—আমি কিছুটা হলেও ভারমুক্ত হলাম। বাহাদুর থাকতো গোপীবাগে, তাই প্রেসের দেখাশুনা যেন আমরা দু'জনে ভাগ করে করতে পারি এজন্য তখন থেকে বিজ্ঞান সাময়িকী টিকাটুলিতে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রেস থেকে ছাপাবার ব্যবস্থা করলাম—অর্থাৎ নিউ নেশন্স প্রিন্টিং প্রেসের জব সেকশন থেকে। সেই থেকে দীর্ঘকাল এই প্রেসে আমাদের আসা যাওয়া।

এখানে শুরুতেই একদিন দেখলাম ভবনের ভেতরে একটি খোলা উঠোনের মত জায়গায় এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বেশ আয়েস করে ইজি চেয়ারে বসে আছেন—হাতে হুকোর নল। অদ্ভুত ভাবে মনে হলো তিনি যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে জোরে জোরে কথা বলছেন বেশ আবেগ দিয়ে—'সরকার বাহাদুর কি মনে করেন তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন..'। প্রেসে ঢুকে জানলাম ইনিই বিখ্যাত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া—ইত্তেফাকে তাঁর অবিস্মরণীয় কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চের' জন্য শ্রুতলিপি দিচ্ছিলেন। একটু দূরে বসে কেউ একজন শ্রুতলিপি লিখছিলেন তা লক্ষ্যই করিনি। মানিক মিয়া কলামটি লিখতেন 'মুসাফির' এই ছদ্মনাম। ইত্তেফাক পত্রিকা বা মানিক মিয়ার সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ হতোনা ওখানে; যাঁর সঙ্গে হতো তিনি হলেন ফজলে ইমাম—প্রেসের জব সেকশনের ম্যানেজার। ঘিঞ্জি বিরাট কক্ষে চারদিকে কম্পোজিটরদের মাঝখানে একটু উঁচু মঞ্চের মত জায়গায় ফজলে ইমাম সাহেবের টেবিলের সামনে বছরের পর বছর আমার বহু ঘণ্টা কেটেছে—প্রুফ দেখতে, পেইজ মেইক আপ বোঝাতে, আর ফাঁকে ফাঁকে চা খেয়ে খেয়ে গল্প করতে। একটু দূরেই লম্বা কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা একজন কম্পোজিটর বসতেন যিনি বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজগুলো করতেন—তাঁকে মাওলানা ডাকতাম। কখনো আমাদের কাজ সরাসরি মাওলানাকেই বুঝিয়ে দিতাম, অপেক্ষা করতাম কখন তিনি ভেজা নিউজ প্রিন্টের ওপর প্রথম গ্যালি প্রুফ এনে হাতে তুলে দেবেন। ফজলে ইমাম তখন বয়সে তরুণ—সমানে চা আর পান খাচ্ছেন। এসময় তিনি প্রেস কর্মচারি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠছিলেন, এবং তাঁর টেবিলে প্রেসের কাজ ছাড়াও ইউনিয়নের কাজ প্রচুর আলোচিত হতো। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে কাজ করার ফলে আমার মনে হয়েছে তিনি নিজকে বিজ্ঞান সাময়িকী টিমের অংশ হিসাবে মনে করতেন। চোখের সামনে দেখলাম কী করে ফজলে ইমাম প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের জনপ্রিয় এবং খুব সম্মানিত প্রধান নেতা হয়ে ওঠেছিলেন। বহুকাল পর পরিণত বয়সে তাঁকে বাংলাদেশের প্রেস ও পত্রিকা ট্রেড ইউনিয়নের বিখ্যাত সভাপতি হিসেবে সম্মান পেতে দেখে আমার খুব ভাল লাগতো।

বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে এবং তার বাইরেও বাহাদুর আর আমি যেন কিছুটা আমাদের ছেলেবেলার সরল সব কৌতূহলে ফেরত গেলাম। তোপখানায় ইউ এস আই এস লাইব্রেরিতে সে সময় মহাশূন্য অভিযান সম্পর্কে মাঝে মাঝে প্রদর্শনী হতো, আমরা সেগুলো এক সঙ্গে দেখতে যেতাম। ১৯৬১-৬২ সনে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্যাগারিন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের জন গ্লেনের মহাশূন্যে কক্ষপথে ভ্রমণের পর মানুষের মহাশূন্যে ভ্রমণের বিষয়টি সারা দুনিয়ার মানুষের কল্পনায় সামনে চলে এসেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতোমধ্যে তার লুনা মহাশূন্য যানগুলোকে চাঁদ পরিক্রমণ করিয়েছে, মানববিহীন যানকে চাঁদের উপর অবতরণও করিয়েছে। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি ষাটের দশক শেষ হবার আগেই প্রথম আমেরিকানকে সশরীরে চাঁদে অবতরণ করানোর সাহসী সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ থেকে পরপর এসেছে আমেরিকান 'জেমেনি' প্রকল্প ও 'এপলো' প্রকল্প। এগুলোর মাধ্যমে প্রস্তুতি চলছিল যাতে একাধিক মহাশূন্যচারী চাঁদে গিয়ে নিরাপদে ফেরত আসতে পারে। এজন্য মহাশূন্যযানের বাইরে গিয়ে এর যাত্রী নিজেই মহাশূন্যে ভেসে মেরামত ইত্যাদি করতে পারা, একটি যান মহাশূন্যে অন্য একটি যানের সঙ্গে নিরাপদে সংযুক্ত হতে পারা ইত্যাদি সাফল্য একে একে আসছিল, যেগুলো চাঁদে অবতরণের জন্য অপরিহার্য ছিল। আমরা দু'জন ওই প্রদর্শনীগুলোর বড় বড় ছবি, ধারা বর্ণনা, আর সিনেমার মাধ্যমে এই সাফল্যগুলো দেখার আর বোঝার চেষ্টা করতাম। এসব সম্পর্কে প্রেস প্রতিবেদন, ছবির প্লাষ্টিক ব্লক ইত্যাদি এখান থেকে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য নিয়মিত পাচ্ছিলাম।

শুধু মহাশূন্য ভ্রমণের বিষয় নয়, বাহাদুর আর আমি তেষট্টি-চৌষট্টি সালের ওই সময়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরো বহু বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম তার কিছু কিছু বিজ্ঞান সম্পর্কিত হলেও অনেক কিছু ইতিহাস সম্পর্কেও বটে। গোপীবাগে থাকার কারণে বাহাদুর পুরোনো ঢাকার অলিগলিতে নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে খবর রাখতো। আমরা ওর বাসার কাছেই 'রোজ গার্ডেন প্রাসাদে' গিয়েছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার হৃষিকেষ দাস বাগান বাড়ি হিসেবে তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদতুল্য বাড়ি—আগাগোড়া বিনোদন-ফুর্তির উদ্দেশ্যে তৈরি। সামনে গ্রিক কলাম, গ্রিক ধাঁচের মার্বেল মূর্তি, বিশাল সব জলসা ঘর মিলে এলাহি ব্যাপার। ও সময় ঢাকার অনেক সিনেমার শুটিং ওখানে হতো, তাই এক ভাবে আগেই দেখেছি এর দৃশ্য। আমরা দু'জন বলদা গার্ডেন, নর্থব্রুক হল, আর্মানি গির্জা ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে গিয়ে ইতিহাস অনুভব করছিলাম। আবার খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে মার্কিন দূতাবাস যখন সিনেমা-প্রযুক্তিতে একটি নতুন আবিষ্কার 'সারকারামা' ঢাকায় আনলো, তখন আমরা এক সঙ্গে সেটি দেখেছি—ভাল করে বোঝার জন্য একাধিকবার। পল্টন ময়দানে বিশাল গম্বুজাকৃতি তাঁবু খাটানো হয়েছিল 'সারকারামা' দেখানোর জন্য। ওর মধ্যে

একেবারে চারদিকে ঘেরা বিশাল সিনেমার পর্দা আর মাঝখানে দাঁড়ানো দর্শকরা। সিনেমার দৃশ্য দিয়ে আমরা এমন ভাবে পরিবেষ্টিত ছিলাম যে নিজেকে সেই দৃশ্যেরই অঙ্গীভূত মনে হতো। যেমন চারদিকে সমুদ্রের দৃশ্যে বড় বড় ঢেউয়ের উথাল পাতাল দেখে মনে হতো সমুদ্রে আমরা কোন জাহাজে আছি আর নিজেরাই ঢেউয়ে দুলছি। সিনেমাকে একেবারে বাস্তবের মত করে তুলতে এর কোন তুলনা হয়না। কিন্তু কেন জানি সিনেরামা জিনিসটি কোথাও তেমন জনপ্রিয় হয়নি। এর ভিত্তিতে কোন নাম করা সিনেমা তৈরিও হয়নি। তবে ঢাকায় এর আগমন আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য বেশ চমকপ্রদ খবর হয়েছিলো।

বাহাদুরের সঙ্গে আরো সাধারণ সিনেমাও প্রচুর দেখা হতো; অধিকাংশই 'গুলিস্তানে' অথবা আরো বেশি তার সঙ্গে থাকা ছোট্ট হল 'নাজে' রোববার মর্নিং শোতে। হলে আমাদের অনেকের এটি একটি নিত্য বিনোদন ছিল। রোববার দশটার দিকে ওখানে গিয়ে চা খাওয়া, অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়া, তারপর জমিয়ে হলিউডের দারুণ সব ছবির এক একটি দেখা।'গান্স অফ নাভারোন', 'রোমান হলিডে', 'সাইকো', 'টু কিল্ এ মকিং বার্ড', 'জাজমেন্ট অফ নুরেমবার্গ', ইত্যাদি জননন্দিত সিনেমাগুলো তো বটেই আবার 'লা ডলচে ভিটার' মত উচ্চ মার্গের ছবি যার উপর আলোচনা চলতে পারতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা তখন দেশে ছিল সেই মহলের সঙ্গে কিছু মেলামেশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর থেকে আমার ঘটেছিল। এক পর্যায়ে রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকাতে বিজ্ঞানের বিষয়ে কথিকা লেখার ও পড়ার আমন্ত্রণ পেলাম। বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠান হলে বাংলা একাডেমিতে আমন্ত্রণ পেতাম, কখনো কখনো সেই আসরে বলারও সুযোগ পেতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দ্বিতীয় বর্ষে ১৯৬৩ এর শুরুর দিকে এমনি একটি সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো—'শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞান' এ বিষয়ে ইউনিসেফ আয়োজিত একটি সেমিনারে আলোচক হিসেবে। প্রধান প্রবন্ধটি পাঠ করবেন আবদুল্লাহ আল-মুতী। তাঁর সঙ্গে ইতোমধ্যেই দেখা হয়েছে; নামটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম বহু আগে থেকে, সেই ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে। সে সময় রঙচঙে বিজ্ঞানের বই মানে ছিল লাইব্রেরিতে ছোটদের ইংরেজি বিজ্ঞানের বই। কিন্তু হঠাৎ বাজারে এসেছিলো ফ্র্যাঙ্কলিন পাবলিকেশন্সের কিছু বাংলা বই, ওই ইংরেজি বইয়ের মতই ঝলমলে। আসলে মূল আমেরিকান ইংরেজি বইয়ের ছবিটবিগুলো হুবহু রেখে বাংলা অনুবাদ—'তাপ', 'বিদ্যুৎ', 'মাটি', 'পোকামাকড়' ইত্যাদি নামের এক একটি বই—ছবিগুলো দেখলেই মন নেচে ওঠে, পড়লে আরো। অধিকাংশই অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ আল-মুতী।

পরে পড়লাম তাঁর নিজের লেখা বই; ভঙ্গিটি খুব সুন্দর—এক্কেবারে ছোট ছেলে মেয়েদেরকে পাত্রপাত্রী করে রীতিমত আসর জমানো বিজ্ঞান। কলেজে বিজ্ঞান সাময়িকী বের করার পর পরই তাঁকে পাঠিয়েছি ডাকযোগে, প্রশংসা

পেয়েছি, পরে লেখাও পেয়েছি। ঢাকায় পড়তে এসে প্রথম সুযোগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। সেই থেকে কখনো তাঁর স্নেহ, সহায়তা এবং উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হইনি। তখন তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের প্রধান, তারও পর আরো বড় বড় পদে—এক সময় জনশিক্ষা পরিচালক (ডি পি আই), মন্ত্রণালয়ের সচিব; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে সব সময় মেলে ধরতেন বিজ্ঞান প্রচারের কাজে একজন সহযোদ্ধা হিসেবে। এমনকি সেই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রথম বর্ষের ছাত্র মাত্র, তাঁর কাছে কিন্তু সহযোদ্ধা বই আর কেউ নই।

আমার থেকে অনেক ছোট কাউকেও তিনি এরকম সহযোদ্ধা মনে করতে সক্ষম ছিলেন। তার প্রমাণ পেলাম বাংলা একাডেমির ওই সেমিনারে গিয়ে। সেখানে দুটি বালকের সঙ্গে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম তিনি ওদের সম্পর্কে সব কথা আগে থেকেই জানেন। একজনের নাম ভূঁইয়া ইকবাল (পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) অন্য জনের নাম আবদুল কাদের (পরে সরকারী কলেজে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক, 'কম্পিউটার জগত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক)। দু'জনেই আজিমপুরের ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী শেষ করে সদ্য নবম শ্রেণীতে উঠেছে। ওদের স্কুল থেকে ওরা সুন্দর একটি বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে সেটির নাম 'টরেটক্কা'। ওই পত্রিকা নিয়েই ওরা এই সেমিনারে এসেছে শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞানের বিষয়ে শুনতে। দেখলাম কাদের আর ইকবাল বিজ্ঞান সাময়িকীর কথা ভাল করেই জানে এবং মোটামুটি নিয়মিত পড়ে। টরেটক্কা উল্‌টে পাল্‌টে দেখলাম—ছোটদের উদ্যোগে বের হলেও খুব যত্ন নিয়ে করা। এখানেই তাদের সঙ্গে অনেক কথা হলো, বললো হলে আমার রুমে আসবে আরো আলাপ করতে।

ইকবালের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব ও একত্র কাজ শুরু এভাবেই, আর কিছুটা কাদেরের সঙ্গেও। কাদের পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সময়ে তার একনিষ্ঠ উদ্যোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওই স্কুলে থাকতেই হাতে কলমে বিজ্ঞানের কিছু কাজ সে এমন ভাবে করে গেছে যে ধরনের প্রচেষ্টা আমি বহু পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করার চেষ্টা করেছি। এটি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবসায়িক প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। কাদেরের উৎসাহ ছিল রাসায়নিক কাজে—সে বুট পালিশ, পাউডার, স্নো ইত্যাদি জিনিস তৈরি করতে শিখেছিল এ সম্পর্কে বইপত্র ঘেঁটে। এগুলো সে সুন্দর নাম দিয়ে কৌটাবদ্ধ করে বিক্রিও করেছে। কাদেরকেই আবার পরিণত বয়সে দেখেছি নিজের বিষয় মৃত্তিকা বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে কম্পিউটার আন্দোলনে যোগ দিতে এবং এতে নেতৃত্ব দিতে। এদেশে ডেস্কটপ কম্পিউটারের প্রথম যুগে কাদেরের স্থাপিত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তার তত্ত্বাবধানে আমি প্রথম এর ব্যবহার শিখি। কিন্তু তার কম্পিউটার আন্দোলনের বেগবান কাজের মাঝপথে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সে অসুস্থ হয়ে অকাল প্রয়াত হয়।

ওই সেমিনারের পর ইকবালরা বেশ কয়েকদিন আমার হলের রুমে এসে গল্প করে গিয়েছে। ওরা টরেটক্কা কী ভাবে বের করে, ওতে কে কী কাজ করে সে কথা, তাদের অন্যান্য বন্ধুদের কথা বলেছে, আমার পরামর্শ চেয়েছে। কথা প্রসঙ্গে দেখলাম ইকবাল ছেলেটির প্রতিভা কিন্তু বহু মাত্রিক। বয়স নির্বিশেষে সে যে কারো খুব কাছাকাছি যেতে পারে, সে এক অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার বয়সী মানুষ তো কোন ছার, আবদুল্লাহ আল-মুতী, এমন কি ড. শহীদুল্লাহর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার যে সব কাহিনী বললো, তাঁদেরকে নানা বেয়াড়া প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করা, তাঁদের জীবন কাহিনী শোনা—ইত্যাদি অবাক হবার মত; কিন্তু সবই নেহাত বালকসুলভ সরল কৌতূহলের অংশ হিসেবে। দেখলাম এ শুধু দু' এক জন মানুষ নয়—অনেক গুণী মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় রয়েছে, বিশেষ করে সাহিত্য জগতের মানুষদের সঙ্গে। নানা দুষ্প্রাপ্য বই, পুস্তিকা, পোস্ট কার্ড, ইত্যাদি খুঁজে পাওয়ার, এগুলোর মূল্য বোঝার এবং সংগ্রহেরও এক অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। নানা ধরনের সাহিত্যের নমুনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের পটভূমি বের করতেও সে সিদ্ধহস্ত। এগুলো অবশ্য একদিনে বুঝিনি, তার নানা মাত্রার পরিচয় ধীরে ধীরে পেয়েছি। কিন্তু গোড়াতেই যেটি বুঝেছি তা হলো বিজ্ঞান সাময়িকী ইকবালের দ্বারা বেশ উপকৃত হতে পারে। আর বয়সে ছোট হলেও ওর সঙ্গটি বেশ কাম্য ও শিক্ষণীয় হতে পারে বয়সে বড় মানুষদের জন্যও। তাই তাকে বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে সাহায্য করতে বল্‌লাম; ওর কাছেও খুব ভাল লাগলো এই সুযোগটি। কিছু পর চৌষট্টি সালের থেকে সলিমুল্লাহ হলে আমাদের বন্ধু মহলেও ইকবাল ধীরে ধীরে বেশ পরিচিত ও আপন মুখ হয়ে উঠেছিল। আমার পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জীবনে, শিক্ষক জীবনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও একত্র কাজ অব্যাহত ছিল, এবং এখনো আছে।

ইকবালের মাধ্যমে সেই সময়ের বিজ্ঞান সাময়িকী বেশ কয়েক জন কিশোর লেখক পেয়ে গিয়েছিল। ওদের অধিকাংশই ছিল ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে ইকবালের সহপাঠী। ওদের মধ্যে বেশি লিখতো আলী ইমাম (পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে খ্যাত, এবং শিশু সাহিত্যিক)। আরো ছিল শহিদুল, রইসুল। শেষের জন পরে আমার ছাত্র হয়েছিল। বড়দের মধ্যেও অনেক লেখক ও শুভানুধ্যায়ী পেতে ইকবাল সহায়ক হলো। ইকবাল থাকতো গভর্নর হাউসের ঘেরাওয়ের ভেতরে, কারণ ওর বাবা গভর্নরের অফিসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। গভর্নর হাউসের ঘেরাওয়ের একটি দরজা টিকাটুলির দিকে ছিল যা ইত্তেফাক অফিসের প্রায় মুখোমুখী। আবার তার স্কুল এবং পরে কলেজের (ঢাকা কলেজ) কারণে তাকে সলিমুল্লাহ হল অঞ্চলে নিয়মিত আসতে হতো। কাজেই প্রেসের সঙ্গে সম্পাদকের যোগাযোগ সৃষ্টিতে তার সুবিধা ছিল। বাহাদুর ঢাকায় থাকা কালে সহ সম্পাদক হিসেবে বিজ্ঞান সাময়িকীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলে ইকবালই এই অভাব পূরণ করেছিলো। এমনকি

পরে আমি যখন পড়াশোনা করতে সাউদাম্পটন (ইংল্যান্ড) চলে গিয়েছি তখন ইকবালের কল্যাণে সাউদাম্পটন-ঢাকা এমন একটি যোগাযোগ লাইন তৈরি হয়েছিল যে তখনো বিজ্ঞান সাময়িকীর নিয়মিত প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিলো।

ঐ যোগাযোগ লাইনের মধ্যে চট্টগ্রামেরও একটি স্থান ছিল, কারণ এর মুদ্রণের জন্য চট্টগ্রামে আমাদের পারিবারিক প্যাকেজেস প্রতিষ্ঠানের কিছু সহায়তা বিজ্ঞান সাময়িকী এসময় পাচ্ছিল। আমি যখন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসি, তার কিছু আগে ইউনূস ভাই চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের পারিবারিক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন—'পাকিস্তান প্যাকেজেস' নামে একটি মুদ্রণ ও প্যাকেজিং শিল্পে। পরিবারে প্রকাশনা ও মুদ্রণের একটি আবহ বহুদিন থেকে ছিল বলে এর প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব ছিল। সে সময় প্যাকেজিং শিল্পটি পূর্ব পাকিস্তানে বেশ অবহেলিত ছিল। অধিকাংশ প্যাকেজিং হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে; এর মধ্যে সেরা প্রতিষ্ঠান ছিল লাহোরের 'প্যাকেজেস লিমিটেড'। ওখানে উচ্চ পদস্থ ব্যবস্থাপক ছিলেন জামিল চৌধুরী (ইলেকট্রনিক্স ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, পরে ঢাকা টেলিভিশনের প্রথম কর্ণধার এবং এদেশে টেলিভিশন বিকাশের মূল নায়ক)। তরুণ জামিল চৌধুরীর সঙ্গে ইউনূস ভাইয়ের সে সময় পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় যা পরে আমাকেও তাঁর খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়। জামিল ভাইই আমাদের প্রস্তাবিত পাকিস্তান প্যাকেজেসের জন্য মূল ব্যবসায়িক ও ব্যবস্থাপনাগত রূপরেখা দেন, এবং প্রধানত ইউনূস ভাইয়ের চেষ্টায় চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছুটিতে, অথবা আন্দোলনের কারণে বাধ্যতামূলক হল ত্যাগের সময়, যে দীর্ঘ দিন চট্টগ্রামে থাকতাম তখন প্যাকেজেসের এই গড়ে ওঠাকে খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। যাঁদের কারিগরি সহায়তা নিতে হয়েছিল তাঁরা সবাই এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। মেশিনগুলো বসালেন করাচি থেকে আসা আইয়ুব আলি নামের একজন ডাকসাইটে প্রকৌশলী। আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তিতে উৎসাহী একজন হিসেবে এসব ছিল আমার জন্য খুবই শিক্ষণীয়। প্যাকেজেসের অফসেট পদ্ধতির কয়েকটি মেশিনই হলো এর প্রাণ, বিশেষ করে একসঙ্গে কয়েক রঙ ছাপাতে পারার মতো জবরদস্ত মেশিন। সুইডেনের বিখ্যাত সোলনা কোম্পানির এ মেশিন রীতিমত তাকিয়ে থাকার মত। সেই সঙ্গে বনেদি পদ্ধতির ভাল লেটার প্রেস মেশিনও একটি থাকলো, খুচরা কিছু কাজের জন্য—এর কোম্পানি 'অরিজিন্যাল হাইডেলবার্গ' এই নামটি জার্মানিতে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশের সঙ্গেই জড়িত। আমার বিশেষ দৃষ্টি এটির উপর কারণ বিজ্ঞান সাময়িকীর কিছু কাজকর্ম করতে চাইলে এটিই হবে সহায়। আর একটি জবরদস্ত মেশিন ছিলো কাটিং-ক্রিজিং মেশিন, কোন প্যাকেট তৈরি করতে কার্ডবোর্ডে যে ভাবে কোন জায়গায় ভাঁজ করতে হয় আর কোন জায়গায় কাটতে হয়, এই

কাজগুলোই এটি দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে। অফসেট মুদ্রণের জন্য যা মুদ্রণ করা হবে তার ফটো নিয়ে এবং তার ইমেজ সংবেদনশীল কেমিকাল মাখা দস্তার প্লেইটে ফেলে সমতল মুদ্রণ প্লেইট তৈরি করা হয়। শক্তিশালী আর্ক ল্যাম্পের আলোয় ফটোগ্রাফির সেকশনটি এবং প্লেইট মেকিং সেকশনটির বৈজ্ঞানিক দিকটিও লক্ষ্য করার মতো।

মূল যন্ত্রগুলোর চালকদের কয়েক জনকে আনতে হলো লাহোর থেকে—ঐ প্যাকেজেস লিমিটেড থেকে। ওসময় পূর্ব পাকিস্তানে এগুলো চালাবার মত দক্ষ কর্মী ছিলনা বললেই চলে। অফসেট মেশিনের তাবাস্‌সুম ও সাবির আলী, প্লেইট মেকিঙের ষ্টিফেন, এবং গ্রুয়িং মেশিনের মনোয়ার—এরা সবাই লাহোরের। ওদের মধ্যে তাবাস্‌সুম কিন্তু খুবই স্মার্ট, চমৎকার ইংরেজি বলে, কারিগরি ও ব্যবসাগত বিষয়ে নানা পরামর্শ দিতে চায়, মাঝে মাঝে তার সিনিয়রদেরকে পার্টিও দেয়। ষ্টিফেন ও মনোয়ারও বেশ শিক্ষিত, মনোয়ারতো লন্ডন থেকে প্রিন্টিঙে ডিপ্লোমা করে সোজা এখানে এসেছিলো। শুধু সাবির আলী স্বল্প শিক্ষিত, কিন্তু কারিগরি দক্ষতা প্রচুর। প্রত্যেকটি মেশিনে অবশ্য উপযুক্ত স্থানীয় সহকারী দেয়া হয়েছিলো যাতে তারা শিখে নিতে পারে। প্রথম যুগে এভাবেই কাজ শুরু করতে হয়েছিল পাকিস্তান প্যাকেজেসকে। আমাদের অনেক আপনজনও এর নানা দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যেমন ইউনূস ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহবুব ভাই প্রথম দিকে দীর্ঘ দিন পাকিস্তান প্যাকেজেসের প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক মাহবুবুল আলমের ছোট ছেলে সবিহ উল আলম (পরে দেশের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী) তখন কমার্শিয়াল আর্টে একজন উদীয়মান তারকা—প্যাকেজেসে আর্টিষ্ট হিসেবে যোগ দিলেন। আবার আমাদের ছোটবেলার বাসার সহকারী আবদুস সালাম, কাজের ছেলে আমাদের 'নেতা' সেই সেকান্দর যে নিজ চেষ্টায় বিএ পাশ করেছিল—ওরা এখানে নানা দায়িত্ব পেয়েছিলো। আব্বার অনেক ছোট তরুণ মামাতো ভাই ইমরান সহকারী মেশিনম্যান ও পরে মেশিনম্যান হিসেবে এখানে বেশ কয়েক বছর হাত পাকিয়ে দুবাই গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত 'গালফ নিউজ' পত্রিকার প্রধান মুদ্রণ ব্যবস্থাপক পদে উন্নীত হয়েছিলো।

প্যাকেজেসে আমি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ছিলাম কুশলী একজন মানুষের প্রতি, মেশিন চালনার জন্য নয় বরং হাতের কাজের জন্য—তিনি বুক বাইন্ডার ময়েজুদ্দিন, ঢাকায় বাড়ি। তিনি কিন্তু তাঁর উপযুক্ত কাজ এখানে বড় একটা পেতেন না—নানা রকম রেজিষ্ট্রার, বালাম ইত্যাদি বাঁধাই করতেন। তাছাড়া অনেক মুদ্রিত কার্ডবোর্ডকে এক সঙ্গে কোপ দিয়ে কাটার জন্য 'গিলোটিন' যন্ত্রটির চালকও ছিলেন। কিন্তু বই বাঁধাই যে অপূর্ব সুন্দর শিল্পের কাজ হতে পারে ময়েজউদ্দিন সেটি প্রমাণ করেছিলেন। তাঁকে দিয়ে আমি আমার পুরোনো বই, বিজ্ঞান সাময়িকীর বার্ষিক সংগ্রহ ইত্যাদি বাঁধাই করাতাম—আর সে বাঁধাই এত অনবদ্য হতো যে কল্পনা করা যাবেনা। এমন উন্নত মানের বাঁধাই আমি পরে আর দেখিনি।

বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে প্যাকেজেস আপাতত একটি ভূমিকা রাখলো এর কভার ছাপিয়ে দিয়ে। এখানে অনেক পরিত্যক্ত কার্ড বোর্ড পাওয়া যেত, যার উপর ওই অরিজিনাল হাইডেলবার্গ মেশিনের মুদ্রণে বিজ্ঞান সাময়িকীর সুন্দর তিন রঙা কভার তৈরি হতো। এই কভারের প্যাকেট সাময়িকীতে সংযুক্ত হয়ে বাঁধাই হবার জন্য রেলওয়ে প্যাকেজ সার্ভিসে ঢাকায় প্রেসে পৌঁছে যেত। প্রথম দিকে বিদেশী বিজ্ঞানের বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদির অনুকরণে কভার করেছি; পরে আকাঙ্খা বেড়েছে, ঢাকার নাম করা প্রচ্ছদ শিল্পীদের কাউকে কাউকে অনুরোধ করে প্রচ্ছদ করাতে পেরেছি। কাইয়ুম চৌধুরীর খ্যাতি ইতোমধ্যেই প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে তুঙ্গে। ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছেও ধরনা দিলাম। নতুন ধরনের কাজ বলে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েছিলেন। করেছেন বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদ। এভাবে শিল্পীর কাছ থেকে প্রচ্ছদ পেতে অনেক দেরি হতো, ঘোরাঘুরি করতে হতো; তাছাড়া সেই লেটার প্রিন্টিং এ তিন রঙা প্রচ্ছদ করতে বড় বড় চারটি ব্লক করতে হতো—যা, অনেক খরচের ব্যাপার। তাই এমন ব্যবস্থা হলো যাতে রঙে কিছু রদবদল এনে একটি বছরের সব সংখ্যাতে একই প্রচ্ছদ চিত্র ব্যবহার করা হতো।

হবু সিএসপিদের আসর

কার্জন হলে যতক্ষণ থাকতাম ততক্ষণ এখানকার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার পরিমণ্ডলটি কিছুটা হবু বিজ্ঞানীদের আসরের মত ছিল। বাকি সময়টিতে, বিশেষ করে সলিমুল্লাহ হলের পরিমণ্ডলে তা ছিল অনেকটা হবু সিএসপি'দের আসর। এখানে বিরাট সংখ্যক ছাত্রদেরই আকাঙ্খা হলো সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্রীয় সুপেরিয়র সার্ভিসে যোগ দেয়া। প্রধান লক্ষ্য ফরেন সার্ভিস অথবা সিভিল সার্ভিস। তা যদি নাও হয় পুলিশ সার্ভিস, একাউন্টস সার্ভিস, ইনকাম ট্যাক্স, পোস্টাল এমন একটি হলেও চলে—সুপেরিয়র সার্ভিস বলে কথা। এসব সার্ভিসের যে দবদবা, ক্ষমতা, সুযোগ, অভিজ্ঞতা, স্বাচ্ছন্দ্য, চাকচিক্য এবং চাকরি-স্থায়িত্ব—তার আকর্ষণ অনুভব না করা সহজ ছিলনা। বিশেষ করে সে সময় সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের অফিসারদেরকে স্থানীয়ভাবে সকল দণ্ডমুন্ডের কর্তা মনে করা হতো, সেই বৃটিশ আমলের মত। বিষয়টি ছিল দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যাপার—তাই সলিমুল্লাহ হলে ভর্তি হবার মুহূর্ত থেকেই ছাত্রদের মধ্যে এই ব্যাপারে একটি চাঞ্চল্য সব সময় লক্ষ্য করেছি। ওই সময় থেকেই প্রতিযোগিতার জন্য সবাইকে কায়মনোবাক্যে প্রস্তুতি নিতে দেখা যেত নানা ভাবে।

এটি সরলভাবে শুধু লেখাপড়া করার বিষয় ছিলনা। হ্যাঁ নিজ নিজ বিষয়ে ভাল পড়াশোনা থাকলে সুবিধা অবশ্যই হতো—সে বিষয় অর্থনীতি, রাজনীতি, ইংরেজি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত—যাই হোক না কেন। তবে সবাই জানতো সিএসএস পরীক্ষায় ভাল করার জন্য আরো অনেক কিছুর দরকার

রয়েছে। ভাল সাধারণ জ্ঞান থাকতে হয় নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকতে হয়। তারপর থাকতে হয় ভাল ইংরেজি জ্ঞান, উচ্চ আইকিউ (বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ), ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, স্বচ্ছন্দে বলার লেখার ক্ষমতা, নীরোগ স্বাস্থ্য ইত্যাদি কত কি—কারণ এর সবকিছুর জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষা রয়েছে। কাজেই এত সব চ্যালেঞ্জের মুখে চিত্ত-চাঞ্চল্যটি গোপন করা মোটেই সহজ কাজ ছিলনা। যদিও এতে আমার সরাসরি কোন আগ্রহ ছিলনা, তবুও সলিমুল্লাহ হলে বাস করে এগুলো না জেনে না দেখে কোন উপায় ছিলনা। যেহেতু হলে শুধু নিজের ব্যাচের সঙ্গে নয়, সিনিয়র যাঁরা আছেন তাদের সঙ্গেও সার্বক্ষণিক আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তাই যাঁরা শিগ্‌গীর সিএসএস পরীক্ষা দিচ্ছেন, যাঁরা দিয়ে ফেলেছেন, যাঁদের বন্ধুরা তখন লাহোর একাডেমিতে ট্রেনিঙে আছেন, আবার যাঁদের বন্ধুরা ইতোমধ্যে বান্দরবনে অথবা সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানে ডেরা ইসমাইল খাঁতে মহকুমা হাকিম হিসেবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছেন—সবার কথা, সবার চাঞ্চল্য আমাদের কাছে চলে আসতো। যদিও সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু ক্লাসিক বই অবশ্য ছিল যা পড়ে কিছু প্রস্তুতি সরাসরি নেয়া যেত; কিন্তু প্রস্তুতির বাকি অংশকে মনে করা হতো বেশ কিছু বছর ধরে নানা ভাবে ধীরে ধীরে নিজকে প্রস্তুত করে তোলার ব্যাপার।

এই ধীরে ধীরে প্রস্তুত হওয়ার একটি কাজ ছিলো 'টাইম' ও 'নিউজ উইক'—এই দুটি মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত পড়া। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় রেখে চলতে এটি জরুরি মনে করা হতো। বড়দার কল্যাণে এগুলো পেতাম বলে চাটগাঁয় বাড়িতে থাকতে এগুলো পড়ার অভ্যাস হয়েছিলো। এখন হবু সিএসপি বন্ধু বান্ধবদের কল্যাণে এখানেও পেতে ও পড়তে অসুবিধা হলো না। আমিও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মোটামুটি ওয়াকেফহাল রইলাম এই ম্যাগাজিন পড়া আর বন্ধু বান্ধবদের আলাপ শোনার ও তাতে যোগ দেবার সুবাদে। কেনেডির মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া, জনসনের 'দি গ্রেট সোসাইটি', ভিয়েতনাম যুদ্ধের খুঁটিনাটি, দক্ষিণ ভিয়েতনামের একের পর এক ক্যু, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভের নতুন পলিট ব্যুরো, মাও সেতুঙের 'দি গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড', এর কিছুই সেখান থেকে বাদ পড়তোনা। আমার কাছাকাছি থাকতেন ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ কয়েক জন ছাত্র—যাঁরা আবার সিএসএস পরীক্ষার ক্ষেত্রেও দারুণ মনোযোগী (শাকুর ভাই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সিনিয়র)। সিএসএস পরীক্ষার্থীর এবং সিএসপি অফিসারদের জীবনে ইংরেজি ভাষার ও সাহিত্যের নানা কারুকার্য কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটি তাঁরা নানা ভাবে প্রাঞ্জল করতেন। প্রত্যেক বছর যাঁরা পরীক্ষা দিতেন তাঁদের কাছে সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা ইত্যাদির এক রকম ধারা বিবরণী শোনতাম। তাছাড়া বর্তমান ছাত্রদের সিনিয়র বন্ধুবান্ধবদের জবানিতে শোনতাম লাহোর সিভিল সার্ভিস

একাডেমির কাহিনী। কেমন করে সেখানে অশ্ব চালনা, খানার টেবিলের আদব কায়দা ড্রেস কোড থেকে শুরু করে কত রকম বিষয়ে তালিম দেয়া হতো। তাও ভাল, এমনও শিক্ষা নাকি দেয়া হতো যার মাধ্যমে আপনি আপনার কর্মস্থলে দুই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন—একটি গোষ্ঠী হলো যারা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে, কিন্তু আপনি তাদেরকে সেটি করতে দেবেননা; আর অন্য গোষ্ঠীটি হলো যারা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে না চাইলেও নিজে উপযাচক হয়ে অবশ্যই তাদের সঙ্গে আলাপ করবেন।

সিএসএস পরীক্ষার জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি উপায় হিসেবে অনেক মনে করতো নিজস্ব বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের সিএসপি প্রস্তুতির আড্ডা। এটি আমাদের সময়ে এসে কিছুটা কমে গিয়েছিলো—কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশ লক্ষ্য করেছি। এ কিছুটা উন্নাসিক ধরনের, কিছুটা অভিজাত ধরনের আড্ডা। হয়তো সে সময় পাঞ্জাবিদের তুলনায় আমাদের পরীক্ষার্থীরা একটু অসুবিধায় আছেন বলে মনে করা হতো। পাঞ্জাব বা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে যারা সিএসএস পরীক্ষা দিতো তারা সবাই প্রায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে অভিজাত শ্রেণীর হতো—শ্রেণী বিভাজনটি সেখানে বেশ স্পষ্ট ছিল। ফলে ব্যক্তিত্বের ওই অভিজাত দিকগুলো তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে নিহিত ছিল—আমাদের অধিকাংশকে এদিক থেকে তাদের তুলনায় বেশি মধ্যবিত্ত ও ঢিলেঢালা অবস্থানে থাকতে হতো। হয়তো ওই নিজস্ব আড্ডাগুলো ছিল এ অসুবিধা দূর করার একটি চেষ্টা। গুলিস্তান এলাকার কাছাকাছি কয়েকটি রেষ্টুরেন্ট ওই রকম বিশেষায়িত উন্নাসিক আড্ডার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছিল—এদেরকে সিএসপি হোটেলও বলা হতো। এর মধ্যে একটি নাম ছিল 'লাসানি, আর একটির 'কসবা', আরো একটির নাম 'গুল্‌সিতান'। নামের মতই তাদের পরিবেশ ছিল বেশ অভিজাত। মনে হয় পরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৫০% কোটা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কারণে সিএসএস পরীক্ষা প্রস্তুতির এই দিকগুলোর গুরুত্ব আগের তুলনায় কমে এসেছিলো।

আড্ডার জন্য সময় আমার অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও আড্ডা আমিও কিছু কিছু দিতাম—তার অধিকাংশই রাজনৈতিক আড্ডা, এবং বাকি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত। শাকুর ভাইকে মধ্যমণি করে শেষোক্ত বিষয়ে প্রায়ই যে আড্ডা হতো তাতে মাঝে মাঝে আমি থাকতাম। তাঁদের সংস্পর্শে সমসাময়িক কবিদের কবিতা পড়ার অভ্যাসও আমার হয়েছিলো। শামসুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আল মাহমুদ—তাঁদের এক একটি নতুন বই বের হলে সে কবিতা নিয়ে যথেষ্ট ঝড় ওঠতো। অন্য দিকে মাহবুবুল্লাহ সাদত, কাদের—ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের আড্ডাগুলোও হতো জমজমাট—সেখানে লিউ শাও চি'র সঙ্গে মাও সে-তুঙের বিবাদ থেকে শুরু করে পুর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র 'গোপন' কাউন্সিল অধিবেশনে পর্যন্ত কিছুই বাদ যেতোনা।

এর মধ্যে আমার আরো সাদামাটা নিজস্ব এক ধরনের আড্ডা ছিল ইকবাল ও মাঝে মাঝে তার বন্ধুদের সঙ্গে। বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজ ছাড়াও ইকবাল প্রায়ই হলে আসতো কখনো একা, কখনো কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। ইকবাল তখনো স্কুলের ছাত্র, তারপর সদ্য ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজের ফাঁকে তার সঙ্গে আড্ডাও বেশ জমে উঠতো। সাধারণত পড়ন্ত বিকেলে হলের ক্যান্টিনে চা খেয়ে আমাদের আড্ডা শুরু হতো, তারপর ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে হাঁটা, প্রায়শ স্টেডিয়ামের দিকে। স্টেডিয়ামের চক্করের মধ্যে কয়েকটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে শুরু হতো আড্ডার আর এক পর্ব। বিষয়বস্তুতে প্রচুর বৈচিত্র থাকতো—তবে ঘুরেফিরে আসতো ইকবালের পরিচিত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-রাজনীতিবিদদের কথায়, এবং খেলোয়াড়দের। ইকবাল ও তার বন্ধুরা যে এই বিচিত্র রকমের বয়স্ক মানুষদেরকে কীভাবে সপ্রশংসভাবে বিশ্লেষণ করছে তা দেখে অবাক হতাম। স্টেডিয়ামের ওই রেষ্টুরেন্টগুলোতে বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিত্য উপস্থিতি থাকতো—বিশেষ করে ক্রিকেটের। ইকবাল ওদের অনেককে চিনতো; সে খেলাধূলা না করলেও তার ছোট ভাই শিবলী তখনই ক্রিকেট খেলে জুনিয়রে। যে বিখ্যাত মানুষটিকে কেন্দ্র করে প্রায়ই খেলোয়াড়দের আড্ডা জমে উঠতে দেখতাম ইকবাল একদিন আমাকে তাঁর সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর নাম মাস্টার আজিজ দূররানী—অনেক বয়স, কিন্তু দশাসই স্বাস্থ্যবান শরীর, উপমহাদেশীয় মানুষ হলেও দেখতে কিছুটা আফ্রিকানের ভাব রয়েছে। তখন তিনি ঢাকার ক্রিকেটারদের গুরু বটে, কিন্তু এককালে পাকিস্তানের কিংবদন্তির ব্যাটসম্যান হানিফ মোহাম্মদকে তাঁর বালক বয়সে কলকাতায় ক্রিকেটের দীক্ষা দিয়েছেন। মাস্টার আজিজের ছেলে অলরাউন্ডার সলিম দূররাণী তখন ভারতীয় টেস্ট টিমের বরপুত্র—বিশেষ করে ১৯৬১-৬২ সালের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ জয়ের নায়ক। অথচ এরকম মানুষকে আমরা দেখি ঢাকা স্টেডিয়ামের মামুলি রেস্টুরেন্টে অনেক কনিষ্ঠ ক্রিকেটারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন।

ইকবালের মজা হলো যে তিন কালের মানুষের কথা ঘনিষ্ঠ ভাবে একা বলতে পারে, তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। কবি রফিক আজাদ, বা মহাদেব সাহা মোটামুটি আমার সমসাময়িক অথচ তাদের কথা আমি প্রথম জেনেছি ইকবালের কাছ থেকে। আবার শিল্পী জয়নাল আবেদিন, সাহিত্যিক মনসুর উদ্দিন বা রাজনীতিবিদ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের নানা গল্পও তার কাছে শোনা। এগুলোর কিছু কিছু তার বিভিন্ন পরিচিতের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে শোনা হলেও অনেকগুলোই সরাসরি তার নিজের অভিজ্ঞতা। সে প্রায়ই আমাকে নানা বিখ্যাত মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাইতো—মাঝে মাঝে নিয়ে যেতোও। এটি শুধু ঢাকায় নয় অন্যত্রও। কয়েক বছর পর একবার এক সঙ্গে ফরিদপুরে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে সেখানে ইকবাল একদিন আমাকে নিয়ে গেলো বিখ্যাত সনেটকার কবি

সুফী মোতাহার হোসেনের বাড়িতে। তিনি তখন পক্ষাঘাতে শয্যাগ্রস্থ; কথা বলতে পারেন না ভাল ভাবে। ইকবালকে দেখে খুব খুশি হলেন। সেবারই ইকবালের উৎসাহে আমরা দু'জন ফরিদপুর থেকে ট্রেনে রাজবাড়ি গেলাম, উদ্দেশ্য শিল্পী রশীদ চৌধুরীর বাড়িতে যাওয়া। শিল্পী তখন বিদেশে থাকেন। কিন্তু তাঁর বাড়ি দেখা, ট্যাপস্ট্রির—(চিত্রিত কাঁথার) আদলে করা তাঁর চিত্রকর্ম দেখা, তাঁর বাবার সঙ্গে আলাপ করা, এগুলোই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁর বাবা ইকবালদের পাশের বাসায় থাকতেন। খুব খুশি হয়ে ছেলে এখন কী করছে, কী আঁকছে সব বোঝালেন। ইকবালের একটি নিত্য বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বাংলা বাজার পুরোনো বইয়ের মার্কেট। ওখানকার সর্বশেষ খবর ইকবাল আমাকে ওই সব আড্ডায় দিতো। অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্লভ বই ওখান থেকে সে কিনতো, আমাকে দিয়েও কিনিয়েছে। ১৯৬৪ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পর একদিন সে বল্‌লো পুরোনো ঢাকার প্রাচীন 'রাম মোহন লাইব্রেরি' দাঙ্গাবাজরা লুট করেছে এবং সেখানকার অনেক বই ছেঁড়া অবস্থায় পুরোনো বইয়ের মার্কেটে ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে। তার মধ্যে অনেকগুলোই উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকদের বই, কী কী ধরনের বই তার একটি বর্ণনা ইকবালের কাছে পাওয়া গেল।

সব সময় হবু সিএসপিদের আসরে থাকলেও পাকা সিএসপিদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হবার সুযোগও সে সময় আমার মাঝে মাঝে হয়েছে। তাঁদের একজন সত্যি সিএসপি কূল শিরোমনি ছিলেন—তিনি একেএম আহসান, তাঁর সময়ে পরীক্ষায় সারা পাকিস্তানে শীর্ষ স্থান দখল করেছিলেন ওই সময় তিনি জৈষ্ঠ সচিব। আমার বাল্যবন্ধু এবং রুম মেইট ইফতেখারের তিনি নিকটাত্মীয়, বেশ কয়েকবার তাঁকে দেখেছি হলে আমাদের রুমে এসে ইফতেখারের সঙ্গে আলাপ করতে। খুব সম্ভব শুক্রবারের জুমার নামাজ পড়তে আসতেন, দেখা করে যেতেন। সলিমুল্লাহ হলের মসজিদে অন্য সময় শুধু ছাত্ররাই নামাজ পড়তো। কিন্তু শুক্রবার জুমা ছিল ব্যতিক্রম—অন্য কাছাকাছি এলাকার অনেকে নামাজ পড়তে আসতেন, আর আসতেন প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকে, তাঁদের অনেকে সমাজে খুবই প্রতিষ্ঠিত মানুষ। ওই ১৯৬৩ তে একটি বছরের মত সময় আমরা চারজন এক রুমে থাকতাম—ইফতেখার, ফজলে রাব্বী (বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, পরে আমেরিকা প্রবাসী), জিয়াউদ্দীন (অর্থনীতির ছাত্র পরে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী) আর আমি। আমাদের মধ্যে সিএসএস দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল শুধু জিয়াউদ্দীন—বাকি তিন জনের সেদিকে আগ্রহ ছিলনা। সিএসএস পরীক্ষা দেয়া ছাড়াও জিয়াউদ্দীনের আরো অন্য আগ্রহও ছিল—তিনি জার্মান শিখছিলেন কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বই পড়ে তাঁর কাছে শিখে একটু আধটু জার্মান বলার চেষ্টা করতাম।

ইফতেখার গণিতের ছাত্র, তার মুখে সব সময় শুনে আসছিলাম সে একজন একচুয়ার হবে। বীমার প্রিমিয়ামের হার হিসেব করার জন্য উচ্চ গাণিতিক

সক্ষমতা সম্পন্ন এরকম যে একটি বিশেষজ্ঞ পেশা আছে তাও ওর কাছেই শোনেছিলাম। সে সময় দেশে এই সক্ষমতার কেউ ছিলেন না। একেএম আহসান সাহেব যখন আসতেন প্রায়ই তাঁর নিজের আমলা জীবন নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা হতো। ইফতেখার যে সিএসএস পরীক্ষা দেবার কোন ইচ্ছে রাখেনা এতে তিনি খুবি খুশি ছিলেন, কারণ তিনি নিজেই তাঁর পেশা সম্পর্কে খুব বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, অন্তত তখন। একবার ইফতেখারকে বল্‌লেন 'যদি তুমি অধস্তনদেরকে লাথি মারতে ভালবাস, আর সেই মত উর্ধ্বতনদের লাথি খেতে রাজি থাকো, এবং সারা জীবন সেভাবে চালিয়ে যেতে তৈরি থাকো তা হলে ওয়েলকাম টু ব্যুরোক্রেসি'। অবশ্য আর যাদের সঙ্গে দেখা হতো তাঁদেরকে মোটেই নেতিবাচক মনে হয়নি, বরং নিজেদের কাজকে তাঁরা খুব পছন্দ করেছেন বলেই মনে হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশকে দেখেছি চাচা আজিজুল হকের সুবাদে।

ইউনূস ভাই যখন ছোটবেলায় করাচি জাম্বুরীতে গিয়েছিলেন তখন প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনার আজিজুল হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর সামান্য পরিচয় হয়। পরে স্কাউটিঙের নানা কাজে তিনি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। কলেজে থাকার সময় আমিও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি, অন্যান্য ভাইয়েরাও। আমরা সবাই তাঁকে চাচা ডাকতাম। আব্বাকে আজিজুল হক সাহেব বেশ শ্রদ্ধা করতেন। আরো পরে তিনি যখন সরকারের খুব উচ্চ পদস্থ অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তখনো চট্টগ্রামে গেলে আব্বার সঙ্গে একটু দেখা করে আসতেন। আজিজুল হক সাহেব পেশাগত জীবনে অবিভক্ত বাংলা থেকেই উচ্চ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তখন ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশনের (ইপসিক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (ইপিআইডিসি) পরিচালক ছিলেন (পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রথম মন্ত্রীসভায় কৃষি উপদেষ্টা)। ছাত্র জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তুখোড় ছাত্র ও সলিমুল্লাহ হলের নামকরা বিতার্কিক ছিলেন (পরে কর্ম-জীবনে হার্ভার্ড থেকেও মাস্টার্স)। চাকুরি জীবনের বাইরে আজিজুল হক সাহেব ছিলেন রোটারিয়ান, স্কাউট কমিশনার, সমাজকর্মী হিসেবে নানা প্রজন্মের সুধিসমাজের নমস্য। আমি কলেজে থাকতে তিনি একবার রাঙ্গামাটি ভ্রমণের সময় চট্টগ্রাম থেকে আমাকে সঙ্গে নেন। সঙ্গে ছিলেন চাচী—তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক হুসনে আরা হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। চাচী নিজেও স্বনামধন্য মানুষ। তাঁর বাবা স্যার আজিজুল হক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, অবিভক্ত বাংলার আইনসভার স্পীকার, শিক্ষামন্ত্রী, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য, লন্ডনে রাষ্ট্রদূত।

সেবার রাঙ্গামটিতে আমরা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি পার্বত্য চট্টগ্রামের (তখন এটাই জেলা) জেলা প্রশাসকের সঙ্গে—চাচার স্নেহধন্য মানুষ। চমৎকার সদালাপী মানুষ জেলা প্রশাসক ও তাঁর স্ত্রী। কিন্তু মর্মে মর্মে বুঝলাম এই পার্বত্য অঞ্চলটির

দন্ডমুন্ড তাঁর হাতে। সকালে একবার আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর পাহাড়ের ওপরের বাংলো থেকে দীর্ঘ সিড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম। দেখলাম সিড়িটি এবং তারপর থেকে দীর্ঘ পথের দুপাশে সরল লাইনে দাঁড়ানো অসংখ্য উপজাতীয় মানুষ সবারই হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে স্থির। এঁরা সবাই জেলা প্রশাসকের দর্শনপ্রার্থী, সবারই কোন না কোন আর্জি আছে তাঁর কাছে। বুঝলাম এই মানুষগুলোর ভাল বা মন্দ করার জন্য অপরিসীম ক্ষমতা তাঁর হাতে রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো ওই ভ্রমণে চাচার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আরেক জন ভ্রমণকারী। তরুণ ব্যারিষ্টার মোস্তফা কামাল, কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীনের বড় ছেলে (পরে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি) তাঁর হাত ধরা ছিল তাঁর বালিকা কন্যা নশিদ কামাল (পরে বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী ও অধ্যাপিকা)।

আমি যখন সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র, চাচা মাঝে মাঝে হলে আসতেন, এই হলের সঙ্গে তাঁর একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। কখনো কখনো আমাকে নিয়ে যেতেন ইপসিকের নানা প্রজেক্ট ইত্যাদি পরিদর্শনে যাবার সময়। ওইসব সময়, এবং তাঁদের বাড়িতে উচ্চ আমলাতন্ত্রের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, কিছুটা আলাপ করতে পেরেছি, তাঁদের আলাপ শোনেছি। দেখেছি আজিজুল হক সাহেবকে তাঁরা সবাই কেন জানি গুরু মানেন। অথচ এ পর্যন্ত নানা ভাবে সি এস এস সিষ্টেমটি সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তিনি ছিলেন তার ঠিক বিপরীত মেরুর মানুষ—বড় সরকারী চাকুরি করা সত্ত্বেও। তিনি কথা বলেন সাধারণ মানুষের ভাষায়, বক্তৃতার সময় ছাড়া অন্য প্রায় সব সময় কুমিল্লার আঞ্চলিক টানে। সব কাজকর্ম করেন স্কাউটিঙের ঢঙ্গে ফুর্তির সঙ্গে। পরিচিত সব মানুষের নামের আগে লাগান 'মৌলভি' টাইটেল অথবা নামের শেষে 'মিয়া'—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে, সে ডাকসাইটে আমলাই হোক অথবা গ্রামের দোকানদারই হোক। দূর পথে কোন কর্মস্থলে গেলে তিনি ফেরার পথে রাস্তার ধারে কোন গ্রাম্য বাজার বসতে দেখলে চেষ্টা করতেন ওখানে নেমে দু'একটি শাক-সবজি কিনতে, বা দাম জিজ্ঞেস করার ছলে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলতে, একেবারে তাদের ভাষাতেই। তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগ রাখার এই যে অদ্ভুত আগ্রহ এটি আমি আরো নানা ভাবে লক্ষ্য করেছি যদিও এগুলো তাঁর সরকারী কাজের কোন বিষয় ছিল না; বাজারে কী এলো, ওরা দাম কেমন পাচ্ছে, এবার বন্যায় কি ক্ষতি হলো—এমনিতরো কথা। অথচ জবরদস্ত সব লোকের কাছে শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বহু কঠিন সমস্যার সমাধানও তাঁকে দিতে দেখেছি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

স্নাতক হবার মানে

অনার্স কোর্সের বিন্যাস ও পরীক্ষার সময়ের দিক থেকে আমাদের কালের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বেশ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। শিক্ষা সম্পর্কে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ প্রদর্শিত দর্শন অনুসরণ করার কারণেই এমনটি ছিল। অনার্সের

যে বিষয় তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কোন পরীক্ষা তিন বছরের মধ্যে একটি বারও হতো না। বলতে গেলে এই তিন বছর একেবারে ফুরফুরে থেকে আমরা অনার্স ফাইন্যাল পর্যন্ত পৌঁছে যেতাম। দ্বিতীয় বছরের শেষে সাবসিডিয়ারি বিষয়গুলোর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে দেয়ার নিয়ম ছিল বটে তাও একেবারে ধরাবাঁধা ছিলনা। পরে, এমনকি অনার্স পরীক্ষার পরেও সাবসিডিয়ারি বিষয় 'ক্লিয়ার' করার সুযোগ থাকতো। এই যে ছাত্রকে এতখানি স্বাধীনতা দেয়া হতো, তিন বছর বলতে গেলে নিজের মতো করে পড়াশোনা করতে সুযোগ দেয়া হতো, কী ধরনের স্নাতক তৈরি করা হবে তা নির্ধারণে এর একটি তাৎপর্য ছিল বৈ কি। আজ যে কোর্স পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে এক একটি কোর্স এক বছরে, ছয় মাসে অথবা আরো কম সময়ে শেষ করে অনেক ক্ষেত্রে তারপর সেটি ভুলে যাওয়ার সুযোগ থাকে—এর ওপর অন্তত পরে আর কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। কিন্তু সে সময় পুরো অনার্স কোর্সটি তিন বছর ধরেই মাথায় ধরে রাখতে হতো। তিন বছর পর গিয়ে এক সঙ্গে আটটি বিষয়ের উপর আট পেপারের পরীক্ষা দিতে হতো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তিন বছরের নানা ব্যবহারিক এক্সপেরিমেন্ট থেকে লটারি টেনে যে কোন কয়েকটি করে দেখাতে হতো; সব শেষে ঘণ্টা খানেক সময় ধরে তিন বছরের পুরো সব কিছুর ওপর সামগ্রিক মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো। এতে আশা করা হতো যে স্নাতক তার অনার্স বিষয়টিতে খুব ভালমত অবগাহন করে এসেছে এই তিন বছর ধরে, এবং সামগ্রিক ভাবে পুরো বিষয়টির সম্পর্কেই একটি দখল আনতে সমর্থ হয়েছে। মনে করা হতো প্রথম বর্ষে পড়া কাঁচা ধারণাগুলোও অন্যান্য নতুন জ্ঞানের আলোকে এখন অনেক পাকা হয়ে এসেছে।

তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের উপর কিন্তু ওই সিস্টেমের চাপগুলো বেশ দেখতে পেতাম। হলে ভর্তি হওয়া অবধি তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদেরকে সমীহ করে চলতে শিখেছি—কারণ তারা এ বছর পরীক্ষার্থী। বর্গক্ষেত্রের আকৃতির হলের একটি বাহুর দিকের সব কামরা সিঙ্গেল সীটেড কামরা—এগুলো তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। অথচ চতুর্থ বর্ষে মাস্টার্সের ছাত্রদের জন্য ওই যত্ন আর থাকতো না, তখন আবার চার জনের রুমে থাকতে হতো। তৃতীয় বর্ষের রুমগুলোর কাছে আমরা সন্তর্পণে হাঁটতাম, বেশি হৈচৈ না করে। পরীক্ষা যত ঘনিয়ে আসতো তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার দেখতাম। একবার দেখলাম তাদের মধ্যে বিশ ত্রিশ জন সবাই যুক্তি করে হঠাৎ ন্যাড়া-মাথা হয়ে গেছে—হয়তো ওই অবস্থায় বাইরে যাবার আগ্রহ কমাতেই এই কাজ। তাই মাঝে মাঝে দেখতাম অনেক ন্যাড়া মাথার মানুষ হলের বাগানে রোদ পোহানোর মত একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আর একদিন দেখলাম সিনিয়র ছাত্রদের বড় একটি দল অসম্ভব হৈচৈ করতে করতে হলে এসে ঢুকে ভীষণ পাগলামি শুরু করে দিয়েছে—কেউ নাচছে তুর্কী নাচন, কেউ তান্ডব নৃত্য, কেউ বা আবার মাইজ ভান্ডার শরীফের সম্মোহিত ফকিরদের মত হালকা জিকির করছে। শোনলাম তাঁদের সবার অনার্স পরীক্ষা

আজ কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে, তাই প্রেশার কুকারের সেফটি ভাল্ব খুলে স্টিম বের হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

যে যাই বলুক, তিন বছরের সময় দিয়ে স্নাতক হবার এই যে সুযোগ আমাদের সিস্টেম দিয়েছিলো সেটি আমার খুব পছন্দ ছিলো। যদিও পরীক্ষার সময় ওই চাপের কুফলগুলো যে আমার ক্ষেত্রে ঘটেনি তা মোটেই নয়। পছন্দের কারণ ছিলো এটি আমাদেরকে সব সময় পরীক্ষার মধ্যে ব্যস্ত রাখেনি, বরং অন্যান্য সব কাজের জন্য তো বটেই, এক রকম বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাব অনুভবের জন্যও অবকাশ এনে দিয়েছে। এই অবকাশের কারণে পদার্থবিদ্যাকে নিজের উপলব্ধির মধ্যে কিছুটা ধারণ করবো এমন উচ্চাশাও মনের মধ্যে পোষণের কিছুটা সুযোগ ঘটেছে। শুরু থেকেই এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার, কখনো তর্ক-বিতর্ক করার, নানা বই খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এক একটি বিষয় ঘন ঘন পরীক্ষা দিয়ে শেষ করার তাড়া থাকলে সেই মনোভঙ্গিটি গড়ে ওঠতো না। যা কিছু শিখছি তার মর্মটি বুঝতে পেরেছি এমন একটি সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার অবকাশ আমাদের ছিল।

এই বোঝার বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো তৃতীয় বর্ষে এসে যখন পদার্থবিদ্যার একেবারে গণিত-নির্ভর মৌলিক বিষয়গুলো এসে পড়লো। একদিকে এর চিরায়ত বিষয়গুলো ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স এবং ক্ল্যাসিকাল ইলেকট্রোডাইনমিক্স হিসেবে একেবারে গাণিতিক আবরণে, আর অন্যদিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মত আধুনিক বিষয় তখন সামনে—সাধারণ বুদ্ধিতে যা ধরা পড়েনা, পড়ে শুধু বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তায়। গণিতের স্বাভাবিক ধাপগুলো অনুসরণ করে পরীক্ষার উত্তর খাড়া করা যায় বটে, কিন্তু উপলব্ধির মধ্যে আনাটি কঠিন হয়; অথচ অভ্যাসটি ছিল ওভাবে আনার চেষ্টা করার। অধ্যাপকরা এ কাজে যে খুব সহায়ক হচ্ছিলেন তা বলা যাবে না—কারণ তাঁরা বোধ হয় চাইছিলেন আমরা গণিতের ভাষায় চিন্তা করতে পারি। আমার বন্ধুদের কেউ কেউ মনে হয় সেটি পারতো, কিন্তু আমি সব সময় ধরাছোঁয়ার মডেলের ভিত্তিতেই শুধু এগুলোকে কল্পনা করতে পারতাম, সেটি না করা পর্যন্ত বোঝেছি বলে শান্তি পেতাম না। গণিতের ভেতরে সব জায়গায় ফিজিক্সটি দেখতে পাওয়া জরুরি ছিল। যে বইগুলো অধ্যাপকরা অনুসরণ করতেন সেগুলো বিশ্ব-সেরা বই, গণিতের জটিল মারপ্যাঁচের যুক্তিতেই সরাসরি চিন্তা করতে পারে না এমন ছাত্রদের জন্য সে বইগুলোর কোন দয়ামায়া ছিল না। তাই বলে অনেকের মত গণিতের ধাপগুলো শুধু অনুসরণ করে তাকেই বিজ্ঞানের সব কথা বলে চালিয়ে দিতেও আমি রাজি ছিলামনা। সেই বইগুলো এবং আমাদের কোন কোন অধ্যাপক বোধ হয় চাইতেন সেই সমীকরণগুলোর মধ্যে আমরা অনায়াসে পরমাণুর তুর্কী নাচন দেখতে পাই, অথবা তরঙ্গের উচ্চতর সব মাত্রার সব কাজ কারবার দেখতে পাই। আমার পছন্দ সে ক্ষেত্রে বেশি ছিল কোন কোন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের লেখা

বই—যেখানে একটু বেশি কথা বলে হলেও গাণিতিক যুক্তিগুলো বোঝাবার একটু চেষ্টা থাকতো, ধরা ছোঁয়ার মতো মডেল কল্পনারও কিছু প্রশ্রয় থাকতো।

প্রথম বর্ষে পড়ার সময় তাপ এবং তাপ-বলবিদ্যার মতো সাধারণ বিষয়ের উপর সাহা ও শ্রীবাস্তবের লেখা একটি বেশ মোটা ও নামকরা বই যোগাড় করেছিলাম বেশ কষ্টে। সাহা হলেন বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, যিনি ওই বিষয়টির একজন আধুনিক স্থপতিও বটেন। কিন্তু বইটি লিখেছেন প্রত্যেকটি বিষয়ের ফিজিক্স এমনকি ব্যবহারিক যন্ত্রপাতিগুলোকেও হাতে ধরে বোঝানোর মত করে—আমার তাতেই বেশি আনন্দ ছিল। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মত বিষয়ে ওরকম পাঠ্যবই সহজে পাওয়া যেতোনা, বিভিন্ন পাঠ্যবই তাই ঘেঁটে দেখেছি কোনটিতে বোঝার বেশি সহায়তা হয়। এরকম বইকে কোন কোন অধ্যাপক উপহাস করতেন, এবং তাঁদের দেখাদেখি আমার কোন কোন বন্ধুরাও করতেন। যতটা না পরীক্ষার জন্য, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানকে কিছুটা হলেও আত্মীকরণ করার চেষ্টায় এই যে সব নানা বিকল্প পথের অনুসন্ধানে সময় দিতে পেরেছি তা ওই সিষ্টেমের জন্য সম্ভব হয়েছিলো।

ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে

তৃতীয় বর্ষে ওঠেছি বলে আমাদের অন্যান্য উৎসাহগুলো অবশ্য থেমে ছিলনা। সামনে সেই মহা-পরীক্ষা নিয়ে একটা উদ্বেগ ঠিকই ছিল, কিন্তু এর মধ্যেও দেশে যে ঘটনাগুলো ঘনিয়ে আসছিলো তার প্রতি নির্লিপ্ত থাকার কোন সুযোগ ছিলনা। এর একটি ছিল ১৯৬৫ এর ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ষাটের দশকের পুরো প্রথমার্ধে আইয়ুব খান দেশের উপর তাঁর স্থায়ী কর্তৃত্বের ব্যাপারে ক্রমেই বেশি বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এর একটি বড় কারণ ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে পাকিস্তানের গাটছড়া তিনি খুব ভাল ভাবে বেঁধে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হতে পেরেছিলেন; একই সঙ্গে এর প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পেরেছিলেন। মার্কিনী স্বার্থে বিকশিত সেন্টো (তুরস্ক ও ইরানের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সংস্থা), এবং সিয়াটো (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সংস্থা) এই দুটি শক্ত চুক্তির মধ্যে পাকিস্তান বড় ভূমিকা নেয়ার ফলে যথেষ্ট মার্কিন সাহায্য পাকিস্তানে পুঁজি বিকাশের সহায়তা করেছে—যদিও প্রধানত দেশের পশ্চিম অংশেই তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। তারপর ভারতের মত বৈরি দেশের সঙ্গেও পঞ্চ নদীর পানি বন্টন চুক্তি, পশ্চিম পাকিস্তানে বিস্তৃত সেচ খালের সিষ্টেম, মঙ্গলা ইত্যাদি বাঁধের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ ও সেচের উদ্যোগ; ইত্যাদির ফলে অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানে নিজের অবস্থান সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান উপদেষ্টা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আবদুস সালামের উৎসাহে ও পরামর্শে তিনি

পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং মহাশূন্য ও উর্ধ্বাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এগুলো করে এবং সেই সময় ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েও তিনি অনেকের এক ধরনের সমীহ আদায় করে নিয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের মুখে কখনো উদ্বিগ্ন হলেও আইয়ুব খানের অত্যন্ত অনুগত গভর্নর মোনেম খান তাঁকে যথেষ্ট আশ্বস্ত রেখেছিলেন। মোনেম খান সপারিষদ এমনভাবে 'ফিল্ড-মার্শালের' বন্দনা করতেন এবং এখানে এলে সর্বত্র জয় জয়কারের মধ্যে তাঁকে এমন ভাবে ঘিরে রাখতেন যে আশ্বস্ত না হয়ে উপায় ছিলনা (আইয়ুব খান ইতোপূর্বেই নিজের জন্য সেনাবাহিনীর ব্যতিক্রমী পদ 'ফিল্ড মার্শাল' বাগিয়ে নিয়েছিলেন)। তবে মুসলিম পারিবারিক আইনের মত সাহসী আইন প্রণয়ন করে তিনি দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীদের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের মধ্যে, একটি প্রশংসার আসন করে নিয়েছিলেন সে কথাও স্বীকার করতে হয়।

নিজের রাজনৈতিক স্থায়ীত্বের ব্যাপারে আইয়ুব খানের আত্মবিশ্বাসের আর একটি বড় কারণ ছিলো বিরোধী দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য। এই অনৈক্য এত প্রকট ছিল যে তাঁর ধারণা ছিল এরা কখনোই এক হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোন সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ দাঁড় করাতে পারবেনা। এরকম পরিস্থিতিতেই তিনি ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে এসে নতুন বছরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। নির্বাচন মানে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটেই নির্বাচন; যাদের অধিকাংশের আনুগত্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নির্বাচনী প্রস্তুতির প্রথম দিকে তাঁর ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। যদিও প্রধান সব বিরোধী দলগুলো 'কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি' (কপ্) নামে একটি মোর্চা গঠন করতে সক্ষম হলো, কিন্তু আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একমত হয়ে একজন প্রার্থী দেবার ক্ষেত্রে শুরুতে ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। একেবারে বামপন্থী ন্যাপ থেকে শুরু করে অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মীয় দল জামাত ইসলাম পর্যন্ত সবাই কপের মধ্যে ছিল; আইয়ুব-বিরোধিতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যে আর কোন ক্ষেত্রে মতের মিল ছিলনা। বিরোধী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে জেনারেল আজম খানকে দাঁড় করানোই ছিল অধিকাংশ দলের মত, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অনেকের দ্বিমত ছিল—প্রধানত মার্শাল ল'র সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্কের কারণে। আইয়ুব খান নিশ্চিন্ত ছিলেন এরা সত্যিকারের কোন শক্ত প্রার্থী দিতে পারবেনা; আমরাও মোটামুটি তাই ভাবছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ করে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেলো। কপ্ আজম খানকে বাদ দিয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে প্রার্থী ঠিক করে ফেল্লো জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে—এবং জাতীয় মঞ্চ থেকে বহু কাল ধরে সরে থাকা এক সময়ের পরম শ্রদ্ধাভাজন এই মানুষটিকে রাজিও করিয়ে ফেল্লো। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পরে

সব সময় জিন্নাহর সঙ্গে সঙ্গে থাকা ও তাঁর সহযোগী হয়ে কাজ করা বোন ফাতেমা জিন্নাহ তখন থেকেই মাদারে মিল্লাত (জাতির মা) হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন, ছোট বেলায় পাঠ্য বইয়ে তাঁর জীবনী পড়েছি। জামাত ইসলামের নেতা মওদুদী চিরকাল ফতোয়া দিয়ে এসেছেন নারী-নেতৃত্ব ইসলামে হারাম। এবার কিন্তু প্রথমে কিছু মৃদু আপত্তি জানিয়ে এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ফতোয়া তুলে নিলেন। নয় দফা চুক্তির ভিত্তিতে কপ্ তার নির্বাচনী প্রচার শুরু করলো। এর মধ্যে ছিল জয়ী হলে সরাসরি সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচন ও পূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বাষট্টির সংবিধানকে সেই মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করার প্রতিশ্রুতি। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় ফাতেমা জিন্নাহর জনসভায় মানুষের ঢল নামলো। মনে হলো এই জন-জোয়ার মৌলিক গণতন্ত্রীদের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করেছে; এই প্রথম নির্বাচনে আইয়ুবের পরাজয় সম্ভাবনাটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আমাদের ছাত্র মহলও এই সম্ভাবনায় নিজেদের শক্তিটুকু যোগ করলো—কপের নির্বাচন প্রচারণায় যোগ দিয়ে। আইয়ুব খানের নির্বাচনী প্রতীক ছিলো গোলাপ ফুল, আর ফাতেমা জিন্নাহর হারিকেন। চুয়ান্নোর নির্বাচনে মুসলিম লীগের হারিকেন পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের চোখের বিষ থাকলেও এখন ওটিই হয়ে পড়লো গণতন্ত্রের একমাত্র আশা। তবে এনএসএফের ছেলেরা কোটের বাটন হোলে একটি গোলাপ কুড়ি লাগিয়ে চলাকে বেশ ফ্যাশন-দুরস্ত মনে করলো।

নির্বাচনের আগে আগে ডিসেম্বর মাসে আমাদের পদার্থবিদ্যা বিভাগের পিকনিক হলো সোনার গাঁয়ে। ফেরীতে শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে সোনার গাঁ অভিমুখে আমাদের বাসের যাত্রাটি বেশ সময় সাপেক্ষ হলো। আগাগোড়া পথ আমরা নির্বাচনী শ্লোগান দিয়ে গেলাম উচ্চ কণ্ঠে আমাদের দুটি বাসে। আমার পাশে বসা ছিল সহপাঠী আহমেদ শফি—ভাল ছাত্র হিসাবে সবার কাছে অগ্রগণ্য হলেও তার সঙ্গে কিন্তু বাকি প্রায় সব ছাত্রের রাজনৈতিক মতামতে গরমিল, কারণ সে আইয়ুব খানের সমর্থক। তার এই ভিন্ন মত জোরেশোরে জানাতে তার কোন কার্পণ্য নেই। আমাদের প্রত্যেকটি শ্লোগান সেও ধরছিলো, কিন্তু বলছিলো আমরা যা বলছি তার বিপরীত কথা। সে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে এই বিপরীত ধ্বনি তুললেও অন্যদের সমবেত কণ্ঠের মধ্যে তা ডুবে যাচ্ছিল—কিন্তু আমি পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছি। আইয়ুবশাহী 'ধ্বংস হোকের' বদলে 'জিন্দাবাদ', ভোট ফর 'ফাতেমা জিন্নাহর' বদলে 'আইয়ুব খান' ইত্যাদি তো রয়েছেই। আমি কৌতূহলী ছিলাম আমাদের গণতন্ত্র 'কায়েম কর'-এই শ্লোগানের বিপরীতে সে কী বলে তা শুনতে। গণতন্ত্র 'নিপাত যাক' নিশ্চয়ই সে বলবেনা। অবাক হয়ে শোনলাম এ শ্লোগানের সঙ্গে সে বলছে গণতন্ত্র 'মৌলিক হোক'। এটিই ছিল তার তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধি—যার জন্য সে সুপরিচিত ছিল। সোনার গাঁয়ে পিকনিক স্পটে পৌছে আমরা প্রায় অর্ধেক ছাত্র হাওয়া হয়ে গেলাম। পিকনিক উপলক্ষে

গ্রামাঞ্চলের দিকে সহজে যেতে পারাটি ছিল আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ। খোঁজ নিয়ে নিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বাড়ি ঘর বের করলাম; যেখানে যেখানে পারলাম সরাসরি তাঁদের কাছে ফাতেমা জিন্নাহর ক্যানভাস করলাম, আর যেখানে পারলামনা অন্যদেরকেও বলে এলাম। একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেই শুধু পিকনিক স্পটে হাজিরা দিলাম।

আইয়ুব খানের নিজের প্রচারও কম বর্ণাঢ্য হলোনা, বরং তিনি প্রেসিডেন্টের পদের পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগালেন প্রচার কার্যে, বিশেষ করে ভোটার মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে নিজের সমর্থনে আনার কাজে। আনুষ্ঠানিক প্রচার কাজটি কিন্তু ছিল ইলেকশন কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত নয়টি প্রজেক্শন মিটিং—শুধু ওই মৌলিক গণতন্ত্রীদের জন্য। তবে মনে হচ্ছিল আইয়ুব খানের নিজেরও সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হয়েছিলো নির্বাচনে তাঁর অনায়াস বিজয়ের ব্যাপারে।

রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ 'কপের' মত আমরা এবার ১৯৬৪ সনের হলের নির্বাচনেও আইয়ুব বিরোধী সব ছাত্রদলের সমন্বয়ে 'সংহতি' নামের প্লাটফরম গঠন করলাম। সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনে আইয়ুব বিরোধী জোয়ারে আমরা অনায়াসে এনএসএফকে পরাজিত করলাম। অন্যান্যবার জামাত ইসলামীর অনুগামী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ পৃথকভাবে নির্বাচন করে। হলে তাদের সমর্থন অল্প কিছু ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবার কিন্তু তারা সংহতিকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচনই করলোনা। হলের ভিপি নির্বাচিত হলেন সংহতির পক্ষে এপসুর আবদুল হালিম, জিএস ছাত্র শক্তির শাহেদ আলী, এজিএস নবাগত ছাত্র ছাত্রলীগের খোন্দকার মোশাররফ হোসেন (পরে বিএনপি নেতা ও মন্ত্রী)। ভিপি হালিম ভাই হলেন খুব ভিন্ন রকম ভিপি, তিনি বৃহত্তর ছাত্র রাজনীতিতে নিবেদিত, হল সংসদের প্রতি উদাসীন রইলেন পুরো বছরটি, হলে থাকতেনও না। জিএস শাহেদ ভাই সংসদের কাজকর্ম কিছুটা চালালেও সংসদে তেমন নেতৃত্ব ছিলনা। এপসুর ভিপি'র হল সংসদের প্রতি এই নির্লিপ্ত আচরণ পরের বছর আমাদের নির্বাচনে একটি নেতিবাচক প্রভাব রেখেছিল।

১৯৬৪ এর ২৫ শে ডিসেম্বর ঢাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল কারণ ওই দিন ঢাকা টেলিভিশন যুগে প্রবেশ করেছিলো। সেই রাতে জাপানি কোম্পানি এন ই সি'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করা পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের ঢাকা স্টেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ শুরু করেছিল। একটি আধুনিক প্রযুক্তি টেলিভিশনের যুগে আমরা ঢোকার সুখবরটি ছাড়াও আমার কাছে এটি আরো এক কারণে খুব খুশির খবর ছিলো। এই ঢাকা স্টেশনের প্রধান সৃষ্টিকার ও প্রধান নির্বাহী হলেন জামিল ভাই। এর আগে যখন তাঁদের অফিস বসেছে, এবং ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের ভবনের (ডিআইটি ভবন, বর্তমানে রাজউক ভবন) চূড়া থেকে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই জামিল ভাইয়ের কাছে মাঝে মাঝে এই প্রস্তুতির কথা শুনেছি, বিশেষ করে তিনি ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে এই

ব্যাপারে খুব যোগাযোগ রাখছিলেন। ঢাকা টেলিভিশনের লোগো, লেটার হেড ইত্যাদির জন্য বাংলা অক্ষরে ডিজাইনটিও করে দিয়েছিলেন ইউনূস ভাই। আসলে অনেক কাজই এর হচ্ছিল একটি সৃষ্টিশীল ঘরোয়া কাজ হিসেবে। জামিল ভাইয়ের ব্যক্তিত্বটাই ছিল এমন—সাদাসিধে, আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত, অথচ খুবই সৃষ্টিশীল, রুচি সম্পন্ন এবং দরদ দিয়ে করা।

প্রথম দিকে টেলিভিশন সম্প্রচার ডিআইটি ভবনের চারদিকে কয়েক মাইলের বেশি দূরে যেতোনা। এর মধ্যে যারা বাস করেন তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে টেলিভিশন কর্পোরেশন নিজেই কিছু টিভি সেট উপহার দিয়েছিলো। এই সুবাদে আমাদের হলের রেডিয়ো রুমে একটি টিভি সেট বসানো হয়েছিলো। এই রুমে এতদিন রেডিয়োতে 'অনুরোধের আসর' শোনার জন্য ভীড় হতো; কিন্তু এই রাতে তিল ধারণের জায়গা ছিলনা। আমরা খুবই উৎফুল্ল মনে ফেরদৌসী বেগমকে দাঁড়িয়ে মৃদু ছন্দিত নাচের ভঙ্গিতে গাইতে শোনলাম এবং দেখলাম 'ঐ যে আকাশ নীল হলো আজ...'—সবার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। আইয়ুব খান উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। কেন জানি আমাদের অনেকের কাছে মনে হলো তিনি চিন্তিত, কিছুটা বিষণ্ন। অথচ দেশে এই টেলিভিশনের উদ্বোধন তাঁর একটি বড় কীর্তি হবার কথা। আমরা এর ব্যাখ্যা করেছিলাম নির্বাচনের ভাবসাব তাঁর সপক্ষে যাচ্ছেনা এই ধারণা দিয়ে।

আমাদের এই ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয়েছিলো; আইয়ুব খান খুব স্বচ্ছন্দেই জিতেছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। তবে পরে দেশী-বিদেশী গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে এই নির্বাচনে জেতার জন্য তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার করতে হয়েছিল—ঘুষ দেয়া, ভীতি প্রদর্শন এমনকি নির্বাচনের ফলাফল বদলে দিয়েও। তবে সেই সময় এই নিয়ে তেমন কথা হয়নি; এর একটি কারণ নির্বাচনের কিছুদিন পরই আইয়ুব খান ভারতের সঙ্গে গায়ে পড়ে সামরিক বিরোধ বাধিয়ে চলেছিলেন, ধীরে ধীরে এর তীব্রতা বাড়িয়ে, এবং অবশেষে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বাধিয়ে। যুদ্ধের জিগির তাঁর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কিছুটা সুবিধা এনে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু শেষ অবধি সেটিই ছিল তাঁর অজান্তে তাঁর পতনের শুরু।

ইতোমধ্যে আমার সেই তৃতীয় বর্ষ শেষের স্নাতক পরীক্ষার যুদ্ধও শুরু হতে যাচ্ছিল, এবং এক পর্যায়ে দেশের যুদ্ধ এবং আমাদের এই পরীক্ষাযুদ্ধ প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। বিজ্ঞানের অনুধাবনের জন্য যত পড়ালেখা, আলোচনা, তর্ক এতদিন করিনা কেন পরীক্ষার মধ্যে তার প্রমাণ দেয়া কঠিন। আমাদের সনাতন সিষ্টেমে পরীক্ষার নিজস্ব একটি মতিগতি রয়েছে। আর পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তার বেশির ভাগই অংক কষার ব্যাপার। প্রত্যেক পেপারে চার ঘণ্টার পরীক্ষা, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আটটি পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। মনে রাখার মত পর্বত প্রমাণ তথ্য ও ফরমুলা এখন নখদর্পণে রাখতে হবে। এ জন্য বার বার স্মরণ

করার বিষয়গুলো ছোট ছোট অক্ষরে লিখে রাখার জন্য এক রকম কার্ড সিষ্টেম করলাম। এর কিছু কার্ড সব সময় সঙ্গে রাখতাম, মাঝে মাঝে দেখে মনে থাকাটি নিশ্চিত করতে। হলের রুমেও সর্বত্র ছড়ানো থাকতো কিছু কার্ড। পরীক্ষার চাপটি অনুভব না করে কোন উপায় ছিলনা।

এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লাম এক অদ্ভুত অসুখে। হলে আসা অবধি তেমন বড় কোন অসুখে ভুগিনি। মাঝে মাঝে জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে এর জন্য আশু প্রতিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই পাওয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে ঝটপট একটি মিক্সচার তৈরি করে বোতলের মধ্যে দেয়া হতো খাওয়ার জন্য। বোতলের উপর একটি কাগজ সাঁটা থাকতো কাচি দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটু একটু কাটা যা দেখে ওষুধের ডোজ ঠিক করা যেতো। ওখানে ছিলেন ডাক্তার মর্তুজা (স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যতম শহীদ বুদ্ধিজীবী), চিকিৎসা পাওয়ার চেয়েও তাঁর সরস বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শোনাটিই বেশি কাম্য হতো। রটনা ছিল যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিভিন্ন হলের জন্য বিভিন্ন রকম মিক্সচার আগে থেকেই তৈরি থাকতো, কারণ ডাক্তার জানতেন কোন হলের ছেলের কী অসুখ হয়। একজন তরুণতর ডাক্তার হল ভিজিটে আসতেন। একবার জ্বরের সময় তিনি রুমে এসে আমাকে বলেছিলেন মাঝে মাঝে এরকম জ্বর হওয়া ভাল, নিজেকে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ মেলে এই অবকাশে। মনে হয়েছিলো কথাটি তিনি খুব মন্দ বলেননি। কিন্তু এবারকার অসুখটি শিগ্‌গীর আতঙ্কের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রায়শ মৌসুম পরিবর্তনের সময় যা হতো, প্রথম একে সাধারণ ফ্লু মনে করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল এটি সাধারণভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পর আর থামছেনা; মাঝারি গোছের জ্বর, সারা গায়ের ব্যথা, এমনকি হাঁটতে চলতেও অসুবিধা বেড়েই চলছিলো। ওদিকে ঝড়ের দমকা হাওয়ায় হলের রুমের বড় জানালাটি একদম ভেঙ্গে গিয়েছে—বৃষ্টি বাদলের বিরুদ্ধে প্রায় উন্মুক্ত রইলো ঘরটি বেশ কিছু দিন। এই সব কিছু ঘটছে যখন পরীক্ষা দ্রুত কাছে চলে আসছে—সব মিলে মানসিক চাপটিও প্রচণ্ড। সেদিনের ঢাকায় যে নামকরা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা ছিলেন তাঁদের দু'এক জন এমন এমন সব সম্ভাব্য কিছু ভয়ঙ্কর অসুখের নাম বললেন এবং বুকের এক্সরে ইত্যাদি বার বার করে চল্‌লেন যে তাতে মনে হলো তাঁরা শুধু আতঙ্ক বাড়িয়ে তোলার কাজই করছেন। এ সময় চাচা আজিজুল হক সাহেব একবার হলে এসেছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তাঁর ধারণা হলো রুমের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, পরীক্ষার দুশ্চিন্তা, ডাক্তারদের চিকিৎসা বিভ্রান্তি এগুলো বিনা কারণে আমার এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন 'আমাদের বাসায় চলো, একটু পরিবেশ বদলাক, সেখানে কাছে ভাল ডাক্তারও আছেন যিনি কম ডাক্তারিতে বিশ্বাস করেন। চাচা এটি শুধু বল্‌লেন না এক রকম জোর করেই ধানমণ্ডি ছয় নম্বর রাস্তায় তাঁদের সরকারী বাসায় নিয়ে গেলেন। সেই যে কয়েকদিনের জন্য গেলাম, ফিরলাম কিন্তু অনেক দিন পর। সেটি অসুখের

অবস্থার অবনতি হলো বলে নয়, বরং এত দ্রুত উন্নতি হলো যে চাচা এবং চাচী বাধ্য করলেন পরীক্ষা তাঁদের বাসা থেকে দিতে। শুধু পরীক্ষা নয়, সেখানেই কাটালাম দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দিনগুলো, এবং নিয়ে এলাম অনেক সুখকর স্মৃতি।

স্নেহ ঘেরা বাড়ি থেকে পরীক্ষা এবং যুদ্ধ

তিন বছরের মাথায় ওই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি হল থেকে না দিয়ে দিলাম একটি স্নেহ ঘেরা বাসা থেকে। ফলে পরীক্ষার উদ্বেগ-উত্তেজনা, এর মধ্যে যুদ্ধের ডামাডোল ইত্যাদির উত্তেজনা স্মৃতিতে যত না জেগে আছে তার চেয়েও বেশি আছে বাড়ি থেকে দূরে অন্য এক বাড়ির অতি স্নিগ্ধ সেই আবহের কথা। ঘরে বসে পড়াশোনা করা, খাবার টেবিলে বসে চাচা ও চাচীর সঙ্গে গল্প করা, চাচার চার-পাঁচ বছরের ছেলে জিয়া (জিয়াউল হক, বর্তমানে মার্কিন সরকারের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ) স্কুল থেকে ফিরলে তার সঙ্গে খেলা করা এ নিয়ে দিন কাটছিলো। চাচার নির্ধারিত ডাক্তারের সহজ সরল সমাধান দুদিন পর পর গ্রীনরোডের মাথায় একটি ফার্মেসিতে গিয়ে একটি পেনিসিলিন ইনজেকশন নিয়ে আসাটি ছিল একমাত্র চিকিৎসা। তখন আজকের মতো এত উন্নত ও বিচিত্র এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুলের প্রচলন হয়নি—পেনিসিলিনই ছিল সে যুগের ধন্বন্তরী ওষুধ, আর তখন এটি প্রয়োগ করা হতো ইনজেকশন দিয়ে, সম্ভাব্য কোন প্রদাহ থাকলে তার থেকে মুক্ত করার জন্য।

চাচা ব্যস্ত মানুষ; তাঁর অফিস এবং পরিদর্শনের কাজ তো রয়েছেই তার উপর রোটারি, স্কাউটস আন্দোলন ইত্যাদি নানা সামাজিক কাজে নিজকে ভীষণ ব্যস্ত রেখেছিলেন। সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ফাঁকে চাচীকেই পাওয়া যেত বেশি। আমার বন্ধু ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের কাছে প্রফেসর হুসনে আরা হক বেশ কড়া নো-ননসেন্স শিক্ষিকা হিসাবে পরিচিত। তাঁর ইংরেজি ভাষণ তো বটেই বাংলা ভাষণও খুবই পরিমার্জিত ও প্রমিত। তাঁর আদি বাড়ি পশ্চিম বঙ্গের শান্তি পুরে হওয়াটাও তার একটি কারণ। আমার পরীক্ষা, হল, রাজনীতি সব বিষয়ে চাচীর আগ্রহের মোটেই কমতি ছিলনা—সেই খাবার টেবিলের আলোচনায়। আর জিয়া ছিল খুব মজার ছেলে। তার বিভিন্ন ছোট ছোট খেলনা গাড়ি ও বিমানের নামগুলো সে আমাকে শিখিয়ে ছেড়েছে। একটি মজার খেলাও শিখিয়েছিলো—আমাকে বকা দেবার ভঙ্গিতে বলতো 'তুমি একটি টাইনোসেরাস', তার উত্তরে আমাকে বলতে হতো 'তুমি একটি টেরোডেকটাইল' বা ওই রকম অন্য কোন বিলুপ্ত প্রাণির সেরকম খটমটে নাম। এসব বিলুপ্ত প্রাণির ছবি ও নাম তার কমিক বইতে ছিল, তার মা নামগুলো শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে খাবারের প্রশ্ন উঠলে তার যত ওজর আপত্তি। চাচী যখন খাওয়াতেন, আমি যদি হাতের বাহুটি ধরে বলতাম এই তো খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পুষ্ট হচ্ছে এটি, তাহলে সে আশ্বস্ত হতো এবং আপত্তি তুলে নিতো।

এর মধ্যেই দিয়ে দিলাম অনার্স পরীক্ষা—একের পর এক নির্দিষ্ট বিরতিতে আট পেপারের পরীক্ষা হয়ে গেল। সামনে রইলো ব্যবহারিক পরীক্ষা। অনেকগুলো ব্যবহারিক এক্সপেরিমেন্ট থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন একটি করতে দিলে তা করতে হবে, এবং পর পর কয়েকদিন ধরে কয়েকটি করতে হবে। তাই মাঝে মাঝে কার্জন হলে গিয়ে এগুলো আবার একটু ঝালাই করে নেবার চেষ্টা যেমন করতে হলো তেমনি এর পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ব্যাখ্যার উপর পড়াশোনাও। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার চাপের তুলনায় এসব তেমন কিছুই নয় বরং আমার বেশ প্রিয় জিনিস। তাই এর মধ্যে রেডিয়োতে, পত্রিকায়, আলাপে দেশ দুনিয়ার খবরের দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিতে পারলাম।

১৯৬৫ এর শুরুতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে আইয়ুব খানের সরকার ও সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি রেখা বরাবর ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ক্রমাগত ছোট ছোট খণ্ড-সংঘাত ঘটিয়ে চলেছিল। কখনো তা অল্প মাত্রার সংঘাত, কখনো যথেষ্ট বড় মাত্রার—দু পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটছিলো। এ ভাবেই চলছিলো বহু মাস ধরে। এরপর শুরু হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকায় এরকম ছোট মাত্রার সংঘাত—এটি হলো কচ্ছের রান অঞ্চলে। পাকিস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে ভারতের সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের কচ্ছে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলা জায়গা যা 'কচ্ছের রান' বলে পরিচিত। একটি গুজব রটেছিল যে এখানে তেল-গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় জনবসতিহীন এই জলাগুলোর কোন কোন অংশ পাকিস্তান নিজের বলে দাবি করতো। এমন জলা জায়গায় ভারতেরও তেমন কোন উপস্থিতি ছিলনা। এবার পাকিস্তান সেগুলো দখলের চেষ্টা চালায়, এর কোন কোনটি কার্যত দখলও করে। এতে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে এক রকম যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি হচ্ছিল। স্পষ্টত যুদ্ধের একটি দামামা বেজে চলছিলো; কিন্তু সেটি যে সত্যি সত্যি একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ পাবে এমন কথা তখন ভাবতে পারিনি।

চাচা-চাচীর পরিবারও যে সে রকম আশঙ্কা করেননি তার প্রমাণ এ সময় চাচীর মা ভারত থেকে বেড়াতে এসেছিলেন, এবং যুদ্ধের ও যুদ্ধ পরবর্তী বিধি নিষেধের কারণে দীর্ঘকাল আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। কিন্তু তিনি এ সময় ওই বাড়িতে থাকাতে আমার খুব লাভ হয়ে গিয়েছিল—তাঁর কাছ থেকে পুরোনো দিনের অনেক গল্প শুনতে পেরে। আমাকে হাতে পেয়ে তাঁরও একটু সুবিধা হতো—বাসার বাইরে যাওয়ার সময় কলকাতার তাঁর প্রিয় ম্যাগাজিনগুলোর পূজা সংখ্যা খুঁজে আনতে বলতেন। এটি বলতেন একান্তে, এবং বলে দিতেন যেন টেপিকে না জানাই। টেপি তাঁর ছোট মেয়ে, অর্থাৎ চাচী। চাচী চাইতেন না তিনি এই বয়সে চোখের উপর এত চাপ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যাগাজিন পড়ুন। তাঁর বড় দুই মেয়েও কাছেই থাকতেন, প্রায়ই আসতেন মায়ের সঙ্গে গল্প করতে। চাচীর বড় বু' (মিসেস আলম) এবং কচি বু' (মেজ বোন, মিসেস দস্তগীর) ঢাকায় থাকতেন; তাঁরা এলে গল্প আরো জমতো। জিয়ার এক খালাতো ভাই নিশাত দস্ত

গীর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ছাত্র। ছোট বড় অন্যান্যরাও এসে মাতিয়ে রাখতো। চাচীদের পরিবার দীর্ঘকাল থেকেছে বিহারের হাজারিবাগে—খুব সুন্দর স্বাস্থ্যকর এই জায়গাটি তাঁদের বাড়ির মত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে পরের দিকের আবাস কলকাতা, হাজারিবাগ ইত্যাদি জায়গা হলেও তিনি যে শান্তিপুরের মানুষ সেটি তাঁর মুখের ভাষায় একেবারে বিশুদ্ধ ভাবে ছিল, যেটি চাচীও হয়তো দীর্ঘ ঢাকা বাসের মধ্যে কিছুটা হারিয়ে ফেলেছেন। সেখানকার কথা চাচীর মায়ের কাছে অনেক শুনেছি, সব চেয়ে বেশি তাঁর স্বামী স্যার আজিজুল হকের কথা—একজন মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতা যে কত বর্ণাঢ্য ও সফল হতে পারে স্যার আজিজুল হকের জীবন এর প্রমাণ। কিংবদন্তির এই মানুষটি ১৯৪৭ সালেই মারা গেছেন; স্বয়ং তাঁর জীবনসঙ্গিনীর কাছ থেকে তাঁর সেই কৃষ্ণনগর কোর্টে ওকালতির ও কৃষ্ণনগরের পৌর চেয়ারম্যান থাকা সময় থেকে শুরু করে স্পীকার, মন্ত্রী, ভাইস চ্যান্সেলর এবং অবশেষে দিল্লিতে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে সদস্য, ইত্যাদি নানা দায়িত্ব পালনের কথা। তাছাড়া এভাবে তাঁর লেখক সত্তা, তাঁর শিক্ষাবিদের সত্তা, নেতার সত্তা এ সব জানার সৌভাগ্য হয়েছে। ইকবাল আমার সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে এখানে আসতো, চাচা-চাচীর বেশ প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেছিল। অনেক পরে সে স্যার আজিজুল হকের লেখা একটি বই পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলো, তাঁর জীবন নিয়েও লিখেছে।

পাকিস্তান ও ভারত দুই সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষগুলো হঠাৎ একটি যুদ্ধের রূপ নিতে শুরু করলো আগস্টের প্রথম দিকে এসে। সাধারণ উপজাতীয়দের পোষাকে প্রচুর পাকিস্তানি সৈন্য কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে নানা জায়গায় আক্রমণ চালাতে থাকে, এবং এখানকার ভারতীয় বাহিনীকে পরাভূত করার উপক্রম করে। এর জবাবে ১৫ আগস্ট ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যাপক ভাবে এসে যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রম করে। কিন্তু শুধু কাশ্মীরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকানো যাচ্ছিলনা—কারণ তারা আঁখ নূর নামক ভারতীয় কাশ্মীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌছে গিয়েছিলো। তখনই ভারত সিদ্ধান্ত নেয় যে যুদ্ধকে বিস্তৃত করতে হবে, কাশ্মীরের বাইরে পাক-ভারত সীমান্তে নিয়ে যেতে হবে। এর ফলে শিয়ালকোট, লাহোর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নগরের কাছে বিভিন্ন সীমান্তে উভয় পক্ষের ট্যাংক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। ধারণা করা হয় যে ৪০০ থেকে ৬০০ ট্যাংক ওই বিশাল সমতল ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অনেকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে পর্যন্ত এটি ছিল দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ট্যাংক যুদ্ধ। এক পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়লে লাহোরের মত গুরুত্বপূর্ণ নগরী প্রতিপক্ষের কাছে একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়তো, অন্যদিকে ভিন্ন পক্ষ দুর্বল হলে দিল্লি উন্মুক্ত হয়ে পড়তো। লাহোরের খুব কাছে সেচের যে ক্যানাল সিষ্টেম ছিল তা এক রকম শেষ প্রতিরক্ষার কাজ করছিল বটে, কিন্তু তারও উপর দিয়ে কিছু কিছু ট্যাংক বাহিনী অতিক্রম করে গিয়েছিলো।

তবে শেষ পর্যন্ত লাহোর বা দিল্লি বিপন্ন হয়নি, যা হয়েছে তা হলো উভয় বাহিনী প্রতিপক্ষের বেশ কিছু জায়গা ইতোমধ্যে ভাল ভাবেই দখল করে নিয়েছিলো। সেজন্য লাহোরের কাছে ভারতের খেমকারান নামক একটি জায়গায় বড়সড় স্থান পাকিস্তানি বাহিনীর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—খেমকারানের ধ্বংসলীলা, এর অধিকৃত রেলওয়ে স্টেশন, নানা স্থাপনার ছবি পত্রিকায় বহু দেখেছি; দেখেছি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মুসা সগৌরবে সেনা পরিদর্শন করছিলেন হিন্দিতে 'খেমকারান' লেখা রেলওয়ে স্টেশনে। সেই থেকে বহু দিন এটি ছিল মানুষের মুখে মুখে। যেমন কাউকে হঠাৎ মাথা ন্যাড়া করা অবস্থায় দেখলে বলা হতো 'কিরে মাথাটাকে একেবারে খেমকারান সেক্টর করে ফেললি দেখছি'। দুই পক্ষেই ভয়াবহ রকমের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। লাহোরের প্রতিরক্ষায় বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাহসিকতা বড় ধরনের খবর সৃষ্টি করেছিলো।

এই যুদ্ধ যখন চলছিলো তখনই আমাদের ব্যবহারিক পরীক্ষাও শুরু হয়েছিলো। যুদ্ধের আর একটি বড় দিক একটু পরের দিকে শুরু হলেও তখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো—সেটি হলো বিমান যুদ্ধ। বিমান যুদ্ধটি প্রথম শুরু হয় সেপ্টম্বরের প্রথম দিন থেকেই। যেদিন খবর এলো ভারতীয় বিমান বাহিনী লাহোরে বোমা বর্ষণ করেছে, সেদিনই ছিল আমার শেষ ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন। একবার বোমা বর্ষণ যখন শুরু হয়েছে তা দ্রুত দেশে ছড়িয়ে পড়বে, প্রধান প্রধান নগরগুলো বিমান দ্বারা আক্রান্ত হবে এমন আশঙ্কা ছিল প্রচুর। পরীক্ষা দিতে লাবোরেটরিতে গিয়ে লাহোরের উপর বিমান আক্রমণের কথা প্রথম শোনলাম। পরীক্ষা নেবার দায়িত্বে থাকা আমাদের অধ্যাপক শামসুল ইসলাম স্যার খুবই উত্তেজিত ভাবে এ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখছিলেন, এবং কিছুক্ষণ পর পর আমাদেরকেও অবহিত রাখছিলেন। বিভিন্নমুখী উত্তেজনাকর সেই দিনটি ভোলা শক্ত। ব্যবহারিক পরীক্ষার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ এক্সপেরিমেন্টটি করতে হচ্ছে। আমার ভাগে পড়েছে কনষ্ট্যান্ট ডেভিয়েশন স্পেকটোগ্রাফ দিয়ে তামার আর্ক বাতির বর্ণালী বিশ্লেষণ। বেশ পুরোনো ধাঁচের যন্ত্র এটি। এর জন্য দুটি তামার রডকে পেন্সিলের মত ছেঁচে সুচালো করে রাখা হয়েছিল। সুচালো প্রান্ত দুটির মাঝখানে খুব সামান্য ফাঁক রেখে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে সৃষ্টি করেছি সেই শক্তিশালী আর্ক বাতি। স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্রের বাক্সের মধ্যে এই আলোর বর্ণালীকে ধরতে হবে ফিল্মের উপর। সেই কাজের চিন্তা—ঠিক মতো সব কিছু হচ্ছে কিনা, হবে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ; এ নিয়ে তাৎক্ষণিক মৌখিক যে ব্যাখ্যা দিতে হবে সে সম্পর্কে চিন্তা; এসবতো ছিলই কিন্তু সবকিছুর পেছনে আমার মনের মধ্যে কাজ করছে দেশে কী হতে যাচ্ছে, এই যুদ্ধ আমাদেরকে কতখানি গ্রাস করবে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিলাম লাহোরে বোমাবর্ষণের জবাব দিতে ভারতের পাঠানকোট, আদমপুর ইত্যাদি শহরে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। ওগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিমান ছাউনি। উত্তরে চাম্ব-

জুরিয়ান সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে যাওয়ার উপক্রম হলে সেই চাপ নিবারণ করতে বিমান বাহিনীই শুধু লাহোরে বোমা বর্ষণ করেনি—বরং ট্যাংকবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে সরাসরি লাহোরের দিকে এগিয়েও গিয়েছিলো। কাজেই পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে ওঠেছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ কী রূপে দেখা দিতে পারে তা নিয়ে দুই রকমের কথা শুনছিলাম। এ সম্পর্কে গোড়া থেকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নীতির কথা যেটি শোনতাম তা খুব সোজা সাপটা—বিশ্বাসযোগ্য নয়। বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানে তেমন বড় কোন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নেই—তাই বরাবর শুধু এক ডিভিশন সৈন্যই এখানে থাকতো (চৌদ্দতম ডিভিশন বলে পরিচিত)। বিমান প্রতিরক্ষা ইত্যাদিও এখানে ছিল খুব দুর্বল। এর কারণ হিসেবে বলা হতো ভারত কখনো পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে সাহস করবেনা। ভারতের সমর সক্ষমতা এমন সীমিত যে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিলে পাকিস্তানি আক্রমণ সোজা দিল্লি পৌঁছে যাবার ক্ষমতা রাখে—ঠিক যেমন ভাবে পানিপথের সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে পাঠান-মোগল বাহিনী দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিল বার বার। এরকম দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু হবার কয়েকদিনের মধ্যে দিল্লিতে লাল কেল্লার পার্টিতে বিজয় উদযাপন করা হবে—এমন একটি কথা তখন খুব প্রচলিত ছিল। কিন্তু পঁয়ষট্টির সেপ্টম্বরে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে ব্যাপারটি মোটেই সে রকম মনে হচ্ছিলনা। পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ না করা অবস্থাতেই পাকিস্তান বাহিনী কিছু জায়গায় সীমান্ত অতিক্রম করে ওখানেই আটকে গিয়েছিলো, বরং এখন নিজের লাহোর রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত।

মনে হবার কারণ ছিল যে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে পাকিস্তান প্রতিরক্ষাকে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দিতে পারে। অবশ্য তার চেয়ে বেশি মনে করা হচ্ছিল যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের থেকে দূরে রাখতে চায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে অনাবশ্যক অধিক শত্রুতাভাব সৃষ্টি ও যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি সে করবেনা। আমরা এই দ্বিতীয় ধারণার উপরই ভরসা করছিলাম। তবে বাঙালি সৈন্যরা কিন্তু পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধে তাদের অগ্রণী অংশ গ্রহণ বজায় রেখেছিলো। লাহোরের প্রতিরক্ষায় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কৃতিত্ব এখানে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো। তবে এখানে সব চেয়ে বেশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো ঢাকার বৈমানিক স্কোয়াড্রন লিডার এম এম আলমের অসামান্য সাফল্য। বিমানযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তিনি এক মিনিটের মধ্যে পাঁচটি ভারতীয় বিমান একা ভূপাতিত করে প্রায় অসম্ভব একটি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন (এটি ছিল একটি বিশ্ব রেকর্ডের মত)। পুরো যুদ্ধে তিনি মোট নয়টি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করেছিলেন। এম এম আলম অর্থাৎ মুহাম্মদ মাহমুদ আলম মূলত কলকাতার উর্দুভাষী বংশোদ্ভুত, দেশভাগের পর ঢাকায় চলে এসেছিলেন এবং এখানেই স্কুল-কলেজে পড়ে বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ওই অত্যাশ্চর্য

ঘটনার পর এখানে এম এম আলম নামটি ছিল বহুদিন সবার মুখে মুখে। পরের বছর আমি সলিমুল্লাহ হলের ভিপি থাকার সময় তাঁকে আমরা হলে একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। ছোটখাট মানুষটি মিতভাষী, বিনয়ী—সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। পরে আমি তাঁর কাছে ওই পাঁচটি বিমান এক মিনিটে ভূপাতিত করার কৌশলটি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন কৌশল কিছু নয়, তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি কী ভাবে সেটি সম্ভব হলো, একটি ঘোরের মধ্যে ছিলেন। এও বল্‌লেন 'বোধ হয় আল্লাহ এটি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।' তাঁর ছোট ভাই সাজ্জাদ আলম আমাদের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিল—ওর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল পদার্থবিদ্যার মেধাবী একজন ছাত্র হিসেবে। সাজ্জাদ পরে আমেরিকায় চলে যায় ও সেখানে কৃতী পদার্থবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঁয়ষট্টির বীর বৈমানিক এম এম আলম ১৯৭১ এর পর করাচিতেই থেকে যান।

শেষ পর্যন্ত ঢাকায় বিমান আক্রমণ না হলেও আমাদের বেসামরিক প্রস্তুতি কিন্তু কম ছিল না, সেই আগস্ট মাস থেকেই। এজন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষার (সিভিল ডিফেন্স) থেকে সব রকম পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। এর কিছু ছিল সরকারী ভাবে দফতর, ভবন ইত্যাদিতে করণীয়; আর কিছু ছিল ব্যক্তি পর্যায়ে বাড়িঘরে করণীয়। এই একটি দিক দেখেই শুধু এখানে বোঝা যেত যে দেশ যুদ্ধের মধ্যে আছে। বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দফতরের ভবনগুলোর সামনে বালির বস্তার দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল বোমার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য—এমনকি জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে (জিপিও'র বর্তমান ভবনটিই) বালির বস্তার যে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা হয়েছিল সেটি ছিল খুব দর্শনীয়। কিছু কিছু জায়গায় বিমান আক্রমণরোধী ঊর্ধ্বমুখী কামানও স্থাপন করা হয়েছিলো। রাতে নিস্প্রদীপ মহড়া হতো।

ধানমন্ডির ছয় নম্বর সড়কের বাড়িতে এ সবের ব্যবস্থা করার ভার নিয়েছিলাম চাচা আর আমি। দু'জনেই স্কাউট মানুষ—চাচার আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সিভিল ডিফেন্সের অভিজ্ঞতা আছে। আমরা কালো কাগজ লাগিয়ে জানালাগুলো সব ঢেকে দিলাম—যাতে বিমান আক্রমণের সাইরেন পড়লে ভেতরে দু'একটি মোম বাতি জ্বালালেও তার আলো বাইরে না যায়। তা ছাড়া ফিতার মত করে কাগজ কেটে তাতে আঠা লাগিয়ে জানালার কাচে বিভিন্ন দিকে কোনাকুনি করে সেঁটে দিয়েছিলাম যাতে বোমার প্রচণ্ড শব্দ বা কাঁপুনিতে কাচ সহজে ভেঙ্গে না পড়তে পারে। সেপ্টম্বরের শুরু থেকে মাঝে মাঝে রাতে বিমান আক্রমণের সাইরেন বেজে ওঠতো, পরে যথারীতি অল-ক্লিয়ার সাইরেনও দেয়া হতো। কিন্তু কখনো কোন বিমান আক্রমণ দেখতে পাইনি। রাডারে দূরে কোথাও ভারতীয় জঙ্গি বিমানের ঢাকামুখী তৎপরতা দেখে এই সাইরেন দিতো, নাকি নেহাত প্রস্তুতি ঠিক রাখার জন্য মহড়া হিসেবে দিতো তা কখনো স্পষ্ট করা হয়নি। চাচা চাইতেন আমরা প্রত্যেকবারে এর সব নিয়ম কানুন মেনে চলি, অর্থাৎ নিস্প্রদীপ নিয়মটি

পূর্ণ বজায় রাখি, সবাই বাড়ির নিরাপদ স্থানে থাকি জানালা ইত্যাদি থেকে দূরে। এসবকে কেউ গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে, আবার কেউ নিচ্ছেনা। প্রায়ই গুজব শোনা যেতো যে কোন বাড়ি থেকে আলো দিয়ে কল্পিত 'আক্রমণকারী' বিমানকে সিগন্যাল দেয়া হয়েছে—এ নিশ্চয়ই কোন গুপ্তচরের কাজ—ইত্যাদি।

সত্যিকারের আক্রমণ না হলেও পূর্ব পাকিস্তানেও প্রচার যুদ্ধের কাজটি নিয়মিত চলছিলো। রেডিয়োতে বীরত্বপূর্ণ, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, কথিকা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছু বলতে গেলো থাকতোইনা। ফাঁকে ফাঁকে থাকতো যুদ্ধের বুলেটিন, এ সম্পর্কে সমীক্ষা ইত্যাদি। নজরুলের গান ও কবিতার সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়েছে এতে—বিশেষ করে তাঁর ইসলামী গান গুলো।

'বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান'

এমনি সব গান বারবার বাজানো হতো। নতুন গান রচনাও কম হয়নি—বেশির ভাগ দেশাত্মবোধক গান। গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) অদ্ভুত সুন্দর কিছু গান লিখেছিলেন যা বহুল সম্প্রচারিত ছিল। একটি গান তখন এবং পরবর্তীকালেও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো :

'আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে প্রাণ মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে
নাই কোন প্রয়োজন।'

ব্যবহারিক পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, চাচা-চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চাটগাঁয় বাড়িতে গেলাম ওই যুদ্ধের সময়েই। ট্রেন যথারীতি চলছিলো কিন্তু কুমিল্লার কাছে কসবা স্টেশনটি একেবারে ভারতীয় সীমান্তের ওপর, বলতে গেলে স্টেশনের পেছনে দেয়াল থেকেই ভারত শুরু। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া ছিল এখানে দিয়ে ট্রেন পার হবার সময় মেঝেতে নিচু হয়ে থাকতে হবে—জানালার উচ্চতার নিচে। এর কারণ ক'দিন আগে নাকি সীমান্তের ওপার থেকে ট্রেনের উপর গুলি হয়েছে। চট্টগ্রামেও সবাই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন—যদিও যুদ্ধ রয়ে গেছে অনেক দূরে। ওখানে নতুন জিনিস পেলাম চট্টগ্রাম রেডিয়ো স্টেশন থেকে বিশেষ ধরনের যুদ্ধের খবর পরিবেশন। এর মূলে ছিলেন রেডিয়োরই একজন—বেলাল মোহাম্মদ (কবি, মুক্তিযুদ্ধের একেবারে প্রথম দিনগুলোতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠকদের অন্যতম)। পথের ধারে কবিতা পাঠ করা কবিয়ালদের ঢঙে তিনি নিজে প্রতিদিন কবিতার মত করে যুদ্ধের সংবাদকে লিখতেন এবং সে সংবাদ ওই ঢঙে পাঠ করতেন—ছন্দে ছন্দে খবর পাঠ, প্রতি

ছত্রে ছত্রে অনুপ্রাস। দেখেছি কয়েক ঘণ্টা পর পর সংবাদ, ঘন ঘন বুলেটিন ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও বেলাল মোহাম্মদের এই কবিতার সংবাদ খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সবাই রাতে এটি শোনার জন্য অপেক্ষা করতো। শুরু হতো এভাবে :

আল্লাহর নাম, দিই সালাম
আমি বশংবদ;
ছন্দ করি, খবর পড়ি
বেলাল মোহাম্মদ।

এর পর এক একটি খবর। যেমন একটি খবরে শোনলাম :

মোদের মিনিস্টার, জুলফিকার
নিউয়র্কে গেলেন;
জাতিসংঘে, সেই প্রসঙ্গে
ভাষণ দিলেন।

জুলফিকার মানে, জুলফিকার আলী ভুট্টো—তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে আইয়ুব খানের রাজনীতির ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে এই রাজনীতিবিদ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, যেমন রেখেছিলেন পুরো পাকিস্তানের ভাগ্য বিপর্যয়ে আরো কয়েক বছর পর। সিন্ধু প্রদেশের ভূ-স্বামী পরিবারের সন্তান ভুট্টোকে প্রথম মন্ত্রীসভায় এনেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা। আইয়ুব খানও তাঁকে বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীত্ব দেবার পর ১৯৬৩ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি নীতি আইয়ুব খান গ্রহণ করেছিলেন মূলত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোর পরামর্শেই। কিন্তু পঁয়ষট্টির যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো। ৬ সেপ্টেম্বর যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা স্থায়ী হয়েছিলো মাত্র ১৭ দিন, কারণ ২৩ সেপ্টম্বর উভয় দেশ যুদ্ধ বিরতি করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে স্বীকৃত হয়। এর কারণ ওই অল্প সময়ের মধ্যে উভয় দেশই ভয়াবহ রকমের ধ্বংস ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়, এবং তাদের কারো পক্ষে যুদ্ধ ঐভাবে বেশি দিন চালিয়ে নেবার মত সামর্থ্য ছিলনা, একতরফা ভাবে কারো জেতারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলনা। পরে নিরপেক্ষ সূত্রগুলো যে ধারণা দেয়েছে তাতে মনে হয় প্রত্যেক দেশ তিন থেকে চার হাজার সেনা সদস্য হারিয়েছে; পাকিস্তানের ২০০ থেকে ৩০০ এবং ভারতের ১৫০ থেকে ১৯০ টি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে; পাকিস্তানের ২০টির মতো এবং ভারতের ৬০ থেকে ৭৫ টি বিমান ধ্বংস হয়েছে। উভয় দেশের বিস্তীর্ণ জনপদ তখন শত্রু সেনার দখলে। যুদ্ধ থামার আর একটি কারণ ছিলো আন্তর্জাতিক চাপ। যুদ্ধের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এটি অপছন্দ করে এসেছে; এবং যেহেতু তখন পাকিস্তানের সামরিক সম্ভার প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র-আশ্রয়ী ছিল, নতুন করে অস্ত্র ও গোলা বারুদের রসদ সরবরাহ করতে ওই দেশ অস্বীকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটের উপর ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কে থাকলেও এই

ক্ষেত্রে তারাও ভারতের উপর যুদ্ধ বন্ধের চাপ প্রয়োগ করছিলো। ২২ সেপ্টম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি সর্বসম্মত যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব পাশ হয়—ভুট্টোর সেই ভাষণে এর প্রতিবাদ সত্ত্বেও (বেলাল মোহাম্মদের প্রসঙ্গে উল্লেখিত); এবং ২৩ সেপ্টম্বর উভয় দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

পরে ১৯৬৬ সনের জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় আইয়ুব খান ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে তাসখন্দ শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ভুট্টো যুদ্ধ বিরতি এবং তাসখন্দ চুক্তি কোনটাই মেনে নিতে পারেননি। তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী মনোভাব পাকিস্তানের মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবলভাবে গড়ে উঠেছিল। ভুট্টো তার সুযোগ নিয়ে আইয়ুব খানের বিরোধিতা শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট তাই ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তাঁকে পদচ্যুত করেন।

এই ভুট্টোকে আমি তখনই একবার দেখেছিলাম—মন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর পর। তিনি শাহবাগ হোটেলে থাকছিলেন। আমাকে কোন কারণে শাহবাগ হোটেলের লবিতে যেতে হয়েছিল। দেখলাম ভুট্টো লবিতে দাঁড়িয়ে এখানকার কিছু কেউকেটার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁকে তাঁর নিজস্ব দু'চার জন মানুষ ঘিরে রেখেছে—হয়তো দেহরক্ষী হবে। কিছুক্ষণ পর তিনি অন্যদের অগম্য ভিআইপি অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন। যতক্ষণ ছিলেন আমি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম এই মানুষটিকে—ইতোমধ্যে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। মজার ব্যাপার হলো তখন অবধি ঢাকা শহরে শাহবাগ হোটেলই ছিল উচ্চ মানের হোটেলের শেষ কথা। এখন যেটি বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি বা পিজি হাসপাতাল রূপে রয়েছে তার পুরোনো দোতলা মূল ঘরটিই ছিল সেকালে শাহবাগ হোটেল—নেহাত মামুলি একটি সাদামাটা ভবন। অথচ মাওলানা ভাসানী একেই মনে করতেন এই গরীব দেশের জন্য বেমানান একটি বিলাস কেন্দ্র; একে একবার বলেছিলেন—'শাদ্দাদের বেহেস্ত'। সেই ১৯৬৬ সালেই কিছুদিন পর শাহবাগের কাছেই শুরু হয়েছিলো ইন্টার-কনটিনেন্টাল হোটেল (যেটি পরে শেরাটন, রূপসী বাংলা হয়ে এখন আবার ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হতে যাচ্ছে); ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছিলো আমাদের বিলাসিতার সংজ্ঞা। এসব অবশ্য কিছুটা পরের কথা।

১৯৬৫ সনে ২৩ সেপ্টম্বর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল; এর কিছু দিন পর আমাদের স্নাতক অনার্সের ফলাফল প্রকাশিত হলো। ফল আশানুরূপই হলো—ফার্স্ট ক্লাস পেলাম, চতুর্থ স্থান নিয়ে। বাড়ির সবাই খুব খুশি হলো। ইউনূস ভাই এর আগে আগে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে চলে গিয়েছিলেন। শুরুতে থাকছেন কলরাডোর বোল্ডারে, কলরাডো ইউনিভার্সিটিতে কিছু পিএইচডি কোর্সে পড়াশোনা করতে। তিনি সেখান থেকে উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখলেন। আর দারুণ খুশি হলেন আজিজুল হক চাচা-চাচী আর ওই বাড়ির সবাই; চাচীর মাকে মাঝখানে রেখে রীতিমত উৎসব বসলো সেখানেও।

ভিপির ডায়েরি

ছাত্র রাজনীতিতে চাঞ্চল্য

১৯৬৫-৬৬ সনে আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম। সেটি ছিল আমার জীবনের একটি বড় অভিজ্ঞতা এবং স্মরণীয় অধ্যায়। ওসময় প্রতিটি দিন এমন নানা কাজে-উত্তেজনায় কাটতো যে সাধারণ একটি খাতাতে এসবের কিছু কিছু দিনলিপি মাঝে মাঝে লিখে রাখতাম। খাতার নাম দিয়েছিলাম 'ভিপির ডায়েরি'। দুর্ভাগ্যবশত খাতাটি এখন আর নেই—থাকলে আরো অনেক বিস্তারিত লিখতে পারতাম আমার এই অভাবনীয় সময়টি সম্পর্কে, তখন যত গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের সবার কথা। আপাতত স্মৃতিই ভরসা; তবে সেকথায় একটু পরে আসছি।

পঁয়ষট্টি সনের প্রথম দিকটিতে 'কপের' (কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি) বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের নির্বাচন বিজয়ের মুখে সম্মিলিত বিরোধী দল এবং সম্মিলিত ছাত্র আন্দোলন উভয়েই কিছুটা থিতিয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু তাই বলে আমাদের হল জীবনে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য থেমে ছিলনা। এর একটি কারণ ছিল একগুচ্ছ প্রতিভাবান রাজনীতি সচেতন ছেলেদের আগমন। আমি নিজে চাঞ্চল্য অনুভব করতাম প্রত্যেকবার এরকম নূতনের আগমনে। এটি আমার পুরোনো অভ্যাস, নবাগতদের পরিচিতি ও বন্ধুত্ব কামনায় আমি খুব আগ্রহী থাকতাম। যারা ইতোমধ্যে এপসু'র মতবাদে বেশ দীক্ষিত তাদের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগটি বেশি ঘটতো। সলিমুল্লাহ হলের ওই 'সংহতি' প্লাটফরমের নির্বাচনের বছর চৌষট্টি সালে হলে যোগ দিয়েছিল আফজাল, মোয়াজ্জেম, আলমগীর, পারভেজ এবং আরো বেশ ক'জন এপসু সমর্থক প্রাণচঞ্চল ছেলে। কাজী আফজাল তখন থেকেই সংযত, স্বল্পভাষী (পরে সিএসএস কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ফরেন সার্ভিসে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছে)। অন্যদিকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোয়াজ্জেম হোসেন (পরে ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদক), আলমগীর কবীর (পরে

ব্যাংক চেয়ারম্যান), আনোয়ার পারভেজ (পরে আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান) এরা খুবই সপ্রতিভ—সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক চলে, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হুমায়ুন কবীর বাংলা সাহিত্যে অনার্স পড়ছিল দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। সে হুমায়ুন আজাদ নামে কবিতা লিখতো (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হিসেবে এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন এই নামেই)। তখন থেকেই সে দারুণ নাকউঁচু ভাবের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, অন্য প্রতিভাবানদের প্রতি খুব সদয় মন্তব্য করতোনা, এপসুর সমর্থক হলেও প্রচলিত রাজনীতির প্রতিও তার এক রকম অবজ্ঞাই ছিল। ছাত্র লীগে যোগদানকারী নবাগত মোশাররাফের সঙ্গে (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক, বিএনপি'র মন্ত্রী) বেশ আলাপ ছিল—দেখতাম রাজনীতিটি তার একদম মজ্জাগত। সেই একেবারে তরুণ ছাত্র থাকা কালেও তার নিজের বাড়ি দাউদকান্দিতে নানা সমাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল যেগুলোর গল্প তার কাছে শোনতাম; যেমন একবার সেখানে মেঘনার ফেরিতে বাসে দুর্ঘটনায় অনেকে হতাহত হয়েছিল, মোশাররাফ দ্রুত সেখানে গিয়ে উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছিলো। এনএসএফএ যোগ দেয়া নবাগত ফখরুল ইসলাম মুনশিকে (পরে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আয়ুর্বেদীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এ'পির চেয়ারম্যান) দেখেছি বেশ মিশুক হিসেবে। সেই 'সংহতি' নির্বাচনের বেশ কিছু দিন আগে থেকে হলে ছাত্র রাজনীতি জমে উঠলে এদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো, যেমন হয়েছিলো এমনি আরো বহু প্রতিভাদীপ্ত তরুণের সঙ্গে।

পরের বছর ১৯৬৫ তে আমার সেই অনার্স পরীক্ষার ধাক্কা শেষ হবার পর পরই পরিচিত হলাম হলে আরো এক গুচ্ছ নবাগতদের সঙ্গে। এর মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে আমার নিজের ভিপি প্রার্থী হয়ে হল নির্বাচন করা, তারপর সত্যি সত্যি ভিপিগিরি করা—এসবের মধ্য দিয়ে হলের তরুণতম তুর্কী হিসেবে বার বার তাদের সহায়তা নিয়েই এগোতে হয়েছে। ফলে তাদের অনেকের সঙ্গে গড়ে উঠেছিলো বয়সের কিছু তারতম্য সত্ত্বেও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধন যা পরের জীবনে অটুট থেকেছে। দ্রুত এ বন্ধন গড়ে উঠার আরো কিছু কারণ ছিল। এদের অধিকাংশই এক জোটে সদ্য ঢাকা কলেজ থেকে এসেছিলো এবং বলা যায় ওখানে থাকতেই বেশ কিছু নক্ষত্র একত্র হয়ে একটি গ্যালাক্সি গঠন হয়ে গিয়েছিলো ওদের। ওই গ্যালাক্সির এক নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসলে পুরো গ্যালাক্সির সঙ্গে তা না হবার কোন কারণ ছিলনা। এর মধ্যে ভূঁইয়া ইকবাল তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, একটু জুনিয়র হলেও ওদের অনেকের সঙ্গে ইতোমধ্যেই তার দারুণ পরিচয়—সেই সুবাদে আমাকেও তারা শিগ্‌গীর সেখানে শামিল করে ফেললো। তাদের নিজেদের সাধারণ চর্চার বড় বিষয়টি ছিল বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি।

এদের মধ্যে মোসলেহ উদ্দিন (পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এটিএনটি-বেল ল্যাবের বিজ্ঞানী ও উচ্চ কর্মকর্তা) কিছুটা নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে

খুঁজে নিলো—কারণ সে ভর্তি হয়েছে পদার্থবিদ্যায়। বন্ধুদের প্রেরণায় ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র হবার লোভ সামলাতে পারেনি, অথচ জানে যে এটি মোটামুটি বিজ্ঞান ছাত্র বিবর্জিত জায়গা। আমাকে পেয়ে, আমার কথা শুনে, সে যেন হাতে চাঁদ পেলো। আপাতত ঢাকা কলেজ থেকে এলেও তার চিন্তা-চেতনার অনেক খানি জুড়ে ছিল জীবনানন্দের বরিশাল, ওখানে ব্রজমোহন স্কুলে তার বাল্যকাল। বরিশালের বিশেষ বিশেষ অন্য সব আকর্ষণের কথা তার কাছে শোনতাম।

ঐ গোষ্ঠীর দু'এক জনের সঙ্গে আমার অন্য রকম একটু পূর্ব-সম্পর্কও ছিল যদিও ব্যক্তিগত ভাবে আগে তাদের চিনতামনা। যেমন ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ থেকে আসা আনিসুল ইসলাম মাহমুদের (পরে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী) বাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছে একই হাটহাজারি থানায়; ওর বাবা সিরাজুল ইসলাম মাহমুদ আমার আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি সেই ১৯৫৭ সালে পি আই এ'র একটি ডেকোটা বিমান চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথে নোয়াখালীর লক্ষ্যার চর অঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সব আরোহী নিয়ে। আনিসের বাবাও তাতে ছিলেন। তখন এই নিয়ে আব্বার কত আহাজারি শুনেছি। এরপর বহুদিন আব্বা বিমান ভ্রমণকে খুব অপছন্দ করতেন, প্রায়শ তাঁর বন্ধুর কথা স্মরণ করতেন। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ) চট্টগ্রাম কলেজে আমার সহপাঠী গিয়াসুদ্দীনের ছোট ভাই; কলেজে আমার সব চেয়ে প্রিয় শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ স্যার ছিলেন তাদের দুলাভাই। ওয়াহিদ তখনই ছিল সেই সব বিখ্যাতদের একজন যারা প্রতি বছর একজনই থাকতো—বোর্ডে ফার্স্ট হওয়া ছাত্র। আমাদের সঙ্গে যেমন ছিল পদার্থবিদ্যায় আমার সহপাঠী আহমেদ শফি, পরের বছর এই পদার্থবিদ্যাতেই পড়তে আসা মাহবুব হোসেন খান (পরে সিএসএস পাশ করেও সেই চাকরি ত্যাগ করে সফল ব্যবসায়ী), তারো পরের বছর আবদুল মুঈন খান (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী), সবাই এই পদার্থবিদ্যাতেই; এবং এরপর ওয়াহিদ—অর্থনীতি বিভাগে।

সক্রিয় ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে ওদের থেকে এগিয়ে ছিলো আহমেদ কামাল আর মির্জা আলমগীর—যার একটি কারণ ওরা দু'জনই রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। আহমেদ কামালের (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, উন্নয়ন-গবেষক) সঙ্গে খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠ হলাম, তার অদ্ভুত দিল-খোলা মানসিকতার কারণে। তার বাবা আদেলুদ্দীন আহমেদ ফরিদপুরের বিখ্যাত আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং মার্শাল ল' জারি হবার আগে আগে অল্প সময়ের জন্য আওয়ামী লীগ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের (পরে মন্ত্রী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব) বাবা মির্জা রুহুল আমিন এবং চাচা মির্জা গোলাম হাফিজ দু'জনেই ঠাকুরগাঁওয়ের স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ—প্রথম জন পরে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, এবং দ্বিতীয় জন মন্ত্রী ও

স্পীকার হয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই কামাল ও আলমগীর রাজনীতিতে যথেষ্ট সোচ্চার ছিল। আনিস আর আলমগীর দু'জনেই অর্থনীতির ছাত্র ছিল, আলমগীর পরে সরকারী কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপনাও করেছে। অর্থনীতির আর দু'জন সদ্য ছাত্র তখন হলের অনাবাসিক ছাত্র হলেও এই গোষ্ঠীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সেই সুবাদে আমারও—সালেহউদ্দীন আহামদ (পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর) এবং রিজওয়ানুল ইসলাম (পরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র উচ্চ পদস্থ অর্থনীতিবিদ)। ওরা বন্ধুদের টানে প্রায়শ হলে যাতায়ত করতো। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের, এবং বিশেষ ভাবে হল জীবনের বড় আশীর্বাদই ছিল টগবগে এরকম তরুণদের সান্নিধ্য—এর মধ্যে একটি বড় ভূমিকা রাখতো ছাত্র রাজনীতি।

পঁয়ষট্টি সাল যত এগিয়েছে ছাত্র রাজনীতির চাঞ্চল্যও তত বেড়েছে। আইয়ুব বিরোধী মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে ক্রমে তীব্রতর হয়েছে—যার ফলে দল হিসেবে এনএসএফের সমর্থন কমে যাচ্ছিল। আমরা যখন হলে আসি তার আগে থেকেই সলিমুল্লাহ হলে এই দলের খুব খাতির ছিল—বিশেষ করে রাজনীতি বিমুখ এবং নির্বিবাদে নিজেদের মেধা ও পেশাগত উচ্চাকাঙ্খা চর্চায় মনোযোগী ছাত্রদের মধ্যে। আইয়ুব-মোনেম সরকারের স্বার্থে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে দলটি ক্রমে সরকারী পেটোয়া বাহিনীর রূপ লাভ করতে থাকায় এনএসএফ তার আকর্ষণ ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিল। সে জন্য পরে এই যে টগবগে মেধাবী তরুণরা আসছিলো তাদের মধ্যে আমার চোখে স্প্রতিভ বেশি কাউকে এনএসএফের দিকে এগোতে দেখিনি, বরং তারা এপসু'র মধ্যেই একটি নতুন জোয়ার নিয়ে এসেছিলো। অন্যদিকে অন্তত সলিমুল্লাহ হলে ছাত্র লীগের সমর্থকদের মধ্যে মোটেও তেমন দীপ্তি দেখা যায়নি। ছাত্র শক্তির মধ্যে বরং এই দীপ্তি আগে ছিল—সেই শেলী ভাই, আনোয়ারুল করিম (জয় ভাই, পরে জাতিসংঘে আন্ডার সেক্রেটারি), আমাদের একটু সিনিয়র মুয়ীদ চৌধুরী ভাইদের সময়ে। কিন্তু নবাগতদের প্রতিভার চমক ছাত্র শক্তির দিকেও বেশি প্রসারিত হয়নি। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এপসুর নেতৃত্বের ওপর তখন অনেক দায়িত্ব—এতজন প্রতিভাদীপ্ত নবাগত সমর্থকদের সামনে একটি আদর্শ, আত্মনিয়োগ করার মতো একটি লক্ষ্য, তুলে ধরার কাজ। আইয়ুবশাহী ধ্বংস করা এবং গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া একটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল—সেটি অবশ্য এপসুর বাইরেও অধিকাংশের লক্ষ্য। কিন্তু তারপর কী? আমার কাছে মনে হয়েছে এদিক থেকে এপসু নেতৃত্ব জাতীয় ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য তুলে ধরেছিলো তার অনেকটা ঐতিহাসিক একুশ দফা আর কাগমারি সম্মেলনের কিছু মৌলিক লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যার মূল হলো অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি। অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এপসুর সংহতি হলো আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশবাদের শেকল থেকে মুক্ত হবার জন্য সমাজবাদী সংগ্রামে রত মানুষের সঙ্গে। সারা বিশ্বের বামপন্থী

তরুণদের মতো আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তখন কিউবা বিপ্লবের নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো ও চে গুয়েভারা; কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, ভিয়েতনামের হো চি মিন জ্বল জ্বল করছে, এবং সফল বা ব্যর্থ যাই হোক তাঁদের দেশের মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের প্রবল একাত্মতাবোধ ছিল। এপসুর নেতৃত্বকে তারুণ্যের এই আকাঙ্খাগুলোর সবগুলোর মধ্যে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করতে হচ্ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—রাজনৈতিক কারণে কর্তৃপক্ষ-লালিত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, অসৌজন্য, এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে; সেখান থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম; সব কিছু সম্পর্কে এপসুর নীতি এবং কার্যকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন ছিল।

যদিও ফরহাদ ভাই প্রমুখ বিখ্যাত কিছু নেতা ইতোমধ্যে ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে জাতীয় রাজনীতিতে মনোযোগী হয়েছেন—এপসুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনো কাজী জাফর আহমদ, সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, বদরুল হক, মহিউদ্দিন এমনি সব সিনিয়র নেতাদের হাতে। তারপরেই রয়েছেন রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, হায়দার আকবর খান রনো এবং তাঁদের সমসাময়িক অন্যরা। মেনন ভাই দু'বছর আগে সলিমুল্লাহ হলের প্রতিনিধি হিসেবে ডাকসুর ভিপি ছিলেন। মতিয়া আপা পরের বছর ডাকসুর জিএস হয়েছেন, রোকেয়া হলের প্রতিনিধি হিসেবে। সাধারণত ওই পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় ডাকসুর ভিপি-জিএস এর নির্বাচন বা প্রাধান্য পরবর্তী কালের মত এতোটা ছিলনা। কিন্তু মেনন ভাই আর মতিয়া আপার মত নেতাদের কারণে ও সময় ওই পদের গুরুত্ব সাময়িক ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো অনেকটা। সলিমুল্লাহ হলে এপসুর দিক থেকে সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে জাফর ভাই ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সাইফুদ্দিন মানিক ভাই—তিনি তখন এপসুর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক; গোপীবাগে থাকেন, শুধু অতি জনপ্রিয় ছাত্র নেতা হিসেবে নয় ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংগঠক হিসেবেও প্রচুর খ্যাতি ছিল তাঁর। তিনি পরে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব ও ছায়ানটের অন্যতম সংগঠক হিসেবে অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের পরেই আমাদের হলের জন্য ছিলেন মেনন ভাই। আমাদের হলের নিজস্ব এপসু নেতৃত্ব ছিল বিশেষ করে আবাসিক ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমার বন্ধু আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীকে হল এপসুর সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর আবদুল কাদের ভূঁইয়াকে সম্পাদকের দায়িত্ব। মান্নান ভূঁইয়া এত দিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে এসেছিলেন; আগেরবার তিনি হল থেকে ডাকসু প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। হল পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে এবং নানা সংকট ইত্যাদিতে তাঁরাই আলোচনায় বসতেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি ছিলাম নীতি নির্ধারণীতে পরের সারির সঙ্গে।

কেন্দ্রীয় এপসুতে একটি বড় সংকট যে তৈরি হচ্ছে সেটি আমরা আঁচ করতে পারছিলাম। এ নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ লড়াই দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, যদিও সেটি তখনো গরম লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়নি। সংকটটির উৎস ছিল সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও গণচীনের পরস্পর বৈরিতা দেখা দেয়ার ব্যাপারটি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের এই দুই বড় শক্তির মধ্যে বৈরিতা শুরুতে সীমিত আদর্শিক মতান্তর হিসেবে থাকলেও এটি তখন দ্রুত প্রায় শত্রুতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আর এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো অনেক দূরে তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাজনৈতিক ভাবধারার মধ্যেও।

এপসু মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতাকে খুব বড় স্থান দিয়ে থাকে—অনেক তরুণের কাছে এর আকর্ষণের কারণই হলো এটি। এপসুর মাঝারি নেতৃত্ব এবং বিশাল সংখ্যক নিবেদিত সমর্থকদের কাছে এই দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও অন্যান্য ছাত্র দলের মতই এর উর্ধ্ব নেতৃত্ব এর সমর্থনপুষ্ট জাতীয় রাজনৈতিক দলের সমসাময়িক নীতিকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করতো—আর এই ক্ষেত্রে দলটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি। অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টি যেহেতু সে সময় গোপন দল ছিল তাই এই নেতাদের অনেকে প্রকাশ্য বামপন্থী দলগুলোতে এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহে সক্রিয় থাকতেন। তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে সে সময়কার দুটি শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল—সেই অর্থে এই পার্টি এবং এপসুও আন্তর্জাতিক দিক থেকে তাদের অনুসারী ছিল। এজন্য এপসু-বিরোধীরা প্রায়ই বলতো যে মস্কোতে বৃষ্টি হলে এপসুর ছাত্ররা ঢাকায় ছাতা ধরে। কথাটি এপসুর উর্ধ্বতন নেতাদের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা সত্য ছিল, কিন্তু তাই বলে এর আপামর সমর্থকদের ক্ষেত্রে নয়। এপসুর নীতিনির্ধারণীমূলক নেতৃত্ব যে ওই দুই সমাজবাদী দেশের নিজস্ব নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতো তার একটি প্রমাণ হলো ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে এতে মস্কো-পিকিং মতভেদের প্রভাব পড়ে। এর আলামতগুলো আমাদের কাছেও স্পষ্ট হতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি মনোনয়নের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী ও চীনপন্থীদের কোথায় কার স্থান হবে এই চিন্তা চলে আসছিলো।

মাও সেতুং যখন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে একদিকে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং অন্যদিকে চীনের জাতীয়তাবাদী শাসক চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে ১৯৪৯ সালে গণচীনের বিজয় এনেছিলেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁর সহায় ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে যুদ্ধে মাওয়ের সব কৌশল সমর্থন করেনি, বরং মাওকে চিয়াঙের সঙ্গে এক রকম আপোষের পরামর্শ দিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও মাও যখন জয়ী হন, তখন স্টালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নবজাত কম্যুনিস্ট দেশের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলো। মাওয়ের মৌলিক নীতিগুলোও স্টালিনের থেকে খুব বেশি আলাদা ছিলনা। কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে পরের বছর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্টালিনের 'নিষ্ঠুর চরমপন্থা'র হাত থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিলেন এবং স্টালিনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনকে নিন্দা জানালেন, তখন

আদর্শিক দিক থেকে গণচীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের টানাপোড়েন শুরু হয়। চীন নিজের কম্যুনিস্ট ধারাকে এখনো স্ট্যালিনের অনুগামী ধারা হিসেবে পরিচিত করে, এবং সোভিয়েতে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে নতুন নীতিকে আপোশকামী ও সমাজতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে দেখতে শুরু করে; এ নিয়ে নিজ দেশে ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে প্রচারকার্যও চালায়। পরে ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত হলে সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওই মাসেই মাও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে মস্কোতে পাঠান নতুন সোভিয়েত প্রধান ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের আলাপ করতে। কিন্তু সে আলাপ ব্যর্থ হয়েছিলো, মাও যেটি আশা করেছিলেন সেভাবে সোভিয়েত নীতির পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাই ওই ব্যর্থ আলোচনার পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ ছাড়াই ক্রুশ্চেভ মতবাদ চলছে এমন ঘোষণা দিয়ে দুই দেশের মধ্যে বৈরিতাকে আরো উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেলেন।

শুধু চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি নয়, চীনের সঙ্গে বেশি সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বেশ কিছু দেশের কম্যুনিস্টরাও তখন সোভিয়েত নেতৃত্বকে 'সংশোধনবাদী' (রিভিশনিষ্ট), 'পরাজয়বাদী' (ক্যাপিচুলেশনিষ্ট), 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' (সোশ্যাল ইম্পেরিয়ালিষ্ট) ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করতো। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বে আলবেনিয়াই শুধু কট্টর চীন-অনুগত ছিল। কিন্তু সে সময়ের বেশ শক্তিশালী মালয় কম্যুনিস্ট পার্টি, ইন্দোনেশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি, এবং এমন কি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিরও একটি বড় অংশ চীনপন্থী মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অন্যদিকে সোভিয়েতপন্থীরা এই চীনপন্থীদেরকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'বাম হঠকারী' ইত্যাদি নামে ডাকতো। আমাদের এপসু'র কোন কোন নেতা ও 'তাত্ত্বিকদের' কথাবার্তায় এখানেও মতদ্বৈততাগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের উপর বেশি প্রভাব যে কেন্দ্রীয় নেতারা রাখতেন সেই জাফর ভাই, মেনন ভাই, রনো ভাই প্রমুখ, এবং হলের মধ্যেও এপসু নেতাদের অধিকাংশ চীনপন্থী ভাবধারার ছিলেন বলে আমাদের আলোচনায় সেই ধারাটাই প্রাধান্য পেতো বেশি।

পত্র-পত্রিকায় যা পড়তাম আর হলের আলোচনায় যা শোনতাম তাতে মনে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বিরোধের একটি বড় কারণ ছিল স্টালিনকে ওভাবে বাতিল করা চীন কখনো মেনে নিতে পারেনি, চীনের মতে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাকলেও স্টালিনের কড়া মতবাদ কম্যুনিজমের ভবিষ্যতের জন্য একান্ত আবশ্যক। ক্রুশ্চেভ ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে যে সহ-অবস্থানের নীতি নিয়েছিলেন, যা পরবর্তীরাও চালিয়ে গেছেন চীন তার ঘোরতর বিরোধী ছিল। সোভিয়েত গোষ্ঠী বড় যুদ্ধকে বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র সহযোগে বিশ্বযুদ্ধকে এড়াবার জন্য যেভাবে চেষ্টা করছে চীন সেটি পছন্দ করেনি, বিশেষ করে কেনেডির হুমকির মুখে ক্রুশ্চেভ যেভাবে কিউবা থেকে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত

মিসাইলগুলো তুলে এনেছিলো চীন তার তীব্র সমালোচনা করেছে। মাও সেতুঙের কাছে পাশ্চাত্য শক্তি হচ্ছে আসলে 'কাগুজে বাঘ', তার সামনে নতি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে বিশ্বকে কীভাবে কম্যুনিস্ট বিশ্বে পরিণত করা হবে সে ব্যাপারে চীনের মতবাদ ছিল সোভিয়েতের থেকে ভিন্ন। টিটোর যুগোশ্লভিয়া ভিন্ন রকম সমাজতন্ত্রী হবার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সোভিয়েত গোষ্ঠী যেভাবে তাকে মেনে নিয়েছে এটি চীন খুবই ভুল নীতি মনে করতো। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন দেশ এক দিন কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে সোভিয়েতের এমন স্বপ্নকে চীন দুঃস্বপ্ন মনে করতো। বরং মাও সেতুঙের নীতি ছিল ক্রমাগত জনযুদ্ধ করে জন-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর সেটি সেই আদি কম্যুনিস্টদের মত শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব।

ঠিক সে সময় আমাদের দেশের রাজনীতির বা সমাজের অবস্থায় কী এই বিরোধগুলোর এমন কোন বড় প্রাসঙ্গিকতা ছিল না যে এজন্য এপসুর সমর্থক ছাত্রদেরকে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতে হবে। এর বছর খানেক পর থেকে অবশ্য কিছু রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা দেখা দিয়েছিল। ভারতের সঙ্গে পঁয়ষট্টির সেপ্টম্বর-যুদ্ধের মাধ্যমে খোদ আইয়ুব খান সরকারের সঙ্গে চীনের ভাল দহরম মহরম শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র-সহায়তা বন্ধ হয়ে গেলে আইয়ুব খান ক্রমে বেশি পরিমাণে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফলে বামপন্থী নেতাদের চীনপন্থী অংশ অন্তত পররাষ্ট্র নীতির দিক থেকে আইয়ুব খানকে সমর্থন দিচ্ছিল—যা সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্যের জন্য বিব্রতকর ছিল। পাকিস্তানে চীনের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিলো, সরকারী ভাবেও মাও সেতুংকে এবং চীনের বিপ্লবকে বেশ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছিল।

ভিপি পদে প্রার্থী

এদিকে আমাদের হল নির্বাচন ঘনিয়ে এলো। হলে এপসুর নেতারা নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিলো। এবার কিন্তু আমরাই সিনিয়র। হলের এপসু সভাপতি ও সম্পাদক আমার দুই বন্ধু—আনোয়ারুল্লাহ ও কাদের। মান্নান ভূঁইয়া ভাই, মোস্তফা জামাল হায়দার ভাই এবং কখনো মেনন ভাই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ধুরা প্রায়শ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আমার সঙ্গেও কথা বলতেন যদিও আমি সে ভাবে নেতৃত্বে ছিলাম না মোটেই। আসলে আমার অন্যান্য চিন্তার মধ্যে এপসু'র নীতি নির্ধারণ নিয়ে মাথা ঘামানো খুব বেশি অগ্রাধিকার পেতোনা। পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশনা তখন তার সকল দাবি নিয়ে আমার কাছে অগ্রগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে গবেষণা ছাত্র হিসেবে একটু হাতেখড়ি হবে, সেই আনন্দেও বিভোর ছিলাম। তার মধ্যেও অবশ্য এপসুর নির্বাচন নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলাম কারণ এবার হলে নির্বাচন এপসু একক ভাবে করবে এটি সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। সব দলই একক ভাবে নির্বাচন করবে। দেশের রাজনীতি

তখন এমন একটি অবস্থায় রয়েছে যে আইয়ুব বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিরোধী দলের অগ্রাধিকারগুলো বেশ গোলমেলে—বিশেষ করে যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায়। প্রত্যেকে চাচ্ছিল নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে।

সলিমুল্লাহ হলে এপসু'র একমাত্র দুশ্চিন্তা এনএসএফকে নিয়ে। এনএসএফ তখনো এখানে একটি জনপ্রিয় দল। এই হলের অনেক ছাত্রের কাছে সুপেরিয়র সার্ভিসের স্বপ্ন ঘেরা ভবিষ্যৎটিই প্রধান চিন্তা, ছাত্র রাজনীতিকেও সেই চোখে দেখতে ওরা অভ্যস্ত। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রকেও যদি নির্বিবাদ হল জীবনের জন্য সমর্থন করতে হয়, তাতেও আপত্তি নেই। ছাত্র লীগ এবং ছাত্র শক্তিও সেসময় সার্বিক দল হিসেবে শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের হলে তখন এ দুই দলের যে অবস্থা তাতে এগুলোর প্রতি রাজনীতিতে নির্লিপ্ত ছাত্রদের বেশি উৎসাহ জাগেনা। তাছাড়া ছাত্র লীগও (এপসুর মত) সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্দোলনে লিপ্ত। এপসুর ছেলেরা প্রতিভাদীপ্ত—কিন্তু এই দল সব সময় সংগ্রামের কথা বলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক করে রাখে, আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা তাত্ত্বিক বাকবিতণ্ডা করে, যা ওই রকম নির্বিবাদ ছাত্রদের আত্মমুখী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খুব ভাল যায়না। ফলে অন্য কোন কোন হলে এনএসএফের পেটোয়া চরিত্রের জন্য দুর্নাম থাকলেও সলিমুল্লাহ হলে এটি তখনো নির্বাচনে জেতার মত জনপ্রিয়তা রাখতো। কাজেই স্পষ্টত আমরা বুঝতে পারছিলাম যে একক নির্বাচনে এপসুর জেতাটি মোটেই সহজ হবেনা।

এই নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে নানা পর্যায়ে চিন্তা ভাবনা হচ্ছিল, তার কিছু কিছু কানে আসছিলো। আনোয়ারুল্লাহ, কাদের ওরা আমাকে জানিয়ে গেল যে হলের এপসু সদস্যদের মধ্যে ভিপি পদে আমার নামটি বেশি প্রস্তাবিত হচ্ছে; তাদেরো এটিই মত। গত তিন বছরে নিজেকে যে সলিমুল্লাহ হলের ভিপি হিসেবে কল্পনা যে করিনি তা নয়। কিন্তু সেটি নেহাতই অলস কল্পনা মাত্র। কারণ ভিপি হবার জন্য যে ধরনের একাগ্রচিত্তে এই লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োগ করতে হয় তা করতে আমি কখনই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার অভ্যাস হলো যেটি করতে ভাল লাগে সেটি করে যাওয়া—তার জন্য সন্ধ্যার পর প্রায় জনশূন্য হলে একাকী রুমে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লেখার কাজ করাটাই আমার বেশি আনন্দ। আর ভিপি নির্বাচিত হবার প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত হয়ে গেলে তার রাজনৈতিক, দাফতরিক, আর সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যে কী জিনিস তা হলে আসা অবধি নানা ভিপিদের ক্ষেত্রে দেখে আসছি। হ্যাঁ হলের নতুন পুরাতন ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে এবং নানা বিষয়ে গল্প করতে আমার সব সময় উৎসাহ থাকতো বটে কিন্তু সেও নেহাত আনন্দের ব্যাপার, কখনো রাজনৈতিক বা অন্য কোন রকম নেতৃত্বের আকারে সেটি আসেনি। তাছাড়া আগে যদিও বা ভাল ছাত্র, ভাল বক্তা, ভাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছাত্রদের খুব বেশি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ছাড়াই ভিপি নির্বাচিত হওয়াটি সলিমুল্লাহ হলে রেওয়াজ ছিল সম্প্রতি তাতে পরিবর্তন আসছিলো।

খুরশিদ হামিদ, শফি সামি, ফরাস উদ্দীনের মতো ব্যক্তিত্বকে ওই ভাবে সফল ভিপি হিসেবে দেখেছি বটে, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি হল সংসদের নেতৃত্বকেও রাজনৈতিক ডামাডোলের কেন্দ্রে এনে দিয়েছিলো, যে কারণে আগেরবার হালিম ভাইকে প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই এপসু' ভিপি হিসেবে নির্বাচিত করিয়েছিলো। এই পরিস্থিতিতে আমার স্বাভাবিক আনন্দের ভূবন বিজ্ঞান জগত, বিজ্ঞান সাময়িকীর জগত এ সবের সঙ্গে বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি নিতে আমার তেমন সায় ছিলনা।

ভিপির দৈনন্দিন যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলোর কোনটিতে আমার কোন অসুবিধা ছিলনা—বক্তৃতা দেয়া, ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করা, নানা ধরনের উদ্যোগ আয়োজন করা—এসব বরং আমার পছন্দেরই কাজ। কিন্তু রাজনৈতিক চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে ভিপি'র কাজ সেরকম দৈনন্দিনগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নিশ্চয়তা তখন আর ছিলনা। এদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে আমার তেমন কোন অভিজ্ঞতাও ছিলনা। দ্বিধার কারণ ছিল এসবই। কিন্তু সেটি বন্ধুরা শুনবে কেন—ওদের দরকার হলো একটি বিশ্বাসযোগ্য প্যানেল যেটি নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে। এই প্যানেলের ভিপি প্রার্থীকে হলের ভিপি হিসেবে মানানসই হিসেবে দেখা গেলেই তারা খুশি, তার রাজনৈতিক কার্যকারিতা কতখানি হবে সেটি পরের প্রশ্ন, তার জন্য অন্যরা রয়েছে। জাফর ভাই, মেনন ভাইয়েরও সেই একই মত। নানা দিক থেকে তাঁরা ব্যাপারটি ভেবে দেখেছেন। জিএস হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে বাংলা বিভাগের আবুল কাসেম ফজলুল হককে—বামপন্থী রাজনীতির একজন যোগ্য বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। কাজেই ওদিকটি নিয়ে আমাকে বেশি ভাবতে হবেনা। সবাই আমাকে বোঝালো হলের ছাত্রদের মধ্যে ভিপি হিসেবে আমার যে গ্রহণযোগ্যতা আছে অন্য কারো সেটি নেই; কাজেই একজন সার্বজনীন ভিপি হিসেবে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে গেলেই আমার জন্য যথেষ্ট। এসব বেশ উৎসাহিত হবার মতো কথা। দেখলাম বিশেষ করে অনুজপ্রতিম যারা আছে তারা সবাই এক পায়ে খাড়া—শুধু ঢোলের বাড়ি পড়ার অপেক্ষা। তবুও রাজি হবার আগে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিতে চাইলাম। কারণ সব দিক থেকেই আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এটি জীবনের বড় সিদ্ধান্ত গুলোর একটি। কিন্তু তখন তিনি আমেরিকার কলরাডোতে। চিঠি আসতে যেতে দু'সপ্তাহ লাগতে পারে, তাই একটু দীর্ঘ টেলিগ্রামের ওপরেই নির্ভর করলাম। তাঁর সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাফিক জবাব—'দ্বিধার কোন কারণ নেই এটি অপূর্ব সুযোগ, শুভ কামনা রইলো'। তক্ষুণি মত দিয়ে দিলাম, এবং দলের সমর্থকদের যে আনুষ্ঠানিক সভায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হবে তাতে আমার তা গ্রহণ করার বক্তৃতাটির (এ্যাকসেপটেন্স স্পীচ) কথাগুলো মনে মনে খাড়া করার কাজে লেগে গেলাম। ওই বক্তৃতাটি একদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ—এটিই অনেকটা ঠিক করে দেবে এই

নির্বাচনে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কী রকম হবে, আমি নির্বাচিত হলে হলের জন্য, এবং দলের জন্য কী রকম ভিপি হতে চাইবো। ওই দিন থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন ছোট বড় অনেক বক্তৃতা করতে হয়েছে—কোনটি হলের নানা কক্ষে দল সমর্থক ছাত্রদের সভা, কোনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত কলাভবনে, আর পরে যখন প্রতি রাতের প্লাটফরম সভা শুরু হয় তখন হলের চত্বরে আমাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায়। কলা ভবন ইতোমধ্যে মেডিক্যাল হাসপাতাল সংলগ্ন আদি বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে সরে, শহীদ মিনারের কাছে বর্তমানে যাকে সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন বলা হয়, সেখানে সরে এসেছিলো।

আ কা ম ফজলুল হককে জিএস, প্রথম বর্ষের ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদকে এজিএস, মুসা আহমদকে (পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের খ্যাতনামা প্রযোজক) সংস্কৃতি সম্পাদক, ফারুক আলমগীরকে (পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ বিভাগের প্রধান) সাহিত্য সম্পাদক, আরবাব আহমেদকে ক্রীড়া সম্পাদক করে জনা দশেকের আমাদের প্যানেল চূড়ান্ত হলো—কিন্তু তখনো মনোনয়নের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। ঠিক এমন সময়ে এলো চরম দুঃসংবাদ—এপসু সত্যি সত্যি ভেঙ্গে গেছে। মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থীদের টানাপোড়েনের কথা জানলেও এটি যে এই পর্যায়ে চলে গিয়েছে তা টের পাইনি। বার্ষিক কাউন্সিলে প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে এপসু একটি অভিন্ন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হলো। বন্ধুদের মধ্যে যারা ওতে কাউন্সিলর ছিল তাদের মুখে শুনেছি দুই পক্ষের অনমনীয় অবস্থানের কথা এবং যারা দু'দিন আগেও এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ করেছে তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও মারমুখী আচরণে লিপ্ত হয়েছে। সব দেখে শুনে আমার মনে হলো এগুলো এপসুর ঊর্ধ্ব নেতাদের কারণেই হয়েছে, যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থক প্রকাশ্য দলগুলোর বড় নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রয়েছেন; শেষোক্তরা আবার কোন এক ভাবে সোভিয়েত ও চীনের সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই এই বিভক্তির সুতা বহুদূর বিস্তৃত। তবে নেতাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা আর ব্যক্তিগত সম্পর্কও এর জন্য কম দায়ী ছিলনা। শেষ পর্যন্ত এপসু বিভক্ত হয়ে গেল—যা পরে মেনন গ্রুপ (চীনপন্থী বা পিকিংপন্থী, বেইজিংকে তখনো পিকিং বলা হতো) এবং মতিয়া গ্রুপ (সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী বা মস্কোপন্থী) নামে পরিচিত হয়েছিলো। দ্বিধাবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপে রাশেদ খান মেনন সভাপতি ও আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাধারণ সম্পাদক, মতিয়া গ্রুপে মতিয়া চৌধুরী সভাপতি ও সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক সাধারণ সম্পাদক হন।

ঘটনাটি এমন সময় ঘটলো যখন আমরা হলে একটি নির্বাচনের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। সল্লিমুল্লাহ হলে যারা এপসুর তাত্ত্বিক লাইন নিয়ে সোচ্চার তারা প্রায় সবাই পিকিংপন্থী মতেরই অনুসারী ছিল—জাফর ভাই, মেনন ভাই, রনো ভাইদের প্রভাবটিই সেখানে মুখ্য। অন্যান্য সাধারণ সমর্থকরা মোটা দাগে এপসুর নীতির সমর্থক, তারা সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচারের বেশি ধার ধারতোনা। কাজেই এপসুর ভাঙ্গন

সাধারণ ভাবে আমাদের পেছনে সমর্থনে বড় রকমের প্রভাব রাখার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তিশালী এনএসএফের বিরুদ্ধে বিভক্ত দলের নির্বাচন দারুণ কঠিন হয়ে পড়লো। শোনা গেলো আমাদের প্যানেলের বিপক্ষে এপসু'র অন্য গ্রুপ মতিয়া গ্রুপ একটি প্যানেল দেয়ার চেষ্টা করছে। হলে তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কেউ কেউ ছিল—আমাদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও এতদিন দলে সহযাত্রী। তাছাড়া আমাদের হলের অনাবাসিক এপসু সমর্থকদের মধ্যে এই সহানুভূতির ব্যাপকতা কতখানি রয়েছে তা জানা ছিলনা। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই হলে না থাকলেও কোন না কোন হলের সঙ্গে সংযুক্ত (এটাচ্ড) থাকতে হয়, বেশির ভাগ ছাত্রই এভাবে সলিমুল্লাহ হলের এটাচ্ড থাকতেই পছন্দ করতো। কাজেই আমাদের অনাবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল বিপুল। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এরকম বিভক্ত প্যানেল দেখলে এপসু সমর্থক হয়েও আমাদের ওপর বিরক্ত থাকবে। সব মিলে মতিয়া গ্রুপের নামে বাড়তি প্যানেল হওয়া মানেই হলো পরাজয় সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া। এই প্রস্তাবিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল বাংলার ছাত্র বরকত উল্লাহকে (পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বড় কর্মকর্তা, অধুনালুপ্ত চ্যানেল ওয়ান টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী)। আমার খুব বন্ধু মানুষ বরকত, তাছাড়া প্রস্তাবিত এই প্যানেলের অন্যান্য সম্ভাব্য প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যেও অনেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আনোয়ারুজ্জামান পারভেজের কথাও শোনা যাচ্ছিল সে প্যানেলে। বরকতের সঙ্গে কথা বল্লাম, অন্যান্যদের সঙ্গেও। দেখলাম আলাদা প্যানেল হতে ওদের আগ্রহ যে প্রচণ্ড তা মোটেই নয়, তাদের নেতারা আমাদেরকে নার্ভাস করে দেবার জন্য এই আয়োজন করছেন। এর সম্ভাব্য প্রার্থীরা সলিমুল্লাহ হলে এই সময় এনএসএফকে ক্ষমতায় আনার দায় নিতে খুব উৎসাহিত বোধ করছিলোনা—তাছাড়া বন্ধুত্বের দাবিটিও তারা এড়াতে পারছিলো না। শেষ পর্যন্ত মতিয়া গ্রুপের কোন প্যানেল হলোনা, আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ এনএসএফ ভি পি প্রার্থী দিয়েছে আমারই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পদার্থবিদ্যার সহপাঠী আজিজুল বারীকে, যার কথা আগে বলেছি। জি এস প্রার্থী আনোয়ারুল বার চৌধুরী (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং পররাষ্ট্র দফতরের উচ্চ কর্মকর্তা) আমার আর একজন বন্ধু। চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম বর্ষে থাকতে আজম খানের সৌজন্যে ট্রেন ভ্রমণে যখন সিলেটে এম সি কলেজে গিয়েছিলাম সে কলেজের ছাত্র ওকে সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম কলেজের কোর্টে টেনিস খেলতে—সামান্য কথাও হয়েছিলো। হলে আসা অবধি আমরা বন্ধু। এখন আমরা ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনী মাঠে।

এখন থেকে কিছু কিছু সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হতো। সেই এ্যাকসেপটেন্স বক্তৃতায় যে কথাগুলো এনেছিলাম সেই বিষয়গুলোই নিয়ে আসতাম বক্তৃতায়। তাছাড়া প্রতিপক্ষের সভাগুলোতে এপসু সম্পর্কে, হল সংসদে নির্বাচিত হলে

আমাদের সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে, নানা নেতিবাচক মন্তব্য করা হতো; এপসু ক্ষমতায় এলে তার কারণে নানা আশঙ্কা প্রকাশ করা হতো; সেগুলো যথারীতি নোট করে এনে দেয়া হতো জবাব দেবার জন্য। এপসু সম্পর্কে সব চেয়ে বড় সমালোচনা ছিল এর 'স্বপ্নবিলাসী আন্তর্জাতিকতাবাদী'—যারা সারা দুনিয়ার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে থাকার কথা বলে বটে, কিন্তু আসলে মস্কোতে বা পিকিঙে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা ধরে। এ সম্পর্কে আমি স্পষ্ট বলতাম যে ছাতা ধরার কথা যতই বলা হোক না কেন আমরা আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে থাকবোই—নব্য উপনিবেশবাদের বিপক্ষে আমাদের প্রতিবাদটুকু যোগ করাটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সংগ্রামে আমাদের সবার এ সমর্থনটুকু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বলতাম সংসদে নির্বাচিত হবার চেষ্টার পেছনে এটিও আমাদের একটি কারণ—শুধু হলের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য নয়।

মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র আলাদা করে বলতাম। আফ্রিকায় কঙ্গোর ইতোপূর্বের ঔপনিবেশিক শক্তি বেলজিয়ামের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সরাসরি হস্তক্ষেপে মুক্তিকামী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে নির্মম ভাবে হত্যার পর জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রেসিডেন্ট কাসাভুভু ও সেনাপ্রধান মবুতু সেখানে নিষ্ঠুর খেলা খেলছিলো। পঁয়ষট্টির সেই সময় এভাবে মবুতুর দানবীয় শাসন ওখানে পোক্ত করার পাঁয়তারা চলছিল। এশিয়ায় ভিয়েতনাম তখন আমাদের সবার চিন্তা-চেতনায় ইতোমধ্যেই ঢুকে গেছে। এর প্রধান কারণ হো চি মিনের উত্তর ভিয়েতনাম এখন আর শুধু স্বেচ্ছাচারী দক্ষিণ ভিয়েতনামী জেনারেলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলোনা বরং পুরো ভিয়েতনামের মুক্তিকামীরা সরাসরি শক্তিশালী মার্কিন সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করছিলো। ১৯৬৫ সনেই প্রথম বারের মত একটি পূর্ণাঙ্গ মার্কিন বাহিনী তার সমস্ত আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধে নেমেছিলো। তাদের দোসর হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়াও পাঠিয়েছে একটি সৈন্যদল, আর অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড আপাতত কিছুটা প্রতীকী ভাবে হলেও সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আর ওদিকে প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন বিমান বাহিনীকে উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপক বোমা বর্ষণের আদেশ দিয়েছেন, যদিও বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ তাদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। এই মরণপণ সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী মানুষের সমর্থন ভিয়েতনামের জনগণের একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের নির্বাচনের ঠিক আগের সময়টিতে শুরু হয়েছিল সব চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে জাতির অবিসংবাদী নেতা শোকার্নোকে অমান্য ও অপমানিত করে সেনাবাহিনীর জান্তা ও দক্ষিণপন্থীরা কম্যুনিস্ট সমর্থক এই আখ্যা দিয়ে হত্যা করা আরম্ভ করেছিল নগরে গ্রামে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষকে। ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবার বিপ্লবী ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সাফল্য যখন পুরো মহাদেশকে অনুপ্রাণিত করছে তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডির আদেশে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ও হত্যার চেষ্টা করেছে সিআইএ প্রথমে 'বে' অফ পিগের' চক্রান্তের আক্রমণে এবং

পরে আরো বহুবার গুপ্ত প্রচেষ্টায়। প্রেসিডেন্ট জনসন কিউবাকে ধ্বংস করার সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী ডোমিনিকান রিপাবলিকের বিদ্রোহ দমনে মার্কিন সেনা ব্যবহার করে সেখানে পুতুল সরকারের ব্যবস্থা করেছেন, এর আগে গুয়াতেমালার বৈধ নির্বাচিত বামপন্থী সরকারকে কৌশলে উৎখাত করেছেন। এরকম সকল সংগ্রামে এপসু এবং সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন দিয়ে যাবে, কখনো নীরব থাকবেনা। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য মস্কোকে বা পিকিংকে সাহায্য করা নয়; বরং নির্যাতিত সংগ্রামী গণ-মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে যে এই বিশ্বব্যাপী মুক্তি কামনা থেকে আলাদা করা যায়না এটিও ছিল আমার যাবতীয় বক্তৃতার একটি অপরিহার্য দিক। আইয়ুব শাহীকে ধ্বংস করতেই হবে, এবং এজন্য ছাত্র সমাজের ঐক্য আগের মতই প্রয়োজন। এই ঐক্য ভঙ্গ করে আইয়ুব খানকে সমর্থন দিয়ে এনএসএফ জঘন্য জনবিরোধী কাজ করেছে। তেমনি সারা দেশে এই প্রশ্নে মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে সত্যিকারের গণতন্ত্র চর্চার লক্ষ্যে। দেশের সকল অংশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (অতীতের সব প্রদেশের) এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া এই গণতন্ত্র অসম্ভব। এই স্বায়ত্তশাসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান যে কতখানি অসহায় তা সাম্প্রতিক কালে প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদরা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন; আর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তো কয়েক মাস আগের যুদ্ধ তা একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। ছাত্র লীগ তখনো সিয়াটো এবং সেন্টোর নিগড়ে বাঁধা মার্কিন গাঁটছড়ার স্বপ্নে বিভোর রয়েছে—যাকে সোহরাওয়ার্দী প্রথম পূর্ণতা দিয়েছিলেন। আইয়ুব খান সরকারও নিজেদের স্বার্থে মার্কিন বলয়ে আত্মসমর্পণ করে দেশের নিজের স্বাধীন নীতি গ্রহণের ক্ষমতা বিসর্জন দিয়েছে; এবং এর ফল যুদ্ধের সময় ভোগ করেছে, কাজের সময় মার্কিন সাহায্য বন্ধ হবার মাধ্যমে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে দেখিয়ে দিতাম যে আইয়ুব-মোনেম সরকারকে তুমুল ছাত্র আন্দোলন থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল কৌশল অবলম্বন করছে। একেবারে স্পষ্ট ভাবে ভিসি ওসমান গণি আইয়ুব-মোনেমের বশংবদ হিসেবে কাজ করছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সেভাবে ব্যবহার করছেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করতে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা অপারগ—তাঁকে সর্বোতভাবে বয়কট করতে হবে। এনএসএফের বন্ধুরা বলছেন সেটি করলে হল সংসদের কোন কাজ হবেনা, এমনকি ভিসির অবর্তমানে সংসদের অভিষেকও হতে পারবেনা, তা হলে আমাদেরকে নির্বাচিত করে লাভ কী? আমাদের বক্তব্য হলো প্রয়োজনে তাই হবে, নির্বাচিত হলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে অভিষিক্ত করবো; আর হলের কয়েকটি অনুষ্ঠান করার জন্য সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ নির্বাচিত হয়না, বরং তার দায়িত্ব আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক প্রশ্নে তার লক্ষ্য আরো অনেক উঁচুতে—আমরা সেই বড়

দায়িত্বই পালন করবো পুরো ছাত্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক, সামাজিক কাজ হোক এর মান ও সৌকর্য কত উঁচুতে হতে পারে তা এপসুর সংস্কৃতি সংসদ নিয়মিত প্রমাণ করে এসেছে; সলিমুল্লাহ হলে নেতৃত্ব পেলে ভিসিকে নিয়ে নয়, ছাত্র সমাজকে নিয়ে আমরা তা আবার এই হলেই প্রমাণ করবো।

মাহবুবউল্লাহ, আ কা ম ফজলুল হক প্রমুখ আরো তাত্ত্বিক বক্তৃতা দিতো জনগণতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে। আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী এপসু হল শাখার সভাপতি হিসেবে প্রায়ই সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করতো। তার ও অন্যান্যদের বক্তৃতায় প্রাণ-প্রিয় সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে অনেক আবেগ ভরা কথা থাকতো—তবে সাম্প্রতিক বিভাজনের দিকে ইঙ্গিত করে এমন কোন কথা আমরা নির্বাচনী সভাগুলোতে তুলতামনা। মেনন ভাই, জাফর ভাইয়ের বক্তৃতা আমাদেরগুলোর মত রোজকার সভায় ঘন ঘন হতো না, কিন্তু খুব জনপ্রিয় ছিলো। বন্ধু প্রার্থীদের গুণ বর্ণনায় অনেক বক্তা বেশ ফুলেল ভাষা ব্যবহার করতো। সা'দত নিজস্ব কায়দায় প্রধান প্রার্থীদের বক্তৃতার মাঝখানে 'জিনিয়াস জিনিয়াস—ভার্সেটাইল জিনিয়াস' এই শ্লোগান দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতো; আবার কখনো কখনো প্রায় নিজে নিজেই সজোরে উৎসাহ দিয়ে বলে উঠতো 'সান অফ অ্যা গান অফ অ্যা বুল ফাইটার'। তবে সব শ্লোগানের মূল শ্লোগান ছিল একেবারে সাদামাটা—'ভোট ফর ভোট ফর—এপসু এপসু'। তালে তালে ছন্দে ছন্দে এটিই যেন দিন রাত সবার একমাত্র জপ হয়ে উঠেছিল—'ভোট ফর ভোট ফর—এপসু এপসু'। আর ছিল 'ইব্রাহীম-হক ক্যাবিনেট—জিন্দাবাদ'। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে এই 'ইব্রাহীম-হক ক্যাবিনেট' কথাটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটি চেষ্টা থাকতো যাতে এনএসএফের 'বারী-বার ক্যাবিনেটের চেয়ে এটি পরিচিতিতে এগিয়ে থাকে।

প্লাটফরম সভাগুলোতে সব চেয়ে বেশি বৈচিত্র সৃষ্টি করতো মূসা আহমদ—আমাদের একজন প্রার্থীও বটে। তার বৈশিষ্ট হলো কীর্তনের সুরে গানের ধুয়া ধরে তাকে শ্লোগানে পরিণত করা। এর মূল ধুয়াটি হলো 'এস এম হলের ঘরে ঘরে—এপসু দেখা যায়; এপসু দেখা যায়'। তারপর প্রতিপক্ষের নানা সমালোচনা কীর্তনের সুরে। যেমন আমাদের ওপরে এনএসএফের প্লাটফরম আর আমাদের ডানে ছাত্রলীগের প্লাটফরমের দিকে ইঙ্গিত করে কীর্তন হতো :

'আমার ওপরে নসফ রাণী, ডানে মার্কিনী, মোরা স্বর্গে যাবগো,—স্বর্গে যাব গো'।

রাত বারোটার পর প্লাটফরম সভা শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ সারিতে আমরা শ্লোগান দিতে দিতে অথবা গান গাইতে গাইতে যথারীতি চলতাম পলাশীর চায়ের দোকানে। সেখানে এক কাপ খালি চা পান করতে করতে সেদিনকার মত সর্বশেষ নির্বাচনী বিশ্লেষণ করতাম কখনো এই চা হতো ভিপি প্রার্থীর সৌজন্যে, কখনো জিএস প্রার্থীর সৌজন্যে, কখনো পার্টি সভাপতির সৌজন্যে—ইত্যাদি।

নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে দিনের বেলা ও সন্ধ্যাগুলো কাটতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা শহরের নানা অঞ্চলে অনাবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজে (এটাচ্‌ড কন্টাক্ট)। আসলে সভা, বক্তৃতা, শ্লোগান ইত্যাদি ছাড়াও নির্বাচনের আসল কাজটি ছিলো প্রত্যেক ভোটারের সঙ্গে জানাশোনা ও বন্ধুত্বের আবহ সৃষ্টি করা। হলের আবাসিক ছাত্র যাকে কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন দেখছি তার সঙ্গেও এ সময় একটু বিশেষ ভাবে আলাপ করা দরকার একটু হেসে, অন্তরঙ্গতার সঙ্গে। বলা যায়না, এপসুর সমর্থক হয়েও যদি অন্য দলের কোন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বসে বন্ধুত্বের খাতিরে। অনেকের সমর্থন সেভাবে বোঝারও উপায় ছিলোনা। এটি আরো কঠিন হয়ে পড়তো অনাবাসিকদের সংযোগ করতে গিয়ে। দলের পক্ষ থেকে তাদের ঠিকানার একটি দীর্ঘ তালিকা করা হয়েছিলো—শহরের বিভিন্ন এলাকায়, এবং রাস্তায় ভাগ করে নিয়ে। দু'তিন জনের ছোট ছোট দলে আমরা সবার বাসায় যাবার চেষ্টা করেছি। বাসায় যদি তাকে না পেতাম ওখানে বলে আসতাম যে আমি এসেছিলাম, কাগজপত্র দিয়ে আসতাম। এভাবে এটাচ্‌ড কন্টাক্ট করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তখনকার টেলিভিশন সংবাদ পাঠক ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরে ভয়েস অব আমেরিকাতে) সলিমুল্লাহ হলের অনাবাসিক। অনাবাসিক ছাত্রদের একটি বড় অংশ ছিল ঢাকার বনেদি এলাকায়। ওই বনেদি এলাকা ছিল আজকের গুলশান বা বারিধারা নয়, বরং পুরোনো ঢাকার অভিজাত আবাসিক এলাকা ওয়ারী, র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রিট ইত্যাদি এবং কিছুটা সদ্য গড়ে ওঠা ধানমণ্ডি। নির্বাচন উপলক্ষে ওসব জায়গায় খুব যাওয়া আসা হলো। এভাবে ঢাকা শহরে ঘোরার ক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ করার একটি সহায় হয়েছিলো মির্জা আলমগীর—সে তার বাবার খোলা জিপটি নিয়ে আসতো, নিজেই চালাতো—আমাদেরকে নিয়ে এভাবে অনেক জায়গায় গিয়েছিল।

আসলে আলমগীর ও তার তিন রুম মেট ছিল এই নির্বাচনে আমাদের দিক থেকে সব চেয়ে অগ্রণী কর্মী। প্রথম বর্ষের ছাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আহমেদ কামাল, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ হলের নিচের তলায় মূল গেইটের কাছাকাছি একটি রুমে থাকতো—আর এটিই পরিণত হয়েছিল অনানুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের এক ধরনের নির্বাচনী অফিসে। প্রত্যেকদিনের সব পরিকল্পনা আমরা ওখানে বসেই নিতাম। ওয়াহিদ নিজে প্রার্থী, বাকি তিন জন তুখোড় কর্মী—কোথায় কাদের ভোটগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে, কাগজ পৌঁছাতে হবে, সভা আয়োজন করতে হবে, সব কিছুতে তৎপর ওরা। আর এই রুমের নির্বাচনী আড্ডাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ ঘুরে ফিরে সবাই সব তথ্য এখানেই দিয়ে যায়। এই আড্ডায় একজন নিয়মিত সদস্য ছিল ভূঁইয়া ইকবাল। সে এখনো ঢাকা কলেজে পড়লেও তাদের কলেজ জীবন থেকে এই রুমের সবার আপন, আর আমি ভিপি প্রার্থী হওয়াতে এই নির্বাচনে তার প্রচণ্ড আগ্রহ। অনেক ছাত্র সম্পর্কে ইকবালের জ্ঞানটি বেশ কাজে এলো বৈ কি। ওই যে

কাগজের কথা বলছি তার মধ্যে রয়েছে ভোট দেবার আবেদন, আমাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো, প্রার্থী তালিকা ইত্যাদি। তবে সব চেয়ে জরুরি ছিল প্রত্যেক প্রার্থীর পরিচিতি (ক্রেডেনশিয়াল) যা প্রথাগত ভাবে ইংরেজিতেই লেখা হতো। এই জিনিসটির উপর সে সময় খুব গুরুত্ব দেয়া হতো—প্রার্থীরাও নিজেদের জীবন পরিচিতি বেশ ফুলেল ভাবে উপস্থাপন করতো। সে সময় কোন কোন প্রার্থীর এই ক্রেডেনশিয়াল সম্পর্কে মজার জনশ্রুতি ছিলো যে সেগুলোর অধিকাংশ হলের ভোটারদের কাছে বিলি না করে রোকেয়া হলে বিলি করা হয়েছে। ভিপি প্রার্থীর ক্রেডেনশিয়াল অন্তত মুদ্রণ সৌকর্যে যেন ভাল হয় সে জন্য চট্টগ্রামে আমাদের প্যাকেজেস থেকে ভাল কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলাম। জরুরি ভিত্তিতে জাহাঙ্গীর সেগুলো ছাপিয়ে নিয়ে এলো; ফলে তারও দেখার সুযোগ হলো আমাদের নির্বাচন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল সংসদগুলোর নির্বাচনকে সে সময় জাতীয় গণমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো—এবং তার মধ্যে সলিমুল্লাহ হল একটু বাড়তি মনোযোগ পেতো। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোযোগ বেড়ে গেলো। আমাদের প্রচার কার্যের খবর, পরিচিতি, প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি পত্রিকাগুলোতেও স্থান পেলো। খুব ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি দিল আজাদ পত্রিকা—মেনন ভাইয়ের, আমার এবং আরো কয়েকজন প্রার্থীর ও সমর্থকদের সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে একটি ছোটখাট প্রচার মিছিলের ছবি। *দৈনিক পাকিস্তানের* শেষের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন হলের ভিপি প্রার্থীদের ছবি পৃথক ভাবে ছাপানো হলো প্রত্যেকের পরিচিতি সহ।

যথেষ্ট উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয়ে গেল ১৯৬৫ সালের একেবারে শেষের একটি দিনে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে এতে, হলোও তাই। ভিপি পদে আমি জিতলেও এপসু'র বিজয়টি খুবই অসম্পূর্ণ হলো। জিএস, সংস্কৃতি, পাঠাগার ইত্যাদি বেশ কয়েকটি পদে এনএসএফের প্রার্থী জিতলো। এ কারণে এপসু'র সমর্থকরা বিজয়ের আনন্দ সেভাবে করতে পারলোনা—সবারই মন খারাপ বিশেষ করে এপসুর ফজলুল হক না হয়ে এনএসএফের আনোয়ারুল বার জিএস হওয়াতে। আলমগীর কবীর কাঁদো কাঁদো মুখে আমার কাছে এসে উত্তেজনায় তার নোয়খাইল্যা শব্দ প্রয়োগে বল্‌লো 'আপনি তো ভোট পাইছেন সবার কাছে আপনার কেলানির (বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির) কারণে, এপসু'র কী হইলো?' অনেকদিন পর একক নির্বাচনে নেমে আমরা বুঝলাম এনএসএফের সমর্থন, এবং প্রকারান্তরে আইয়ুব খানের সমর্থন এখনো যথেষ্ট। আমি জিতলাম এনএসএফের ভিপি প্রার্থী আজিজুল বারীর থেকে ৫০টি ভোট বেশি পেয়ে। কিন্তু এপসুর যারা হেরেছে তাদের হারার পার্থক্য যে রকম বড়, তাতে বুঝলাম একটু ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা থাকাতেই আমাদের কয়েকজনের জেতাটি সম্ভব হয়েছে। খুব সম্ভব মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়াটি অনেক এপসু সমর্থকও পছন্দ করেনি।

সে রাতে আমরা শহীদ মিনারে গেলাম শপথ নেবার জন্য। জাফর ভাই আমাদেরকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করালেন। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুভব করলাম এর সঙ্গে সঙ্গে বড় একটি দায়িত্ব এসে পড়লো—হলের ভিপি হিসেবে, এবং এপসু' থেকে নির্বাচিত ভিপি হিসেবেও। এর পরদিন থেকে হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জীবন আর ঠিক আগের মত রইলোনা।

ভিপিগিরি

নির্বাচনের পরপর হলের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে, বিশেষ করে নির্বাচনের দিনগুলোতে এপসু'র যে কর্মীদের নিয়ে প্রচার কার্যে রাত দিন কেটেছে তাদের সঙ্গে একটু উদযাপন করা হলো বৈকি। কিন্তু সেই উদযাপনেও সেকালের সাদামাটা ভাবটি বেশ স্পষ্ট। সবাই ধরলো সেনু পাহলোয়ানের দোকানের মোরগ পোলাও খাওয়াতে হবে। হেঁটে প্রায় মিছিল করেই সবাই চলে গেলাম হল থেকে পুরোনো ঢাকার চক বাজারের কাছে সেই মোরগ পোলাওয়ের দোকানে, মেনন ভাইও ছিলেন। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে হৈচৈ করে খাওয়া হলো। সে রাতে ছিল আর একটি এমনি উদযাপন—বলাকা সিনেমাতে দল বেঁধে গিয়ে 'স্পারটাকাস' সিনেমাটি দেখা; রোমান আমলে এক সাহসী দাসের দাস-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানের কাহিনী এই এপসু'র উপযুক্তই বটে। নির্বাচনের পর পরই মোসলেহ উদ্দিন বরিশালে বাড়িতে চলে গিয়েছিলো। ওখান থেকে আমাকে চিঠি লিখলো লঞ্চে যাওয়ার সময় ইঞ্জিনের যে ঝিক ঝাক শব্দ তালে তালে হচ্ছিল, তার শুধু মনে হচ্ছিল ওটি বলছে 'ভোট ফর ভোট ফর—এপসু এপসু'।

সলিমুল্লাহ হলের ভিপি আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিষেক ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যভার গ্রহণ করার আগেই যে শহরে একজন কেউ-কেটা হয়ে যায় সেটি সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম। হলের সবার থেকে তো বটেই, হলের এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও যাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয়টুকু ছিল তাদের অভিনন্দন বার্তা পেতে থাকলাম। ঘনিষ্ঠরা তো অত্যন্ত খুশি হলেন। সব চেয়ে বেশি খুশি হলেন চাচা আজিজুল হক সাহেব। তাঁর উচ্ছসিত আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভিপি আমি নির্বাচিত হইনি, তিনি হয়েছেন। আগেই দেখেছি সলিমুল্লাহ হলের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক কখনো শেষ হয়নি—সুযোগ পেলেই হলে চলে আসতেন। এখন যেখানে তাঁর স্নেহভাজন আমি ভিপি, তিনি যেন সম্পর্কটি আরো ভাল ভাবে অনুভব করতে পারছিলেন। নির্বাচনের কয়েকদিন পর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে'র বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে এলেন। বামপন্থী এই পত্রিকা তখন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। শিগ্‌গীর এর 'ক্যাম্পাস ক্রনিক্‌ল' নামক ফিচারে আমার ছবি সহ "আওয়ার চয়েস, আওয়ার লিডার" শিরোনামে এই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিলো। আমাদের ছাত্র রাজনীতির স্বরূপ কী হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি

সেটি নিয়ে কথা হয়েছিলো। চিন্তার স্বাধীনতা, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি রাজনীতিতে কী ভাবে রূপ পেতে পারে—সেটি নিয়েও। দেশের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং হলের আবাসিক ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আলাপ হলো। দেখলাম শুধু ছাত্রদের কাছে নয়, এখন ভিপি নির্বাচিত হবার ফলে পত্রিকার পাঠকের কাছেও এসব নিয়ে আমার মতামতের খানিকটা গুরুত্ব তৈরি হয়েছে।

গুরুত্বটি আর একটু অদ্ভুতভাবে বুঝলাম নির্বাচনের পর প্রথম কার্জন হলে আমার পদার্থবিদ্যা বিভাগে গিয়ে। শিক্ষকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে দেখা হলো একটু মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলাম। পদার্থবিদ্যার মনোযোগী ছাত্র হিসেবে আমাকে দেখতেন এমন কয়েকজন শিক্ষক একটু উদ্বিগ্ন হলেন ছাত্র রাজনীতিতে আমাকে এতখানি জড়িয়ে যেতে দেখে। বাকিরা কিন্তু খুউব খুশি হলেন—সলিমুল্লাহ হলের ভিপি নির্বাচিত হবার ব্যাপারে তাঁদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। শিগ্‌গীর বিভাগীয় প্রধান আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেবের কক্ষে ডাক পড়লো। তিনি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম আলাদাভাবে একান্তে তাঁর সঙ্গে আমার কোন রকম কথা হলো, বা আমাকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিলেন। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বল্‌লেন যে পদে নির্বাচিত হয়েছি সেটি খুব দায়িত্বশীল পদ। সরাসরি জানতে চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করবো কিনা—বিশেষ করে ভিসি ওসমান গণির সঙ্গে। আমি সবিনয়ে জানালাম যে আমাদের নির্বাচনী নীতিতে ছিল সেটি আমরা করবোনা। এতে তিনি খুশি হলেন বলে মনে হলো, যদিও বিভক্ত হল সংসদে এনএসএফের গুরুত্বপূর্ণ পদ থাকাতে এটি সম্ভব কতখানি হবে এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন।

প্রথম সুযোগেই হলের প্রভোস্ট প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমেদ আমাকে ডাকলেন কথা বলার জন্য। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হলেও সেখানে আমার সাবসিডিয়ারি ক্লাসের কালে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা হয়নি। প্রভোস্ট হিসেবে হলে কালেভদ্রে হয়েছে, কিন্তু সেটি তাঁর খুব মনে থাকার কথা নয়। এই প্রথম যথেষ্ট সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হলো; মনে হলো তিনি বাস্তববাদী মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর হল কর্তৃপক্ষ এই দুইকে একেবারে এক করে ফেলতে চান না। অভিষেক অনুষ্ঠান, তাতে ভিসি'র উপস্থিতি, কার্যভার গ্রহণ, গত সংসদে সৃষ্ট অকার্যকর অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ হলো। বললাম আমি এনএসএফ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারবো—কী করা যাবে, আর কী করা যাবেনা। জিএস নির্বাচিত এনএসএফের আনোয়ারুল বার চৌধুরী অনেক আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যরাও অনুজ প্রতিম, আমাকে বরাবর মান্যগণ্য করে—বিশেষ করে হলের আবাসিক ছাত্র সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত মোহসীন ও পাঠাগার সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্‌শী। তারা সবাই খুব খুশি হয় যদি আমার নেতৃত্বে একটি কার্যকর সংসদ গড়ে ওঠে—তবে এপসুর আর এনএসএফ উভয়ের কিছু কিছু বিষয়ে অনড় অবস্থানের বিষয়ে তারা অবহিত ছিল। আপাতত সমস্যা হলো

ভিসিকে ছাড়া অভিষেক অনুষ্ঠান না করতে দেয়ার জন্য প্রভোস্টের সংকল্প। অথচ এটি ছাড়া সংসদের স্বাভাবিক কাজগুলো হতে পারছিলোনা—বাজেট অধিবেশন করে বাজেট পাশ না করালে এর কোন টাকাও খরচ করা যাচ্ছিলোনা। হল কার্যক্রমে অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও সংসদের নিয়মিত কিছু ব্যয় ছিল—যেমন কয়েকজন কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি। কোন পক্ষের নতি স্বীকার না করার মধ্য দিয়ে এভাবে মাস কেটে গেল। অবশেষে প্রভোস্ট এবং কর্তৃপক্ষ ভিসি ছাড়া অভিষেকে রাজি হলেন, দল হিসেবে এনএসএফও রাজি হলো।

অভিষেক অনুষ্ঠানটি বেশ জমজমাট হলো। গণ্যমান্য অনেক প্রাক্তন ছাত্ররা এলেন। এর আয়োজন করতে গিয়ে দেখলাম মঞ্চ সজ্জা, স্মরণিকা প্রকাশ ইত্যাদিতে সংসদ সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে, আমিও মনের আনন্দে এর জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিদের সহায়তা নিতে পারছি। অভিষেক অনুষ্ঠানে আমার বক্তৃতাটি বেশ প্রশংসিত হলো। 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় বেশ বড় ছবি দিয়ে সংসদের পক্ষে—আমার শপথ নেবার দৃশ্যটি দেখানো হলো, সেই সঙ্গে অভিষেক অনুষ্ঠানের পুরো খবর।

আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিপিগিরির শুরুতেই আর একটি কর্তব্য ছিল যা নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম—তা হলো বাজেট পাশ। এতে হলের সব ছাত্ররা অংশ নিতে পারে ও কথা বলতে পারে। জনশ্রুতি ছিল বাজেট যাতে পাশ না হতে পারে এজন্য কখনো কখনো কেউ ফিলিবাস্টারের আশ্রয় নিয়ে থাকে—এর অর্থ একটি ছাটাই প্রস্তাব এনে অথবা অন্য যে কোন উছিলায় বক্তৃতা দিতে উঠে ক্রমাগত বলতে থাকা—যাকে থামানো নাকি প্রথা বিরোধী। বেশ কিছু ছাটাই প্রস্তাব এলেও, কিছু দীর্ঘ বক্তৃতা হলেও, ফিলিবাস্টার ঠিক হলোনা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমস্যা বা আপত্তির কারণগুলো কী ভাবে দূর হবে তা আমি বুঝিয়ে দিতে পারলাম। তাই হয়তো কোন খাত থেকে দশ বিশ টাকা ছাটাই করে তা পাশ করিয়ে ফেলে এক ধরনের বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করার সুযোগ কেউ শেষ পর্যন্ত পায়নি।

সলিমুল্লাহ হলের ভিপিগিরির কয়েকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ রয়েছে। এর একটি হলো বকায়দা একজন আমলার রূপ—একটি অফিস রয়েছে, তাতে আমলার মতই নিয়মিত কাজ করে নানা সিদ্ধান্ত নেয়া, সই-ছাপ্পড় দেয়া—যেগুলো প্রধানত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, হলের ছাত্রদের স্বার্থে অথবা কর্মচারীদের স্বার্থে যেগুলো সংসদকে নিতে হয়। কোন কোন ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়েও উদ্যোগ নিতে হতো—হলের আবাসনের নানা কিছু সংস্কার, নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি। এগুলোর ব্যাপারে আগে থেকেই কিছু দাবি দাওয়া আছে, নতুন করেও কিছু কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রধানত এই আমলা রূপের কারণেই চিরকালের সম্বোধনটি হারিয়ে ফেলে হলে ক্রমে আমার যে পরিচিতিটি কায়েম হয়ে গেলো সেটি হলো 'ভিপি সাহেব'; এমনকি খুবই পরিচিত বন্ধু-স্থানীয় সব ছাত্রদের কাছেও (তারা যেন কিছুটা মজা পেতো এতে), অন্যদের কাছে তো

বটেই। হলের অফিস ছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অফিস ইত্যাদির লোকজনেরও আনাগোনা ঘটতো ভিপি'র অফিসে তাদের কাজ, পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে—সে সবেও মনোযোগ দিতে হতো। একবার পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় সলিমুল্লাহ হলের আবাসন অব্যবস্থা নিয়ে একটি দীর্ঘ সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। কোথায় ছাদ দিয়ে পানি পড়তে পড়তে সেখানে শ্যাওলার রাজত্ব হয়েছে, ডাইনিং রুমে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, স্যুয়ারেজের নলগুলির অনেকগুলো ভাঙ্গা—এসব নানা অভিযোগ। হলের সুনামের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে এই প্রতিবেদন। এর প্রতিকারে তাই হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের দাফতরিক ছুটাছুটি যেমন হলো আমাকেও কিছু তৎপর হতে হলো; পত্রিকাকেও এ সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে হলো। ভিপিগিরির আমলা রূপের অন্য একটি দিকও ছিল, সেটি মন্দ নয়। আমাদের ক্যান্টিন, ডাইনিংরুম, বাগান ইত্যাদিতে অনেক বালক ও তরুণরা কাজ করতো। তাদের জন্য নাইট স্কুলের ব্যবস্থা ছিল—হলের স্বেচ্ছাসেবক ছাত্ররাই শিক্ষকতা করতো। তা ছাড়া বছরের নানা সময় ওদের কিছু অনুষ্ঠানও হতো, যেমন একটি যাত্রার পালা হয়েছিলো যার জন্য ওরা বেশ কিছু দিন ধরে মহড়া দিয়ে গেছে। বাইরে থেকে কিছু শিল্পীর সঙ্গে তারাও অংশ নিয়েছে। ভিপি সাহেবকে এই সব কিছুর উৎসাহদাতা (পেট্রন) হিসেবে থাকতে হতো। নাইট স্কুলের কাজ, তাদের পুরস্কার বিতরণী সভা, যাত্রা পালার মহড়ার আয়োজন, তারপর এর চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক পরিবেশন সব কিছুতে প্রধান অতিথি হিসেবে মাঝখানে আমাকে ছাড়া চলেনা। সেই সূত্রে তাদের অনেকের জীবন সম্পর্কে জানতে পারলাম—যা সাধারণত হতোনা।

ভিপিকে ছাত্রদের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজক-সংগঠক হিসেবেও প্রধান ভূমিকা রাখতে হতো। সে আমলে ছাত্রদের পাঠ্য বহির্ভূত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল হল, পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক তেমন কিছু হতোনা বল্লেই চলে। হয়তো সব ভিপি এসবে উৎসাহ নিতোনা—অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় সম্পাদকই মুখ্য ভূমিকা নিতো। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সম্পাদক ছাড়া অন্য সব বিভাগীয় সম্পাদক সব কিছু আয়োজনে আমার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ক্ষমতার উপরই প্রধানত নির্ভর করলো। তাই এসবেও যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছে—তবে নিজের আইডিয়াগুলোকে অন্যরা মূল্য দিতে দেখলে এবং একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করতে পারলে বেশ আনন্দও হতো বৈকি। এসব করতে গিয়ে শিল্পী, কুশলী, বিদগ্ধ জন সবার কাছাকাছি আসতে পেরেছি। মনে পড়ে হলে এমনি একটি সাহিত্য সভা আয়োজন করতে গিয়ে প্রথম কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। তখন তিনি টগবগে তরুণ কবি। সংসদের অফিসে আরো কয়েকজনের সঙ্গে বসে অনেক্ষণ আলাপ হয়েছিল। হলে আসার পরেই তাঁর কবিতার স্বাদ প্রথম পেয়েছিলাম—'রৌদ্র করোটিতে' এবং 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এই দুটি বই থেকে। তাঁর একটি কবিতা 'তিনশ'টাকার আমি' দারুণ মুগ্ধ করেছিল

আমাকে—বিশেষ করে এর শেষ পংক্তিটি 'হরলিক্স মিল্ক আর হাক্সলির নয়া বই কিনে, সাধের মানব জন্ম ধন্য করি তবু কোনোমতে'। ওই তরুণ কবিকে আমারই আয়োজিত একটি সভা উপলক্ষে এভাবে একান্তে পেয়ে খুব ভাল লেগেছিল।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে প্রধান বক্তা হিসেবে পেয়েছিলাম কাজী মোতাহার হোসেনকে। তিনি তখন মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন। যথেষ্ট বয়স হলেও তখনো শরীর শক্ত, প্রচুর হাঁটতে ভালবাসেন। বিজ্ঞান সাময়িকীর সুবাদে তাঁর সেগুন বাগিচার বাসায় দু'একবার গিয়েছি। আমি গিয়ে দাওয়াত করে এলাম। অনুষ্ঠানের দিন তাঁকে আনতে যাকে পাঠালাম সে গিয়ে তাঁকে পেলনা, কারণ তিনি ইতোমধ্যেই হেঁটে রওয়ানা হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি কখনো স্মৃতি চারণ করলেন, কখনো আবৃত্তি করলেন, দু'একবার রবীন্দ্র সংগীতের কিছু অংশ কথা প্রসঙ্গে গেয়েও শোনালেন—সবই খুব আবেগ দিয়ে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের উজ্জ্বলতম বাতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন।

ভিপিগিরির আর একটি রূপ ছিল যে কোন জন-প্রতিনিধির ভাবসাবের মত—সে ইউনিয়ন কাউন্সিলেরই থেকে আর আইন সভারই হোক। অভাব-অভিযোগ শোনা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ঝগড়ায় মিটমাট করা পর্যন্ত কিছুই বাদ যেতোনা এই ক্ষেত্রে। এই যেমন একবার আলমগীর কবীর আর পারভেজের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। ওরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, ঝগড়াটি চরমে গিয়ে পৌঁছলো। অন্যরা থামাতে না পেরে আমার শরণাপন্ন হলো—ভিপি হিসেবেও, উভয়ের অগ্রজ প্রতিম বন্ধু হিসেবেও বটে। জড়াতে হলো তাদের ব্যক্তিগত নানা মান-অভিমানের সঙ্গে, সফলও হলাম। ভিপি'র সাইনবোর্ড শোভিত আমার রুমটিতে নানা মানুষের আনাগোনা সব সময় ছিল। হলের কর্মচারী সহ কারো কারো অভাব অভিযোগ যেগুলো আসতো তার অনেকগুলো হয়তো সম্পূর্ণ আমার আওতায় নেই। তারপরও ভিপি মনোযোগ দিলে, বা এটি নিয়ে এগিয়ে গেলে অন্যরা একটু নড়েচড়ে বসতো। অনেক কিছু এমন হতো যে একজনের কথা শুনলে, অন্য কারো স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। সবাইকে খুশি রাখা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। প্রায়শ এতে দলের বিষয় চলে আসতো। আমার ছিল বহুমুখী সংকট। আমি এপসু থেকে নির্বাচিত ভিপি, কিন্তু কাজ করতে হয় সংসদে এনএসএফের সদস্যদের সঙ্গেও; এপসু নিজেও এখন মেনন গ্রুপ আর মতিয়া গ্রুপে বিভক্ত—হল নির্বাচনের পর বিভক্তি ও পরস্পর দ্বন্দ্ব ক্রমে বেড়ে উঠছিল। হলের শান্তির ও সৌজন্যের স্বার্থে ছোটখাট বিরোধগুলোকে বাড়তে না দেয়ার চেষ্টা করতে হতো। তাতেও সব সময় শেষ রক্ষা হতো না, সমালোচনা শুনতে হতো। তবে তা কখনো সৌজন্যের সীমা ছাড়াতোনা বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেতোনা। একবার কেউ একটি বেনামী চিঠি আমার রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে দেখলাম, তাতে লেখা শুধু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য—'মিস্টার ভাইস প্রেসিডেন্ট, টু-গুড ইজ নো গুড'।

সাধারণ ভাবে ছাত্রদের যেরকম ভালবাসা আর সম্মান আমি পেয়েছি তাকে অভাবনীয় মনে হয়। অনেকেই 'আওয়ার ভিপি' বলতে উচ্ছ্বসিত ছিল। মজার ব্যাপার হলো সেদিনের এই সম্পর্ক অনেকে বহু কাল মনে রেখেছে। তখন থেকে বহুকাল পরে মাঝবয়সী আমি ঢাকা বিমান বন্দরে কাষ্টম-ইমিগ্রেশন ঘেরাও এর অভ্যন্তরে খুব সম্ভব বিমান থেকে মাল নামেনি বলে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করছি। এমন সময় একজন সিনিয়র কাষ্টম কর্মকর্তা আমাকে দেখে এসে উজ্জ্বল হাসি হেসে জড়িয়ে ধরলেন। বল্‌লেন 'ইউ মে হ্যাভ ফরগটেন, ইউ ওয়্যার মাই ভিপি; মাই রুম অ্যান্ড মাই হার্ট ওয়্যার ভেরি ক্লোজ টু ইউরস'। তিনি আসলে সিএসএস এ কাষ্টম সার্ভিস পেয়ে এই মুহূর্তে বিমান বন্দরে বড় কর্তা। বাকি সময় তাঁর কক্ষে খানাপিনা, গল্প ও মালপত্র বুঝে নেবার কাজে ব্যয় হলো। এ রকম ঘটনা সারা জীবন বার বার ঘটেছে। মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হয়েছে সলিমুল্লাহ হলের বহু বছরের ছাত্ররা সবাই যেন আমার অন্তরঙ্গ—বয়সে অনেক বড়রাও, অনেক ছোটরাও। আর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ যেখানেই যাই সেখানে তারাই সর্বেসর্বা। এই যে পরিচিতি এটি পরবর্তী কালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চালাতে আমার কী যে সহায়ক হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

সলিমুল্লাহ হলের ভিপি'র আর এক রূপ ছিল, অনেকটা পদাধিকার বলেই ঢাকা শহরের গণ্যমান্যদের একজন, যদিও অন্য সব সম্মানিত নাগরিকদের থেকে বয়সে অনেক তরুণ। নানা রকম সামাজিক কাজে, অনুষ্ঠানে, বিদগ্ধ জনের সমাবেশে একটি দাওয়াত অবধারিত ভাবে পেতাম। প্রতিদিন সংসদের বার্তাবহ এসে বেশ কিছু চিঠির একটি বাণ্ডিল রুমে দিয়ে যেত—যার অধিকাংশই হতো এরকম দাওয়াত পত্র। স্বাভাবিক কারণেই সবগুলোতে যাওয়া হতোনা। বেছে বেছে যেগুলোতে যেতাম তার অনেকগুলো সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নাগরিক জীবনের এক একটি দিক উন্মোচন করতো। কিছু কিছুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িতও হয়ে যেতাম; হলের দিক থেকে, আমার দিক থেকে তাদের সঙ্গে কিছু করার থাকলে সেটি করার চেষ্টা করতাম। যেমন একবার এভাবে অন্ধ কল্যাণ সমিতির বিশেষ অনুরোধে তাদের স্কুলে গেলাম। গিয়ে তাদের প্রচেষ্টা—বিশেষ করে ব্রেইলিতে বই ইত্যাদি তৈরি, অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হলাম, এদের কয়েক জনের সাহসী অগ্রসরমানতা দেখেও। এরপর ওদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন হলে এসেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। আমি হলের ছাত্রদের কাছে তাঁদের কাজ তুলে ধরার, ছাত্রদের থেকে স্বেচ্ছাসেবক পাওয়ার ইত্যাদি কাজের কিছু চেষ্টা সংসদ থেকে করেছি। এমনিতরো যোগাযোগ আমার জন্যও চোখ খুলে যাওয়ার মত ব্যাপার হতো। বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটির মতো তখন খুবই সীমিত সংখ্যক পণ্ডিতদের আসরেও এভাবে যাওয়ার ও অংশগ্রহণের সুযোগ হতো।

আরো এক ভাবে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হতো। কখনো কখনো আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখে করতে আসতো। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিনিধি যেমন থাকতো, আবার তার বাইরেরও থাকতো। কখনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও থাকতো—যেমন কোন নতুন ক্রীড়া টুর্নামেন্টের আয়োজনের প্রস্তাব। আমেরিকার কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস গভর্নমেন্টের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো। তাদেরকে আমরা খুব সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলাম। ওদের ছাত্র সংসদ ও আমাদের সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছিলো। এরকম বিভিন্ন কাজের জন্য প্রায় দিনই কিছুক্ষণ সময় সংসদ অফিসে কাটাতে হতো।

ভিপি হবার পর একটি বিষয় গুরুজন স্থানীয় অনেকে অনুযোগের সুরে বলতেন তা হলো সলিমুল্লাহ হলের ভিপি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আমি সিএসএস পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিনা কেন? ভাল রেজাল্ট, নানা বিষয়ে আগ্রহ ও জ্ঞান, তার সঙ্গে এই ভিপিগিরি—এতো শিওর সাকসেস। ভাবখানা এমন যেন সিএসপিই যদি না হতে চাইবো তবে এত কান্ড করে সলিমুল্লাহ হলের ভিপি হতে গেলাম কেন? বরাবর এই পদটিকে সিএসপি হবার পক্ষে একটি বড় সিঁড়ি হিসেবে মনে করা হয়ে এসেছে। ভাবতাম সলিমুল্লাহ হলে এমনিতেও তো সিএসপি হওয়ার মতো ছেলেরাই আসে, আর ভিপি নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে ওই রকম গুণগুলোর কথা মনে রাখা হয়—তাই ব্যাপারটি কাকতলীয়। কিন্তু পরে দেখেছি ভিপিগিরির যে অভিজ্ঞতা তাকে অনায়াসে একজন সুপেরিয়র সার্ভিস অফিসার তৈরির ড্রেস রিহার্সেল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সে জন্য বোধ হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিএসএস পরীক্ষকরা তাদেরকে একটু এগিয়ে রাখতো। যেই গুরুজন-স্থানীয়রা সিএসএস পরীক্ষা সম্পর্কে আমার নির্লিপ্ততা দেখে একটু বিরক্ত হতেন, বিস্ময়করভাবে তাদের একজন ছিলেন আমাদের প্রভোস্ট প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমেদ। তিনি রসায়নের একজন নিষ্ঠাবান ও সফল অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও এসময় বহুবার আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে আমার এ সিদ্ধান্তটি ভুল।

আইয়ুব-মোনেমের রাজনীতি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল রকমের হস্তক্ষেপ শুরু করেছিলো। তার উপর একটি অনুগত ছাত্র দল এনএসএফকে ব্যবহার করতে পারাতে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপরের দিকে থাকা অধ্যাপকদের অনেকেই এই ব্যাপারে খোলাখুলি সহযোগিতা করাতে, এর মাত্রা বেড়ে চলছিলো। হস্তক্ষেপের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যের বিষয়ের উপর। আইয়ুব খান, তাঁর গভর্নর মোনেম খান, এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশে তাঁর বেশ কিছু মন্ত্রীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে রাজনীতিতে এই যে আইয়ুব বিরোধী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—তার একটি কারণ পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-ঘেঁষা সংস্কৃতি। কিছু পরে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে আইয়ুব খান একথা খোলাখুলি লিখেছেন। সে জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামী ভাবধারা

আনার জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাও নেয়া হয় মোটামুটি গণমান্য কিছু সাহিত্যিক, লেখক, সংস্কৃতিবিদদের মাধ্যমেই। এজন্য 'পাকিস্তান কাউন্সিল', 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্ষ্ট্রাকশন (বিএনআর), লেখক সংঘ (রাইটার্স গিল্ড), 'নজরুল একাডেমি' ইত্যাদি কিছু বেশ অর্থপুষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়—ঐ অনুগত বুদ্ধিজীবীদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য। এর একটি দিক ছিল রবীন্দ্র সাহিত্যকে হিন্দুয়ানিতে আকীর্ণ এবং বিজাতীয় বলে বর্জনীয় এবং নজরুল সাহিত্যকে পাক্কা ইসলামী বলে প্রতিপন্ন করা। বায়ান্নোর এত দিন পরেও আইয়ুব ও তাঁর অনুগত কেউ কেউ বাংলাকে রোমান হরফে লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। এর প্রায় সবটাই যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিলো, এবং ওই সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাজকর্ম অনেকটাই যে উপহাস ভরে দেখা হতো—আইয়ুব-মোনেমের পক্ষের মানুষরা সেটি খুব একটা লক্ষ্য করতেন না। যেমন ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকন্ষ্ট্রাকশনকে সবাই বলতো 'জাতীয় মেরামত কমিটি'। তা সত্ত্বেও এসবের হোতারা ভেতরে বা বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক সংস্কৃতি চর্চায় অনর্থক কর্তৃপক্ষীয় টানা হ্যাঁচড়ার সৃষ্টি করতো। ভরা মার্শাল ল'র সময়ে ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম কলেজে বার্ষিকী 'অন্বেষা' সম্পাদনার সময় যেমন অধ্যক্ষ এবং আরো কেউ কেউ রবীন্দ্র-বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিলেন, এখনো মার্শাল ল' ছাড়াই সে চেষ্টা চলছিলো। হয়তো সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট এবং অন্য কেউ কেউ মনে করতেন যে হলে এ সবের দায়িত্বে তো এখন এনএসএফের নির্বাচিত সদস্য (সংস্কৃতি সম্পাদক) রয়েছে, তারপরও এখানে রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে কেন, রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া হবে কেন, বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি এভাবে উদ্‌যাপিত হবে কেন—ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা জানতেননা যে এনএসএফ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা নিজেরাও সত্যি সত্যি এসবের বিরোধী ছিলনা বরং তাদের সঙ্গে মিলে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিতে আমার মোটেই তেমন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় খিটিমিটি সব সময় চলেছেই। ভিসি ওসমান গণিকে অভিষেকের সময় না এনে আমরা জিতেছিলাম ঠিকই, কিন্তু ভিসিকে সম্পূর্ণ বাইরে রেখে হল সংসদের কাজ চালাতে গিয়ে, বা হলের উন্নয়নের কাজে হল সংসদের ভূমিকা রাখতে গিয়ে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছিল। ভাল দিক হলো যে আমাদের প্রভোস্ট এই ব্যাপারে একেবারে জিহাদী মনের ছিলেননা বা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে পুরো নিমজ্জিত ছিলেন না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক না কেন তিনি বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন, এবং আমার ও এপসুর সঙ্গে একটি কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইতেন। আমাদের হলের এপসুর নেতৃত্বকেও তাঁর সঙ্গে নরমে গরমে সামাল দিতে হতো। আনোয়ারুল্লাহ (এপসু সভাপতি), কাদের (এপসু সম্পাদক), এবং অন্যান্য অনেকে নিজেদের মধ্যে তাঁকে 'মফিজ ভাই' ডাকতো। যে কোন নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গে পেতাম, যদিও তিনি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের একজন

ছিলেন। হলে আমার দায়িত্ব পালনের একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্র জন্মদিনে রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছি খুব ভোরে; অনুষ্ঠান স্থলের কাছাকাছি যেতে প্রভোস্ট মফিজ স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিলেন যে প্রাতঃভ্রমণের জন্য তিনি রোজ ভোরেই এখানে আসেন, সেই কারণেই এসেছেন।

ভিপিগিরিতে সাংগঠনিক দায়িত্ব, আমলা-ধরনের দায়িত্ব, জন সংযোগের দায়িত্ব ইত্যাদি যতই থাকুক, সলিমুল্লাহ হলের ভিপি শেষ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতিরই একটি অংশ, তা তিনি রাজনীতিতে যতই মাঠে থাকুন বা না থাকুন। আমার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিলনা। আমার ভিপিগিরির সময়ে তোলপাড় করা কোন ছাত্র আন্দোলন হয়নি, যাতে আমাকে নেতৃত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিলো যাতে নিজের মতামত দিতে হয়েছে, বক্তৃতা করতে হয়েছে, অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে হয়েছে—অন্তত এপসুর নীতি নির্ধারণে।

ভিপি জীবনে ছাত্র রাজনীতি

আমার ভিপি থাকার সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে কয়েকটি বড় মোড় পরিবর্তন হয়েছিল যার ফলে এপসু' নেতৃত্বকে এবং সাধারণ ভাবে বামপন্থী নেতৃত্বকে তাদের নীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। এপসু পর্যায়ে এ সম্পর্কে সভা সমিতিতে একেবারে নীরব দর্শক থাকা সলিমুল্লাহ হলের ভিপি'র পক্ষে সম্ভব ছিলনা। মনে রাখতে হবে যে এ সময় বাম দলগুলো এবং এপসু নিজে মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, এবং আমি এই শেষোক্তদের দলের সঙ্গেই ছিলাম। সলিমুল্লাহ হলের এপসু সংগঠনটিও এই দলেই ছিল। আমাদের নির্বাচনের পরে পরে বড় ঘটনা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দুতিয়ালিতে তারই মাটিতে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসানের জন্য চুক্তি সম্পাদন। সেপ্টম্বর যুদ্ধের (১৯৬৫) পর থেকে এই পর্যন্ত উভয় দেশ অপরের বিস্তীর্ন ভূমি ও জনপদ নিজেদের সামরিক দখলে রেখে দিয়েছিলো। ১৯৬৬ এর জানুয়ারিতে এই তাসখন্দ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন আইয়ুব খান তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টোকে নিয়ে, এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিংকে নিয়ে। মধ্যস্থতা করছিলেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল এই শান্তি আলোচনায়। কয়েকদিনের আলোচনার পর জানুয়ারির (১৯৬৬) ১০ তারিখ যে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তাকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটি বিরাট ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আইয়ুব খান যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন পাকিস্তানের তথাকথিত সামরিক প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে সামরিক ভাবেই কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে এবং সেই ভাবে দেশে নিজের স্থানটিকে

পাকা পোক্ত করে নিতে। কিন্তু যুদ্ধে প্রচণ্ড রকম জানমালের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তাসখন্দ চুক্তিতে পাকিস্তানকে আবার কাশ্মীরে সেই পুরোনো যুদ্ধবিরতি লাইনে ফিরে আসতে স্বীকৃত হতে হলো—কারণ তার নিজের অনেক ভূমি তখন ভারতের দখলে। ৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যে উভয় সেনাবাহিনী যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় যার যার সীমানার মধ্যে ফেরত চলে আসবে ও সকল যুদ্ধবন্দী বিনিময় করবে। যদিও তখন ওভাবে বলা হয় নি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ওটি ছিল পাকিস্তানের পরাজয়।

১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর হবার পরের দিন ওই তাসখন্দেই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ হার্ট অ্যাট্যাকে মারা গেলেন। তাঁর শব বহনে শামিল কোসিগিন ও আইয়ুব খানের ঐতিহাসিক ছবি আমরা পরে পত্রিকায় দেখলাম। তাসখন্দ চুক্তির ফলে পাকিস্তানে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে, যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো তার পূর্ণ সুযোগ নিলেন ভুট্টো। তিনি এমন ভাব করলেন যেন এ চুক্তিতে তাঁর সায় ছিলনা; সরকারে থেকেও তিনি আইয়ুবের ভারত-নীতির বিরোধিতা করতে লাগলেন এবং জুন মাসে পদত্যাগ করলেন। এরপর তাঁর আইয়ুব বিরোধী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় গঠন করলেন পাকিস্তান পিপল'স পার্টি। পূর্বে ও পশ্চিমে এক সঙ্গে গণ-বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আইয়ুবশাহী এই প্রথমবার মনে হয় সত্যিকারের বেকায়দায় পড়লো। তারই ফলশ্রুতিতে সরকারের পররাষ্ট্র নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল এ সময়।

এই নতুন পররাষ্ট্রনীতি মার্কিনমুখীতা বাদ দিয়ে ক্রমাগত চীনমুখী হয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রতিরক্ষা সহায়তা হারিয়ে এখন সেটি চীনের থেকে সমরাস্ত্র কেনার মাধ্যমেই পূরণ করছিল। মনে রাখতে হবে ১৯৬২ সনে সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিকানা নিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত অপমানজনক ভাবে পরাজিত হয়েছিলো। চীন অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে গেলেও উভয়ের দাবি করা এই বিরাট অঞ্চল নিয়ে চীন-ভারত শত্রুতা রীতিমত বজায় ছিলো। অন্য দিকে পাকিস্তান তার নতুন চীনমুখী নীতির কারণে চীনের সঙ্গে তার নিজের সীমান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটিয়ে ফেলেছিলো। এপসু বিভক্ত হবার পর এর চীনপন্থী অংশ সরকারের এই চীনমুখী নীতিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছিলো—ফলে তার পক্ষে দেশীয় রাজনীতিতে আইয়ুব বিরোধিতা আর ভূ-রাজনীতিতে চীনপন্থী হওয়ার মধ্যে কিছুটা টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিলো বৈ কি।

আমার ভিপিগিরির বছরটি এবং তার পরও বহুদিন পিকিংপন্থী এপসুর সদস্যদের উৎসুক দৃষ্টি ছিল চীনের অভাবনীয় কিছু ঘটনার উপর, যার কেন্দ্রে ছিল ওখানকার তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। এনিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের কোন সীমা ছিলনা। ছেষট্টি সালের মাঝামাঝিতে গিয়ে মাও সেতুঙের মনে হয়েছিলো যে চীনের অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতার দায় তাঁর উপর দেবার ছলে সরকারের উচ্চ পদে আসীনরা তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করছে। এ ধারণা থেকে মাও-সমর্থক তরুণরা বড় অক্ষরের নানা পোস্টারের (বিগ্ কারেক্টার পোস্টার)

মাধ্যমে বিক্ষোভ জানায়, নানা জায়গায় প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সরকারের প্রধান পদে আসীন লিউ শাও চি, এবং কর্তৃত্বে থাকা অন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতা দেং শিয়াও পিং তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরকম নিবৃত্ত করাতে যে মাওয়ের সায় ছিলনা তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন উহান শহরে চলে গিয়ে এই ৭২ বছর বয়সে সেখানে খরস্রোতা ইয়াংসি নদীতে সাঁতরিয়ে। মাওপন্থী ক্ষিপ্ত তরুণ তুর্কীরা এখন নিজেদেরকে রেড গার্ড পরিচয় দিয়ে মাওকে নতুন বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান জানালো। মাওয়ের উত্তর দিলেন নিজেই একটি বড় অক্ষরের পোস্টার লিখে—'হেডকোয়ার্টারে কামান দাগো' ('বোমবার্ড দি হেডকোয়ার্টার')। অর্থাৎ তিনি দল ও রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে আসীনদের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেই নিজের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে বুর্জোয়াতে পরিণত হবার অপবাদ দিয়ে তাদের প্রতি আঙুল নির্দেশ করলেন। এভাবে উৎসাহিত রেড গার্ডদের প্রবল আন্দোলনের ফলে দ্রুত লিউ এবং দেং এর পতন হলো, উত্থান ঘটলো আন্দোলনে উৎসাহদাতা লিন পিয়াওয়ের। এই লিন পিয়াও আরো ব্যাপক আকারে পরিবর্তনের আয়োজন করলেন ওই রেড গার্ডদের মাধ্যমে; এবং ধীরে ধীরে নিজকে মাওয়ের উত্তরাধিকারীর আসনে নিয়ে গেলেন। মাও এবং লিনের লক্ষ্য হলো চীনা সমাজের খোল নলচে আরো ভাল করে পরিবর্তিত করে পরিপূর্ণ সমাজবাদী চিন্তাচেতনায় নিয়ে আসা।

আমরা এপসুর ছেলেরা এই রেডগার্ডদের কাজ কারবার রুদ্ধ শ্বাসে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তাদের পীড়াপীড়িতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি 'সর্বহারাদের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' (দি গ্রেট প্রোলেতেরিয়ান কালচারাল রেভোলুশন) ঘোষণা দেয়, আর লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী চীনের শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে চড়াও হয়—প্রশাসন ও অর্থনীতি তো বটেই, শিক্ষা, আর্ট, সাহিত্য সব কিছুতে বর্তমান ধারক বাহকদের টেনে নামিয়ে প্রোলেতেরিয়ান বিপ্লব আনবে বলে। তারা সোচ্চার হলো 'চার পুরোনোর' বিরুদ্ধে—পুরোনো রীতি, পুরোনো কালচার, পুরোনো অভ্যাস, পুরোনো ধারণা; লিন পিয়াও সামনে থেকে এর নেতৃত্ব দিলেন। শুধু পিকিঙের তিয়ান আন মান স্কোয়ারেই ১০ লক্ষ রেড গার্ড সমাবেশ করলো। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ওরা 'পুরোনোদের' আক্রমণ করলো—পুরোনো স্মৃতি চিহ্ন, কনফুসিয়ান মন্দির, নরমপন্থী গুরুজন, সবাই তাদের আক্রমণের শিকার হলো। স্থানীয় পার্টি নেতা, কর্মকর্তা এরাতো আক্রমণের মুখে পড়লোই, নিজেদের বাবা-মা-শিক্ষক ওরাও বাদ গেলোনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপমান করা, নিজেদেরকে বুর্জোয়া মনোভাবপন্ন বলে স্বীকার করে অনুতপ্ত হতে বাধ্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, এর থেকেও বড় জবরদস্তির ঘটনাও কম ঘটছিলোনা, বেশ কিছু মানুষ আহত-নিহতও হচ্ছিলো। আমরা ঢাকার তাত্ত্বিকরা অবশ্য একে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে এসবে তেমন বিচলিত বোধ করছিলামনা।

লিন পিয়াও রেড গার্ডদের সবাই পড়ার জন্য এবং সর্বত্র হাতে নিয়ে দোলানোর জন্য মাও সেতুঙের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্বৃতিসহ ছোট্ট লাল বই 'লিটল রেড বুকের' ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এই বইয়ের ৩৫ কোটি কপি ছাপানো হয়েছিলো। আমাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিলো ইংরেজি সংস্করণে এই লিটল রেড বুক। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে এত কথাবার্তা হয়েছিলো যে অনেক উদ্বৃতি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। এখানে মজার ব্যাপার ঘটালেন আইয়ুব খান অথবা তাঁর চ্যালাচামুণ্ডদের কেউ কেউ। তাঁরা ঠিক ওই আকারের 'লিটল গ্রিন বুক' আইয়ুব খানের নানা উদ্বৃতি দিয়ে হাজার হাজার কপি সর্বত্র বিতরণ করলেন। তবে একে কেউ চীনা বইটির ক্যারিকেচার ছাড়া আর কিছু ভাবেনি।

প্রথম দু'এক বছরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেই নেহাত তরুণ তরুণী, বালক বালিকারা চীনা সমাজটিকে এক্কেবারে ওলট পালট করে দেবার উপক্রম করেছিলো—ভেঙ্গে ফেলেছিলো বলতে গেলে সব রকম প্রতিষ্ঠান; মাও তাতে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়ে রাখায় তাঁর নিজের সরকার এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছিলোনা। অবশেষে এর ধাক্কা যখন চীনা সেনাবাহিনী গণ-মুক্তি ফৌজের উপর গিয়ে পড়লো তখন মনে হলো কিছুটা সম্বিত ফিরলো, রেড গার্ডদের ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। এর মধ্যে লিন পিয়াও নিজেই নাকি মাওয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাশিয়ায় পালানোর পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান (!)। তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সত্যি সত্যি শেষ হয়েছিলো মাও সেতুং মারা যাবার পর (১৯৭৬)। দেং শিয়াও পিং আবার ক্ষমতায় ফিরে এসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সব চেয়ে উগ্র কাজগুলোর জন্য দায়ী 'চার কুচক্রীকে' (গ্যাং অব ফোর) শাস্তি দিয়েছিলেন, যার একজন ছিলেন মাওয়ের স্ত্রী; এবং মাওকে সব কিছুর উর্ধ্বে সম্মানের আসনে রেখেও আজকের আধুনিক বাজার অর্থনীতির চীনের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

১৯৬৫ এর ডিসেম্বরে আমরা সলিমুল্লাহ হলে নির্বাচিত হয়েছিলাম। এর পরপর ১৯৬৬ এর জানুয়ারিতে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। কয়েক দিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো সেটি আওয়ামী লীগের দিক থেকে, আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে এই দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দিক থেকে। ফেব্রুয়ারির একেবারে প্রথম দিকে লাহোরে সব বিরোধী দলগুলোর সর্বদলীয় সম্মেলন বসেছিল নতুন পরিস্থিতিতে আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির কর্মপন্থা ঠিক করতে। সেখানে শেখ মুজিব ছয়দফা পরিকল্পনা পেশ করেন—সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র—এই দুই দফতর রেখে বাকি সব প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। দুই প্রদেশের জন্য পরস্পর বিনিময়যোগ্য দুটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে; সেটি না হলে একই মুদ্রা রেখেও দুই প্রদেশের একটি থেকে অন্যটিতে পুঁজি চলে যাওয়া রোধ করা হবে।

ব্যাংক রিজার্ভ এবং কর ও মুদ্রা নীতি দুই প্রদেশে পৃথক হবে। প্রদেশরাই কর সংগ্রহ করার মালিক হবে, এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রাপ্য অংশ পাবে। বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসেবে রাখা হবে, প্রদেশ নিজে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। পূর্ব পাকিস্তান একটি আধা সামরিক বাহিনী রাখতে পারবে। অকস্মাৎ আসা এই ধরনের একটি প্রস্তাবে সবাই বিস্মিত হলেও ওই সম্মেলনে উপস্থিত বা তার বাইরের বিভিন্ন দলের নেতারা একে মোটেই গুরুত্ব দিতে রাজি হননি—বরং একে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার বা প্রাদেশিকতার একটি নগ্ন প্রকাশ এবং পাকিস্তানের মূল ধারণার বিরোধী আখ্যায়িত করে পত্রপাঠ নাকচ করে দেন। একদিকে ডানপন্থী ধর্মীয় দলগুলো থেকে শুরু করে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, বামপন্থী ন্যাপ সবাই এই একই প্রতিক্রিয়া দেখায়—অবশ্য এক এক দল এক এক কারণকে গুরুত্ব দিয়ে। শেখ মুজিব পরে ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ লাহোরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিরোধীদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করেন, ঢাকায় ফিরে তাঁর নিজের দল এবং অন্যান্য দলের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রচারকার্য শুরু করেন। নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে পাকিস্তান আওয়ামী লীগে তো বটেই, খোদ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগেও এর বিরোধীরা ছিল। কিন্তু এ বছর ১৮-২০ মার্চের কাউন্সিল সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবকে সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পুনর্গঠিত হয়, এবং ছয়দফা এ দলের কার্যক্রমে পরিণত হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে শুরু করে এই ছয়দফা দাবি ক্রমে একটি আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ৭ই জুন ডাকা হরতাল ও বিক্ষোভে তুঙ্গে উঠে।

আমাদের এপসুর দৃষ্টিতে পুরো বিষয়টি ছিল যথেষ্ট বিস্ময়কর, এবং অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন। ১৯৬৬ সালের সেই ফেব্রুয়ারিতে ছয়দফা দেবার আগে পর্যন্ত সবাই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবির পুরোধা হিসেবে মাওলানা ভাসানীকে এবং তাঁর দল ন্যাপকেই মনে করতো। আওয়ামী লীগের নেতা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পঁচানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়ে গেছে দাবি করেছিলেন যেটি তাঁর দলের ভাসানীপন্থীরা মেনে নিতে পারেননি, তাই তাঁরা কাগমারি সম্মেলনে এ নিয়ে জোর দাবি তুলেছিলেন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির দাবির সঙ্গে। ভাসানী ওই সম্মেলনেই প্রথম হুমকি দিয়েছিলেন যে নইলে পূর্ব পাকিস্তান আস্‌সালাম আলাইকুম বলতে বাধ্য হবে। এ সম্মেলনের কিছু পরে এসব প্রশ্নেই আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাপ গঠিত হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরেও দেখেছি যে ছাত্রদের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পুরোধা ছিল এপসু, ছাত্র লীগ নয়। হলে নতুন আসার সময় আমাকে সেই যে ছাত্র লীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানেও দীর্ঘ আলাপের কোথাও ছাত্র লীগের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কোন নীতি বা আন্দোলনের কথা তিনি বলেননি। বরং গণতন্ত্র, বাম ও ডানের মধ্যে মধ্যপন্থা ইত্যাদির কথাই

তিনি বলেছিলেন। হলের নির্বাচনগুলোতে ছাত্র লীগের প্লাটফরমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অনেক কথা থাকতো, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বাড়াতে হবে সে কথার উপর কখনো জোর দিতে শুনিনি। বাঙালি সংস্কৃতির প্রশ্নেও তখন এপসু এবং তার অঙ্গসংগঠন সংস্কৃতি সংসদ ছিল শেষ কথা—এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে সব চেয়ে অগ্রণী। বিরোধী মহলে এপসু'র সমালোচনা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মূলমন্ত্র, ইসলামী ভাবধারা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতা ও হিন্দু প্রভাবিত সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মস্কো ও পিকিং এর হুকুম বরদারী করা নিয়ে। আর ছাত্র লীগকে বিরোধীরা সমালোচনা করতো মার্কিনী তল্পিবাহক হিসেবে, এবং মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হলেও এসব ব্যাপারে সুবিধাবাদী বক্তব্যের অভিযোগ এনে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের নির্বাচনের সময় প্লাটফরম সভাগুলোতে মূসা আহমদের সেই কীর্তনেও ছাত্রলীগের প্রতি কটাক্ষ করে বলা হতো 'আমার ডানে মার্কিনী'—অন্তত ছাত্র লীগ এমনি একটি পরিচয়ই বহন করতো। তার 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো' শ্লোগানটি এসেছে হঠাৎ করে ছয়দফা দেয়ার পর, তার আগে নয়।

এই শ্লোগান এবং ছয়দফার বিষয়ে সবার মধ্যে দ্রুত আগ্রহ বৃদ্ধি এপসুকে বেশ একটু চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। এপসুর সমর্থন ন্যাপ প্রভৃতি যে সব জাতীয় দলের দিকে—তারাও ছয়দফাকে খুব ইতিবাচক হিসেবে নেয়নি। ন্যাপের প্রতিক্রিয়া হলো ছয়দফায় গণমানুষের কথা নেই—বরং কেন্দ্রীয় পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রের বদলে প্রাদেশিক পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতায়িত করাটিই এর লক্ষ্য। এপসুতে আমরাও মোটামুটি এরকম একটি অবস্থান নিলেও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ছয়দফার আকর্ষণটিকে মোটেই উড়িয়ে দিতে পারছিলামনা। তাই আমরা যেটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম তা হলো 'বাঙালি জাগো' এটি আমাদেরও স্বপ্ন—এজন্য পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই প্রয়োজন। তবে একই সঙ্গে 'জাগো জাগো, জনতা জাগো' শ্লোগান দিয়ে আমরা ওই স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেও নিপীড়িত জনতার অধিকারের কথাকে জোরদার করতে চাই। স্বায়ত্তশাসন সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই এপসু'র বড় দাবি, ছয়দফাতেই সেটি সর্বোত্তম বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তা আরো বিবেচনা সাপেক্ষ, তবে গণমানুষের ভাত-কাপড়ের অধিকার ও সমাজবাদের কথা বাদ দিয়ে শুধু স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্থহীন।

ছয়দফা প্রশ্নে এপসু'র অবস্থান নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেও তর্কবিতর্ক কম হচ্ছিলনা। এই প্রশ্নে চলমান আন্দোলনে আমাদের সক্রিয় থাকাটি জরুরি ছিল, কারণ গণতন্ত্রের পথে, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে তখন এটিই যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করছিল। কিন্তু আন্দোলনে থাকাটি কীভাবে, কী শর্তে, কতখানি তা স্থির করা প্রয়োজন ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের মেনন গ্রুপ এপসুর 'কম্যুনে' এ গিয়ে আলোচনায় শরিক হয়েছি। আমরা নিজেদের মধ্যে রসিকতা করে কম্যুন বলতাম

কাজী জাফর আহমদের বাসাকে, শব্দটি ১৮৭১ সালের প্যারিসের বামপন্থী বিদ্রোহীদের স্থাপিত 'প্যারিস কম্যুন' থেকে এসেছিলো।

ওই সময় আমাদের মধ্যে, এবং বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও রাজনীতি সচেতন মানুষদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—তা হলো ছয়দফাটি মূলত কারা রচনা করছে। অবশ্যই এর প্রবক্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন শেখ মুজিব; কিন্তু তারপরেও এর উৎস নিয়ে নানা রকম কথা চালু ছিল। কেউ কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের কথা বলতেন, কেউ কিছু উচ্চ পদস্থ কয়েকজন বাঙালি আমলার কথা বলতেন, আবার কেউ কেউ দেশের বাইরের বুদ্ধিজীবীদের হাত আছে বলেও মনে করতেন। তবে বাঙালি সরকারী আমলাদের কাছে এটি যে তখন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেছিল, তা আমরা সলিমুল্লাহ হল থেকেই বেশ টের পেতাম। ১৯৬৬ এর জুলাই-আগস্টের দিকে আমি একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিলাম—বিশেষ করে এর উপজাতীয় অঞ্চলগুলি। এটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উপজাতীয় কাউন্সিলের আমন্ত্রণে; এবং এর প্রস্তুতি পর্বে ঢাকায় সচিবালয়ে কয়েকজন উচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। তাঁরা প্রত্যেকে আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যেন আমরা দৃঢ়ভাবে স্বায়ত্তশাসন ও ছয়দফার বিষয়গুলো সেখানে তুলে ধরি। তাঁদের ধারণা ছিল বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত ছোট অঞ্চলগুলোতে অনেকে এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। ওই ভ্রমণে আমি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ইসলামবাদেও গিয়েছিলাম। সেখানেও বাঙালি কর্মকর্তা যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সবার মধ্যে ছয়দফা নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছি।

এদিকে সলিমুল্লাহ হলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছয়দফা নিয়ে এপসু'র অবস্থানগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, আবার আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে দলের উপস্থিতি বড় রাখার চেষ্টা করেছি। গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে মাওলানা ভাসানীর ভূমিকা ও বক্তব্যকে যেখানে সেই স্বায়ত্তশাসনের সুফল আপমর বাঙালি জনগণের স্বার্থে যেমন তেমনি দেশের অন্য অংশের অবহেলিত জাতি গোষ্ঠীগুলোও ভোগ করতে পারে। কিন্তু এটিই তখন এপসুর একমাত্র সমস্যা ছিল না। আরো বড় সমস্যা সদ্য বিভক্ত এপসুর এই মেনন গ্রুপ যাতে মূল বিরাট সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে তার আদর্শটিকে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু সদ্য বিভাজনের তিক্ততা এখনো উভয় গ্রুপের মধ্যে দগদগে হয়ে বিরাজ করছিলো। গতকাল যারা হাত ধরাধরি করে আন্দোলন করেছে, এক সঙ্গে জেল খেটেছে, আজ সারাক্ষণ তারা একে অপরকে নানা রকম রাজনৈতিক কটুকাটব্য করছে—ভাবখানা এই যেন তারাই সব চেয়ে বড় শত্রু। আমাদের দলের কারো কারো মুখে নতুন নতুন শব্দ শোনলাম—তার একটি ছিল 'গ্যাড়া' এর অর্থ মতিয়া গ্রুপের যে কেউ। অপেক্ষাকৃত কম দেখা

হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন এপসু সমর্থকদের সঙ্গে দেখা হবার আগে জেনে নেবার চেষ্টা করতে হতো সে তখন কোন দলে—'গ্যাড়া' কিনা। আলোচনায় বক্তৃতায় তাদের সম্পর্কে সংশোধনবাদী, নব্য সাম্রাজ্যবাদী, বিপ্লবে আপোশকামী ইত্যাদি চোখা চোখা বিশেষণ ব্যবহার করা হতো। আসলে সুদূর মস্কোতে ক্রেমলিনের মহাশক্তিধরদের সব রকমের খারাপ কাজকে আমরা তখন আমাদের এই প্রাক্তন বন্ধুদেরও কীর্তি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম।

এসব নিয়ে উভয় পক্ষ যে কেমন সরব তা প্রথম দেখলাম ওই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিন। সলিমুল্লাহ হল সংসদের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের একটি নিয়ম-নীতি প্রতি বছরের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। খুব ভোরে একটি ঘণ্টা বাজানো হতো সবাইকে ঘুম থেকে তুলে প্রভাতফেরির জন্য আহ্বান জানাতে। এ সময় হলের চূড়ায় একটি কালো পতাকা তুলে দেয়া হতো। সংসদের বেয়ারা বাচ্চু মিয়া নিয়ম করে এ কাজগুলো সম্পাদন করতো। এ বছর প্রভাতফেরির নেতৃত্ব দেবার পালা ভিপি হিসেবে আমার। আমরা খালি পায়ে প্রভাতফেরির গান গাইতে গাইতে চলে গেলাম আজিমপুর কবরস্থানে—যেখানে পাশাপাশি ভাষা শহীদ আবুল বরকত ও সফিউর রহমানের কবর। তখনকার দিনে এই কবরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে নিয়েছিলো আজিমপুরের ছেলেদের একটি ক্লাব। এখানে এসে প্রভাতফেরি শ্লোগান মুখর মিছিলে পরিণত হয়। এপসু'র নানা শাখার অনেকগুলো মিছিলের সঙ্গে একত্রিত হলাম, যার সবই মেনন গ্রুপের। সবগুলোতে আমার পরিচিত অনেক মুখও রয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু কর চালু কর, শহীদ স্মৃতি অমর হোক, আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক—এসব প্রত্যাশিত শ্লোগানের সঙ্গে সেখানে শোনলাম কিছু নতুন শ্লোগান, এবং সেগুলোই মনে হলো প্রাধান্য পাচ্ছিল। সেগুলো হলো 'আধুনিক সংশোধনবাদ, নিপাত যাক', 'নব্য সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংস হোক'; ইত্যাদি। বুঝলাম এখন এপসুর অনেকের মনে অন্য রাজনীতির চেয়েও বেশি স্থান পাচ্ছে নিজ দলের বিভাজনে সৃষ্ট নতুন প্রতিপক্ষটাই। ঠিক তখন মতিয়া গ্রুপ এপসু'র কোন মিছিল সেখানে ছিলনা; থাকলে হয়তো তাদের মধ্যেও এই একই বিষয়টি দেখতাম।

ভিপি'র কাজ ছিলো এত সব বিভাজনের মধ্যেও হলের এক ধরনের ছাত্র ঐক্য ধরে রাখা। সেকালে সকল ছাত্র দলের সব রকম ছাত্র রাজনীতির অভিন্ন শ্লোগানটি ছিল 'ছাত্র ঐক্য, জিন্দাবাদ'। সবকিছুর পরও এক পর্যায়ের ছাত্র ঐক্যকে সবাই খুব গুরুত্ব দিতো, এবং সেটি কিছুটা টিকেও ছিল। সে জন্যই সেই আন্দোলনমুখর দিনগুলোতে যখন বিভিন্ন দলের পরিচিত অবস্থানগুলোতে দ্রুত পরিবর্তন আসছিলো, দলের মধ্যেও বিভাজন প্রবল হচ্ছিল, তখনো সলিমুল্লাহ হলের ভিপি এক ধরনের সর্বজনীন সমর্থন ও সম্মান পেতো, সবার ভিপি হিসেবেই তাকে দেখা হতো। সংসদ অফিসে ও ভিপি'র রুমে প্রায়শ নানা মতের ছাত্রদের সঙ্গে কথা হতো। মাঝে মাঝে ছোটখাট ঘটনা নিয়ে হলের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে

উঠতো, কিন্তু ভিপি'র স্থানটিই এমন ছিল যে এসবের সমাধানে কথা বলতে তাকে অত্যন্ত সাহসী কেউ হতে হতোনা। যেমন একদিন শোনা গেল যে অন্যত্র এনএসএফের ছাত্রদের গুণ্ডামির কারণে ইকবাল হল থেকে ছাত্র লীগের ছেলেরা সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করবে এখানকার এনএসএফের ছাত্রদের 'শিক্ষা' দিতে। এরকম গুজব প্রায়শই দেখা দিতো; তারপরও হলে এক রকম আতঙ্ক দেখা গিয়েছিলো। হলে এপসু, এনএসএফ এবং ছাত্র লীগের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে শিগ্‌গীর এই উত্তেজনা ও আতঙ্ক দূর করা সম্ভব হয়েছিলো।

আমার রুমে রাতের দিকে প্রায়শ একটি রাজনৈতিক আড্ডা বসতো—মাহবুবুল্লাহ, সা'দত, আনোয়ারুল্লাহ, কাদের এরাই ঘুরে ফিরে আসতো। আলোচনাগুলো হতো কখনো তাত্ত্বিক, কখনো সাদামাটা। আমার কাছে তখন একটি সুন্দর ট্রানজিস্টর রেডিয়ো ছিল। জাপান থেকে আনা আগের রেডিয়োটি চট্টগ্রামে রেখে এলেও এটি হলে তার স্থান নিয়েছিলো। অধিকাংশ সময় পড়াশোনা বা অন্য কাজের পটভূমিতে রেডিয়োটি মুখ নানা দিকে করে বিশেষ বিশেষ স্টেশনকে খুব ভাল শোনা যেতো—এখানে টেবিলের উপর বিভিন্ন স্টেশনের দিকগুলো নির্দেশ করে কাগজে একটি নক্সাই করে রেখেছিলাম দেশের ও বিদেশের নানা স্টেশন ভাল ভাবে শুনতে। ওই বন্ধুদের এসে কিছু সময় কাটাবার একটি উপলক্ষ ছিলো রেডিয়োতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান শোনাও। এখানেই রাতের পর রাত তর্ক চলেছে ছয়দফা, এপসুর নীতি, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট দমনের নামে গণহত্যা, ইত্যাদি সব কিছু। মাহবুবুল্লাহদের কারণে তাত্ত্বিক আলোচনা বেশি হলেও দেশ দুনিয়া সম্পর্কে ওয়াকফহাল থাকতে এটি বেশ সাহায্য করতো, সেই সঙ্গে ভিপিগিরির কর্তব্য নির্ধারণেও সহায়ক হতো।

আব্বা এলেন বেড়াতে গাড়ি নিয়ে, সঙ্গে ছোট মইনুও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় যে কতকিছু হয়েছে, সব আমার দেখা হয়নি। আব্বা যে সময় ঘন ঘন আসতেন তখন ঢাকা মানে ছিলো পুরোনো ঢাকা। এখন নতুন ঢাকা গাড়িতে করে ঘুরে দেখতে খুব মজা হলো। সব চেয়ে ফুর্তি হলো মইনুর; তার শুধু আপত্তি হলো প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাজের সময় হলে নতুন নতুন মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আব্বা এখানে থামলে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হতো। ঢাকার আকর্ষণ কিন্তু শুধু নতুন দালান কোঠা নয়, বরং যাদুর বাক্স হয়ে উঠা টেলিভিশনও। ডি আই টি ভবনের আশপাশে কয়েক মাইল এলাকায় মাত্র এটি দেখা যাচ্ছে, এখনো। আব্বাদের টেলিভিশন দেখাতে নিয়ে গেলাম ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের কাছে 'সাকুরা' রেস্টুরেন্টে—ওখানে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে দেখা যেতো চা খেতে খেতে। ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেল নিজেও অবশ্য একটি নতুন দেখার জিনিস তখন।

পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র প্রতিনিধি

পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় বিষয়ক কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ছাত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গিয়ে লাহোর বিমান বন্দরে নামলাম। বোরহান এসেছিলো আমাকে তাদের হোস্টেলে নিয়ে যেতে। ওদের পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে তখন আমার অনেক বন্ধু—বোরহান, বরকত উল্লাহ (চট্টগ্রাম কলেজের বন্ধু), সৈয়দ রেজাউল হায়াত, আহমদ উল্লাহ, খসরুজ্জামান (অর্থনীতির ছাত্র সলিমুল্লাহ হলে এক বছর থেকে এখানে এসেছিলো, পরে সিএসপি এবং যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক), আরো অনেকে। যে দু'একদিন তাদের সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে পারলাম ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সম্পর্কে একটি পরিচয় পেলাম। পঁয়ষট্টির যুদ্ধটি একেবারে তাদের কাছ ঘেঁষেই ঘটে গেছে—লাহোর ছিল আক্রমণের একেবারেই মুখে। হোস্টেলের অদূরে সেচ ক্যানালগুলোই ছিল লাষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স। কাজেই যুদ্ধ নিয়ে সব উত্তেজনাকর গল্প ছিল মুখ্য। তা ছাড়া ছয়দফা, পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য ঘটে যাওয়া সাতই জুনের হরতাল, তাতে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু—এগুলো সম্পর্কে তাদের মতামত, এখানকার ছাত্রদের মতামত, এসব জানা গেল। এখানকার ছাত্ররা সেই অর্থে রাজনীতি সচেতন নয়, পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছে সে খবর কমই রাখে। পরে দেখেছি এদিক থেকে পাঞ্জাবিদের চেয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্তের পাঠানদের সচেতনতা বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই তারা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারে। ওয়ালী খানের ন্যাপ এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দল হওয়াতে এবং এর প্রধান মাওলানা ভাসানী হওয়াটি এর অন্যতম কারণ মনে হয়েছে। সলিমুল্লাহ হল থেকে বেশ কয়েকবার পশ্চিম পাকিস্তানে আসা যাওয়া করেছে অনুজ প্রতিম বন্ধু ফখরুদ্দীন (পরে অক্সফোর্ডে রোডস স্কলার, যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষক, বাংলাদেশের পত্রিকায় কলামিষ্ট)। তখন সে রসায়নে প্রথম বর্ষের ছাত্র, মেধাবী ছাত্র হওয়া ছাড়াও দূরপাল্লার দৌড়বিদ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ সম্মান তার। তাই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লাহোর, করাচি ইত্যাদি জায়গায় যেতো, এবং এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা হতো; তার আনা আঙুর, বেদানা ইত্যাদি দুর্লভ ফল আয়েস করে খাওয়া হতো। এবার পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রায় তার থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছিলাম।

খুব গরমের সময় পাঞ্জাবে এসে পড়েছি। রাতে গরমের কারণে হোস্টেলের রুমে ঘুমানো কষ্টকর। অনেকেই দেখি বাইরে দড়িতে ছাওয়া চৌকি পেতে ঘুমাচ্ছে। আমার জন্যও একটি বাড়তি চৌকি আনা হলো। এখানে বাঙালি ছাত্রদের ভাত-তরকারি খাওয়ার স্বাদ মেটাবার জন্য বাঙালি মেসের কথা শোনলাম। নাম বাঙালি মেস হলেও আসলে এর সদস্যপদটি বেশ আন্তর্জাতিক। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি কয়েকটি ভেতো দেশের বিদেশী কয়েকজন ছাত্রও এই মেসের অন্তর্ভুক্ত। পালা করে একজন ছাত্র মেসের ম্যানেজার থাকে। একবার

নাকি আউয়াল নামের একজন বাঙালি মেস ম্যানেজার খুব খারাপ খাইয়েছিল। খুব অল্প ইংরেজি-জানা এক থাই ছেলে তাই বলছিলো 'বেঙ্গল, আউয়াল, হোপলেস'।

বোরহানদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার সুখ বেশি স্থায়ী হলোনা। ছাত্র প্রতিনিধি হবার ডাকে এবার ট্রেনে যেতে হবে পেশোয়ারে—উপজাতীয়রা তো ওদিকেই থাকে। রাতের ট্রেনে যখন ভোর হলো তখনো পাঞ্জাবের শস্যের ক্ষেত, পঞ্চ নদীর পানির প্রভাব কিছুটা দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছু পরে দৃশ্যপট বদলে গেল—দুদিকে শুধু ধূধূ শুকনা মাটি, মাঝে মাঝে নিচু মাটির ঘর, আশেপাশে পানির বা সবুজের কোন চিহ্ন নেই। এমনি দৃশ্যের মধ্য দিয়েই এক সময় পেশোয়ারে এসে হাজির হলাম। উপজাতীয় কাউন্সিলের অফিসে পরিচিতিমূলক যে সভা হলো সেখানে অনেক তথ্য পেলাম এই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, বেলুচিস্থান অঞ্চল এবং এখানকার কয়েকটি দেশীয় রাজ্য আর বিশেষ উপজাতীয় এজেন্সিতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উপজাতিগুলোর সম্পর্কে—আফ্রিদি, খুগিয়ানি, শিনোয়ারি, ইউসুফজাই আরো কতকি। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অনেকটাই মূল ধারার জীবন থেকে আলাদা, তাদের উন্নয়ন সমস্যাগুলো পর্বত প্রমাণ। অত্যন্ত গোঁড়া ও সনাতন ভাবধারা শত শত বছর ধরে এখানে জেঁকে রয়েছে—আধুনিকতার পরশ পেয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে খুব কম সংখ্যক মানুষ। অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা হওয়াতে, এবং নিজের উপজাতির মুরুব্বিদের ছাড়া আর কারো কোন শাসন না মানার প্রবণতার ফলে কোন রকম উন্নয়নের ছোঁয়া এখানে লাগানো কঠিন কাজ। প্রতিনিধি দলের ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা যেন এ সমস্যাগুলো বুঝি এবং পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা যেন দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে।

সেই সঙ্গে অবশ্য আমাদের নিজেদের আরো তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এরা কী ভাবে তা দেখা। এই অঞ্চলে যেখানেই গিয়েছি চেষ্টা করেছি আইয়ুব খানের শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ছয়দফা, একে কেন্দ্র করে আন্দোলনে সরকারের দমন নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে এখানকার সচেতন মানুষদের মতামত জানতে। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে—যেমন পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, উপজাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল ইত্যাদি। সব জায়গায় প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ছিল। তার বাইরে অন্যদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপে জানার চেষ্টা করেছি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা কী ভাবছেন। মনে হলো ব্যক্তি হিসেবে আইয়ুব খানকে অনেকেরই পছন্দ, বিশেষ করে শাসন কাজে তাঁর দক্ষতার। কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অধিকাংশেরই ভীষণ অপছন্দ—কারণ এটি প্রায় সর্বাংশে পাঞ্জাবিদের আধিপত্যে রয়েছে এবং পাঞ্জাবিদেরকে এরা পছন্দ করেনা, বিশ্বাসও করেনা। অন্তত এই একটি কারণে পাঞ্জাবিদেরকে কিছুটা ভারসাম্যে রাখতে পারার মানুষ হিসেবে তারা বাঙালিদের দিকে তাকিয়ে আছে,

কিছুটা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। অনেকেই দেখলাম ৭ই জুন কী হয়েছিল তার খুঁটিনাটি বলছে—এতেই বুঝতে পারলাম তাদের আগ্রহ।

যতটুকু বোঝার সুযোগ পেয়েছি—তাতে মনে হলো সত্যিকার রাজনৈতিক মতাদর্শে পাঠানরা তখনো সেই পুরোনো দুই নেতৃত্বের আকর্ষণে বিভক্ত—একটি হলো কাইয়ুম খানের আদর্শ, অন্যটি বাদশা খানের (খান আবদুল গাফফার খান)। পাকিস্তানের জন্মের সময়েই এই দুটি মতাদর্শের সংঘর্ষ হয়েছিলো—কাইয়ুম খানেরটি ছিল জিন্নাহর মুসলিম লীগের আকর্ষণ, আইয়ুব খানের বিরোধিতায় যেটি এখনো স্পষ্টবাদী। বাদশা খানেরটি ছিল পাখতুন জাতীয়তার আকর্ষণ—যেটি এখন তাঁর ছেলে ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের মাধ্যমে প্রকাশিত। আমাদের ভ্রমণে উভয় মতাদর্শের মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁরা বেশ খোলাখুলি তাঁদের পক্ষপাত জানিয়েছেন। উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদেরকে নানা জায়গায় নিয়ে গেছেন কাউন্সিলের যে কর্মকর্তা (বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়) গাড়িতে, সফরে তাঁর সঙ্গে সমানে কথা হতো। তিনি আইয়ুব খানের ভক্ত, তাঁকে কথায় কথায় শের শাহের সঙ্গে তুলনা করেন শাসন নৈপুণ্যের কারণে। তাঁর ধারণা উভয়েই ভাল শাসক হয়েছিলেন পাঠান হওয়ার কারণে। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি পুরাপুরি কাইয়ুম ভক্ত—যিনি কিনা গণতান্ত্রিক শিবিরের বড় নেতা। রাস্তায় ভাল যা কিছু দেখেন—একটি বড় প্রতিষ্ঠান, একটি বাঁধ—বলতে ভোলেন না এ সব কাইয়ুম আমলের অবদান। আবার আইয়ুব খানের গভর্নর থাকাকালীন আর এক পাঠান আজম খান যে বাঙালিদের মন জয় করেছিলেন যে সম্বন্ধেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আমাদেরকে আজম খানের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, পরে জানা গেল তখন তিনি বাড়িতে নেই।

পেশোয়ার শহরে যা যা অবশ্যই করতে হয় তার সব করা হলো—ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা গাড়িতে চড়ে কিচ্ছা খানির বাজারের চায়ের দোকানে বসা, দারুণ সুস্বাদু চর্বিদার চাপলি কাবাব খাওয়া, ইত্যাদি সব কিছু। এবার বাইরের দিকে যাওয়া। পেশোয়ারের বাইরে বাব-ই-খাইবার ফটক পার হয়ে খাইবার গিরিপথ ধরে আফগান সীমান্তে তুর্খামে। এই সেই খাইবার আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে সব বিদেশী আগন্তুকরা যে সরু পথ দিয়ে ভারতে ঢুকেছিলো, আর এখনো যেই পথের দু'পাশের স্বাধীনচেতা উপজাতীয় পাঠানরা তাদের খেয়ালখুশি মতো নিজেদের আইনে চলে—পাকিস্তানের আইনে নয়। ওই উঁচু পার্বত্য পথে বৃটিশরা রেলওয়েও তৈরি করেছিলো—সেই অসম্ভব কীর্তিটিও দেখা যায় গাড়ির পথ থেকে। তুর্খাম সীমান্তে আফগান প্রহরীরা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে—অনেকটা ইউরোপীয় চেহারা তাদের। কাছেই লাণ্ডিকোটাল বাজার—সেখানে সব কিছু চোরাই পথে আসা মাল—ট্যাক্স ফ্রি বলে দারুণ সস্তা। ঘড়ি, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, সিল্ক, সিনথেটিক কাপড়, পশমি পোষাক এমন কিছু নেই যা এই লান্ডিকোটাল

বাজারে পাওয়া যায়না। পাকিস্তান অথবা আফগান কোন কর্তৃপক্ষের কোন বাধা নেই এতে—এও যেন উপজাতীয় পাঠানরকে দেয়া এক রকম স্বাধীনতা। প্রচণ্ড দরদাম করতে হয়; এ সবের মধ্যেই কিছু কেনার চেষ্টা করলাম নানা জনের জন্য।

পাকিস্তানের সব চেয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জায়গা বলে শুনেছি সোয়াত। গাড়িতে চললাম সেই সোয়াত দেশীয় রাজ্যে উদ্দেশ্যে। ওটি তখন ঠিক পাকিস্তানের সরাসরি শাসনে ছিলনা, অভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে শাসন করতেন এর বংশানুক্রমিক অধিপতি সোয়াতের 'ওয়ালি'। ওখানে ওড়ানো হতো পাকিস্তানের পতাকা নয়—সোয়াতের পতাকা। তবে সার্বিক ভাবে পাকিস্তান সরকারই এর নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য দায়ী ছিল। আমরা থাকলাম রাজধানী সাইদু শরীফে। ওয়ালির বাবা বাদশা সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য। তিনি বৃদ্ধ বয়সের কারণে ছেলের হাতে অধিপতির আসনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই ১৯৪৯ সালে। এখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, কিন্তু খুবই সপ্রতিভ ও সচেতন। খুব নরম গলায় দু'একটি ছোটখাট কথা বল্‌লেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর বড় ছেলে বহুদিন ধরেই সোয়াতের ওয়ালি—একক অধিকর্তা হিসেবে শাসন করেন—প্রায় মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে এখন আধুনিক স্কুল-কলেজের প্রবর্তন করে শিক্ষা দীক্ষায় অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ওয়ালির ছেলে মিয়াগুল আওরঙ্গজেব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসার হয়ে এখন সোয়াতের যুবরাজ, আইয়ুব খানের মেয়ে নাসিম আওরঙ্গজেব তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্কুল শিক্ষা ভারতের বিখ্যাত পাবলিক স্কুল দুন স্কুল ও পরে ইংল্যান্ডে। ওয়ালির ছোট ভাইয়ের সঙ্গেই কথাবার্তা হলো—তিনি জানালেন কী ভাবে সোয়াতের আধুনিকীকরণ চলছে।

সোয়াতের এ মাথা ও মাথা ঘুরলাম—রাস্তার পাশে পাশে অনেক নিচে দিয়ে চলে গেছে পার্বত্য সোয়াত নদী। নিচে নেমে পানি স্পর্শ করে দেখলাম অসম্ভব ঠাণ্ডা এই গ্রীষ্মের দিনেও। যেটুকু দেখলাম মনে হলো এখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি একেবারে গল্পের রাজ্যের মত। একটি বড় রাস্তা রাজ্যটির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পাশে সোয়াত নদী, অদূরে দুই দিকেই পাহাড়। রাস্তা থেকে দেখা যায় পাহাড়ের ফাঁকে উপত্যকায় জনবসতি। এই রাস্তায় নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ছোটখাট একটি কেল্লার আকৃতিতে থানা ও সরকারী অফিস। ওই কেল্লা সব একই রকম—ঠিক রূপকথার কেল্লার আদলে। মজার ব্যাপার হলো আমরা যখন এই পথে যাচ্ছিলাম তার কিছু পর এখান দিয়ে সোয়াতের ওয়ালির নিয়মিত দেশ পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। তাই দেখলাম ওই প্রত্যেক কেল্লার সামনে কিছু সালওয়ার কামিজের মত মিলিশিয়া পোশাক পরা প্রহরীরা আর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ালি যাওয়ার সময় তাঁকে অভিবাদন জানাতে। তিনি হয়তো এদের কোন কোনটিতে থামবেন পরিদর্শনের জন্য। সাইদু শরীফ একটু নিচু জায়গার উপত্যাকায়। আমরা গেলাম আরো উচ্চতায় রাজ্যের উত্তর প্রান্তে একে একে বাহরায়েন, মাদায়েন—এই সব ছোট ছোট শহরে। এই গ্রীষ্মেও যেখানে দারুণ ঠাণ্ডা, অদ্ভুত সুন্দর পার্বত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য। এদের অনেকে নাকি

আলেকজান্ডারের সঙ্গে আসা গ্রিকদের বংশোদ্ভূত, উপজাতীয় নিয়ম কানুনে নিজেদের বংশের মধ্যেই বিয়ে থা হয়েছে বলে চেহারাতেও সেই ইউরোপীয় ছাপ—কিন্তু কাপড় চোপড় খুবই মলিন। ওয়ালির জারিকৃত আইন কানুন যদিও সাধারণভাবে পাকিস্তানের অন্যত্র প্রচলিত আইনের মত, এদের সামাজিক, ধর্মীয় সবকিছু কিন্তু এখনো গোত্র শাসিত এবং অত্যন্ত গোঁড়া। এর একটু নমুনা টের পেলাম যখন আমরা কয়েকজন সাইদু শরীফের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। আমার শার্টটি প্যান্টের ভেতরে গোঁজা ছিল। বলা নেই কওয়া নেই দেখলাম দশাসই এক লোক এসে শার্টটি প্যান্টের ভেতর থেকে টেনে তুলে দিল। ধরে নিলাম এটিও গোত্রের নিয়ম। আর এই নিয়ম পালন করানোর ভঙ্গিটিও হয়তো গোত্রের নিয়ম। সোয়াতের কাছে একটি জায়গায় নিয়ে গেলো যাকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় বুদকারা—এ হলো প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি পীঠভূমি। এটি মনে করিয়ে দিলো যে আমরা প্রাচীন গান্ধারা সভ্যতার অঞ্চলে আছি। এখানে যাদুঘরে প্রাচীন অনেক বুদ্ধ মূর্তি দেখলাম সেই আমলের অনেক ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন, তা ছাড়া খনন কাজে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদি।

সোয়াতে তবুও নানা কিসিমের মানুষ আছে—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও কম নয়। কিন্তু পেশোয়ারে ফিরে আসার পর আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেটি একেবারেই উপজাতীয় ভাবধারায় পরিচালিত, আর এখানকার মানুষের প্রধান পেশাটিও অদ্ভুত। পর্বতের কোণে দুর্গম এ জায়গাটির নাম দারা আদমখেল। এখানকার ঘরে ঘরে মানুষ রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল ইত্যাদি তৈরি করে—বৃটিশ আমল থেকেই তা বংশানুক্রমে করে আসছে, এবং দিব্যি খোলা বাজারে এসব অস্ত্র বিক্রিও করছে। অস্ত্র আইনের সরকারী নিয়ম কানুন এসব অঞ্চলে অচল। আমাদের সঙ্গে থাকা কর্মকর্তারা জানালেন দুনিয়ার নাম করা সব চেয়ে মোক্ষম যে কোন ছোট অস্ত্র শুধু একটি নমুনা দেখেই ওরা হবহু অনুকরণ করে বানাতে পারে—আসল-নকল বোঝার কোন উপায় থাকেনা। দেখলাম এর জন্য ব্যবহার করে নেহাত ছোট খাট যন্ত্রপাতি—হাতুড়ি, ছোট লেদ, ঘষার রেত ইত্যাদি; এদের খুবই ছোট কারখানা—কামার বাড়ির মত। নেহাত হাতের কুশলতায় গড়ে ওঠছে আধুনিক মডেলের পিস্তল অথবা কলাশনিকভ রাইফেল। ঝগড়াঝাটি, গোত্র-কলহ ইত্যাদিতে এরা যে এসব অস্ত্রের ব্যবহারেও পারদর্শী তা বলাই বাহুল্য। এদের নিয়ে প্রশাসনের সমস্যাগুলো বেশ স্পষ্ট।

দারা আদমখেলে কাউকে উর্দু বলতে শোনলাম না—পশতু ছাড়া এরা কিছুই বলতে পারেনা, একটি প্রাইমারি স্কুলে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানকার ছাত্রদেরকে উর্দু শেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষকের মাধ্যমে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বললাম। পূর্ব পাকিস্তানের কথা তারা শুনেছে, সেখানকার পানিতে এক রকম লম্বা লম্বা আশের গাছ হয় তাও শুনেছে (ওরা বলে পাটশন)। জানিনা এই বাচ্চাদের কেউ কেউ দারা আদমখেলের মূল শিল্প থেকে বের হয়ে এসে অন্য কিছু করতে পারবে কিনা।

পোশায়ার ছাড়ার আগে উপজাতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখানো হলো আমাদেরকে। আমার খুউব ভাল লাগলো এদের লোকগীতি ও লোক-বাদ্য। ওই ক্ষেত্রে গিয়ে মনে হলো আমাদের লোক সংস্কৃতির সঙ্গে কোথায় যেন একটি মিল—সেই বাউলের ভাব, সুফি-ফকিরের ভাব—পাঠান রক্ষণশীলতার কোন চিহ্ন নেই। ব্যাপারটি আরো ভাল ভাবে চোখে পড়লো কয়েকদিন পর কোয়েটায় এমনি আর একটি অনুষ্ঠানে। মনে হলো আমাদের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিভিন্ন বালুচ উপজাতির একেবারেই লোকজ সব সংগীত সাধকদের—পোষাক, ভঙ্গি, সুর, শব্দ সবকিছু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এতই অনন্য এবং এতই বিচিত্র যে দুনিয়ার যে কোন আসরে এরা সম্মানিত হবে তা প্রায় অবধারিত। সংগীতের কথাগুলোর কিছুই বুঝলামনা—কিন্তু মগ্ন হয়ে উপভোগ করতে তা বাধা হয়নি। একটি জিনিস অবশ্য লক্ষ্যণীয় এই যে উপজাতীয় এলাকার পথে প্রান্তরে, শহরে-গ্রামে ভ্রমণ তার কোথাও মহিলাদেরকে বড় একটা দেখিনি—না যাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ হয়েছে সেই উচ্চ কর্মকর্তাদের মধ্যে, না শিল্পী-কুশলীদের মধ্যে, না পথে ঘাটে। পুরো জগতটাই যেন এখানে পুরুষদের জন্য।

পোশায়ার থেকে কোয়েটা ট্রেন যাত্রাটি গেল খুবই রুক্ষ পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে। এক জায়গায় মজা লাগলো সমতল থেকে সামান্য নিচু একটি খাদের মত হয়ে আঁকাবাঁকা চলে গেছে যাতে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ছাড়া এখন কিছুই নেই। কিন্তু তার এক জায়গায় ইংরেজিতে সাইনবোর্ড দেয়া আছে 'রিভার বোলান' এই নামে। বুঝলাম এটিই সেই বিখ্যাত বোলান গিরিপথ সৃষ্টিকারী বোলান নদী; অথচ এই মূহূর্তে সম্পূর্ণ পানিবিহীন এ নদী। হয়তো পরবর্তী বসন্তে পর্বত চূড়ার বরফ গল্‌লে এখানে আবার পানি দেখা দেবে।

কোয়েটাও পেশোয়ারের মত বড় শহর, তবে আরো সুন্দর। এখানে গভর্নমেন্ট কলেজে গেলাম যেখানে ছাত্র ও ছাত্র নেতাদের সঙ্গে আলাপ হলো। দেশের রাজনীতি নিয়েই তাদের সঙ্গে প্রধানত কথা হলো। মনে হলো কলেজে যারা আসে তারা অধিকাংশ ধনী পরিবারের, রাজনীতি নিয়ে ধারণা একটু সোজা-সাপটা; এ নিয়ে মাথা ঘামায় কম। তবে তাসখন্দ চুক্তির ব্যাপারটি নিয়ে বেশ উত্তেজিত রয়েছে সবাই। তারা মনে করছে এই চুক্তির মাধ্যমে দেশের বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বালুচ জাতীয়তাবাদের কথা যা শোনেছিলাম সে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে খুব বেশি কিছু বলতে পারলো না। আসলে এই বেলুচিস্থান অঞ্চলটির একটি বড় অংশ হলো বড় বড় দেশীয় রাজ্য নিয়ে। ওই সোয়াতের মতই তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কোন ছোঁয়া তেমন ছিলনা। কোয়েটা থেকে আমাদের প্রতিনিধি দলের বাকি সব সদস্য লাহোরে ফেরত গেল বিমানে ঢাকা ফেরার জন্য। আমি কিন্তু রয়ে গেলাম ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে।

কোয়েটা থেকে করাচির উদ্দেশ্যে ট্রেন নিলাম—বোলান এক্সপেস। দীর্ঘ পথ—দিন রাত সবই ট্রেনে কাটলো। আগাগোড়া রুক্ষ পথ—প্রথমে পাথুরে, তারপর সিন্ধুর ধূধূ মরু ভূমি—সারা গায়ে ধূলাবালিতে একসা হয়ে গেলাম।

করাচিতে যাচ্ছি বোরহানের ভরসায়—সে ইতোমধ্যে ওখানে পৌঁছে গেছে এবং তার সেজ ভাইয়ের বাসায় আছে। সেজ ভাই আবদুল্লাহ হোসেন সিদ্দিকীর (সলিমুল্লাহ হলের প্রাক্তন ভিপি) চাকরি এখন করাচিতে। তাই ক'দিন করাচিতে বেড়াবার এটি একটি ভাল সুযোগ। বেশ ফুর্তি করে আমরা দু'জন করাচিতে ঘুরে বেড়ালাম—সেই শহর যার কথা ছোটবেলা থেকে এত শুনেছি। ইউনূস ভাইয়ের স্কুলে থাকতে ট্রেনে করাচি জাম্বুরীতে আসা, তারপর বিশ্ব জাম্বুরীতে যাবার আগে ট্রেনিং নেবার সময় করাচির পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো, তাঁর বেশ কিছু বন্ধুর করাচি প্রবাসী হওয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে না দেখেও এই শহরের নানা কিছু এতদিন মাথায় গেঁথে ছিলো—এবার সেগুলো দেখা হলো। করাচি থেকে বোরহান আর আমি দু'জনেই আবার ট্রেনে লাহোরে—আরো দু'একদিন তাদের সঙ্গে থেকে ইসলামাবাদ যাব বলে।

লাহোরে খসরুজ্জামান আমাকে নিয়ে ইসলামাদের বাসে তুলে দিলো। খসরুর এক পাঞ্জাবি বন্ধু এই বাসে সেখানে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। ইসলামাবাদের দীর্ঘ পথে ওই বন্ধু আমার অসম্ভব যত্ন নিলো; একটুও অসুবিধা কোথাও হচ্ছে কিনা বিশেষ ভাবে নজর রাখলো, পথে যেখানে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিয়ে পার হলাম সেগুলো সম্পর্কে জানালো। মুস্তাকের কথা খুব মনে হলো, যে শুধু চিঠি পাঠাতোনা আমাকে নানা রকম উপহার পাঠাতো ভাল কলম-বন্ধুর মত। তার বাড়িতো এখানেই, লাহোরের কাছে শেখুপুরা জেলায়। আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পাঞ্জাবের পঞ্চ নদীর মধ্যে যে তিনটি অতিক্রম করলাম—রাভি, চেনাব ও ঝিলাম। সহযাত্রীকে যখন বললাম এগুলোর আরো প্রাচীন সংস্কৃত নামেই আমি এদের ভাল জানি—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা আর বিতস্তা, সে খুব অবাক হলো। তার এলাকার এই নদী, অথচ কখনো এর প্রাচীন নামের কথা শোনেনি। আসলে এই নদীগুলো পার হবার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে এর কাছেই একদিন ছিলো তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির লালন ভূমি—আজ তার ছিটেফোঁটাও নেই এখানকার সংস্কৃতিতে। তবে আরো সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস সম্বন্ধে এরা বেশ সচেতন। এই যে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ যাচ্ছি যে রাস্তায় তার অনেকখানি পথ কিন্তু হুবহু শেরশাহের তৈরি সেই বিখ্যাত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, এখনো ওরা জিটি রোড বলে একে। এই সেই মহাসড়ক যা ঢাকার কাছে সোনার গাঁও থেকে শুরু হয়ে সারা ভারত অতিক্রম করে পেশোয়ার অবধি চলে গিয়েছিলো; ভারতে এর পুরো অংশ এবং পেশোয়ার পর্যন্ত পাকিস্তানের অংশটির অনেকটা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইসলামাবাদ তখন নেহাতই সরকারী শহর, সদ্য গড়ে উঠছে গত চার পাঁচ বছর ধরে। বিরান জায়গার ওপর একেবারে নকশা করে পরিকল্পনা করে কী ভাবে দ্রুত শহর গড়ে উঠেছে তা দেখলাম। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরাই প্রধানত শহরের বাসিন্দা, তাই এর স্বল্প সংখ্যক বাসিন্দার মধ্যে একটি বড় অংশ বাঙালি সরকারী কর্মচারী—তাঁদেরই একজনের আতিথ্যে আমি আছি,

খসরুজ্জামানরা সব ঠিক করে দিয়েছিলো। তিনি কাছেই রাওয়ালপিণ্ডির বাস ষ্ট্যান্ড থেকে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি পুরোনো শহর, পাকিস্তানের সামরিক হেড কোয়ার্টার; করাচি থেকে রাজধানী প্রথম দফা এখানেই স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এখন এর কাছেই গড়ে ওঠেছে নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ—উভয়কে জোড় শহরও বলা হয়। রাতের বেলা গাড়িতে আমার হোষ্ট বললেন চোখ বন্ধ করে থাকলেও টের পাবেন কখন ইসলামাবাদের আওতায় এসে পড়েছেন, কারণ তখন গাড়িতে ঝাঁকুনি আর থাকবেনা, এক ফোটাও না। এখানকার নতুন রাস্তা অতি মসৃণ, চিন্তাও করা যায়না কত মসৃণ। তাঁর বাসায় পৌঁছে আরো কিছু নতুন জিনিস দেখলাম—যেমন রান্নাঘরে প্রাকৃতিক গ্যাস, ওখানে বলা হয় সুই গ্যাস। বেলুচিস্তানের সুই অঞ্চলের গ্যাস থেকে আসে বলে এই নাম। কী চমৎকার রঙবিহীন, পরিস্কার গ্যাস, আরামে কালিঝুলিবিহীন ভাবে রান্না চলে—কল খুললেই গ্যাস। আমাদের সিলেটে ফেঞ্চুগঞ্জে গ্যাস পাওয়ার কথা শুনেছিলাম কিন্তু সে শোনা পর্যন্তই। মারগালা পাহাড়ের পাদদেশে ব্লকে ব্লকে তৈরি শহর ইসলামাবাদকে খুবই কৃত্রিম একটি শহর মনে হচ্ছিল। এ শহর যে পূর্ব পাকিস্তানেরও সে কথা অবশ্য মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছিল, বড় বড় সড়কের নামে স্মরণীয় বাঙালি নেতাদের নামও ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের ট্যাক্সের টাকাও যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছিলো এই আনকোরা শহরটি তৈরিতে। অবশ্য ঢাকাকে ইতোমধ্যে 'দ্বিতীয় রাজধানী' ঘোষণা করে এখানে শেরে বাংলা নগরে তারও পরিকল্পনা ইত্যাদি চলছে বার বার বলা হচ্ছিল। বিশেষ করে বিশাল একটি পার্লামেন্ট ভবন হবে তার ডিজাইনের দায়িত্ব এবং 'দ্বিতীয় রাজধানীর' পরিকল্পনার ভার দেয়া হয়েছে বিখ্যাত মার্কিন স্থাপতি লুই কানের হাতে। কিন্তু সবই এখনো পরিকল্পনা মাত্র—আর ইসলামাবাদ একেবারেই বাস্তব।

অল্প দু'একদিনের ইসলামাবাদ থাকার সময় বিভিন্ন পর্যায়ের বাঙালি আমলা যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁরা আমার কাছে ঢাকার পরিস্থিতি জানতে চেয়েছেন, বিশেষ করে ছয়দফা আন্দোলনের। আমলাতন্ত্রের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনটি যে বেশ প্রকট হয়েছে তা এখানে এসে আরো ভাল বোঝা গেল। সাতই জুনের ঘটনার পর আন্দোলন কোন দিকে গড়ায় এ নিয়ে এখানে যথেষ্ট কৌতূহল আর গুঞ্জন লক্ষ্য করলাম।

দেশে ফেরার আগে লাহোরে আরো দু'একদিন কাটালাম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারাই ফিরতো সে সময় বন্ধুবান্ধবদের জন্য আঙুর-আপেল এসব আনতো। আমাকেও এটা-সেটা স্মারক আনতে হলো। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বায়না ছিল ইকবালের ছোট ভাই লিংকনের—সে তখন ফাইভ বা সিক্সে পড়ে, তার অরিজিনাল শিয়ালকোটের ক্রিকেট ব্যাট চাই, খুঁজে বের করতে হলো। লিংকন অর্থাৎ ভুঁইয়া ইমরান পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় থেকেই বিজ্ঞান সাময়িকী ও পরে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রথম প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়েছিলো (পরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা)।

ঢাকায় ফিরে দেখলাম ছয়দফা আন্দোলনের প্রথম ধাক্কা কিছুটা যেন থিতিয়ে এসেছে। সাতই জুনের পর পর ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগের প্রায় সব নেতাতো আগে থেকেই গ্রেপ্তার ছিলেন। ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হলো। এ ভাবে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া এক নজিরবিহীন ঘটনা। সরকারের দমননীতি দিন দিন বেড়ে চলছিলো। এই অবস্থাতেই ১৯৬৬ এর শেষ মাসগুলো এবং পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে একটি থমথমে ভাব চলে এসেছিলো। আওয়ামী লীগের প্রায় সব নেতাদের গ্রেপ্তার, সাতই জুনের হরতালে প্রধানত পুলিশের গুলিতে প্রায় ১৩ জন মানুষের প্রাণ হানি, সরকারের দমননীতি—এসব সত্ত্বেও কিছুটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি যেন ফিরে এসেছিলো। এ যেন ছিল এক রকম পুনর্মূল্যায়নের সময়, অথবা বলা যায় বড় ঝড়ের আগে একটি দীর্ঘ থমথমে অবস্থা।

তখনো বিভিন্ন দলে ছয়দফা নিয়ে সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক চলছিলো। ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ, অন্যান্য বামপন্থী দল, দুই এপসু—এরা সবাই ছয়দফার ওপরেই সব কিছু বাজি রাখতে রাজি ছিলনা। কারণ তাদের কাছেও পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মানুষের অধিকার, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, সমাজবাদ ইত্যাদিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। তাছাড়া এক রাষ্ট্রের মধ্যে ছয়দফার সব দফা সত্যিই বাস্তবায়নযোগ্য কিনা সে ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে এপসু বেশি গুরুত্ব দিতো। পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের বিষয়টি একটি বড় জায়গা জুড়ে থাকে। ছয়দফার মধ্যে যেমনটি ছিল—একই দেশের দুই অংশ কী ভাবে দুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের নীতি গ্রহণ করতে পারবে সেটি অন্তত মেনন গ্রুপ এপসু'র কাছে বোধগম্য হচ্ছিলনা। কিন্তু সে যাই হোক সলিমুল্লাহ হল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির নিরিখে সেদিন মনে হয়নি যে আগামী বছরগুলোতে অন্য সবকিছু ছাড়িয়ে এই ছয়দফাই মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় দাবি হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বরং তখন দেখছিলাম আইয়ুব খান শুরুতে 'অস্ত্রের ভাষায়' কথা বলার হুমকি দিয়ে আওয়ামী লীগ আর ছয়দফার বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখালেও (ছয়দফা দেয়ার পর পর ঢাকার একটি সভায় তিনি এমন কথাই বলেছিলেন) পরে তাঁর মনোযোগ বরং পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোসৃষ্ট অসন্তোষ, মার্কিনীদের বৈরিতা ইত্যাদি দিকেই বেশি বিস্তৃত হয়েছিলো। আমরাও ছাত্র আন্দোলনের দিক থেকে তাই এক রকম অবকাশের মধ্যে ছিলাম, যখন চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীই বরং অন্তত এপসুকে বেশি ব্যস্ত রেখেছিলো।

বিজ্ঞান গবেষণার স্বাদ

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আয়োজন

হলে যখন আমার পরিচয় ভিপি সাহেব, পদার্থবিদ্যা বিভাগে তখন আমি সংগ্রাম করছি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রাথমিক থিওরিগুলো বুঝে ওঠার চেষ্টায়। মাস্টার্সে পদার্থবিদ্যায় ছাত্রদের জন্য কয়েকটি বিকল্প ছিল—নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়া, অথবা সলিড ষ্টেট ফিজিক্স, অথবা কোয়ান্টাম ইলেকট্রো-ডাইনামিক্স। আমার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সটিই বেশি পছন্দ—শিগ্‌গীর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন হবার সম্ভাবনায় দেশে তখন এরই গবেষণার আকর্ষণ বেশি; বিশেষ করে আমার মতো যারা পরীক্ষণের কাজেই উৎসাহী বেশি, তাদের কাছে। আসলে এর আগের দশকগুলো থেকে সে সময় সারা দুনিয়াতেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে দারুণ উৎসাহ যাচ্ছিল। এর পরেপরে অবশ্য পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারিগরি চাহিদা থাকলেও অন্যান্য শাখার তুলনায় মৌলিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অগ্রগণ্যতা কিছুটা কমে গিয়েছিলো।

আমাদের বিভাগের দু'জন কৃতী শিক্ষক নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন—ড. এ কে এম সিদ্দীক এবং ড. মুহতাশাম হোসেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ড. শামসুল হক এবং ড. হিরন্ময় সেনগুপ্ত। তাঁরাই আমাদেরকে পড়াতেন এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক। প্রথম দু'জনের তখন নিজেদের গবেষণার প্রধান স্থান ছিল কার্জন হলে নয়, বরং তার বেশ কাছেই পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে। এর কারণ নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যায় পরীক্ষণ করতে হলে অতি দামি সব যন্ত্রপাতি দরকার, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলনা, কিন্তু পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ছিল। এখানে বড় আকর্ষণ ছিল এর ভ্যান ডি গ্রাফ কণিকা ত্বরক যন্ত্রটি। নতুন নতুন মৌলিক কণিকা আবিষ্কার হওয়ার মাধ্যমে যে কণিকা বিদ্যা আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি সব চেয়ে চমকপ্রদ অংশ হয়ে পড়েছিল তার প্রাণ-কেন্দ্র হলো এরকম কণিকা ত্বরক (পারটিকল অ্যাকসেলারেটর)। এতে নানা ভাবে কিছু কণিকাকে

ক্রমাগত বেগ বাড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুত বেগে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে এগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে অথবা অন্য কণিকার সঙ্গে সজোরে সংঘর্ষ করতে পারে। ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্র হলো অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তির এমনি একটি কণিকা ত্বরক। এতে চার্জ সম্পন্ন কণিকাকে অথবা তার মাধ্যমে চার্জবিহীন কণিকা নিউট্রনকে যথেষ্ট বেগে নিয়ে গিয়ে একটি টার্গেটে আঘাত করানো সম্ভব হয়। বারংবার ঘর্ষণের ফলে ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের এক প্রান্তে স্থির বিদ্যুতের এমন বিশাল ভোল্টেজ গড়ে তোলা হয় যে তার শক্তিতে কণিকা এই প্রচণ্ড গতি লাভ করে। এই যন্ত্র থাকাতে ঢাকাতেই সম্ভব হয়েছিলো 'স্বল্প শক্তির' নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার গবেষণা। এখন অবশ্য অনেক বেশি শক্তির কণিকা ত্বরকে হাই এনার্জি ফিজিক্সের কথাই আমরা বেশি শুনতে পাই—যার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন কণিকা ও নতুন নতুন তত্ত্ব। তখন ঢাকার ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটরে অনেক বিজ্ঞানী কাজ করতেন। তার মধ্যে আমাদের বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক ও তাঁদের ছাত্ররাই বেশি। এই ছাত্রদের কয়েকজন ইতোমধ্যেই পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন। আমি ড. মুহতাশাম হোসেনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম। তাঁর সঙ্গে কাজের সুযোগটিই একটি সৌভাগ্য—এটি শুধু তিনি উঁচু মাপের বিজ্ঞানী বলে নয়, খুবই উঁচু মানের শিক্ষক ও মানুষ হবার কারণেও। অত্যন্ত অমায়িক, খুবই উৎসাহের সঙ্গে তিনি আমাদেরকে পরিচালিত করতেন।

আমার গবেষণার কাজটি ছিল মাঝখানে ফাঁপা একটি সিলিণ্ডার আকৃতির টার্গেটের উপর ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্র থেকে দ্রুত বেগের নিউট্রন দিয়ে আঘাত করানো। ওই টার্গেটের যে পদার্থ তার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত করে নিউট্রনগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে নানা দিকে চলে যায়। এভাবে বিক্ষিপ্ত নিউট্রনগুলোকে উদ্ঘাটন করার জন্য টার্গেটের থেকে বিভিন্ন দিকে কিছু দূরত্বে উদ্ঘাটক যন্ত্র বসিয়ে বসিয়ে সেখানে নিউট্রনের শক্তি ও তাদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এটি করে কী লাভ এটি সে সময় প্রফেসর আবদুস সালামের দেয়া একটি বক্তৃতায় দেয়া উপমা অনুসরণে বলাটিই মজার হবে।

সালাম এসেছিলেন পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে একটি সম্মেলনে। তিনি একটি জনপ্রিয় বক্তৃতায় ভ্যান ডি গ্রাফের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি বল্লেন ধরা যাক একটি অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে একটি অন্ধকার কক্ষের মধ্যে, যে কক্ষ চিরকাল অন্ধকারেই থাকবে। এখন এই ভাস্কর্যের রূপটি আমাদের কাছে প্রতিভাত করার একটি উপায় হতে পারে এর মুখের উপর বালির বা পানির সরু স্রোত সজোরে ছুঁড়ে দেয়া। তার ফলে ভাস্কর্যের নানা অংশ, এর কোনা-কাছি মুখমণ্ডল বা অন্য নানা সূক্ষ্ম অংশের উঁচুনিচু সৌকর্য থেকে ওই স্রোত বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাবে। ওই সব দিকের কোনটিতে কতখানি ও কী স্রোতে পানি বা বালি গিয়েছে তা জেনেই এবং সে সব তথ্য বিশ্লেষণ করেই মূর্তিটির মূল জটিল রূপটি জানতে পারা সম্ভব ওই অন্ধকারেই। সত্যিকার ক্ষেত্রে আমরা একই ভাবে

নিউট্রনের বিক্ষেপন থেকে টার্গেট নিউক্লিয়াসটির অন্তর্নিহিত গুণাগুণগুলো খুঁজে বের করতে পারবো।

ঠিক হলো আমি এ ভাবে পরীক্ষণ চালাবো সালফারের (গন্ধক) ওপর। সালফারের নিউক্লিয়াস সম্পর্কে এসব গুণাগুণ জানা দরকার ছিল। গন্ধককে একটি ছাঁচে জমিয়ে সুন্দর একটি টার্গেট বানাতে সাহায্য করলেন পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের একজন সহকারী আজিজ সাহেব। তাঁর সাহায্য ছাড়া এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। আসলে গবেষণা আমার হলেও এর পেছনে কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও সহকারীদের প্রচুর অবদান ছিল—বড় একটি যন্ত্রের পরিচালনা বলে কথা। বিশেষ করে দিলদার ভাইয়ের (পরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক) অবদান ছিল খুব বেশি—কারণ ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকতো প্রধানত তাঁর হাতে। ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রটি ছিল একটি বড় বিশেষ কক্ষে। এটি যখন চালু থাকতোনা তখন আমরা ঢুকে সব যন্ত্রপাতি ওখানে সাজিয়ে দিয়ে আসতে পারতাম। তারপর আমাদেরকে বের হয়ে চলে আসতে হতো। কারণ যখন সত্যি সত্যি যন্ত্র চালু হবে তখন তার আশেপাশে ওই কক্ষে ক্ষতিকর কণিকা ও রশ্মি ছড়িয়ে পড়বে বলে সেটি খুবই বিপজ্জনক হবে। তা সত্ত্বেও যে অবশিষ্ট ছিটেফোটা রশ্মি আমাদের গায়ে লাগতো দিনের পর দিন তার জমা পরিমাণ যেন বিপদ সীমার কাছে যেতে না পারে সে জন্য সব সময় ওখানে একটি বিশেষ ব্যাজ পড়তে হতো—যেটি বিশ্লেষণ করে পুরো মাসে কত বিকিরণ গায়ে লেগেছে তার রিপোর্ট পেতাম। ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের প্রসঙ্গে আরো একটি জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তা হলো তরল বাতাস। বাতাসকে অত্যন্ত নিচের উত্তাপে নিয়ে গেলে এটি তরলিত হয়। তরল বাতাস যে উত্তাপে ফুটতে আরম্ভ করে তা হলো বরফের উত্তাপের চেয়ে ১৯৬ ডিগ্রি নিচের উত্তাপ—তাতে বোঝা যায় পানির মত দেখতে এই তরলটি কত ঠান্ডা! এটি তৈরির জন্য পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের মধ্যেই একটি কারখানা ছিল। এ তরল ব্যবহৃত হতো ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রকে ঠান্ডা রাখার কাজে।

গবেষণার বাকি কাজ ওই উপাত্ত নিয়ে হিসেব নিকাশ করা, ফর্মুলা ব্যবহার করে—সালফার নিউক্লিয়াসের বিশেষ বিশেষ গুণগুলোকে নির্ণয় করা ও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা। এসব কাজে মুহতাশাম স্যারের ও অভিজ্ঞ অন্যদের পরামর্শ পেতাম। আমার ঠিক আগে কার্বন টার্গেট নিয়ে একই রকম গবেষণা করেছেন একরাম ভাই (একরামুল ইসলাম, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অকাল প্রয়াত)। তাঁর পরামর্শও পেতাম যথেষ্ট। এসব কাজ নিজের সময় মত ধীরে সুস্থে করতে পারতাম—তাও প্রধানত পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে গিয়েই। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি ভ্যান ডি গ্র্যাফ যন্ত্রে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমি 'মেশিন টাইম' পেতাম, তখন সে সময়কে খুব যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হতো; খুবই সাবধান থাকতে হতো যেন কোন 'মেশিন টাইম' আমার অসাবধান প্রস্তুতির কারণে নষ্ট না হয়। এত বড় একটি যন্ত্র চালনায় প্রতি মুহূর্তই খুব মূল্যবান।

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে এমএসসির জন্য গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আর একটি কৌতূহলের জিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—সেটি হলো কম্পিউটার। ওই ১৯৬৬ সালে কম্পিউটার জিনিসটির গুরুত্বের কথা আমাদের দেশেও পৌঁছে গিয়েছিলো। প্রথম সত্যি সত্যি একটি কম্পিউটার এসেছিলো এর মাত্র বছর খানেক আগে সেই পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে। তখন কম্পিউটারের গণনা ক্ষমতা নিয়ে অনেক কথা আমরা শোনতাম—তার অনেকখানিই ছিল সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অন্তর্গত। তবে উন্নত দেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে দৈনন্দিন কাজে কম্পিউটারের প্রভাবের কথা বেশ চালু ছিল। মাত্র বছর বিশেক আগে ইলেকট্রনিক্সের উপর ভিত্তি করে আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটার উদ্ভাবিত হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকেও সেগুলোকে অসংখ্য ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব ব্যবহার করতে হওয়াতে বিশাল অবয়বে বড় জায়গায় তার আয়োজন করতে হতো। ট্রানজিস্টর এসে ভাল্‌বের জায়গা নেয়াতে এর অবয়ব তুলনামূলক ভাবে কিছুটা ছোট হলো—কিন্তু তখনো এর জন্য আলাদা বড় কক্ষ, এমনকি পৃথক ভবনের প্রয়োজন হতো। বড় বড় ব্যাংক, ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অনায়াসে এর ব্যবস্থা করতে পারতো—আমেরিকার মত দেশে সেভাবেই এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবশ্য এটি অনেক আগে থেকেই যথেষ্ট অপরিহার্য ছিল। ওই ১৯৬৬ সালেই আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীতে 'কম্পিউটার বিভ্রাট' নামে একটি বেশ হাসির লেখা ছাপিয়েছিলাম ওখানকার ওই সাধারণ জীবনে কম্পিউটারের অনুপ্রবেশকে নিয়ে। এক ভদ্রমহিলা বার বার একটি কোম্পানি থেকে এমন কিছু কেনার মূল্য শোধ করবার তাগাদা পাচ্ছিলেন, যা তিনি মোটেই কেনেননি। ভদ্রমহিলা যতই লেখেন যে তিনি এটি কেনেননি, ওদিককার চিঠিতে ততই নতুন নতুন অংকের বিল আসতে থাকে, এবং তা তা দ্রুত শোধ করার অনুরোধ করা হতে থাকে। প্রত্যেকবার চিঠির নিচে লেখা থাকতো 'এটি একটি বিজনেস মেশিন কার্ড, দুমড়াবেন না বা মোচড়াবেন না'। অবশেষে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে মহিলা লিখলেন 'দয়া করে কোন সত্যিকারের মানুষ আমার চিঠিটি দেখবেন কি, আমার সঙ্গে কথা বলবেন কি!'

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের আমাদের কম্পিউটারেও সব তথ্য দিতে হতো ওরকমই কার্ড বোর্ডের ছোট ছোট কার্ডের মাধ্যমে, এবং ফলাফলও পাওয়া যেত এমনি কার্ডের মাধ্যমে। এদেরকেও দুমড়ানো বা মোচড়ানো নিষেধ ছিল—কারণ তা হলে এগুলো কম্পিউটার ঠিক মত পড়তে পারবেনা। সাধারণত তথ্য দেয়া বা নেয়া একটি মাত্র কার্ডের ব্যাপার ছিলনা, বরং বেশ কিছু কার্ডের প্যাক হিসেবেই তা দেয়া হতো—কম্পিউটার একটি একটি করে পড়ে নিতো, বা একটি একটি করে এর উপর লিখে দিতো। সোয়া সাত ইঞ্চির মত লম্বা ও সোয়া তিন ইঞ্চির মত চওড়া এই কার্ডের কোনাটি কাটা থাকতো আর এর গায়ে সারিবদ্ধ অনেক ছোট ছোট দাগ দেয়া থাকতো যার যে কোন নানা জায়গায় ছিদ্র করাটাই ছিল

তাতে তথ্য লেখা, আর ওই ছিদ্রের ভাষায় কম্পিউটার তা পড়ে নিতে পারতো। বিশেষ ধরনের টাইপ রাইটারের মত যন্ত্রে সাধারণ ভাবে টাইপ করলে সঠিক জায়গায় ছিদ্র হয়েও যেতো—সেটিই হতো কার্ডের উপর লিখা। পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতেন তাঁরা এভাবে কার্ড ছিদ্র করে তাঁদের প্রোগ্রাম এবং তথ্য তাসের প্যাকের মতো অনেক কার্ডের বড় বড় প্যাকের আকারে কম্পিউটারে নিয়ে যেতেন। ফলাফলও তাঁদেরকে এই কার্ডের প্যাকের আকারেই দিয়ে দেয়া হতো। কম্পিউটারটি ছিল আই বি এম-১৬২০ তখনকার দিনে অপেক্ষাকৃত ছোট কম্পিউটারের মধ্যে যার বেশ চাহিদা ছিল। এর জন্য একটি আলাদা ছোট কম্পিউটার ভবন ছিল, সেখানে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হানিফ সাহেব (হানিফ উদ্দীন মিয়া, দেশের অগ্রণী কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ) ও তাঁর সহকর্মীরা কম্পিউটার চালাবার কাজ করতেন। ব্যবহারকারীরা শুধু প্রোগ্রামের ও ইনপুট তথ্যের কার্ড তৈরি করতেন এবং সেগুলো তাঁদেরকে দিতেন; প্রত্যেকের জন্য খানিকটা কম্পিউটার টাইম বরাদ্দ করে তাঁদের কাজগুলো করে দেয়া হতো।

মাস্টার্সের থিসিস করতে গিয়ে অবশ্য আমাকে এই কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয়নি। আমার যেটুকু অঙ্ক করার ছিল সেটি এত দীর্ঘ বা কঠিন ছিলনা যে তার জন্য কম্পিউটার প্রয়োজন হবে, কালকুলেটর দিয়েই কাজ চলতো। অবশ্য সেই যুগে হাতে নিয়ে ঘোরার মত ইলেকট্রনিক কালকুলেটর ছিলনা। ওখানে যা ছিল তা হলো টেবিলের উপর বড় বড় ইলেকট্রিক্যাল কালকুলেটর। বেশ সশব্দে সেগুলোতে বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ ইত্যাদি ঝপাং ঝপাং করে হয়ে চলতো।

পদার্থবিদ্যার সাধারণ হিসেব নিকাশের জন্য আরো কম যান্ত্রিক ব্যবস্থাও ছিল। হুবহু উত্তরের বদলে কয়েক দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন উত্তর পেলে চলে এমন হিসাবের জন্য স্লাইড রুল ব্যবহার করতাম—ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের জন্য যেটি সেকালে ছিল একরকম সাইনবোর্ডের মত, ডাক্তারি ছাত্রদের জন্য যেমন ষ্টেথেস্কোপ। আমার কাছে ছিল একটি সস্তা স্লাইড রুল যা সাধারণ রুলারের চেয়ে খুব বড় ছিলনা। এ দিয়ে আমার ল্যাবোরেটরির হিসাব নিকাশগুলির চটপট করে ফেলতে পারতাম। স্লাইড রুলে বড় স্কেলটির মাঝখান দিয়ে একটি ছোট স্কেল সামনে পেছনে আসা যাওয়া অর্থাৎ স্লাইড করতে পারে। মূল স্কেল ও স্লাইড স্কেলের দাগগুলো মিলিয়ে লগ স্কেলে যোগ বা বিয়োগের কাজ হয়। এর অর্থ মূল সংখ্যাগুলোর গুণ-ভাগ। এভাবে পর পর বড় বড় গুণ-ভাগও করে ফেলা যায় শুধু স্কেলটি দু'একবার ঠেলে আনাগোনা করিয়ে। পরীক্ষার সময় আমার নড়বড়ে স্লাইড রুলের উপর ভরসা না করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে গিয়ে আমার স্কুলের বন্ধু শহীদুল হোসেনের কাছ থেকে খুব প্রফেশানাল 'এরিষ্টো' স্লাইড রুলটি ধার করে আনতাম আরো সূক্ষ্ম ফলাফল পাওয়ার জন্য। পরে ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়ে প্রথমেই সোৎসাহে একটি দামি এরিষ্টো স্লাইড রুল কিনে ফেলেছিলাম। কিন্তু হায় ইতোমধ্যে পকেটে রাখার মত এবং হুবহু ফলাফল দেবার

মত বেশ শক্তিশালী ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর চলে আসায় এটি খুব বেশি ব্যবহার করা আর হয়নি। চার বছর পরে যখন দেশে ফিরলাম তখন স্লাইড রুল জিনিসটাই মিউজিয়ামে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

কার্জন হলের ছাত্রজীবন

কার্জন হলে আমার ছাত্রত্বের দিনগুলো ফুরিয়ে আসছিলো। কিন্তু তাই বলে মনে কোন দুঃখ ছিলনা, কারণ আমার মন বলছিলো এখনই না হলেও শিগ্‌গীর কোন একদিন শিক্ষক হিসেবে এখানেই কাজ করবো। পুরো কার্জন হল এলাকাটিই আমাদের কাছে খুবই প্রিয় একটি জায়গা ছিল। এর লাল রঙের সুন্দর ইঙ্গ-ভারতীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন ভবনের সামনে রয়েছে বিস্তৃত সবুজ প্রাঙ্গণ—একে আমরা বলতাম কার্জন হল গ্রিন। আমাদের বিভাগে ঘন ঘন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, আবহাওয়া ভাল থাকলে এগুলো কার্জন হল গ্রিনের ঘাসের ওপরেই অনুষ্ঠিত হতো। সেই প্রথম বছরে আমাদের নবাগত সংবর্ধনা হয়েছিল এখানেই ঘাসের উপর বসে বিভাগীয় প্রধান ইন্নাস আলীর সভাপতিত্বে। অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ছিলাম আমরা, খুবই ঘরোয়া পরিবেশ। এই অনুষ্ঠান শেষে সবাই ইন্নাস স্যারের বাসায় হেঁটে চলে গিয়েছিলাম, সেখানে তাঁর স্ত্রী সবাইকে আম কেটে খাইয়েছিলেন। ক্লাসের ফাঁকে পদার্থবিদ্যার নানা বিষয় নিয়ে আমাদের তর্কগুলোও মাঝে মাঝে এই সবুজ মাঠে গাছের ছায়ায় বসে জমে উঠতো।

মূল কার্জন হল ভবনটি পুরোটাই ছিল পদার্থবিদ্যা বিভাগ—যেমনটি এটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে—সেই সত্যেন বসুর এখানে যোগ দেবার কাল থেকেই। কার্জন হলের বিশাল কারুকার্যময় হলঘরটির এপাশে ওপাশে দুই দিকেই দুই তলার প্রশস্ত সব কক্ষগুলোকে বেশ ঐতিহাসিক ও রহস্যময় মনে হতো। এর অনেকগুলোই ছিল গবেষণা-ল্যাবোরেটরি হিসেবে নির্দিষ্ট। তখনো এই গবেষণায় একটি ক্লাসিক্যাল ভাব ছিল—এর অনেক যন্ত্রপাতি ছিল এখানেই তৈরি, অধ্যাপকরা নিজেরাই ডিজাইন করে তৈরি করাতেন, যেমন করিয়েছিলেন সত্যেন বসু, কৃষ্ণাণের মত বিশ্বখ্যাত অধ্যাপকরা। এর জন্য কার্জন হলের পেছনে যে পুরোনো ওয়ার্কশপটি ছিল সেখানকার কুশলীদের হাতের কাজ দেখলে অবাক হতে হতো। আমাদের সময় ওই কুশলীদের প্রধান ছিলেন যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ অক্ষয় বাবু। অক্ষয় বাবু ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গবেষণাকারীরা গড়ে তুলতেন ধাতুর কাজ, কাচের কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে এক একটি গবেষণা যন্ত্র। প্রয়োজনে এগুলোর মেরামতও হতো এখানে। ছাত্রদের শিক্ষা-ল্যাবোরেটরি কাজও এখানে করা হতো। তবে এ সময় কতগুলো খুব দামি যন্ত্রও আমদানি করে স্থাপন করা হয়—যেমন ইপিআর স্পেকট্রোস্কোপী, এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। প্রথমটি দীর্ঘকাল বহু গবেষণার জন্ম দিলেও শেষেরটি ভাল ভাবে কখনো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গবেষণার এই যে আবহ,

কার্জন হলের অলিন্দগুলোতে এই যে ছাত্র-শিক্ষক গবেষকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা ও কাজ, কনিষ্ঠতর ছাত্র হিসেবে আমাদেরকে খুব উদ্বুদ্ধ করতো। আমার নিজের গবেষণার পালা যখন এলো তখন আমি অবশ্য পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের আধুনিকতর আবহেই সেটি করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মূল কার্জন হল ভবনের পদার্থবিদ্যা বিভাগের মতই প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারতো একটু দূরের রসায়ন বিভাগের সেই একই রকমের লাল ইটের স্থাপত্যমণ্ডিত রসায়ন ভবন। এখানকার গন্ধটিই আলাদা। সাবসিডিয়ারি ক্লাস করার জন্য প্রথম দু'বছর এখানে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। এখানেও ছিলেন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সিনিয়র শিক্ষক—প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর জহির হায়দার প্রমুখ; তবে আমরা রসায়ন শিখতাম তরুণতর ড. মাহবুবুল হক, ড. নওয়াব আলী—এঁদের কাছ থেকে। ল্যাবোরেটরিতে আমাদেরকে মাতিয়ে রাখতেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিক্ষক মহব্বত আলী—যিনি 'বিশুদ্ধ' নোয়াখালির ভাষাতেই আমাদের মধ্যে রাসায়নিক কৌতূহল জাগাবার চেষ্টা করতেন। আসলে ওটি ছিল তাঁর একটি কৌশল—ছেলেমেয়েদের আরো কাছাকাছি যাবার কৌশল। মজার ব্যাপার হলো আমরা পরে ইংল্যান্ডে যখন পিএইচডি'র কাজ করছি, মহব্বত আলী স্যার যথেষ্ট পরিণত বয়সে আমাদের প্রায় একই সময়ে পিএইচডি করেছেন প্রবল উৎসাহ সহকারে। একেই বলে শিক্ষকতার জীবন চিরকাল ছাত্র থাকার জীবন।

রসায়ন বিভাগে একজন ছিলেন যাঁকে অনেকেই জ্ঞান-তাপস বলে অভিহিত করতেন—তিনি হলেন মোকাররাম হোসেন খোন্দকার, দীর্ঘ সময় বিজ্ঞানের ডীন ছিলেন। তিনি ছিলেন গবেষণায় নিবেদিত একজন মানুষ। কিংবদন্তির কথায় শোনতাম যে সত্যেন বসুদের আমলে কার্জন হলের ঘরগুলোতে গভীর রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলতো। শুধু কিংবদন্তি কেন, কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিকথা মূলক লেখায় পড়েছি একদিন সকালে সত্যেন বসু তরুণ প্রভাষক কাজী সাহেবকে একটি গাণিতিক সম্যস্যা সমাধান করতে দিয়েছিলেন। বসুর কক্ষে তিনি দুপুর পর্যন্ত সমাধান না করতে পারাতে ওখানেই দুজনে এক সঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সেই চেষ্টা চলে রাত নয়-দশটা পর্যন্ত। তারপর দু'জনেই চলে যান রাস্তা পার হয়ে (এখন যেখানে দোয়েল চত্বর) বসুর বাসায় (এখন যেখানে বিজ্ঞান লাইব্রেরি)। সেখানে রাতের খাবার খেয়ে গভীর রাতের দিকে সমাধান মিলেছিলো। আমাদের যুগে কার্জন হল এলাকায় এরকম রাতে বাতি জ্বালাবার কারণ ঘটাতেন প্রধানত প্রফেসর মোকাররাম হোসেন খোন্দকার। তাঁর মৃত্যুর পর নির্মিত নতুন বিজ্ঞান ভবনের নামকরণ করা হয়েছিলো মোকাররাম হোসেন খোন্দকার ভবন।

নিজের গবেষণা শুধু নয়, বরং গবেষণা সংগঠনের জন্য সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তখনো কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রফেসর কামাল উদ্দিন আহমেদ। কৃতী

বিজ্ঞানী হিসেবে যাঁকে চট্টগ্রামে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো, এবং আমি কলেজে থাকতে সে ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য সোৎসাহে লিখেছি; আর স্কুলে থাকতে যার আবিষ্কারের কথা শিশুপাঠ্য মার্কিন বইয়ে পড়েছি। তিনি তখনো ছিলেন তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে, বায়োকেমিষ্ট্রি ভবনে—কার্জন হল এলাকার আর একটি সুন্দর লাল ইটের স্থাপত্য। ঠিক একই রকম অন্য ভবন ছিল উদ্ভিদবিদ্যার। কার্জন হলের গা ঘেঁষে আর একটি ভবন তৈরির কাজ আমাদের ছাত্রত্বের শেষের দিকে শুরু হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল পদার্থবিদ্যা বিভাগ সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেয়া, এবং সদ্য সৃষ্ট নতুন বিভাগ ফলিত পদার্থবিদ্যার (অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স) স্থান করে দেয়া। এ সময় রেডিয়ো বিদ্যা, টেলিকম্যুনিকেশন এবং সাধারণ ভাবে ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত অগ্রগতি এবং তাতে প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিকতম পদার্থবিদ্যার গুঢ় তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ অপরিহার্য হওয়াতে এই ফলিত দিকটির আলাদা বিভাগ হওয়া জরুরি মনে হচ্ছিল। তাছাড়া আমাদের একজন খুবই সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর শাহ ফজলুর রহমানের বিষয় ছিল এই দিকটি এবং তিনি এর নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রধানত তাঁকে ঘিরেই বিভাগটি শুরু হয়ে প্রথমে কার্জন হলে ও পরে এই নতুন ভবনে এর ঠাঁই হয়। আমাদের বিভাগের দু'একজন শিক্ষক এতে গেলেন, এবং অনার্স পাশ করে কিছু ছাত্র মাস্টার্স লেখাপড়া পদার্থবিদ্যায় না করে বরং ফলিত পদার্থবিদ্যাতেই করলো। কিন্তু শুরু থেকেই এই ভবনটির নক্সা নিয়ে ভীষণ আপত্তি ছিল। এর স্থাপত্য একে তো কার্জন হল এলাকার বাকি ভবনগুলোর সঙ্গে মোটেই সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না, এমনটি রঙটিও লাল না হয়ে সিমেন্ট রঙের ছিল। তার চেয়েও বড় কথা হলো ঐতিহ্যবাহী বা আধুনিক কোন রকমেরই কোন স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট এর ছিলনা। এলাকায় ঢুকতেই এই বেখাপ্পা দালানটি চোখে খুবই বেমানান মনে হতো।

কার্জন হলের পেছনে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) দিঘির পাড়ে অবশ্য একেবারে সরল স্থাপত্যের একটি নতুন ভবন ছিল; গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা এবং ভূবিদ্যা এসব বিভাগ ছাড়াও বিজ্ঞান লাইব্রেরি তখন এখানেই ছিলো। মাস্টার্সে গবেষণা-ছাত্রের ভাব সাব যখন কিছুটা অর্জন করলাম তখন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মুহতাশাম হোসেন কিছুটা বাধ্য করতেন ওই লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক জার্নালগুলো ঘাঁটতে। এভাবে প্রথম এই কাজটির সঙ্গে পরিচিত হলাম। সায়েন্টিফিক আমেরিকান অথবা নিউ সায়েন্টিস্টের মত জনপ্রিয় জার্নাল আমি বহুদিন ধরেই খুব মজা করে পড়ছি। কিন্তু এরকম কাঠখোট্টা ভাষায়, প্রায়শ জটিল গাণিতিক চিহ্নে লেখা রিসার্চ পেপার পড়ার অভ্যাস কিছুটা কষ্ট করেই এসময় গড়ে তুলতে হলো। কাজটিকে আরো কঠিন করে তুলেছিলো এই জার্নালগুলোর পুরো বছরের সব সংখ্যা একত্র বাঁধাই করা বিশাল বিশাল ভল্যুমগুলো থাকতো লাইব্রেরির ঘিঞ্জি, অগম্য জায়গায়—সেখান থেকে এক একটি ভল্যুম বহন করে এনে ধূলো ঝেড়ে প্রাসঙ্গিক

পেপারটি খুঁজে বের করতে হতো। ওই পর্যায়ের গবেষণায় ওটি যে খুব বেশি করতে হয়েছে তা নয়, তবে তাও একটি অভিজ্ঞতা বৈ কি।

ঐ একই ভবনে আর একটি এলাকা কিন্তু আমার খুব প্রিয় জায়গা ছিল—সেটি হলো ভূ-তত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়াম। এই একটি চমৎকার সংগ্রহশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বহু কাল ধরে গড়ে তুলেছিলো। এতে বিভিন্ন ধরনের শিলা, স্ফটিক ইত্যাদি ছিল। এর মধ্যে ছিল আদি আগ্নেয় শিলা, সেটি ক্ষয় হয়ে হয়ে গুড়ো পলি জমে জমে স্তরে স্তরে গড়ে উঠা পাললিক শিলা, আবার ওই পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল পাথরের মত রূপান্তরিত শিলা—স্কুলে পড়া এই জিনিসগুলো সত্যি সত্যি বাস্তবে দেখে খুবই ভাল লাগতো। বিশেষ করে শিলার স্তরগুলো এত সুন্দর এত স্পষ্ট; এগুলো যে কোটি কোটি বছরের ইতিহাস ধারণ করে আছে—সেই ব্যাপারটিই চমকপ্রদ লাগতো। আবার একেবারে বড় মিছরির মতো স্বচ্ছ কোয়ার্টাজ ইত্যাদি স্ফটিক যার মধ্যে চতুর্ভূজ, ষড়ভূজ তলগুলো স্পষ্ট হয়ে এসেছে দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগতো। তবে সব চেয়ে অবাক হবার মতো জিনিস ছিলো এই মিউজিয়ামের ফসিল সংগ্রহ। একদম গাছের গুড়ির মত দেখতে, অথচ নিরেট পাথর বৈ নয়, এক কালের গাছ পরবর্তী কালে পাথরে পরিণত হয়েছে—ঐ এবড়ো খেবড়ো বাকল, কর্তিত অংশে একের ভেতর এক গাছের রিং হুবহু সব কিছু আছে, কিন্তু সব পাথর। এভাবে গাছ, পাতা, বীজ, এসব তো বটেই মাছ, ছোট ছোট স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ইত্যাদিরও প্রস্তরীভূত রূপ—ফসিল। অবাক হয়ে দেখলাম এর বেশ কিছু ফসিল আমাদের দেশ থেকেই সংগৃহীত।

কার্জন হলের এলাকায় বিভিন্ন ভবনের মধ্যে বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে যে শিক্ষাদান হতো, যে গবেষণা কাজ হতো, এক সঙ্গে তার একটি প্রকাশ সর্ব সাধারণের জন্য উন্মোচিত হতো প্রতি বছর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে। সেদিন শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্ররা বিশেষ করে গবেষণা-ছাত্ররা তাদের যন্ত্রপাতিগুলো নিজ নিজ বিভাগের নিজ নিজ গবেষণা কক্ষে সাজিয়ে রাখতেন, এর ব্যাখ্যা করে নানা কথা ও ছবির পোস্টার সহ। সারাদিন ধরে দর্শকরা আসতো—সাধারণত বিভিন্ন কলেজ থেকেই ছাত্ররা আসতো, আসতেন তাদের অভিভাবকরা। এক একটি বিভাগের প্রদর্শনী দেখতে গেলে বোঝা যেত সেই বিষয়টির স্বাদ-গন্ধ, কী নিয়ে তার কারবার, ওখানে যে গবেষণা হচ্ছে ভবিষ্যতে সেগুলো কোন দিকে যাবে, কী ধরনের সমস্যার সমাধান করবে। যথেষ্ট ভীড় হতো এ সব প্রদর্শনীতে। আমরা বিভাগে নানা দায়িত্ব পালন করতাম, মাইকে আমাদের প্রদর্শনীগুলো সম্পর্কে আকর্ষণীয় ঘোষণা দিতাম। এর মধ্যেও আমি চেষ্টা করতাম অন্যান্য প্রত্যেকটি বিভাগের বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনী দেখতে, এ নিয়ে প্রদর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে। বিভিন্ন বিষয়ে নতুন কিছু অগ্রগতি চাক্ষুষ দেখতে পারার ব্যাপারে আমার এমনিতেই প্রচুর কৌতূহল থাকতো; তা ছাড়া প্রত্যেকবার এটি বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য একটি বড় উপজীব্য হতো—দেশের বিজ্ঞানীদের কিছু কাজ তুলে ধরার এই ভাল সুযোগ। এটি আমি যত বিস্তারিত ভাবে ও যত আকর্ষণীয় ভাবে সম্ভব নিজেই করার চেষ্টা করতাম।

কার্জন হল এলাকাটি বেশ বিস্তীর্ণ এবং স্থাপত্য সুশোভিত হলেও সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটি হলো মূল কার্জন হল অর্থাৎ আমাদের পদার্থবিদ্যা বিভাগ। কার্জন হল গ্রিনের একটি অনুষ্ঠানের কথা খুব মনে পড়ে এর সঙ্গে জড়ানো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীর কারণে। মোনেম-সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপের মাত্রা যখন খুব বেড়ে গিয়েছিলো সেই সঙ্গে বেড়ে গিয়েছিলো সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মদদপুষ্ট এনএসএফের পেটোয়া বাহিনীর দৌরাত্ম। আমাদের শিক্ষক জয় কুমার সারোগী ঢাকা হলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সেই হলেই ছিল এনএসএফ গুণ্ডামির প্রধান হোতাদের আশ্রয়। এরকম কোন গুণ্ডামির ঘটনায় প্রতিবাদ করাতে তিনি ওদের দ্বারা ছুরিকাহত হয়েছিলেন। তাঁর মতো অমায়িক এবং জনপ্রিয় একজন শিক্ষকের উপর এই আক্রমণ সবার মধ্যে খুব ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলো। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে নেয়া হলে তারা নাকি আক্রমণকারী ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেছিলো। যদিও পঞ্চাশ টাকার দাম তখন আজকের মূল্যমানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, তবুও এমন ভয়ানক অপরাধের শাস্তি বহিষ্কারের বদলে এই সামান্য অর্থদণ্ড হওয়াতে সবাই খুব স্তম্ভিত হয়েছিল—কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। এই ক্ষোভের অন্য রকম বহিপ্রকাশ হলো কার্জন হল গ্রিনে আমাদের বিভাগের অনুষ্ঠানে।

সেটি ছিলো ১৯৬৫ সালে, সে বছর যারা বিভাগ থেকে পাশ করে চলে যাবে তাদের বিদায় সংবর্ধনা। এই দলে একজন তুখোড় ছাত্র ছিলেন মুশফিকুর রহমান (পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক); তুখোড় শুধু পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসেবে নয়, বরং বামপন্থী রাজনীতির বোদ্ধা ও সক্রিয় কর্মী হিসেবে, এবং অত্যন্ত সমাজ সচেতন বুদ্ধি-দীপ্তির কারণেও। রাজনীতিই হোক আর পদার্থবিদ্যাই হোক মুশফিক ভাইয়ের সরস কথাগুলো আমরা খুব উপভোগ করতাম। ওই বিদায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ওসমাণ গণিও উপস্থিত ছিলেন। মুশফিক ভাই বিদায়ীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সারোগী স্যারকে ছুরিকাহত করার প্রসঙ্গ তুললেন; বল্‌লেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে এভাবে আহত করলে ছাত্রের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে যদি রাস্তা পার করে হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিই তা হলে আমার কতটাকা জরিমানা হতে পারে? এ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মুশফিক ভাই পিন পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন। শোনেছি এই মুশফিক ভাই পরে যখন পি এইচ ডি'র জন্য ওখানে পড়াশোনা করছিলেন ১৯৬৮ তে প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট দ্যগল বিরোধী বিখ্যাত 'ছাত্র বিদ্রোহে' সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আটষট্টির সেই ছাত্র বিদ্রোহ ফ্রান্স ও দ্যগলের রাজনৈতিক ইতিহাসে, এবং পুরো ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু মুশফিক ভাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে এরও বেশ কয়েক বছর পর সত্তরের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আমার কামরায়। হঠাৎ দীর্ঘ দাড়ি, ও লম্বা ঝুল বিশিষ্ট পাগড়ি, পা

পর্যন্ত বিস্তৃত জোব্বা পরা একজন তরুণ ওখানে এসে ঢুকলেন লম্বা করে 'আস্‌সালাম আলাইকুম' বলে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে তাবলিগ জামাতের কেউ তাবলিগী দাওয়াত দিতে এসেছেন। কথাটি ঠিক, তাবলিগের মানুষ ঠিকই; কিন্তু ওই দাড়ি, পাগড়ি, জোব্বার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো সেই দারুণ স্মার্ট সাহসী বামপন্থী মুশফিক ভাইয়ের চেহারা—আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে খুব মজা পাচ্ছিলেন, মুচকি মুচকি হাঁসছিলেন।

'জাতি, সমাজ ও বংশগতি'

পদার্থবিদ্যার ওই ছাত্র থাকাকালীনই জীবনে প্রথম বারের মত কেউ আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাকে একটি লেখার কাজ দিল। বাংলা একাডেমি তখন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু বইয়ের অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলো। একাডেমিতে যাঁরা আমাকে চিনতেন তাঁদের ধারণা হলো সে সময়ের বহুল আলোচিত একটি বই 'হেরেডিটি, রেইস, অ্যান্ড সোসাইটি' অনুবাদ করার জন্য আমি উপযুক্ত ব্যক্তি হবো। বইটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত—লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দু'জন অগ্রণী জীব-বিজ্ঞানী এল সি দুন এবং থিয়োডোসিয়াস দোভজানস্কি। এতে জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যায় তখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছিলো অবিশেষজ্ঞদের বোঝার উপযুক্ত করে তার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার ভাল লাগলো যে বাংলা একাডেমি এমন একটি বিষয়ের বই অনুবাদ করতে আমাকে দিলো যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার লেখাপড়ার বিষয় নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভিন্ন শাখার সঙ্গেও যে আমার কিছুটা পরিচিতি রয়েছে সে ব্যাপারে তাঁরা আমার উপর আস্থা রেখেছিলেন; আর হয়তো মনে করেছিলেন যে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ বাংলায় সেগুলো তুলে ধরার কাজটি আমি বিশেষজ্ঞদের তুলনায় ভাল করতে পারবো। বইটি সাধারণ পাঠ্য হিসেবে রচিত হলেও লেখকদ্বয় এতে বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি ও জটিলতর বিষয়গুলোকে মোটেই এড়িয়ে যেতে চাননি। এমনকি যে সব সংখ্যাতাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা আধুনিক জেনেটিক্সকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বাদ যায়নি এই জনপ্রিয় বই থেকে। কাজেই প্রথমত বক্তব্যগুলো ভাল ভাবে বোঝা এবং তারপর তা বাংলায় লেখা এই দু'ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল এতে। বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য ক্রমাগত লিখতে হওয়ার কারণে এই চ্যালেঞ্জ আমার একেবারে অপরিচিত ছিলনা, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ক্লাসিক বইয়ের বিষয় বলে এই ব্যাপারটি ভিন্ন।

এই অনুবাদের কাজটি তাই শুধু আমার প্রথম বই প্রকাশের কারণে স্মরণীয় ছিলনা, বরং দিনের পর দিন নিয়ম করে এই অনুবাদটি করতে গিয়ে এরকমের বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি বাংলায় প্রকাশের কায়দা নিয়ে আমারো নিজস্ব কিছু ভঙ্গি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেটি একটি সুযোগ ছিলো। মনে রাখতে হবে সে সময় শুধু স্কুল পর্যায় পর্যন্তই বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয় বাংলায় পড়া হতো। তাই সব বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা ছিলনা। থাকলেও আমি তার সবগুলো ব্যবহার করতাম কিনা

সন্দেহ আছে, কারণ অভিধানে অথবা কিছু কিছু বইয়ে যে পরিভাষা কিছু কিছু পাচ্ছিলাম তার অনেকটাই আমার পছন্দ হয়নি, ব্যবহার করলে অনুবাদটি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে মনে করে। কাজেই অনেক কিছু নিজের মত করে তৈরি করে নিতে হচ্ছিল। এসব এক দিকে যথেষ্ট চিন্তার বিষয়, অন্যদিকে দারুণ আনন্দের—উভয়ের সমন্বয়ে বেশ উত্তেজনাকর ছিল এই কাজটি।

ঐ ১৯৪৭ সালে দুন ও দোভজানস্কি যখন বইটি লিখছিলেন, তখন কিন্তু ডি এন এর গঠন তাঁদের জানা ছিলনা। তখন সদ্য (১৯৪৪) এইটুকুই আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে বংশগতির বাহক হচ্ছে ডিএনএ। অর্থাৎ বাবা-মা'র বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে বহন করে নিয়ে যায় ডিএনএ, নিজের মধ্যে এসবের কোডিং করার মাধ্যমে। এদিক থেকে বইটি জেনেটিক্সের আধুনিকতম ও সরলতর আবিষ্কারগুলোর সুযোগ নিতে পারেনি বরং ক্লাসিক ধরনের জেনেটিক্স যা রক্তের গ্রুপ, ফলের মাছির উপর গবেষণা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল। অনুবাদ করার সময় আমার ভাসা ভাসা জানা ছিল যে ইতোমধ্যে ১৯৫৩ সালে ডিএনএ গঠন উদ্ঘাটিত হয়ে তাতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাবে বংশগতি বহনের জন্য কোডিং এর পদ্ধতিও (ষাটের দশকে) আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে কিছুটা বাসি তত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও, দুন ও দোভমানস্কির বইটির তখনো অন্য বিশাল আবেদন ছিল। বিশেষ করে দোভজানস্কি বিখ্যাত ছিলেন যে আবিষ্কারের জন্য তা হলো যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে জীব বিবর্তন হয় একটি বড় জনসংখ্যায় কোন একটি বৈশিষ্ট সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে কিছু বেশি সদস্যের মধ্যে দেখা দেয়ার মাধ্যমে। ওই জনসংখ্যায় কোন বিশেষ সদস্যের ক্ষেত্রে ওই গুণ থাকতেই হবে, অথবা থাকতে পারবেনা এমনটি মনে করার কোন অর্থ নেই। অথচ এমনিতরো যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী কোন কোন গোষ্ঠীর বা জাতির মধ্যে বুদ্ধিমত্তার বা এমনি অন্য গুণের একচেটিয়াত্ব দাবি করছিলো, আফ্রিকান এবং অন্য কোন কোন বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এই গুণ নেই বলে প্রচার করছিলো। আরো ভয়ঙ্কর কথা হলো এমন সব তথাকথিত জেনেটিক্সের দোহাই দিয়ে ইউজেনিক্স বা সুপ্রজনবিদ্যা নামের একটি মতবাদের প্রচলন হয়েছিলো যারা চাইছিলো শুধু উন্নত গুণ সম্পন্ন তথাকথিত উন্নত বংশগতির মানুষরাই যেন ভবিষ্যতে থাকে সে জন্য অন্যদের বংশবৃদ্ধি আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে। মহাপরাক্রমশালী একনায়ক হিটলার এই মতবাদ অনুসরণ করেই 'দুর্বল' বংশগতির জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লেগেছিলেন। 'হেরেডিটি, রেইস অ্যান্ড সোসাইটি' বইটি নৈতিক দিক থেকে নয় বরং স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকেই ওরকম ধারণার গোড়ায় কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করেছিলো। এই বই প্রকাশের দু'বছর আগে হিটলারের পতন হলেও ওই তথাকথিত উন্নত বংশের ধারনা বহু দেশের, বিশেষ করে খোদ আমেরিকার বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলো।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি আরো বেশি করে করে সব বিজ্ঞানকে এক করে দেখতে অভ্যস্ত হলাম, বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে আগ্রহ আরো অনেক বেড়ে

গেল। পরে বাংলা একাডেমি থেকে আমার এই প্রথম বইটি (অনুবাদ) প্রকাশিত হতে দেখলাম, খুব ভাল লেগেছিলো। এই বইটি একাধারে যেমন বিজ্ঞানের খুবই রহস্যময় একটি দিকের জটিল তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ধ্যান ধারণায় তার ভুল-শুদ্ধ নানা রকম প্রভাবের বিষয়টিকেও জোরালো ভাবে এনেছে। বিজ্ঞানের সত্যিকারের রূপটিকে সাধারণ মানুষের বোঝার মত করে তুলে ধরতে পারা যে কত গুরুত্বপূর্ণ—সেটি নতুন করে উপলব্ধি করলাম। এ সময় আবিষ্কার করলাম যে খুব সুন্দর আধুনিক স্থাপত্যরীতিতে গড়া ঢাকার নতুন পাবলিক লাইব্রেরি ভবনটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের চমৎকার সব বই রয়েছে—ক্লাসিক, সাম্প্রতিক, সব রকমের। বিশেষ করে যে বিভিন্ন ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া এখানে আছে সেগুলোও পছন্দ মত নানা বিচিত্র বিষয়ে বেশ গভীর ভাবে বিচরণ করার জন্য বেশ উপযোগী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান লাইব্রেরিতে বহু বই থাকলেও তার বেশির ভাগ পাঠ্যবই ও গবেষণা সংক্রান্ত—ঐ জনপ্রিয় বইয়ের ক্ষেত্রে তা ছিল দুর্বল। ওই সুন্দর পাবলিক লাইব্রেরি ভবনটি অবশ্য পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লাইব্রেরিতে অঙ্গীভূত হয়েছে। তখন যেটুকু সময় পারি ওই বই পড়ার ও ঘাঁটার লোভে প্রায়ই ওখানে যেতাম। সিঁড়ির বদলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে যে ঢালু পথটি দোতলায় ওঠে যেত তাতেও একটি চমৎকার আধুনিকতা ছিল। তার নিচে ও আশপাশে ছিল ভাস্কর নভেরা আহমদের বিশেষ ঢঙের চমৎকার কাজগুলো—যে নভেরা আহমদ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল সত্ত্বেও কখনো কিছু জানতে পারিনি। অতি সম্প্রতি (মে,২০১৫) প্যারিসে নভেরার মৃত্যু হলে অবশ্য তাঁর আগের ও সাম্প্রতিক জীবন সম্পর্কে সামান্য কিছুটা উঠে এসেছে। ওই ভবনের চত্বর ঘেঁষে তখন সদ্য গড়ে উঠছিলো শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন। সেখানে গেলে কখনো কখনো আমার ছাত্র-রাজনীতির বন্ধুদের কারো কারো দেখা মিলতো, তার চেয়েও বেশি দেখা মিলতো একটু বোহেমিয়ান, দার্শনিক গোছের বন্ধুদের। মধুর ক্যান্টিনে রাজনীতি বেশি হলেও এই শেষোক্তদের কারণে শরীফ মিয়ার আকর্ষণ ছিল আমার কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি। ক্যান্টিনের ভেতরটি খুব স্বল্প পরিসর হলেও বাইরে ঘাসের উপর বোহেমিয়ানদের আড্ডাটি জমতো ভাল। ওদের বেশ কয়েকজন ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। এর মধ্যে পদার্থবিদ্যায় আমার নিজের সহপাঠীদের মধ্যে বেশি কেউ না থাকলেও কিছু পরের ছাত্রদের বেশ কয়েকজন ছিলো। তাদের একজন সাইফুল কামালের সঙ্গে তখন বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করে খুবই তৃপ্তি পেতাম। সাইফুল পরে বিদেশে একজন কৃতী পদার্থবিদ হিসেবে কাজ করার সময়ও তার এই দিকটি বজায় রেখেছিলো। বিদেশে মাঝে মাঝে দেখা হওয়া এবং ওই রকম আড্ডা দেয়ার সুযোগ পাওয়া ছাড়াও পরে সে বেশ কয়েক মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে এসে আমাদের বিভাগে কাজও করেছে।

নতুন পরিচয়ে একই জগত

কার্জন হলে শেষ পরীক্ষা

কার্জন হলের যে মূল হলটি সেটি রীতিমত একটি রঙমহলের মতো—চারদিকে সারাটা দেয়াল জুড়ে বিরাট বিরাট খিলানের সঙ্গে ভারী অলঙ্কৃত কাঠের দরজা, তার ওপরে তিন দিক জোড়া একের উপর এক দুই তলা অলঙ্কৃত প্রশস্ত ব্যালকনি; অন্য দিকটায় বেশ উঁচু বিশাল মঞ্চ; এই মঞ্চে ওঠে সামনের দিকে তাকালে দৃষ্টি চলে যায় হল ছাড়িয়ে, সামনের বিশাল আরো দরাজ সিংহ-দরজা ছাড়িয়ে, কার্জন হল গ্রিনে, এবং তারও দূরে রাস্তা ছাড়িয়ে হাইকোর্টের দিকে। এখানে এক সময় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এখানে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখেছি, জমজমাট অনুষ্ঠান দেখেছি। শব্দ শোনার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে বলে শেষ পর্যন্ত এটি ওভাবে আর অনুষ্ঠানাদিতে বেশি ব্যবহৃত হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি থেকে কার্জন হলের আর একটি ব্যবহার আরো নিয়মিত ভাবে চলে এসেছে ছাত্রদের কাছে যার অনুষঙ্গ খুব সুখকর নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পরীক্ষাগুলোর স্থান এটি—সব ছাত্র ছাত্রীর জন্য। পরীক্ষার সময় পুরো হল জুড়ে বিশেষ ভাবে চেয়ার-টেবিল পাতা হয় সারিবদ্ধ ভাবে। প্রায়শ উপরের দুই তলা ব্যালকনিগুলোও বাদ যায়না। পরীক্ষকরা মঞ্চে বসে সবার উপর নজর রাখতে পারেন। অতীতে বহুবারের মতো মাস্টার্স পরীক্ষা দিতেও বসলাম এখানে।

কার্জন হলে আমার শেষ পরীক্ষাটি শেষ হয়ে গেল। অনার্স পরীক্ষার মত ওরকম মানসিক চাপের পরীক্ষা নয় এটি; তবুও ধকল কম গেলো না। এরপর পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে গিয়ে গবেষণার কাজ করার সময় বেশি পেলাম। কিন্তু সব কিছু আমার ইচ্ছেতে হয়না বলে, এক্সপেরিমেন্টের সুষ্ঠু অগ্রগতি নিয়ে কখনো উৎসাহিত, আবার কখনো নিরুৎসাহিত হতে হচ্ছিলো। তাছাড়া লিখিত পরীক্ষার জন্য কিছুটা সময় ভিপিগিরি থেকে সরিয়ে রাখতে পারলেও বেশি দিন এটি তা আর রাখা যাচ্ছিল না। তাই ছাত্র নেতা এবং গবেষণা-ছাত্র উভয় ভূমিকায় কাজ

করতে হচ্ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে থিসিস জমা দেবার, ও সামগ্রিক ভাবে সবগুলো বিষয় এবং থিসিসকে নিয়ে একটি মৌখিক পরীক্ষা দেবার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছিল। কাজেই উভয় ভূমিকা ভাল ভাবে পালন করতে আদাজল খেয়ে লেগে যেতে হলো।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খুব বড় কিছু তখন ঘটছিলোনা—কিন্তু আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত থম থমে। ছয়দফার সাহসী প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান সহ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা তখন জেলে। যদিও এপসুতে বাইরে বাইরে আমরা ছয়দফা সম্পর্কে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে খুবই আস্থাবান ছিলাম, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে এ নিয়ে অস্থিরতা ছিল। এর ফলে ছাত্র রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের গুরুত্বে পরিবর্তন আসাটি অপ্রত্যাশিত ছিলনা। সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনে গত কয়েকবার এপসু যে ধারাবাহিক ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে, আমার ভিপিগিরির সময়ে এসে সেটি বড় রকম ধাক্কা খেলে কিছু দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে—জনমত সৃষ্টি ও সংসদের কাজে সবার মধ্যে সন্তুষ্টি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবার জন্য। কাজেই ভিপিগিরির শেষার্ধে এসে দলীয় ও ছাত্রসংসদের কাজ বাড়ানো ছাড়া কমানোর কোন সুযোগ ছিলনা। সংসদের সামনে হলের কিছু সংস্কার কাজ অপেক্ষা করছিলো—সেগুলো হচ্ছে হবে করে হয়ে উঠছিলো না। এ নিয়ে জাতীয় পত্রিকায় পর্যন্ত সচিত্র লেখালেখি হয়েছে। এর মধ্যে বৃষ্টিতে ঘরে পানি পড়া থেকে শুরু করে এই যথেষ্ট পুরোনো ভবনে শ্যাওলার উৎপাত, স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবনতি ইত্যাদি সবই ছিল। গভর্নর আজম খানের উদ্যোগে ডাইনিং রুমের চেহারার যে আমূল পরিবর্তন হয়েছিলো এখন তাও একেবারে মলিন হয়ে পড়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগের উপর চাপ প্রয়োগ করতে এনএসএফ সদস্যরা সহ বৈঠক করলাম বার বার—এতে কিছু ফল হলো। ওদের উপর আমার ব্যক্তিগত প্রভাবটি এক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগলো।

রাজনৈতিক দিকটি ছিল আরো কঠিন—আর তার ফলাফল কী হচ্ছে তা সহজে বুঝে উঠতে পাবার উপায় ছিলোনা। ছাত্র লীগ এবং মতিয়া গ্রুপ এপসুর প্রচারণার ফলে মেনন গ্রুপ এপসু সে সময় বেশ কিছুটা চাপে ছিল। ওরা ছয়দফা এবং তা নিয়ে পরিচালিত আন্দোলনের সৃষ্ট উৎসাহের সুযোগটি পুরোদমে নেবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে সবকিছুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি শ্লোগানে পরিণত করা সম্ভব ছিলনা। ১৯৫৪ সন থেকে যে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা মাওলানা ভাসানীর অনুসারীরা বলে আসছেন আমরা তার উপরেই জোর দিচ্ছিলাম। জনতার রক্ষাকবচ ছাড়া ছয়দফা যে অর্থহীন সেটি বোঝাতে গিয়ে এপসু অনেকের বিরাগভাজন হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' এই নতুন শ্লোগান যে তখনই জনমতে একটি জোয়ার নিয়ে এসেছে তাও কিন্তু নয়। অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সলিমুল্লাহ হলে ছাত্ররা স্বায়ত্তশাসনের পুরো ব্যাপারটিকে আরো সুচিন্তিত ও সামগ্রিক ভাবে দেখতে

আগ্রহী। কাজেই সামনের হল নির্বাচনকে লক্ষ্য করে এ সম্পর্কে আমাদের অবস্থানের উপর হলে সভা, আলোচনা ইত্যাদি চালিয়ে গেলাম; অন্যখান থেকে, বিশেষ করে পাশে ইকবাল হল থেকে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারণা সত্ত্বেও।

এর মধ্যে থিসিসে কাজও যথা সময়ে শেষ করলাম, মৌখিক পরীক্ষাও হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন পরীক্ষার পুরোই পাটটি চুকিয়ে সেখানে শুধু ফলাফলের অপেক্ষা। আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আমি বহু আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাটাই ছিল সব সময়ের লক্ষ্য। আমার শিক্ষকরাও তাই জানতেন, এবং আমাকে অবহিত রেখেছিলেন যে শিগ্‌গীর বিভাগে নতুন লেকচারার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। অনার্সে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করা আমরা ছিলাম গবেষণা অর্থাৎ থিসিস গ্রুপে। মাস্টার্সে যে বৃহত্তর গ্রুপটি গবেষণা না করে শুধু কোর্স ও ক্লাসের এক্সপেরিমেন্ট করে পরীক্ষা দেয় (জেনারেল গ্রুপ) তাদের ফলাফল আলাদাভাবে আগেই প্রকাশিত হয়ে যায়; এবারো তাই হয়েছিলো। দেখা গেলো ওই ফলাফলের পরে পরেই বিজ্ঞাপন দেয়া হলো, এবং শিগ্‌গীর সাক্ষাৎকারের তারিখটিও দেয়া হলো থিসিস গ্রুপের ফলাফল প্রকাশের ঠিক আগে করে। আমি যথারীতি দরখাস্ত করেছিলাম, আমাদের ফলাফল আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত না হলেও ফলাফল তৈরি ছিল এবং তা সাক্ষাৎকারে উপস্থিত বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকরা তা জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অঘোষিত ফলাফলকে বিবেচনায় আনা হলো না। বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মতিন চৌধুরী স্পষ্ট বলে দিলেন যে আমরা এখনো মাস্টার্স পাশ করিনি, জেনারেল গ্রুপের প্রার্থীরা পাশ করেছে, কাজেই এ যাত্রা তাদের মধ্য থেকেই নিয়োগ দিতে হবে। অতএব কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছায় তারিখের মারপ্যাঁচে আপাতত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার না হয়ে বরং পরমাণু শক্তি কমিশনের 'সায়েন্টিফিক অফিসার' হিসেবে গবেষণার কাজে যোগ দিলাম। পরমাণু শক্তি কমিশন তখন যোগ্য গবেষকদের খোঁজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো। তাদের কাছে আমাদের পূর্বতন রেকর্ডই যথেষ্ট, মাস্টার্স পরীক্ষা দিলেই তারা ফলাফলের আগেই নিয়ে নিচ্ছিলেন এমন ছাত্রদের। অনার্সে যারা আমার থেকেও ভাল করেছে তারা সহ আমার বেশ কয়েকজন সহপাঠী ইতোমধ্যেই দিব্যি সেখানে 'সায়েন্টিফিক অফিসার' হয়ে গেছে; এখন বাধ্য হয়ে আমিও তাদের দলে যোগ দিয়ে দিলাম। এভাবে 'কর্মজীবনে' প্রবেশ করার দু'চার দিনের মধ্যে অবশ্য আমাদের ফলাফলও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হলো : ঠিক অনার্সের মত ফল হলো—ফার্স্ট ক্লাস চতুর্থ।

দুই নৌকার যাত্রী

চাকরিতে যোগ দেবার পর অল্প কিছু দিনের জন্য আমার পরিস্থিতি হলো দুই নৌকার যাত্রীর মত। আমার তখন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়—পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের একজন সায়েন্টিফিক অফিসার, আবার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের

ভিপি; উভয় দায়িত্বই পালন করতে হচ্ছে। থাকি যথারীতি হলে ভিপি'র কক্ষে, সন্ধ্যায় সেখানে ভিপির অফিস করি, রাতে এপসু'র সভাসমিতি করি বা রাজনৈতিক আড্ডা দিই; আবার বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লেখালেখিও করি। সকালে যথারীতি পরমাণুর ছবি সুশোভিত আধুনিক গবেষণা কেন্দ্রের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। আগে যেমন দিনগুলো আবর্তিত হতো হল আর বিভাগের মধ্যে, এখন তা আবর্তিত হচ্ছে হল আর পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের মধ্যে। ইতোমধ্যে আমার ব্যাচের ছাত্ররা হল ত্যাগ করেছে, 'ফেডারেল ব্লকে' তাদের কক্ষগুলোতে সদ্য অনার্স অথবা প্রিলিমিনারি (দুই বছর এম এস সি'র প্রথম বছর) পাশ করা ছাত্ররা চলে এসেছে। আমিই শুধু থেকে গিয়েছি এখনো হলের ভিপি হিসেবে।

পরমাণু শক্তি কমিশনের তখন একটি স্বর্ণযুগ যাচ্ছিল। প্রফেসর আবদুস সালামের উৎসাহে স্থাপন করা এই প্রতিষ্ঠান দেশের অন্যান্য উদ্যোগের তুলনায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিলো। যেটুকু বোঝা যাচ্ছিল এর দুটি উদ্দেশ্যে ছিলো এক, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পারমাণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা এবং দুই, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতের নিউক্লিয়ার অস্ত্র অর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেও এটি অর্জন করা। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলামাবাদের কাছে নিলোরে এর জন্য একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র পিন্সটেক (পাকিস্তান নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট) স্থাপন করা হয়েছিলো। এর জন্যও প্রচুর মেধাবী গবেষক প্রয়োজন ছিল। আমি যখন কমিশনে যোগ দিই তখন এর পরিচালক ড. আনোয়ার হোসেন (পরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান) সদ্য পিন্সটেকে বদলি হয়ে গেছেন। এই সব কর্মকাণ্ড চলছিল আবদুস সালামের উপদেশে ও তত্ত্বাবধানে, এবং কমিশনের চেয়ারম্যান পশ্চিম পাকিস্তানি ড. আই এইচ উসমানির পরিচালনাধীনে। উসমানী সাহেব পুরোনো, জাদরেল সিভিল সার্ভিস অফিসার; অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী ও প্রভাবশালী মানুষ। পরে তিনি যখন অবসর নিয়েছেন তখন তাঁর পূর্ব জীবন ও পরমাণু শক্তি কমিশন গড়ে তোলা নিয়ে বাংলাদেশে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। তখন দেখেছিলাম সিলেট জেলাটির প্রতি তাঁর খুবই উৎসাহ, যেন ওটাই তাঁর বাড়ি। সিভিল সার্ভিসের গোড়ায় দিকে সিলেটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণেই এর প্রতি তাঁর এত মায়া। কমিশনে একজন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কয়েক জন সদস্য ছিলেন। আমাদের পদার্থবিদ্যা বিভাগের দুই প্রফেসর ইন্নাস আলী এবং মতিন চৌধুরী পালা করে এর গবেষণা সদস্য ছিলেন। আমাদের প্রথম বর্ষে কিছু দিন ইন্নাস আলী সাহেব বিভাগীয় প্রধান হিসেবে থেকে কমিশনের সদস্য হয়ে চলে যান। তখন মতিন চৌধুরী সাহেব বিভাগীয় প্রধান হন।

ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্র বলতে গেলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভেতরেই, এবং এটি মোটেই আমার অপরিচিত জায়গা নয়। কয়েক দিন আগেও

আমাকে থিসিসের কাজে এখানেই অনেক সময় কাটাতে হয়েছে। এখন কিন্তু আনকোরা সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে নিজেদেরকে কিছুটা অবহেলিতই মনে হলো। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে আহমেদ শফি, ফজলুর রহমান, এনায়েতুল্লাহ, সানাউল্লাহ—আমরা বেশ ক'জন তখন এতে যোগ দিয়েছি। নবাগত সবাইকে একটি বড় কক্ষে বসতে দেয়া হলো। কক্ষটিকে বলা হতো 'মডেল রুম'—কারণ কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট টেবিলের উপর তারই সমান সাইজের কাচের বাক্সে অনেক দালান-কোঠার একটি স্থাপত্য মডেল ছিল—কমিশনের ভবিষ্যৎ উদ্যোগগুলোর স্থাপত্য অবয়ব কেমন হবে, তারই মডেল। হয়তো এই কক্ষটির উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাগতদের যেন এর চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মডেলটি দেখানো যায় তাই। ইতোমধ্যে আমরা চলে আসাতে জায়গার অভাবে আমাদেরকে এই কক্ষে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গের এলাকা, কম্পিউটার ভবন, কারখানা—এগুলো আমার একেবারেই পূর্ব পরিচিত জায়গা। এখানে বিচরণ করা যেতো ইচ্ছে মত। তাছাড়া পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের লাইব্রেরিটাও চমৎকার খুব আধুনিক; যদিও এর সবই প্রায় বিশেষায়িত বই ও ম্যাগাজিন। তবে একটি এলাকা কিন্তু আমাদের জন্যও প্রবেশ নিষেধ ছিল। কেন তা কেউ বলতোনা। তবে গুজব ছিল যে ওখানে নাকি চলছ 'প্রজেক্ট উসমানি' অর্থাৎ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা। হয়তো কথাটি নেহাত গুজবই।

এম এস সি পাশ করেছি, দেশের কুলীন প্রতিষ্ঠান পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরি করছি; কিন্তু ঢেকি মক্কায় গেলেও যেমন ধান ভানে আমাদেরও তাই চলছে। নবাগতদের এখানে ইলেকট্রনিক্স, ফোরট্রান (পদার্থবিদরা বেশি ব্যবহার করে এমন প্রোগ্রামিং ভাষা) কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখা ইত্যাদি নানা কোর্সে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে—অর্থাৎ ছাত্রের মতই ক্লাস করছি, পুরাতন সহপাঠীদের সঙ্গেই। আর অন্যদিকে সলিমুল্লাহ হলে ছাত্র সংসদের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছি এখনো। কাজেই এখনো নতুন পরিচয়ে পুরোনো জগতেই বাস করছি।

এদিকে হলে নির্বাচন এসে পড়লো। এটিই হবে ভিপি হিসেবে এখানে আমার শেষ কাজ। এর পর নতুন নির্বাচিত সংসদ দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমার ছুটি। এবার নির্বাচনে এপসুর সম্ভাবনা নিয়ে আমরা একটু চিন্তিত ছিলাম। ছয়দফা নিয়ে আন্দোলনে ছাত্রদের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছিলনা। তবে তাই বলে এপসু তার নিজস্ব নীতি ও বক্তব্য থেকে মোটেই বিচ্যুত হয়নি। এর প্রমাণ এপসুর ভিপি প্রার্থী হিসেবে যখন জিশান হোসেনকে প্রস্তাব করা হলো দলের সবাই খুব সোৎসাহে মেনে নিলো। জিশান খুবই সমাজ সচেতন অত্যন্ত বিনয়ী ও বিদগ্ধ মানুষ—অর্থনীতির তুখোড় ছাত্র; তবে বাঙালি নয় উর্দু ভাষী, যদিও চমৎকার বাংলা বলতে পারে। কিন্তু এপসুর কাছে সেটি কোন বিবেচ্য বিষয় ছিলনা। জি এস প্রার্থী দেয়া হলো সা'দতকে; আমাদের জিশান-

সাদত প্যানেল বেশ হৈচৈ ফেলে দিলো। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মেনন গ্রুপ এপসুর জন্য এই নির্বাচনে জেতা খুব প্রয়োজন ছিল, কারণ একমাত্র সলিমুল্লাহ হলেই তার প্রাধান্য রয়েছে, অন্য কিছু হলে অবস্থা ভাল থাকলেও জেতার মত নয়। এবারই প্রথম ছাত্র লীগের প্লাটফরম বক্তৃতাগুলো একটু চাঙ্গা হতে দেখা গেল সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনে। তাদের কাছে 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো' এই শ্লোগানও সোচ্চার হয়ে এলো এই প্রথম। অন্যান্য হলে এটি অধিকতর ঝড় তুল্‌লো। আমরা খুব মজা করে লক্ষ্য করলাম যে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এপসুর এতদিনকার সব যুক্তিগুলো এখন ছাত্র লীগ বেশ জোরালো ভাবে ব্যবহার করছে; বাঙালি সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসেবেই নিজকে পরিচিত করছে। তাতে অবশ্য সলিমুল্লাহ হলে আমাদের বিচলিত হবার তেমন কারণ ঘটলোনা। আমরা আমাদের 'জাগো জাগো, জনতা জাগো' শ্লোগানেই অটল রইলাম। আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মেহনতি মানুষের কথাও বলে যেতে ভুললামনা। এপসুর কাছে তখন আইয়ুব-চক্র যেমন বিপজ্জনক, এ অঞ্চলে মার্কিন আগ্রাসনবাদও কম বিপজ্জনক নয়।

এই নির্বাচনে আমাকে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো বার বার, দলের ভিপি হিসেবে এটি আমার কর্তব্য। তা ছাড়া আগের বারের ভিপি হিসেবে কিছুটা জবাবদিহিতার ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিতে হলো প্লাটফরম সভাগুলোতে। এখন আমার স্থান হলো অনেকটা মুরুব্বি গোছের—দলের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি এবং জিশান-সা'দত প্যানেলের প্রতি অনেকটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রতিটি বিষয় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক ইতি শিগ্‌গীর ঘটবে এ কথা চিন্তা করেও মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে শিক্ষা কেন্দ্র অনেক থাকতে পারে তবে জীবনের সামগ্রিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে এই হলটির মূল্য আমার জীবনে অনেক বেশি।

জিশান-সা'দত প্যানেল চমৎকার ভাবে সলিমুল্লাহ হলে জিতেছিলো। আমাদের উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে এপসু প্রায় আগের মতই এগিয়ে যেতে পারলো, অন্তত সলিমুল্লাহ হলে।

ওদিকে পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে আমাদেরকে খুব সুনির্দিষ্ট করে কিছু করতে হচ্ছিলনা। সেই সুযোগে সদ্যজাত গরু-বাছুরের মত বুঝে না বুঝে পদার্থবিদ্যার নানা দিকে ঢুঁ দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। যেমন আমাদের যে সহপাঠীরা এবং অগ্রজরা এখন এই কেন্দ্রে যে সব বিষয়ে কাজ করেছে তাদের থেকে সেগুলো জানার চেষ্টা। ওদের অনেকে তাত্ত্বিক কাজ করেছে, কম্পিউটারের ব্যবহারও করছে। এর জন্য প্রোগ্রামগুলোর কার্ডের প্যাকেট নিয়ে কম্পিউটার তাদের কাজকর্মের কিছুটা শরিক হতাম ফাঁকে ফাঁকে কম্পিউটারে র‍্যান্ডম নাম্বার বা এলোমেলো সংখ্যা তৈরি; বা কম্পিউটারের সঙ্গে টিক-ট্যাক-টো অর্থাৎ কাটাকুটি খেলা ইত্যাদিরও ছোট ছোট প্রোগ্রাম নিজে দেখে তার প্রয়োগ করে মজা পেতাম।

র‍্যান্ডম নাম্বার আমি নিজেও আন্দাজি নানা সংখ্যা এলোমেলো ভাবে লিখে লিখে তৈরি করে যেতে পারি—কিন্তু সেটি আসলে খুব একটা র‍্যান্ডম হবেনা, কারণ শিগ্‌গীর দেখা যাবে যে কোন কোন সংখ্যার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। ছক্কা ফেলে ফেলে পক্ষপাতিত্ববিহীন ভাবে এটি এক রকম করা যেতে পারে—কিন্তু দ্রুত অনেক এরকম পেতে হলে কম্পিউটার ছাড়া গতি নেই। নেহাত খেলা হিসেবে নয় পদার্থবিদ্যার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংখ্যা তত্ত্বের সম্ভাবনার নিয়ম খাটাতে গিয়ে এদের দরকার হয়। ওই আলাদা কম্পিউটার ভবনে বিশাল অবয়বের আইবিএম ১৬২০ কম্পিউটারে গিয়েই এসব করতে হতো, করতে হতো ওখানকার বিশেষজ্ঞদের প্রশ্রয়ে।

ঐ অবুঝ গরু বাছুরের মত ঢুঁ দেয়ার কাজটি আরো ভাল হতো পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের চমৎকার লাইব্রেরির কারণে, আর আগ্রহী প্রচুর বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষ ওখানে চারদিকে ছিলেন বলে। একটি বড় আকর্ষণ ছিলো ওখানকার ঘন ঘন হওয়া সিম্পোজিয়ামগুলো। চমৎকার একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম—এতে কখনো কেন্দ্রের নিজস্ব বিজ্ঞানীরা, কখনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ভাবে আয়োজিত বিশেষায়িত সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানীরা বলতেন। বড় মাপের যে ক'টি হতো তার বেশ ক'টিতে আবদুস সালামকে উপস্থিত দেখেছি; বলতে গেলে তাঁর কারণেই ওগুলো হতো। এমনি একটি আয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক নিম্ন-শক্তি নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা সম্মেলন। অনেক রথী-মহারথী বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদদের সেবার ওখানে দেখেছিলাম। বিশেষ করে আধুনিক পদার্থবিদ্যার একজন জনক ডেনমার্কের নীল বোরের ছেলে এ্যাগে বোরের বক্তৃতাও শুনতে পেয়েছি এখানে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি নিয়ে তাঁর বোর-মোটলসন তত্ত্ব পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলো। বুঝতে পারছিলাম আবদুস সালাম সর্বাধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের তরুণ পদার্থবিদদের একটি সেতুবন্ধ তৈরি করে দিয়েছিলেন যার সুযোগ অনেকে নিতে পারে।

এর মধ্যে আমার বাসস্থান বদলে গিয়েছিলো সলিমুল্লাহ হল থেকে এলিফ্যান্ট রোডে। সেখানে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে তিন কামরার একটি ছোট্ট আবাসের ব্যবস্থা করেছিলাম। এতে একত্র হলাম আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, লাহোর থেকে ফেরা বোরহান আর বরকত। পরে হল থেকে আর এক বন্ধু সিরাজও যোগ দিয়েছিলো। খুব সখ করে এর নাম দিয়েছিলাম 'কল্পনা'—ঐ নামে ছোট একটি সুন্দর অক্ষরের সাইনবোর্ডও লাগিয়ে দিয়েছিলাম এক তলা এই ঘরটির উপর। আমাদের মনে মনে আদর্শ আবাস সম্পর্কে যে কল্পনা ছিল তার সঙ্গে এই 'কল্পনার' কোন মিল ছিলনা, তবুও এরকম ক'জন তরুণ যে ঢাকা শহরের মাঝখানে একটি আবাস খুঁজে পেয়েছি—সেটিই অনেক। এলিফ্যান্ট রোডের ওপরেই বিখ্যাত এরোপ্লেন মসজিদের কাছে, তখনকার 'কাম্পালা' নামের রেস্টুরেন্টের বিপরীতে ছিল আমাদের এই 'কল্পনা'। ইকবাল ছিল 'কল্পনার'

একজন অতিরিক্ত সদস্য, রাতে ওখানে না থাকলেও অনেকটা সময় কাটাতো। আমাদের মধ্যে বরকত ছিলো ইতোমধ্যে একজন পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার তখন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সবার জানা পাকাপোক্ত একটি পেশা। বাড়িওয়ালির কাছে আমাদের বাকিদের কাজ কারবার সুবিধার ঠেকতোনা। এর অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিল। বোরহান প্রায়ই গান গায়। আর আনোয়ারুল্লাহর সঙ্গে ওই বাসারই কিছু মারদাঙ্গা যুবকের পরিচয় রয়েছে। আসলে ওরা ছাত্র রাজনীতির বেশ কেউকেটা একথা অস্বীকার করা যাবেনা। বাংলাদেশে বর্তমান পরিচিত রাজনৈতিক দলের উচ্চাসনও অলঙ্কৃত করছে এদের একজন। এমনো একদিন ঘটেছে যে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা করে আমাদের উপস্থিতিতেই আমাদের খাট থেকে মশারি খাটানোর ডাণ্ডাগুলো অবলীলাক্রমে খুলে হাতে নিয়েছিল, সামান্য একটু মাফ চেয়ে নিয়ে। ভিপি সাহেব বলে আমার উপর ভীষণ শ্রদ্ধা, আর আনোয়ারুল্লাহর উপর তো আরো বেশি তাদের, গ্রেট লিডার সম্বোধনে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বরকতকে বাড়িওয়ালি খুব আস্থাভাজন মনে করলেও তাঁর বাসার চার-পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট শিশুর ভিন্ন ধারণা ছিল বরকত সম্পর্কে। একদিন কথায় কথায় তাকে বললো 'ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ভালা না, সারা দিন ট্রাকের তলায় চিৎ হয়ে কাজ করতে হয়, কোন্ দিন যে ট্রাকটি তারে চাইপা তেজপাতা বানাইয়া দেয় ঠিক নাই'।

হলের সর্ব পর্যায়ে জনপ্রিয় ভিপি হবার একটি সুবিধা হলো যে ওখানকার ক্যান্টিনের অল্পবয়সী 'বয়'দের মধ্যেও জনপ্রিয় থাকা। তাই যখন বল্লাম বাইরে বাসায় থাকবো, আমাদের সঙ্গে থেকে কেউ বাসার কাজ করবে কিনা, সঙ্গে সঙ্গে কে আসবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি লেগে গেলো। শেষ পর্যন্ত করিম নামের এক ছেলে এলো এবং নানা বাসা বদলের মধ্যেও দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে ছিল। কিছুদিনের মধ্যে যে পাকা বাজার সরকার আর রন্ধনবিদ হয়ে উঠেছিলো যদিও বয়স তখনো তেরো-চৌদ্দের বেশি নয়। তার হাতের 'আলু গোবি (কপি) টমাটের' তরকারি খেয়ে প্রশংসা করেনি এমন বন্ধু আমাদের কম আছে। বাসার মধ্যেই অনেক মাস্টার পেয়ে গিয়ে তার লেখাপড়াও ভাল এগিয়েছিল। পরে আমি বিদেশে চলে গেলে সে চট্টগ্রামে গিয়ে আমাদের প্যাকেজেস ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগ দেয়—এবং এক সময় দক্ষ মেশিনম্যান হয়ে উঠে।

'কল্পনার' অবয়ব, সুযোগ সুবিধা, প্রতিবেশ কোনটিই আদর্শস্থানীয় না হলেও এটি বিজ্ঞান সাময়িকীর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলো। কারণ আমি ওখানে থাকাকালীন সময়ে ওটিই ছিল বিজ্ঞান সাময়িকীর আনুষ্ঠানিক ঠিকানা—যা পত্রিকার লেখা হতো এবং সেখানে সব ধরনের চিঠি পত্র, গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি আসতো। ঠিকানায় 'কল্পনা' কথাটিও লিখতে আমরা কখনো ভুল করতাম না, বাড়িটি সম্পর্কে শ্রদ্ধাভাব আনার জন্য। আর সর্বদা ওখানে উপস্থিত সদস্য হিসবে করিমই সাধারণত ডাক পিয়নের সঙ্গে বোঝা পড়া করতো।

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে অনেক স্বাধীনতা থাকলেও, এবং খুবই আধুনিক একটি গবেষণা কেন্দ্রের সুন্দর আবহ থাকলেও, আমার মন বলছিলো এটি আমার সব সময়ের কর্মস্থল হতে পারেনা। কারণ কোন রকম 'অফিসার' হয়ে থাকতে আমার মনে সায় ছিলনা, সেটি বৈজ্ঞানিক অফিসার হলেও নয়। তাই লক্ষ্য রাখছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ কখন মিলে। যদিও এখন 'কল্পনা' আর পরমাণুশক্তি কেন্দ্রের মধ্যেই আমার অধিকাংশ যাতায়াত, তারপরও কিন্তু সলিমুল্লাহ হল ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে প্রায়শ যাচ্ছি, একই আড্ডা দিতে, একই খোঁজ খবর নিতে। আমার শিক্ষক মুহতাশাম স্যার (এম এস সি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক) এখনো পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে কিছু গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি যে কাজটি তাঁর সঙ্গে করেছিলাম নতুন এম এস সি গবেষণা ছাত্র নুরুল আমিন তারই ধারাবাহিকতায় কাজ করছে। খুবই মেধাবী, সদালাপী ছেলে নুরুল আমিন, ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের কাজে তাকে সহায়তা দেয়া খুবই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল। এরকম একজন টগবগে তরুণ মাত্র বছর দেড়েক পর বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়ার পথে বিমান আকাশে কিছু উচ্চতায় ওঠামাত্র মস্তিষ্কের কোন রোগে হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছিলো।

আমার নিয়মিত যাওয়ার আর একটি জায়গা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন রোডে ইত্তেফাক প্রেসে—সেই ফজলে ইমামের দফতরে। 'কল্পনা' আর প্রেস এই দুইয়ে কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান সাময়িকী চমৎকার এগোচ্ছে তখন। এর কারণ বিজ্ঞান জগতে আমি এখন রীতিমত পাসপোর্ট ধারী—পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে নানা রকম উচ্চতর গবেষণা দেখছি, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে থাকছি, সালাম সাহেবের বক্তৃতা শুনছি; তাছাড়া বৃহত্তর পাঠক সমাজে পত্রিকাটি বেশ পরিচিতও হয়ে ওঠেছে। ইকবাল ইতোমধ্যে নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্র, 'কল্পনার' অনিয়মিত সদস্য, আবার সে গভর্নর হাউসে প্রেসের কাছে থাকে—কাজেই সাময়িকীর কাজে সুবিধা হলো।

বাহাদুর (শামসুল হোসাইন) এদিকে সদ্য স্থাপিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে সেখানে ভর্তি হয়েছিল। তার কাছে শোনতাম একটি একেবারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবার কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—চারদিকে শুধু পাহাড়, দুএকটি রাস্তা গিয়েছে পাহাড়ের ভেতর, পেছনের পাহাড়গুলোতে বন; এর ফাঁকে ফাঁকে আপাতত উঠেছে কিছু কিছু টিন শেড, আর খুব সহজ সরল কিছু দালান, যেগুলো পরে গুদাম, প্রেস ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হবে। আপাতত এগুলোই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, ছাত্রদের থাকার হল ইত্যাদি। ওর মধ্যে বাহাদুরের মত অল্প কিছু ছাত্র নিয়ে সবে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বাহাদুরের আমন্ত্রণে একবার সেখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে রাত্রিবাস করে এসেছি, এই নতুনত্বের আস্বাদ নিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অবশ্য সবার উৎসাহের সীমা

ছিলনা। অনেক সংগ্রাম করে চট্টগ্রাম এই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে। কুমিল্লাও ছিল এর খুব জোরালো দাবিদার। সরকার সমর্থকরা বলতো এটি আইয়ুব খানের দুই প্রিয়পাত্র শিক্ষামন্ত্রী কুমিল্লার মফিজউদ্দিন আহমদ আর জাতীয় সংসদের স্পীকার চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর মধ্যে কে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের জায়গায় নিয়ে যেতে পারে তার লড়াই। যে কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের পক্ষেই গিয়েছিলো।

আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময় গিয়েছিলাম, সেটি ভিন্ন কারণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর ভবিষ্যতে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নেয়া হবে এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার সিনিয়র লেকচারার চেয়েছে। সিনিয়র লেকচারার সাধারণত ডক্টরেট ডিগ্রিধারীরাই হয়ে থাকে, অন্তত বেশ কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাদের থাকে তারাই এটি আশা করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে সে রকম বাধ্যবাধকতা কিছু লেখা ছিলনা। তাই ভাবলাম দরখাস্ত করে দিতে ক্ষতি কী? পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত হবার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বেশ যত্ন নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপকরা ওখানে চলে গিয়েছিলেন। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী পদার্থবিদ্যা বিভাগে শিক্ষকতা করা আবাল্য স্বপ্ন, তবুও ভাবলাম রাজশাহীতেও বা মন্দ কী? সত্যি সত্যি সাক্ষাৎকারের জন্য আহবানও পেলাম। ছোট ভাই আইয়ুব তখন ঢাকায় সলিমুল্লাহ হলে ভর্তি হয়েছে ভূগোল পড়বে বলে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে রাজশাহী চলে গেলাম। আগে কখনো এ শহরে আসিনি, বিশ্ববিদ্যালয়টিও দেখিনি। সাক্ষাৎকার দিতে যথাস্থানে যেতে ক্যাম্পাসটি যতটুকু দেখলাম মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বলতে তো এমনটিই হওয়া উচিত—অবাধ জায়গা, তাতে একই রকমের সুন্দর সুন্দর ভবনে বিভিন্ন বিভাগগুলো। মাঝখানে আমের বাগান, বৃক্ষ সুশোভিত পথঘাট—পুরো বিশ্ববিদ্যালয় একই জায়গায়, ওখানে শুধু ছাত্র শিক্ষকদের বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু সাক্ষাৎকার যেখানে হবার কথা সেই ভাইস চ্যান্সেলর অফিসে গিয়ে শোনলাম দুঃসংবাদ। সাক্ষাৎকারটি কী এক কারণে স্থগিত হয়ে গেছে এবং এই মর্মে প্রার্থীদেরকে টেলিগ্রামও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সাক্ষাৎকারের পরবর্তী তারিখ ধার্য হলে তা পরে জানিয়ে দেয়া হবে। আমি আগেই বাসা ছেড়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছি বলে টেলিগ্রামটি হাতে পড়েনি। খুবই নিরাশ হয়ে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম, কিন্তু ভিসি'র সেক্রেটারি একটু বসে চা খেতে বল্‌লেন, কারণ তিনি ব্যাপারটি ভিসি স্যারকে একটু জানাতে চান।

তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন প্রফেসার শামস্‌উল হক সাহেব—বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও অস্থায়ী ভিসি, এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অত্যন্ত বিদগ্ধ ও অমায়িক, শরীফ মানুষ

হিসেবেই তাঁর সুপরিচিতি। এমন মানুষ কেমন করে আইনী প্রয়োজনীয়তার বাইরে গিয়ে, নিজের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করে, অন্যের নৈরাশ্য দূর করার চেষ্টা করেন তা এবার স্বচক্ষে দেখলাম। ভিসি'র সেক্রেটারি কিছুক্ষণ পর এসে বললেন, 'আপনাকে ফেরত যেতে হবেনা, ভিসি সাহেব বল্‌লেন এসেই যখন পড়েছেন সাক্ষাৎকারে বিশেষ ব্যবস্থা এখনই করা হবে—শুধু দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

তারপর ওই অফিসে বসেই চোখের সামনে সেক্রেটারি সাহেবকে দেখলাম একের পর এক টেলিফোন করে যেতে। তিনি আসলে সাক্ষাৎকার কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরকে অতি স্বল্প নোটিশে ভিসি'র অফিসে আসার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। অধিকাংশ সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়েরই মানুষ, তবে দু'একজন বাইরের সদস্যও ছিলেন—তাঁদের আনতে গাড়ি পাঠানো হলো। কিছুক্ষণ পর তাঁদেরকে একজন একজন করে আসতেও দেখলাম। প্রফেসর শামসুল হক যে ভাবে একজন তরুণের আবার রাজশাহী আসার কষ্ট বাঁচাতে নিজের ও সহকর্মীদের জন্য বাড়তি দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন তাতে মুগ্ধ হলাম। যথারীতি সাক্ষাৎকার হয়ে গেল, আমি তাঁদেরকে বাড়তি এত কষ্ট দিলেও আমাকে নিতে তাঁদের আগ্রহের একটুও কমতি আছে বলে মনে হলোনা, তাই ধৈর্য ধরে বিষয় ও বিষয়ের বাইরে সব রকমের প্রশ্নে আলাপ করলেন। বাকি প্রার্থিরা নির্ধারিত দিনে সাক্ষাৎকার দেয়ার পর ফলাফল জানানো হবে। সব মিলিয়ে রাজশাহী ভ্রমণটি খুব আনন্দদায়ক হয়েছিল। আইয়ুবের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এটি ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের কথা।

এরপর কিছু ঘটনা খুব দ্রুত ঘটলো। শুনছিলাম পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে থাকা প্রফেসর ইন্নাস আলী আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান হচ্ছেন, আর এখনকার প্রধান প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী তাঁর জায়গায় কমিশনে যোগ দিচ্ছেন। ইন্নাস আলী সাহেব যে ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলে এসেছেন তা জানতামনা। রাজশাহী থেকে সেখানে দেয়া সাক্ষাৎকারের ফল এসেছে সিনিয়র লেকচারার হিসেবেই অবিলম্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষকতার সুযোগ পেলাম, পদটিও বড়, খুব ভাল লাগছিলো সব দিক থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছে বলে। তবুও যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকার টানে রয়েছিলাম তাতে এভাবে হুট করে দূরে চলে যাওয়াটি কেমন হবে তাও ভাবছিলাম। এর মধ্যে একদিন অন্যান্য দিনের মত পরমাণু শক্তি কেন্দ্র থেকে হেঁটে কার্জন হলের দিকে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ পথে ইন্নাস স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি উল্‌টো দিকে হেঁটে পরমাণু শক্তি সেন্টারে আসছিলেন। সে সময় এই রাস্তার ফুটপাত দিয়ে হাঁটা বেশ স্বাভাবিক ও আরামদায়ক ব্যাপার ছিল, মানুষজন খুব কম, গাড়ি চলাচলও কম—অল্প ছাত্র শিক্ষকদেরই বেশি দেখা যেত। ইন্নাস স্যার বেশ খানিক্ষণ পথে দাঁড়িয়েই আমার

সব খোঁজ খবর নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগে জয়েন করিনি কেন। সব শুনে বল্‌লেন, 'ঠিক আছে এখন চলে আস।' আমি জানালাম বিজ্ঞাপন দিলে অবশ্যই আমি প্রার্থী হবো। তিনি বল্‌লেন 'সে সব পরে হবে, আপাতত কাল সকালে বিভাগে আমার সঙ্গে দেখা করে অ্যাড হক ভিত্তিতে কালকেই জয়েন করে ফেলো'; আমি রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম ঘটনার আকস্মিকতায়। বল্‌লাম 'আমি যে পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরিতে আছি, ওখানে নিয়ম অনুযায়ী পদত্যাগ করে আসতে হবে না?' তিনি আবার হাঁটা শুরু করার আগে সংক্ষেপে জানালেন 'সে সব আমি দেখবো, আমি ওখানেই যাচ্ছি'।

যে ভাবে তিনি বল্‌লেন ঠিক সেভাবেই সব কিছু হয়েছিলো। পরের দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার শিক্ষকতার চাকরি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সারা জীবনের জন্য আমার গন্তব্য ঠিক হয়ে গেলো ইন্নাস স্যারের সঙ্গে ফুটপাতের ওই আলাপে। সেটি ১৯৬৭ সালের সেপ্টম্বর মাস। এমন বিষয়ে এত বড় অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স জীবনে আর কখনো ঘটেনি। শুধু তাই নয়, লেকচারার হিসেবে এই নিয়োগের সময় পরমাণু শক্তি কমিশনে আমার অধিকতর বেতন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে নিয়োগ ইত্যাদি বিবেচনা করে কিছু বাড়তি বেতনেরও ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। যদিও সেসব ভালই লেগেছে, মনে মনে আমি কিন্তু ভেবেছি অন্য কথা। এ কোন আজব নিয়ম—আমি যা করে দারুণ মজা পাই, সেই ইচ্ছেমত বই পড়া আর অন্যকে তা নিয়ে বোঝানো, সেটি করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, আবার তার জন্য উপরি আমাকেই টাকাও দেয়া হচ্ছে; এ কোন্ বিচার?

ইন্নাস আলী সাহেব কাজের মানুষ। ওই একই বৈঠকে তিনি আরো দু'একজনকে ডেকে বিভাগের ক্লাস রুটিনটি নিয়ে বসলেন। বললেন দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজমের ক্লাসে কোন শিক্ষক নেই—এটি এখনই তুমি পড়াবে। শিক্ষকতার শিক্ষানবিশি করার কোন সুযোগ নেই, সরাসরি ক্লাসে গিয়ে অনার্সের একটি পূর্ণ কোর্স শুরু করে দিতে হবে। আর প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিতে হবে সাবসিডিয়ারির প্রথম বর্ষে—যেখানে গণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব অনার্সের ছাত্র ছাত্রীরা পদার্থবিদ্যা শিখতে আসছে। আমার জন্য এটি বিরাট সুযোগ। যখনই কিছু পড়েছি, বা বোঝেছি বা বোঝেছি বলে মনে হয়েছে তখনই ওটি আমার মত করে অন্যকে বোঝাবার জন্য আকুলি বিকুলি করেছি। এবার সে সুযোগ এলো, দেখা যাবে তাতে অন্যরা কী মনে করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি প্রফেসর শামসউল হকের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে, ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখলাম। এর বেশ কিছুদিন পর ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে আমার চাকরি নিয়মিত করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার হয়েছিলো ভিসি ওসমান গণির সভাপতিত্বে। ইতোমধ্যে প্রফেসর শামসউল হক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে এসেছিলেন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনিও সাক্ষাৎকারে ছিলেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন পড়াতে কেমন লাগছে, রাজশাহীর পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের বিষয়টি তিনি মোটেই অসঙ্গত মনে করেননি।

দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে যাদের পড়াতে হচ্ছে তাদের অনেকের সঙ্গে আমার আগে থেকেই ভাল পরিচয়; কারো কারো সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব। স্কুলে ও কলেজে ওদের কেউ কেউ ইকবালের সহপাঠী ছিল বলেও ওদের কয়েকজনকে আগে থেকে চিনতাম। কাজেই আমার প্রথম দিকের ক্লাসগুলো নিয়ে আমার ও তাদের দুই পক্ষেরই যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। পড়ানো নিয়ে চিরকাল আমার নিজস্ব কিছু ধ্যান ধারণা ছিল। কোনটি ভাল পড়ানো, কোনটি ভাল নয় সে নিয়ে সব সময় আমার স্পষ্ট মতামত থাকতো। খুব সোজা সাপটা করে বলতে গেলে যেই ক্লাস উপভোগ করা যায় সেটিই ভাল ক্লাস। কিন্তু সেই উপভোগটি এমন হতে হবে যেন ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর মনে হয় সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মত বা মনে রাখার মত কিছু শিখেছি। কাজেই উপভোগটি সেই শেখার কাজেও লাগতে হবে। আমার মতে যে কোন বিষয়ে পটভূমি-ইতিহাস স্পষ্ট করা, সহজ করে তাকে বোঝাতে উপমা ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট ঘটনার উল্লেখ, হাসির কথা ব্যবহার এবং যেখানে সম্ভব শিক্ষার্থীরা নিজের পরিচিত কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে বিষয়টি এমন কোন উপস্থাপনা—এগুলো উপভোগের ও শেখার উভয়ের জন্য সহায়ক। যে শিক্ষকরা এটি করতেন তাঁদের ক্লাস আমার ভাল লাগতো, যাঁরা করতেন না তাঁদেরটি ভাল লাগতোনা। আমি আগে ছাত্র রাজনীতির বক্তৃতায়, এবং অন্য বক্তৃতার সুযোগ যেখানে ছিটেফোঁটা পেয়েছি সেখানে এই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। এখন প্রথম বারের মত ক্লাস নেবার সুযোগ পেয়ে সেটিই করেছি, যদিও ছাত্ররা শিখতে পেরেছে এই সন্তুষ্টিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে চ্যালেঞ্জটি একটু বেশি ছিল। এইটুকু বেশ ভাল জানা ছিল যে ক্লাসের পুরো সময়টিতে কী করবো তার খুব ভাল প্রস্তুতি নেবার কোন বিকল্প নেই। এমনকি উপমা বা হাসির কথাগুলো কখন বলবো তাও। অবশ্য সকল প্রস্তুতি সত্ত্বেও যেন ওখানকার পারস্থিতি ও চাহিদা অনুযায়ীই খুব স্বাভাবিক ভাবে যখন যা প্রাসঙ্গিক ভাবে আসছে তাই বলছি এমন ভাবটিও থাকতে হবে।

খানিকটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে কোন বিপত্তি ঘটে। ওই ক্লাসে দু'এক জনকে চিনতাম যারা পদার্থবিদ্যার ভেতরে থেকেই বেয়াড়া প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করার সক্ষমতা রাখে। যেমন শাহজাহান ছেলেটি এই দ্বিতীয় বর্ষেই ঝানু বিজ্ঞানীর মত কথা বলতো। জনশ্রুতি ছিল যে তার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ জন হচ্ছেন আমাদের রফিকুল্লাহ স্যার—উভয়ে নাকি প্রায়শ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপে সময় কাটান। বেশ খানিকটা পাকা চুল আর হাতে সব সময় সিগারেট নিয়ে তাকে দেখতেও রফিকুল্লাহ স্যারের সমগোত্রীয় মনে হতো। কার্যত অবশ্য শাহজাহানকে তখন ও পরে ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র হিসেবেই পেয়েছি, এবং প্রশ্ন

যখন করতো সেগুলো খুবই সঙ্গত আর প্রাসঙ্গিক হতো। ওই ক্লাসের পর সে বরং আমার কাছে এসে শুধু একটি আবদার করেছে যে তার শিক্ষক হয়েছি বলে আমার ঘরে আসতে সিগারেট নিভিয়ে আসতে যেন না বলি, আগের মতই তা যেন সহ্য করি। শাহজাহান পরে যুক্তরাষ্ট্রে কৃতী পদার্থবিদ হিসেবে কাজ করেছে, ঢাকায় থাকতেই সহপাঠীনী খুকুকে বিয়ে করেছিলো যে নিজেও ভাল পদার্থবিদ হয়েছে। এই যে পটভূমি-ইতিহাস বলে, ঘটনা কী হচ্ছে তা মজার উপমা দিয়ে বুঝিয়ে, তার মাধ্যমে গাণিতিক রূপরেখা ব্যাখ্যা করা সেটি অধিকাংশ ছাত্রের কাছে বেশ উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় হতো। কিন্তু দু'এক জন সব সময় থাকতো যারা চাইতো সরাসরি আসল ফরমুলায় চলে যাই। মনে হতো তারা বাকি জিনিসে ধৈর্যচ্যুত হচ্ছে। আমি কিন্তু বরাবর প্রথম দলটির চাহিদাকেই গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ আমি নিজেও ওই দলভুক্ত ছিলাম।

সাবসিডিয়ারি ছাত্রদের যে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করাবার দায়িত্ব পেলাম, তাতে ওদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতে হতো, এক্সপেরিমেন্টগুলোর পেছনের বিজ্ঞানটুকু বোঝাবার চেষ্টা করতে হতো, আবার একই সঙ্গে ঠিক মত ফলাফল না এলে বা যন্ত্রপাতি উল্টাপাল্টা কাজ করলে রোগ নির্ণয়ের ডাক্তারের ভূমিকায়ও তাদেরকে সহায়তা দিতে হতো। এগুলো সবই আমার জন্য খুবই আনন্দের অভিজ্ঞতা ছিলো। শিক্ষকতা প্রথম দিন থেকেই আমার ভাল লেগেছে, এর পর থেকে সব সময় ভাল লেগেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার ফলে এমন অনেকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলাম ছাত্র হিসেবে বা ছাত্র রাজনীতির কারণেও যে পরিচয় আগে ঘটেনি। তাঁরা হলেন বিভিন্ন অনুষদের তরুণ ও প্রবীণতর শিক্ষক। ওসময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে প্রায়শ যেতাম, সেখানেই তাঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সায়েন্স কাফেটেরিয়াতেও শিক্ষকদের জন্য একটি জায়গা ছিলো—যেখানে দুপুরে অনেক সময় খেতে যেতাম। দেশের রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রাজনীতি নিয়ে যে টানা পোড়েনগুলো চলছিলো তার আরো স্পষ্ট একটি ছবি এসব আলাপ থেকে ধীরে ধীরে পাচ্ছিলাম। যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক রকম একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে চলছিলো সরকারের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে সেই ব্যাপারে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। বিভাগগুলোতে অল্প দু'একজন প্রফেসরের ইচ্ছেটাই গুরুত্ব পেতো, বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে একাক্রমে থাকা বিভাগীয় প্রধানদের। তরুণতর শিক্ষকরা চলমান রাজনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে দেখতেন, তাই গণতন্ত্রের আকাঙ্খাটি তাঁরা দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের জন্যই পোষণ করছিলেন। ছয়দফার মধ্যে নিহিত আকাঙ্খাগুলো অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছিলো। কাজেই এখানেও যেন ছাত্র রাজনীতিরই একটি বর্ধিত রূপের মধ্যে বাস করছিলাম। একদিকে সলিমুল্লাহ হলে যাতায়াতের কারণে ছাত্রদের মতামত, হলে পরবর্তী নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কে

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে এখন তার একটি প্রতিফলন তরুণতর শিক্ষকদের আশা-আকাঙ্খার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম। ১৯৬৭ সালের সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনের সঙ্গেও একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ ছিলনা। এপসু'র ঘরোয়া সভায় অর্থনীতির ছাত্র মেজবাহকে (ড. মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, পরে অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ভিপি পদে মনোয়ন দেবার ব্যাপারে এবং নির্বাচনী নির্ধারণে অবদান রাখতে হয়েছিলো। এই নির্বাচনেও বিজয় প্রমাণ করেছে হলে মেনন গ্রুপ এপসু'র প্রাধান্য তখনো পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিলো।

ছাত্র থেকে সায়েন্টিফিক অফিসার, এখন লেকচারার হয়েছি কিন্তু আসলে চিন্তাভাবনা, কাজ, আশেপাশের মানুষ, কোনটিই পরিবর্তিত হয়নি। কলেজ থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জগতে ঢুকেছিলাম সেই আপন জগতে কোন পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয়নি। তবে বেশি বেশি করে যে ভাল লাগাটি মনের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠছিলো তা হলো শিক্ষকতার আকর্ষণ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আবহে বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন শিক্ষক হয়েছি, তখনো আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন একরকম ধীর লয়ে চলছিলো। ক্রমে জনপ্রিয়তা পেলেও ছয়দফা এখনো বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার বিষয় ছিলো। ছাত্রদের মধ্যে এপসুর নেতৃত্ব আরো নানা দল ছয়দফার মূল বক্তব্যে একমত হলেও তারা গণ-আন্দোলনের জন্য জনগণের অধিকারের বিষয়গুলো এর সঙ্গে যুক্ত করে একে আরো সামগ্রিক লক্ষ্য দেবার প্রয়াসী ছিলো। পরের বছর ছাত্রদের এগার দফার মাধ্যমে ছয়দফার সঙ্গে এই বক্তব্যগুলোকে সন্নিবেশিত করে ঐক্যের সৃষ্টি করে উনসত্তরের প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলো তখনো ভবিষ্যতের কথা।

সাতষট্টির ওই বিদায় লগ্নে পূর্ব পাকিস্তান তুলনামূলক ভাবে শান্ত ছিলো, বরং ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠছিলো পশ্চিম পাকিস্তান। ভুট্টোর নতুন দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি ওখানে তাসখন্দ চুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে নানা অসন্তোষ সৃষ্টি করে মানুষকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিলো। হয়তো এর থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই সামরিক বাহিনীর যোগসাজশে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে একটি চাল চাল্‌লেন যার নাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই চালাকিই শেষ পর্যন্ত প্রথমে আইয়ুব খানের এবং পরে অখণ্ড দেশ হিসেবে পাকিস্তানের পতনের ক্ষেত্রে মোড় ঘোরানোর মূল কাজটি করেছিলো।

কিন্তু ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে প্রধানত সশস্ত্র বাহিনীর (সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর) কয়েক জন নিম্ন ও মধ্যপদস্থ বাঙালি কর্মকর্তাকে জড়িয়ে যখন বাহিনীতে বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের

কথা বলা হলো, তখন ব্যাপারটিকে সে ভাবে মনে হয়নি মোটেই। বলা হয়েছিল যে ঢাকার সামরিক গোয়েন্দা অফিসার লেফটেন্টে কর্নেল শামসুল আলমকে হত্যা চেষ্টা প্রকাশের মাধ্যমে ও ষড়যন্ত্রকারীদের একজন সব কিছু ফাঁস করে দেয়ার মাধ্যমে গোয়েন্দারা এটি জানতে পেরেছে। সাহসিকতার জন্য ওই কর্নেল সাহেবকে সামরিক খেতাবও দেয়া হলো। যদিও চাঞ্চল্যকর খবর হিসেবে সেটি সবাই লক্ষ্য করেছি, একে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নানা আজগুবি গল্পের মত এবং আইয়ুব খানের ভীতি প্রদর্শনের এজেন্ডার অংশ হিসেবে মনে করে কেউ তেমন আমলে নিইনি। বলা হয়েছিলো ষড়যন্ত্রকারীরা ঢাকায় ভারতীয় কনসুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারি পিএন ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, এবং তাঁদের দু'জন কুমিল্লার কাছে ভারতীয় সীমান্তের কাছের শহর আগরতলায় গিয়ে ভারতের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ওই পর্যায়েই পুরো গল্পকে খুবই কাঁচা ও কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে।

কিন্তু এর পর পর যা করা হলো তাতে সারা দেশ অবাক হয়ে গেল। শেখ মুজিব, আরো দু'একজন রাজনীতিবিদ, এবং কয়েকজন সিএসপি অফিসারকে এর মধ্যে জড়ানো হলো। মুজিবকে প্রধান আসামি করে এঁরা ও পূর্বে কথিত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হলো। শেখ মুজিবকে ২১ মাসের কারা বন্দীত্বের পর জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার গ্রেপ্তার করে সামরিক বাহিনীর জিম্মায় ক্যান্টনমেন্টে রাখা হলো। সুপরিচিত সিএসপি অফিসার সহ এক এক জনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নানা রকম গুজব রটছে, আর সামনে কাকে কাকে জড়ানো হবে এসব কথা মুখে আলোচনা হচ্ছে; দেশ জুড়ে এ নিয়ে সর্বত্র তোলপাড়। পত্রিকায় খবর যা আসছিলো, তার চেয়ে গুজবই ছিল বেশি।

আমার পক্ষে প্রায় দৈনিক ভিত্তিতে অপ্রকাশিত এরকম খবর জানতে একটু সুবিধা হয়ে গেল কারণ প্রথম বর্ষ সাবসিডিয়ারি যে প্র্যাকটিকাল ক্লাসটি আমি তিন ঘণ্টা ধরে নিতাম, সেখানে আমরা দু'জন শিক্ষক ছিলাম; অন্যজন ছিলেন হাবিব ভাই (পরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী)। হাবিবুল্লাহ ভাই আমার বছর দুয়েক সিনিয়র ছিলেন, বিভাগে তিনি ছিলেন 'অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দি প্রফেসর'—সেই কালে প্রফেসরের গবেষণা ও অন্যান্য কাজে সহায়তা দেয়ার জন্য এই পদটি ছিল। তিনি সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র থাকা কালে একই বিভাগের ছাত্র হওয়াতে আমি ও আজিজুল বারী তাঁর খুব স্নেহধন্য ছিলাম—আমি শিক্ষক হবার পরও। তিনি এনএসএফ করতেন; ছাত্র রাজনীতিতে অথবা পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসেবে খুব তুখোড় না হলেও একটি বিষয়ে কিন্তু হাবিব ভাইকে সবার ওপরে রাখতে হতো—সেটি হলো বিভিন্ন মহলে তাঁর যোগাযোগ, বিস্তৃত নেটওয়ার্ক—যেটি বিশেষ ভাবে ছিলো সলিমুল্লাহ হল থেকে বিভিন্ন সময় পাশ করা সিএসপি অফিসারদের সঙ্গে। তাঁদের কাছ থেকে একটু ভেতরের খবর পাওয়া যেতো। তাই

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তাঁর সঙ্গে আমার একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি ছিল—আমি ছাত্রদের চাহিদা সামাল দেবো, আর তিনি আমাকে সর্বশেষ সংবাদ (গুজব বা প্রামাণ্য) জানাবেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অগ্রগতি সেই সংবাদগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলো।

আটষট্টির জুন মাসে মামলাটি শুরু হয়েছিলো। স্পষ্টত আইয়ুব খান চাইছিলেন শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী প্রমাণ করে পূর্ব পাকিস্তানের ছয়দফা ভিত্তিক বড় আন্দোলন ও বড় নেতাকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা। কিন্তু এই মামলাই যে সেই নেতা ও সেই আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে এটি তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। প্রথমে কথা হয়েছিলো সামরিক আদালতে বিচার হবে। কিন্তু পরে সরকার বুঝলো যে তাতে মামলার গুরুত্বটি গিয়ে পড়বে গ্রেপ্তারকৃত সশস্ত্র বাহিনীর মানুষদের উপর, রাজনৈতিক নেতাদের উপর নয়, সরকারের উদ্দেশ্য তাতে হাসিল হবেনা। কাজেই গুরুত্ব যেন রাজনৈতিক নেতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে থাকে তাই সাধারণ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে প্রকাশ্য বিচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সুপ্রিম কোর্টের একজন অবাঙালি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে দু'জন বাঙালি বিচারককে সদস্য করে তিন সদস্যের ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হলো। সুপরিচিত প্রাক্তন মন্ত্রী মনজুর কাদেরকে সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী নিয়োগ করা হলো তা ছাড়া অ্যাটর্নি জেনারেল টি এইচ খানও রইলেন সে পক্ষে। অভিযুক্তদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন আইনজীবী নিয়োগ করেছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান আইনজীবী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সালাম খান। তাছাড়া ইংল্যান্ড থেকে কুইনস কাউন্সেল (কিউসি) টমাস উইলিয়ামকে আনা হলো আসামি পক্ষে। হাবিব ভাইয়ের কাছে শোনলাম ইংল্যান্ড প্রবাসী বাঙালি ছাত্র নেতারা কীভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করে এই বিখ্যাত আইনজীবীকে পাঠিয়েছিলেন। আদালত বসেছিলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই একটি বিশেষ ভবনে।

যেহেতু প্রকাশ্যে বিচার চলছিলো, তাই আদালতের কার্যক্রম সংবাদপত্রে আসছিলো। শিগ্‌গীর সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে এই মামলার পেছনে সারবত্তা তেমন কিছুই নেই, বিশেষ করে শেখ মুজিবকে এর সঙ্গে জড়াবার চেষ্টাটি যে নেহাত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিলো। যে সময় এই ষড়যন্ত্রের কাজগুলো চলেছিলো বলে অভিযোগ করা হচ্ছে তার আগাগোড়া কাল তো বটেই বরং তার অনেক আগে থেকেই তিনি সরকারের কাছে কারারুদ্ধ ছিলেন। সামরিক গোয়েন্দারা এটি উদ্ঘাটনের যে প্রক্রিয়ার কথা বলছিলো তাতেও মেলা ফাঁক ধরা পড়লো। গ্রেপ্তারে থাকা যে আসামিদের মাধ্যমে এসব উদ্ঘাটিত হয়েছে বলা হচ্ছিল, যারা জবানবন্দি দিয়েছিলো, তারা একে একে কাঠগড়ায় এসে তা অস্বীকার করেছে, বলেছে যে গোয়েন্দাদের অত্যাচারেই তারা তা বলতে বাধ্য হয়েছে।

মামলা প্রমাণের দিকে যেমন খুব এগোচ্ছিলনা, তেমনি মামলায় যে ভাবে যেন তেন প্রকারে দেশদ্রোহী প্রমাণ করে তাঁকে চরম শাস্তি দেবার আয়োজন করা

হয়েছিলো, তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাঙালি স্বার্থের প্রতি শেখ মুজিবের অটল ভালবাসা ও আত্মত্যাগের পরিচয় পাচ্ছিলো। এর কিছু পরে পরে নেয়া আইয়ুব খানের 'উন্নয়নের দশ বছর' পূর্তির যে মহোৎসব শুরু হয়েছিলো মানুষ ওতে মোটেই সাড়া তো দেয়নি, বরং তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করেছিলো। শুধু তাই নয় ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ সহ বামপন্থী দলগুলো এবং ছাত্রদের মধ্যে এপসু ছয়দফা নিয়ে যে দ্বিধা দেখাচ্ছিল, সেটিও ধীরে ধীরে মানুষের কাছে কম গ্রহণযোগ্য হতে আরম্ভ হয়েছিলো। এপসুর অনেকের মত আমরা অনুভব করতে শুরু করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এমন একটি দিক পরিবর্তন এনে দিতে যাচ্ছিল যা ইতোপূর্বে ছয়দফার আন্দোলনও আনতে পারেনি। এর পর হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিলো সেখানেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিস্তারিত শুরু থেকে অনেকটা অনুসরণ করতে পারলেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি, কারণ আটষট্টির সেপ্টম্বর মাসে পড়াশোনা করতে বৃটেনে চলে যাই। পরের যে উত্তাল দিনগুলোর মধ্য দিয়ে আগরতলা মামলা উড়ে গিয়েছিলো, আইয়ুব খানের পতন হয়েছিলো, সেগুলো দূর থেকেই জানতে হয়েছে।

অচিন দেশের ল্যাবোরেটরি

শিক্ষকতার শিক্ষা

নিজের ধ্যান ধারণা মত শিক্ষকতা ভালই চলছিলো। কিন্তু এর মধ্যেও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এমনি সুযোগ নিয়ে এলো আটষট্টি সনের গ্রীষ্মে 'সামার সায়েন্স প্রোগ্রাম' নামক একটি প্রকল্প। এটি প্রধানত মার্কিন সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প, উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকতার মধ্যে যার যার বিষয়গুলোকে দেখার একটি নতুন সুযোগ দেয়া, এবং ছাত্রদের কৌতূহল যেন তাঁরা আরো ভাল ভাবে মেটাতে পারেন তার আধুনিক প্রক্রিয়াগুলো শেখানো। পদার্থবিদ্যার সামার সায়েন্স কোর্স বসলো আমাদের বিভাগে, সেখানে পড়াতে এলেন তিন জন মার্কিন অধ্যাপক যাঁরা একদিকে পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী, অন্যদিকে ছাত্রদেরকে উৎসুক করে তোলার বিদ্যায়ও। তাঁরা উচ্চতর পদার্থবিদ্যার দিকে বেশি গেলেননা। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে গোড়ার দিকের 'হ্যালিডে অ্যান্ড রেজনিক' রচিত যে বিখ্যাত পাঠ্য বই আছে তার ভিত্তিতে নবাগতদের আগ্রহ কী করে বাড়ানো যায় সেদিকেই মনোযোগ দিলেন।

পদার্থবিদ্যার একেবারে মৌলিক ভিত্তিগুলোর মধ্যে কত যে সৌন্দর্য আছে, দুর্বার আকর্ষণ আছে সেটি আমাদের প্রশিক্ষকত্রয়ী বেশ সুন্দর করে তুলে ধরলেন। তবে আমাদেরকে খাটালেনও প্রচুর। ওই বিষয়গুলোর বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে দিলেন, সেগুলো ছাত্রদের কাছেও কী ভাবে প্রাঞ্জল করতে হবে সে চ্যালেঞ্জগুলো ছুঁড়ে দিলেন। বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর শিক্ষণীয় সিনেমা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা, পদার্থবিদ্যার নানা বিষয়ে চাক্ষুষ দেখাবার জন্য। এই যে গরমের ছুটির কিছুটা বিসর্জন দিয়ে তরুণ শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণ, নানাভাবে সেটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ছিলো তো বটেই, বেশ উপভোগ্যও ছিল।

সে বছর অন্তত কিছুকালের জন্য বিভাগে নবীন শিক্ষকদের একটি চমৎকার সমাবেশ ঘটেছিলো। তাদের সাহচর্যও আমার জন্য কম শিক্ষণীয় ছিলনা। আমার

সহপাঠীদের মধ্যে ফৌজিয়া খান এবং আবদুল খালেক যোগ দিয়েছিলো, আমিনুর রশীদ আগে থেকেই ছিলো। আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে তারেক আলী, বামন দাস বসু, এবং গুলশান আরা তখন লেকচারার হিসেবে ছিলেন (পরে সবাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ)। তাঁরা সবাই ছাত্র হিসেবে ছিলেন দুর্দান্ত —একেবারে স্কুল কলেজ থেকে ধারাবাহিকভাবে তার প্রমাণ রেখেছেন। মজার ব্যাপার হলো সেই সময়টাতেই সহপাঠী ও সহকর্মীদের মধ্যে পর পর বেশ কয়েকটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো—কোনটিই তেমন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে হলোনা, অনেকটা নিজেরা নিজেরা সেরে ফেলা; যদিও আমরা বন্ধুরা এর মধ্যে যথেষ্ট জড়িত ছিলাম। তারেক আলী ও ফৌজিয়ার বিয়ে হলো; আহমেদ শফি ও সুলতানার বিয়ে হলো; এবং বামন দাস আর গুলশান আরার বিয়ে হলো। পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স প্রিলিমিনারিতে আমার একজন ছাত্রী শামসুন্নেসা বেগমের (মণি) সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো আমরা শিগ্‌গীর সুযোগ মত বিয়ে করবো। এটি ইকবাল ও খালেক এরকম দু'একজন বন্ধুরই শুধু জানা ছিলো—উভয় পরিবারেরও অন্য কারো না। তবে তারেক-ফৌজিয়া-বামন-গুলশান আরা একদিন কেমন করে জানি মণি আর আমি একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার সময় বেরসিকের মতো ওখানে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দিয়েছিলো, আর পুরো খবর আদায় করেছিলো। তারপরও বিষয়টি শুধু তাদের মধ্যেই ছিলো—বাইরে যায়নি।

এর মধ্যে শিক্ষক হিসেবে অন্যরকম কিছু অভিজ্ঞতা জমা হলো প্রথম বারের মতো প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় বহিরাগত শিক্ষক হিসেবে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে গিয়ে। বেশ কয়েক দিন ধরে পরীক্ষা নিতে হবে, তাই সপ্তা দুয়েকের যাত্রা এটি। মফস্বলে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করার অভ্যাস আমার চেয়ে ইকবালের বেশি, তাই তাকে সঙ্গে নিলাম। বাসে করে বর্ষার বৃষ্টির মধ্যে দুধারে শাপলা-শালুকের শোভা দেখতে দেখতে যমুনা পারে পৌছানোটি ছিল এক আনন্দদায়ক অনুভূতি। সেখান থেকে লঞ্চে ফরিদপুর। স্নাতক শ্রেণীর প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে সাধারণত অভিজ্ঞ বয়স্ক অধ্যাপকরাই যান। আমাকে দেখে রাজেন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষ একটু অবাক হলেও, শিগ্‌গীর তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। শুধু কলেজ জুড়ে নয়, ছোট্ট শহর ফরিদপুর জুড়েই আমার অনেক পরিচিত এবং বন্ধু স্থানীয়রা রয়েছে; আর ইকবালের তো বটেই; তারা হৈচৈ করে এলো। এখানে এসে একদিকে মফস্বল কলেজের পদার্থবিদ্যা শিক্ষার আয়োজন সম্পর্কে যেমন ধারণা হলো, তেমনি নানা আতিথ্যে মফস্বল শহরের যে আলাদা একটি সৌন্দর্য ও মায়া রয়েছে তাও চমৎকার ভাবে আবিষ্কার করলাম। রাজেন্দ্র কলেজ ঐতিহ্যবাহী কলেজ, তার ভবনগুলো, তাতে ক্লাস, ল্যাবোরেটরি ইত্যাদিতে প্রাচীনত্ব থাকলেও দৈন্যের চিহ্ন ছিল তা বলা যাবেনা। শিক্ষকরা আগ্রহী, ছাত্রছাত্রীরাও অধিকাংশই খুবই আগ্রহী। মনে হলো অনেকেই ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে পারতো, কিন্তু তাদের বাড়ির কাছে থাকা দরকার ছিলো বলে এখানে পড়ছে। তাছাড়া সেকালে ভাল ও বনেদি কলেজ অনেক ক'টি ছিলো যেগুলোর

খুব খারাপ বিকল্প মনে করার কোন কারণ ছিলোনা। অবশ্য খুব দায়সারা গোছের পড়াশোনা করেছে এমন ছাত্রের সংখ্যাও কম ছিলনা, প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে গিয়ে তাদের নিয়ে বিপদে পড়লাম।

ছাত্রদের হোস্টেলের একাংশে অতিথি কক্ষ—সেখানে আমাদের বাস। সামনে সুন্দর পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করা। পদার্থবিদ্যা নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে, বিজ্ঞান সাময়িকী নিয়ে আলাপ করতে অনেক ছাত্র আসতো—খুব ভাল লাগতো। যখন পরীক্ষা থাকতোনা বেড়াবার অনেক দাওয়াত থাকতো। বিশেষ করে ফরিদপুর শহরে ছিল আহমেদ কামালের (তখন সলিমুল্লাহ হলের এপসুর তুখোড় নেতা, ইতিহাসের ছাত্র) পৈতৃক বাড়ি ও তার বেশ ক'জন ভাই তখন সেখানেই থাকে; কামাল বাড়িতে বলে দিয়েছিলো। তাদের বাড়িতে কামালের বাবা এডভোকেট আদেল উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্প হলো; তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মার্শাল ল আসার ঠিক আগে আগে। বল্‌লেন 'জানো আজ আমার খুব খুশির দিন, একজন ফাঁসির আসামিকে আমি কোর্টে নিরাপরাধ প্রমাণ করে বাঁচাতে পেরেছি।' তিনি ফরিদপুরের নাম করা আইনজীবী ছিলেন। সদ্য কলেজ পাশ করা ছাত্র বাদলদের একটি বই-ম্যাগাজিনের দোকানে বিজ্ঞান সাময়িকী রাখা হতো। এ এক অদ্ভুত ছেলে বাদল—ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী, ইতোমধ্যেই রীতিমত একজন দার্শনিক। তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলো যে সারা জীবন সে মাঝে মাঝেই আমার খোঁজ রেখেছে, তার শুভাকাঙ্খা জানিয়েছে। বাদল আমাকে নিয়ে যেতো ফরিদপুরের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রমে—মফস্বলে কী ভাবে নিষ্ঠা সহকারে মানুষ এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, বালক বালিকাদের সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলে তা দেখে অবাক হতে হলো। এখানকার যে পাবলিক লাইব্রেরি তা দেখে আমার সেই পঞ্চম শ্রেণীতে পরিচিত হওয়া চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরির কথা মনে পড়লো। আমার জীবনে কত বড় ভূমিকাই না সেটি পালন করেছে। দেখে খুব ভাল লাগলো যে এখানকার লাইব্রেরিয়ানও আমার দেখা মুসা সাহেবের মতোই বইয়ের সন্ধানী সকল বয়সের মানুষের মনন গড়তে সাহায্য দিচ্ছেন। মাত্র দু'একটি রাস্তায় গড়া সেদিনের শহর ফরিদপুর—অথচ তাতেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা নিজেদের জন্য একটি সুন্দর শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলো—যা অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে ঈর্ষণীয় মনে হয়েছে। একদিন বৃষ্টির মধ্যে নৌকা করে এক বন্ধুর গ্রামের বাড়ি গেলাম বেশ দূরে—উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত খাওয়ার নামে ইলিশ উৎসবে যোগ দেয়া। ইলিশের ভরা মৌসুম তখন। শুধু ইলিশ দিয়ে কত পদের রান্না হতে পারে, আর তার স্বাদ কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে তা ঘোর বর্ষায় নদী পরিবেষ্টিত ফরিদপুরের গ্রামে না গেলে বুঝতে পারতামনা।

ফলাফল ভাল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে বিজ্ঞানের বা সমাজ বিজ্ঞানের যে ছাত্র একাডেমিক কাজে যোগ দিতো দু'এক বছরে মধ্যে

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যাওয়াটি তাদের জন্য তখন বেশ স্বাভাবিক ছিলো। এ জন্য বৈদেশিক চুক্তির মাধ্যমে কমনওয়েল্থ, কলম্বো প্ল্যান ইত্যাদির কিছু বৃত্তি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিও ছিল। সরাসরি যোগাযোগ করে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নিয়েও অনেকে যেতে পারতো। ঠিক করলাম এবার পিএইচডি ডিগ্রির কাজে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর নয়। পরমাণু বা তার অংশ নয়, বরং অনেক পরমাণু যখন জমাট বেঁধে বস্তু গঠন করে সেই বস্তুর সামগ্রিক ভৌত গুণাগুণ নিয়ে সলিড ষ্টেট ফিজিক্স সম্প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ পাচ্ছিল। এই বিষয়ে ইংল্যান্ডের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার খোঁজ করে তাদেরকে লিখলে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রায়ান হপকিন্সের পরিচালনাধীন একটি গবেষণা গ্রুপের খুব আগ্রহ দেখতে পেলাম। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বৃত্তির জন্য প্রার্থী হয়ে সফলকাম হয়েছিলাম। কাজেই সব কিছু মিলে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়াটাই স্থির হলো। পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডের যে কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিভার্সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিলো সাউদাম্পটন তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় নবীন, কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে এর গবেষণার সুনাম বিশ্বজোড়া ছিল তখন। প্রধান বন্দর হিসেবে সমুদ্র-বিদ্যার একটি বড় কেন্দ্র এটি, তা ছাড়া প্রকৌশলে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন (শব্দ ও কম্পন), এবং ইলেকট্রনিক্সের জন্য : এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের সলিড ষ্টেট ফিজিক্স ও স্পেস ফিজিক্সের (মহাশূন্য গবেষণা) জন্য এর বিশেষ পরিচিতি ছিল। কাজেই তাদের সঙ্গে সব ব্যবস্থা সোৎসাহে করে ফেল্লাম।

আটষট্টি সালের শরতের সেশনে (সেপ্টম্বর মাস) সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে সব এত দ্রুততার সঙ্গে করতে হলো যে এর মধ্যে মণির সঙ্গে বিয়ের কথা অন্যদের কাছে পাড়ার সুযোগ ছিলনা। তাছাড়া মণির সে সময় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা চলছে। তাই ওর সঙ্গে ঠিক হলো সাউদাম্পটন থেকেই সবাইকে জানাবো এবং ক্রীস্টমাসের ছুটিতে এসে বিয়ে করে সে সহ ওখানে ফিরে যাবো। সে মাস্টার্সের শেষ বর্ষ পড়াটি আপাতত স্থগিত রাখতে চাইলো—ফিরে এসে এটি শেষ করবে। এসব পরিকল্পনা করা যত সহজ হলো বাস্তবায়ন এত সহজ হয়নি। সাউদাম্পটনে গিয়ে এত কাজের মধ্যে সেখান থেকে চট্টগ্রামে (আব্বার কাছে), যুক্তরাষ্ট্রে (যেখানে ইউনূস ভাই পি এইচ ডি করছিলেন), আর কুমিল্লায় (মণিদের বাড়ি) প্রচুর চিঠি চালাচালি করে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিলো। সবাই বিষয়টির আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। চিঠির গতি ছিল অতি ধীর—যেতে লাগতো পাঁচ-ছয়দিন, উত্তর আসতে আরো পাঁচ ছয় দিন। অন্য কোন সহজ বিকল্প ছিলনা; টেলিগ্রাম, টেলিফোন এগুলো খুবই জরুরি অবস্থার জন্যই শুধু ব্যবহার্য ছিল তাও খুব সংক্ষেপে—এর উচ্চ মূল্যের কারণে। সাউদাম্পটনে চার বছরের অধিককালে থাকার সময়ে দেশের সঙ্গে একবারও

টেলিফোনে আলাপ হয়নি। আমেরিকাতে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে শুধু দু'একবার আলাপ হয়েছিলো—সেটি সহজতর ছিলো। এসব দূরত্ব ও সময় সাপেক্ষ পরিস্থিতিতে সবাইকে রাজি করাতে হওয়া সত্ত্বেও বিয়েটা শেষ পর্যন্ত মণি আর আমার ইচ্ছে অনুযায়ী সময় মতই হয়েছিলো।

অন্য ল্যাবোরেটরিটি

সাউদাম্পটন ট্রেন স্টেশন থেকে আসা বাস যখন ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিলো সুটকেস হাতে একাই (প্রথম বার নিজে যাবার সময়) ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট খুঁজে বের করতে হলো। ব্রায়ান হপকিন্স বেশ হৈচৈ করেই অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর সাম্রাজ্যে। তিনি অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষক, সিনিয়র লেকচারার—কিন্তু গবেষণার নেতৃত্ব দেয়াতে অনেক প্রফেসরের চেয়েও বেশি সফলকাম। ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর বিভিন্ন ল্যাবোরেটরি—একটি তলার অধিকাংশ জায়গাই তাঁর ছাত্রদের ল্যাবোরেটরি; এখানেই একটি কক্ষে কাল থেকে আমার কাজ শুরু হবে। ইংল্যান্ডের পি এইচ ডি ছাত্রদের সম্পর্কে রীতিনীতি বেশ একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথম দিন থেকেই তাদেরকে গবেষক হিসেবে দেখা হয়, তাই গবেষণার কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। কোর্স-ক্লাস ইত্যাদি কিছু কিছু করতে হয় বটে, তবে তা এক সঙ্গে চলে—গবেষণায় ভাল করাটিই জরুরি বেশি। প্রথম দু'এক বছর শুধু ক্লাসে এবং পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত থাকতে হয়না অন্যান্য কিছু দেশের মত। শিক্ষকদের মধ্যে যারা ব্রায়ানের মতো কাজের মানুষ তারা সবাই সিনিয়র লেকচারার—প্রফেসর হবার ওপর নজর তাঁদের, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে না হলে অন্য কোথাও। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে যারা এভাবে কোথাও প্রফেসর না হয়ে রীডার হয়ে রয়েছেন তাঁদের গবেষণা-ভবিষ্যৎ তেমন নেই। সাউদাম্পটনে আমাদের বিভাগে প্রফেসর এক জনই ছিলেন—তাঁর নাম প্রফেসর লী।

আমি যে সময় পৌঁছলাম তখন বিকালে চায়ের সময়। সকালে ও বিকেলে চায়ের সময়টি এখানে একেবারে ধরাবাঁধা একটি ব্যাপার—এটি ঠিক মতো না হলে ইংরেজদের দিনটিই বৃথা। দেশে আমরাও তাদের কাছেই এ অভ্যাসটি পেয়েছি। আর সপ্তাহে এই একটি দিন বিকেলের চা'টি ব্রায়ান হপকিন্সের সব গবেষণা-ছাত্র এক সঙ্গে পান করে, আসলে তারা ওই সময় সাপ্তাহিক একটি হালনাগাদ করে সবার কাজ কর্মের। এতে মূল ভূমিকা পালনের ভারটি ছিল এই গবেষণা গ্রুপের একজন লেকচারারের উপর; ব্রায়ান সব শোনেন, আর পরামর্শ দেন। নবাগত আমাকে এখানে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। আমার সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কেও ব্রায়ান সবাইকে জানালেন। দেখলাম এই সভার একটি কাজ হলো গবেষণা-ব্যয়ের ওপর নজর রাখা। কাজ করতে গিয়ে প্রত্যেকের কিছু কিছু খরচ হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু ব্যয় বিভাগের যে কারখানা ও শপ আছে সেখান থেকে এটি সেটি আনতে, বা ওখানে কিছু কাজ করাতেই সম্পন্ন

হয়—তবে সব কিছুর হিসেব রাখা হয়। ব্রায়ানের গবেষক দলের জন্য এবং নানা জনের বিশেষ প্রজেক্টের জন্য টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার মধ্যেই খরচ করতে হয়। এই সভায় জানানো হয় গ্রুপের কার বিশেষ কী ঘটতে যাচ্ছে। কারো পক্ষে বাইরের কোন বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরামর্শের বা কোন ল্যাবের সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে কিনা। এজন্য কাউকে যদি দূরের কোন শহরে কোথাও যেতে হয়, তাও এখানে আলোচনা হয়। প্রায়শ অতিথি বিজ্ঞানীরা আসেন, আমাদের গ্রুপের সঙ্গে কথা বলার জন্য, সে সম্পর্কেও আগাম জানানো হয়। একেবারে শুরুতেই এদের ঘরোয়া অথচ একেবারে চুলচেরা আয়োজন দেখে অবাক হলাম।

হাঁটা পথে বিশ পঁচিশ মিনিটের পথ মন্টিফিউর হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা। সারাদিন ল্যাবোটেরিতে কাটে—ঐ দুই চা পানের সময় এবং দুপুরে লাঞ্চের সময় একটু গল্প করার সুযোগ মেলে। সুবিধে হলো এখানে একেবারে সব নতুন মুখের মধ্যে এসে পড়িনি। একই বিভাগে পি এইচ ডি'র জন্য আমার বছর দু'য়েক আগে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক সুলতান আহমদ সাহেব এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক আলী আসগর সাহেব। সুলতান স্যার ড. ওয়াইনট্রাউব নামের একজন বেশ প্রবীণ গবেষকের পরিচালনাধীনে কাজ করছেন। তিনি একদিকে যেমন কট্টর ইংরেজ, অন্যদিকে কট্টর ইহুদি। সুলতান স্যারের কাছে শুনেছি ১৯৬৭ এর জুনের ৫ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আরব-ইসরাইল যে বিখ্যাত 'সিক্স ডে ওয়ার' হয়েছিলো সে সময় ড.ওয়াইনট্রাউব প্রতিদিন ইসরাইলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করার জন্য পূর্ণ সামরিক ইউনিফর্ম পরে বিভাগে আসতেন। আসগর সাহেবের পি এইচ ডি সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর লী, যিনি বিভাগের এক মাত্র প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান। তিনি প্রবীণ অধ্যাপক—চৌম্বক তত্ত্বের ওপর একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, এর বিষয়ে তাঁর নামকরা বই রয়েছে কয়েকটি। সুলতান স্যার একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব; তাঁর প্রগতিশীল ধ্যান ধারণা, পাশ্চাত্য সংগীতপ্রীতি এবং ছোট বড় সবার সঙ্গে বন্ধুসুলভ অন্তরঙ্গতায় দারুণ সময় কাটতো—বিশেষ করে তিনি তখন স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র নিয়ে এখানে আছেন। আসগর সাহেব মাল্টিফিউর হাউসে থাকেন বলে তাঁর কাছ থেকে ওখানকার সব কিছু জেনে নিতে পারলাম। পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁর অসম্ভব ভালবাসা এবং সেটি একেবারে সাধারণ ভাবে উপমা প্রয়োগে বুঝে নিতে ও বোঝাতে তাঁর ভীষণ আনন্দ। এসব দিকে তাঁর সঙ্গে নিজের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করলাম। পরে দেখলাম এই মিল বামপন্থী রাজনীতি, নানা দেশের মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিস্তৃত। এই দিক থেকে সাউদাম্পটনে হরিষে-বিষাদে আমার বন্ধুর কোন অভাব হয়নি বরং তাঁদের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলাম আরো অনেক চমৎকার মানুষের। যেমন মন্টিফিউর হাউসে অনেক দিন থেকে আছেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফখরুদ্দিন সাহেব—মূলত ভারতের উত্তর প্রদেশের। তিনি নিজ থেকেই এক রকম আমাদের

সবার সর্বকাজে পরামর্শদাতা ও সহায়তাকারীর ভূমিকা নিয়ে নিয়েছেন। এ তাঁর পরম আনন্দ। আসন্ন শীতের জন্য সর্বোত্তম কাপড় চোপড়, জুতা ইত্যাদি কিনতে সাহায্য করলেন, সাউদাম্পটনের পথঘাট চেনালেন সময় দিয়ে। আর ছিলেন ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের দুই ভাই স্বামীনাথন এবং রামনাথন—খুব বন্ধুবৎসল মানুষ। মন্টিফিউর হাউসে স্বামীর রুমে একটি ছোট সাদা-কালো টেলিভিশন ছিলো। সে সময় রঙিন টেলিভিশন ইংল্যান্ডেও শুধু অবস্থাপন্নরাই রাখতে পারতেন, আমরা শুধু আমাদের স্টুডেন্ট ইউনিয়নে এরকম একটি দেখতাম। রাতে ল্যাবোরেটরি থেকে ফিরে মন্টিফিউর হাউসের রান্নাঘরে ফ্রিজে রাখা আগের রান্না করা খাবার খেয়ে প্রায়শ আমাদের কাজ ছিলো স্বামীনাথনের ঘরে গিয়ে টেলিভিশন দেখা ও ফাঁকে ফাঁকে গল্প করা।

ল্যাবোরেটরিতে আমার স্থান হলো ব্রায়ান উইলিয়াম নামের এক সিনিয়র ছাত্রের সঙ্গে একই কক্ষে—সে বছর খানেকের মধ্যে পি এইচ ডি শেষ করবে—তাই যথেষ্ট ব্যস্ত। ওর কাজের সঙ্গে আমার গবেষণা-বিষয়টির সাযুজ্য রয়েছে বলে ওর কাছেই অনেক কিছু শিখতে হবে আমাকে, ওর কাজকর্ম লক্ষ্য করে আমাকেও তা অনুসরণ করতে হবে। ব্রায়ান পদার্থবিদ্যার এক্সপেরিমেন্ট করাতে খুব দক্ষ—কিন্তু দুনিয়াদারি সম্পর্কে খবর রাখে কম, চিন্তা ভাবনাও কিছুটা সেকেলে। ওর গার্লফ্রেন্ড যে ক্যাথলিক এ নিয়ে তার চিন্তার সীমা নেই। আমি বল্‌লাম তাতে কী হয়েছে—সে বল্‌লো 'কী হয়েছে তুমি বোঝো? ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকদেরকে এখনো এক রকম বিজাতীয় শত্রু পক্ষ মনে করা হয়।' পরে দেখলাম এটি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য, যে কারণে প্রতি বছর ৫ই নভেম্বর 'গাই ফক্স ডে'তে বাচ্চারা গাইয়ের একটি কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তা পোড়ার জন্য এবং এই উপলক্ষে আতশ বাজি খেলার জন্য 'পেনি ফর দি গাই' বলে বলে পয়সা সংগ্রহ করে সবার কাছে থেকে। ১৬০৫ সালের ৫ই নভেম্বর এক ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গাই ফক্স নামের ব্যক্তিটি হাউস অব লর্ডসের চেম্বারের নিচে অনেক বারুদ জড়ো করেছিলো—যেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স সহ সেখানকার সবাইকে বিস্ফোরণে হত্যা করা যায়। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাওয়াতে তার ফাঁসি হয়। সেই থেকে ওই বিশেষ দিন ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রকে স্মরণ করে আসা হচ্ছে। ওই দিনটিতে বলা হতো—'রিমেম্বার রিমেম্বার ফিফ্‌থ অব নভেম্বর'। তাই বলে ক্যাথলিকদের প্রতি সন্দেহ যে এখনো অনেকে মনে পোষে সেটি ব্রায়ান উইলিয়ামকে দেখে বুঝেছিলাম। এই ব্রায়ান কিন্তু দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ। তার মুখে এক কথাই ছিলো 'যত কাজে ঘাম ঝরাবে ততই তোমার গবেষণা এগোবে, একটু ঢিলেমি দিয়েছ তো বিপদে পড়বে।'

শিগ্‌গীর সত্যি সত্যি আমার ঘাম ঝরাবার ব্যবস্থা হলো, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। এখানে পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার কাজের নিয়মই হলো—যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব নিজের যন্ত্রপাতি নিজেই গড়ে তুলতে হবে, এবং এর সবকিছু নিজেই সংযোজিত

ও বিন্যস্ত করতে হবে। কাজের যে ধরন তাতে এরকম না করলে নিজের প্রয়োজনীয় রকম এক্সপেরিমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতোনা, প্রয়োজন মতো নিজে তা পরিবর্তন করে নেয়াও সম্ভব হতো না। আমার যন্ত্রপাতির একটি বড় অংশ কাচ দিয়ে তৈরি করতে হবে, তাই গ্লাস ব্লোয়িং অর্থাৎ কাচের পাত্রকে ইচ্ছেমত গড়ে নেয়ার কাজটি আমার শেখা চাই। দিনের পর দিন এই একেবারেই হাতের কাজের দক্ষতাটি শিখলাম বিভাগের নিপুণ প্রবীণ গ্লাস ব্লোয়ার মিস্টার জো লরেন্সনের কাছে। এর জন্য অক্সি-এসিটিলিন অগ্নি শিখার টর্চ হাতে নিয়ে কাজ করতে হতো ওয়েল্ডাররা যে ভাবে করে, বাম হাতে কাচ পাত্র আর ডান হাতে আগুনের টর্চ নিয়ে তাতে অক্সিজেন ও এসিটিলিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হতো ওই একই হাতেই। এই অগ্নিকুণ্ডে ঘাম না ঝরে উপায় ছিলোনা। একই সঙ্গে আবার পাত্রটির সঙ্গে লাগানো একটি রাবারের টিউব মুখে রাখতে হতো; কাচ উত্তাপে যথেষ্ট নরম হয়ে এলে ঠিক উপযুক্ত জোরের ফু দিয়ে ওই অংশকে দরকার মত ফুলিয়ে তুলতে।

আমার এক্সপেরিমেন্ট ব্যবস্থায় কাচ পাত্রকে বায়ুশূন্য করে এমন নিঁখুত শূন্যস্থান এর ভেতর সৃষ্টি হতে হবে যে হাতে গোণা অল্প কিছু বাতাস-অণুর অতিরিক্ত ওখানে কিছু থাকতে পারবেনা। একেবারে মহাশূন্যেই শুধু প্রকৃতিতে এমন শূন্যস্থান পাওয়া যায়। এজন্য আমার কাচের তৈরি সিস্টেমকে একেবারে নিশ্ছিদ্র হতে হবে। অথচ নানা জটিল আকৃতির এই কাচ পাত্র আমি নিজে বানাতে গিয়ে, এতে নানা কাচ-নল জোড়া লাগাতে গিয়ে এবং বিশেষ করে তার ভেতর বিদ্যুৎ চালনা করার মত ইলেকট্রোড এবং পরিমাপের নানা জিনিস ঢুকিয়ে সিল করতে গিয়ে জোড়ার স্থানে খুবই ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক দুএকটি ছিদ্র থেকে যাওয়াটি খুব স্বাভাবিক ছিল। একটি একটি করে এই ছিদ্র উদ্ঘাটন করে প্রত্যেকটিকে কাচ গলিয়ে বন্ধ করার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও মনোযোগ সাপেক্ষ—যদিও নানা বৈজ্ঞানিক কৌশল রয়েছে এর জন্য। তাই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম এই ছিদ্রানুসন্ধানের ব্যাপারটি নিয়ে। তবে মিস্টার লরেন্সনকে মোটামুটি সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম তাঁর শিক্ষানবিশ গ্লাস ব্লোয়ার হিসেবে। লরেন্সন সাহেব নিজে কিন্তু একটি দারুণ চরিত্র। সমস্যায় পড়ে তাঁকে কখনো কোন কাজে ডেকে আনলে লম্বা সাদা এপ্রন পরা লরেন্সন ধূমপানের পাইপটি মুখে দিয়ে অনেকটা সময় এক দৃষ্টে কাজটির দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু ভাবতেন, তারপর সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার একটি সুন্দর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। আমি পি এইচ ডি লাভের পর দেশে ফিরে আসার সময় তিনি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের নতুন ছাড়া একেবারে চকচকে কিছু মুদ্রাকে নিজ হাতে একটি নলাকৃতি কাচ পাত্রে অতি বায়ুশূন্য অবস্থায় সিল করে উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ওই অবস্থায় শতবর্ষেও এগুলো এরকম চকচকে নতুন থাকবে। গ্লাস ব্লোয়িং কাজটি ছিল খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ, এবং বিপজ্জনক—

বহুবার হাত পুড়েছি, শার্টও পুড়েছি। কিন্তু এভাবে নিজের হাতে এত সুন্দর ও কার্যকর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র গড়ে তোলা—তার আনন্দই আলাদা।

লরেন্সনের মত আরেকজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের উপর আমাকে কারিগরি সহায়তার জন্য নির্ভর করতে হতো, তিনি ছিলেন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের চীফ টেকনিশিয়ান জিম কার্গিল। তিনিও বেশ প্রবীণ এবং খুবই ভারিক্কি চেহারার মানুষ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মত মূল্যবান যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। আমি যখন আমার এক্সপেরিমেন্টের মূল বস্তুটি যা কিনা টেন্টেলাম অথবা মলিবডেনাম ধাতুর একটি নিঁখুত ক্রিষ্টালের তলদেশটি একেবারে সমতল ও অতি চকচকে পালিশের অবস্থায় নিয়ে আসতাম, তখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তার ছবি দেখে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতাম যে তা সত্যিই সমতল—একেবারে সূক্ষ্ম পারমাণবিক পরিমাণ গর্ত বা উঁচু-নিচু জায়গাও যেন এতে না থাকে। এর কারণ আমার উদ্দেশ্যই ছিল একেবারে পারমাণবিক ভাবে সমতল একটি ক্রিষ্টালের তলদেশের সঙ্গে পরিবেশের গ্যাস অণুর ক্রিয়া-বিক্রিয়া। মজার ব্যাপার হলো ব্রায়ান হপকিন্সের গ্রুপের সবারই নানা দিক থেকে নানা ভাবে এই তলদেশের পরীক্ষাই করতো—ফিজিক্সের এই শাখাটাকে বলা হয় 'সারফেস ফিজিক্স'। মিস্টার কার্গিলের কাছ নিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্য আমাকে ক্রিষ্টালের একটি বিশেষ তলকে উন্মোচিত করতে হয়েছে একে বিশেষ দিকে সূক্ষ্ম ইলেকট্রিক স্ফুলিঙ্গের ছুরি দিয়ে কেটে। সেভাবে কেটে সঠিক তল উন্মোচিত হয়েছে কিনা বুঝতে হতো এর উপর এক্সরে প্রয়োগ করে প্রতিফলিত এক্সরে কী রকম প্যাটার্নের ছবি তৈরি করে তার মাপজোখ করে। বার বার এ জন্য এক্সরে ছবি তুলতে হতো, ডার্ক রুমে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সে ছবি প্রসেস করতে হতো। আমি ডার্করুমে উচ্চ স্বরে বাংলা গান গাইতে গাইতে এ কাজ করতাম। এক্সরে ছবির বিশ্লেষণে যদি মনে হতো সঠিক তল বেরিয়ে আসেনি, তা হলে সঠিকটির থেকে বিচ্যুতি মেপে ঠিক প্রয়োজন মতো কোণ করে আবার ক্রিষ্টালটি কাটতে হতো।

সঠিক তল পেলে একে নানা ঘর্ষণ বস্তু দিয়ে এবং সব শেষে সূক্ষ্ম হীরক চূর্ণ দিয়ে হাতে ঘষে ঘষে একেবারে সমতল ও চকচকে করার পালা। এত সব করে তারপর মিস্টার কার্গিলের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা। একেবারে প্রায় আণবিক পর্যায়ে দেখার মত করে বিবর্ধিত করা পরও যদি সমতল বজায় থাকতো, এর ওপর উঁচু-নিচু ঢিবি-গর্ত কিছু না দেখা যেতো তখন আমার চেয়ে কার্গিল সাহেব কম খুশি হতেন না। তিনি সব সময় একটু বাড়িয়েই বলতেন 'আ-হা ক্রিষ্টালের এমন সুন্দর সমতল পৃষ্ঠদেশ আমি সারা জনমে একটিও আর দেখিনি'। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্গিল সাহেবের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কোন এক রাজনৈতিক কারণে এখানে ট্রটস্কীপন্থী সমাজবাদী ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা খুব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে কিছু ভাংচুর করেছিলো। এ সম্পর্কে

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য যে কমিটি হয়েছিলো দেখলাম তাতে মিস্টার কার্গিলের নামও রয়েছে—টেকনিশিয়ানদের প্রতিনিধি হিসেবে।

এখানে সবাই আশা করে যে আমি বিভাগের নিচের তলায় যে ওয়ার্কশপ আছে সেখানে গিয়ে নিজেই নিজের মত করে নানা যন্ত্রাংশ বানিয়ে নেবো—সে নানা মেশিন টুল্‌স চালিয়ে ধাতু কাটাচেরা করে হোক বা বৈদ্যুতিক নানা কাজের মাধ্যমে হোক। কিন্তু হায় সেই বিদ্যা তো আমার জানা নেই, এখন নতুন করে শেখার অবকাশও নেই। তাই এজন্য বন্ধুসুলভ কোন টেকনিশিয়ানের বা সহকর্মীর সহায়তা নেয়া ছাড়া উপায় থাকতোনা। আমাদের ল্যাবে বেশ ক'জন পি এইচ ডি ছাত্র কাজ করছিল—একজন শুধু ওয়েলশ্ ছাড়া বাকিরা ইংরেজ। ওয়েলশকে আলাদা বললাম কারণ সে নিজেই তার ভিন্নতাটি প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতো। এরকম ছাত্র আট জনের মধ্যে শুধু একজন মহিলা ছিলো মনিকা লেগেট। একজন ড্যানিশ ছাত্র ছিল যে পিএইচ ডি করছিলোনা। একদিন এসে বল্‌লো 'আমি দেশে চলে যাচ্ছি, কারণ আমার যন্ত্র ভেঙ্গে গেছে। এখন আর একে সারিয়ে তুলে নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার সময় নেই'। আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। সব গড়ে তোলার পর যদি আমার যন্ত্রও কোন দিন এভাবে ভেঙ্গে যায়, তখন কী হবে? কারণ এর প্রায় পুরোটাই তো ভঙ্গুর কাচের তৈরি! ওই প্রথম দিককার দিনগুলোতে ল্যাবোরেটরিতে একজন ভিজিটিং গবেষক ছিলেন কোরিয়ান—ডক্টর লী। সব সময় গোমরা মুখে কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কথাবার্তা বিশেষ বলতেননা। কিন্তু এর পর যে দু'একজন গবেষক বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন, তাঁরা খুবই বন্ধু সুলভ। আর ওই ইংরেজ ও ওয়েল্‌শ ছাত্ররা তারা তো সবাই দারুণ ফুর্তিবাজ। সব সময় নিজেদের স্থানীয় টানে ও খানিকটা উপভাষায় কথা বলতো বলে প্রথম প্রথম বোঝাটা স্বচ্ছন্দ হতোনা, কিন্তু শিগ্‌গীর ঠিক বুঝে গেলাম, কোন কথায় কী বোঝাচ্ছে।

এখানকার গবেষণার দুই ভিন্নমুখী রূপ। যখন কোর্স করছি, কিংবা ব্রায়ান বা অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছি তখন সব কিছু তত্ত্বকথা—বই পড়ে, পেপার পড়েও বুঝতে হচ্ছে। এ হচ্ছে বিশেষ ধরনের ক্রিষ্টালের বিশেষ বিশেষ দিকের উন্মোচিত তল নিয়ে কথা, বাইরের গ্যাস অণুর ওপর তার আকর্ষণের কথা। যাবতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে শুরু করে জীব-দেহের অনেক প্রক্রিয়াও কিন্তু এরকম পৃষ্ঠতলের ওপরেই সংঘটিত হয় এবং তার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আমরা তাই সবাই এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি নানা উপায়ে। ব্রায়ান উইলিয়ামস্ এবং আমি সেটি করছি বৈদ্যুতিক পরিমাপের মাধ্যমে, মনিকা সেটি করছে স্বল্প শক্তির ইলেকট্রন স্রোতকে ওই পৃষ্ঠতলের ওপর থেকে প্রতিফলিত করলে এদের ঠিকরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট প্যাটার্ন দেখে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন অনেকটা আলো বা এক্সরে'র মত কাজ করে কিন্তু তার চেয়ে আরো অনেক সূক্ষ্মভাবে। একে বলা হয় লো এনার্জি ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন বা সংক্ষেপে

'লীড'। একই কাজ পীট উইলিয়ামস করছে হাই এনার্জি ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন বা 'হীড' দিয়ে।

এই তত্ত্বকথার বাইরে দিন-রাত আসল কাজগুলো হলো ওই ঘাম-ঝরানো কাজ—যন্ত্রপাতি নিয়ে সংগ্রাম করা। যেমন নিজেই হালকা একটি বিশাল বাক্সের মত ওভেন বানিয়ে তা দিয়ে পুরো যন্ত্রটি ঢেকে দিনের পর দিন পুরো যন্ত্রকে স্যাঁকা (বেইক করা)। এর ফলে কাচের গা থেকে সব গ্যাসীয় জিনিস বের হয়ে, পাম্প হয়ে গিয়ে ওর ভেতর সেই কাঙ্খিত দারুণ বায়ুশূন্য অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যন্ত্রের সব লীক ফীক সারিয়ে ওই উচ্চ মার্গের বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারলে তবেই প্রশ্ন ওঠবে আসল এক্সপেরিমেন্ট করার। কিন্তু দিল্লি দূর অস্ত্।

কাজের ফাঁকে কখনো কখনো নিচে আসগর সাহেবের ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু গল্প করে আসতাম। একবার আমরা দু'জন একমত হলাম পরীক্ষণ গবেষণা করতে গিয়ে এই যে বিচিত্র রকম কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন করে যাচ্ছি এগুলোর বর্ণনা দিয়ে একটি ডায়েরি রাখা উচিত। তা হলে মনে থাকবে এরকম গবেষণা বলতে কী বোঝায়। ক্ষণে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ঠিক করা; ক্ষণে যন্ত্রের লীক সারানো; ক্ষণে বাইরে থেকে চুম্বক সাবধানে নিপুণ হাতে পরিচালিত করে বায়ুশূন্য কাচের আধারের ভেতরের একটি এয়ার-টাইট কপাট আটকিয়ে দেয়া, ক্ষণে ওভেন দিয়ে উচ্চ উত্তাপে পুরা যন্ত্র স্যাঁকা; ক্ষণে আবার তাকেই বরফের চেয়েও ১৯৬ ডিগ্রি নিচের উত্তাপে নামিয়ে আনা ফ্লাস্ক থেকে ঠাণ্ডা তরল বাতাসের মধ্যে চুবিয়ে। বহুদিন ধরে যত্ন করে তৈরি ওই ক্রিষ্টালটি এখন আমার বায়ুশূন্য যন্ত্রের ভেতর। তাকে বিশেষ উপায়ে তিন হাজার ডিগ্রি উত্তাপে তুলে একেবারে উজ্জ্বল সাদা করে রাখছি প্রায় গলে যাবার মত উত্তাপে যাতে এর ভেতরের সব গ্যাস বেরিয়ে যায়। একটু অসাবধান হলেই গলে যাবে, আর নষ্ট হয়ে যাবে এতদিনকার এত কষ্টের সেই ক্রিষ্টাল, যার তলের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছবি দেখে মিস্টার কার্গিল এমন প্রশংসা করেছিলেন। ডায়েরি লেখার মতই অভিজ্ঞতা বটে এই সব! কিন্তু সে ডায়েরি কখনো লেখা হয়নি।

বিদেশের সেই নীড়

দূরপাল্লার যোগাযোগের মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে ঠিকই ক্রীস্টমাসে দেশে গেলাম, বিয়ে করে মণিকে সহ আবার সাউদাম্পটান ফিরে এলাম। এত দ্রুত সব ঘটলো যে দেশে খুব কাছের বন্ধুরা ছাড়া অন্যরা জানতেই পারলোনা। সাউদাম্পটনের ল্যাবেরেটরিতে শিক্ষক ব্রায়ান হপকিন্স আর সহকর্মীরা এবং তাদের স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ডরা কিন্তু এবার দারুণ অভ্যর্থনা জানালো মণিকে ও আমাকে। রান্নাঘরের উপর বেশি মনোযোগ দিয়ে তারা যাবতীয় ছুরি,কাচি, চামচ সব কিছুর উপহার নিয়ে এলো। সুলতান স্যার,আসগর সাহেব তো ঘরের মানুষ, মল্টিফিউর হাউসের আমার ঘনিষ্ঠ ফখরুদ্দিন, স্বামী, রামনাথন তাদেরো দারুণ

ফুর্তি। ম্যাথোডিস্ট চার্চ সংলগ্ন একটি হোস্টেলে বেড-সীটারের ব্যবস্থা তাঁরা আগেই করে রেখেছিলেন, যাতে একটি বড় কক্ষে শোয়া-বসা-রান্না সব কিছুর ব্যবস্থা থাকে। পরে কিছুদিনের জন্য একটি ভাড়া বাসায়ও রইলাম জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানির মালিকানার। এর মধ্যে সুলতান স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই এর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকা একটি বড় বাসা পেয়ে গেলেন, আমরা দুজনও এর একটি অংশে ঠাঁই পেলাম। সেই থেকে শেষ পর্যন্ত বিদেশে এটিই আমাদের অন্য নীড়। সুলতান স্যারের স্ত্রী মোমেনা ভাবী ও দুই শিশুপুত্র ঝুমুর আর ঝিনুকের সঙ্গে আমরা দু'জন বলতে গেলে একই পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম বেশ ক'টি বছর ধরে। এটি রীতিমত একটি বাড়ি—পেছনে অনেকখানি জায়গা, যেখানে আমরা শাকসবজি লাগাতাম, পরে এমনকি দেশ থেকে কারো আনা ধনে পাতাও (শুধু গ্রীষ্ম কালেই সম্ভব)। বসার ঘরে এখন নিজেদের সাদা-কালো টিভির ব্যবস্থা হয়ে গেল, অবশ্য কেনা নয়—সাপ্তাহিক হিসেবে ভাড়া করা। ও সময় টিভি ভাড়া করার ব্যবস্থা বেশ চালু ছিল।

শুধু ভাড়া করা টিভি'র দিক থেকে নয়, সে সময় স্বল্প-বিত্ত সাধারণ মানুষদের ইংল্যান্ড যে কত সেকেলে ধরনের ছিল তা এখন কল্পনা করা যাবে না। শুধু ঘর গরম করার ব্যবস্থার কথা বল্‌লে কিছুটা বোঝা যাবে। সেন্ট্রাল হীটিং সিস্টেম বলতে যা বোঝায় সেটি তখন অনেক সাধারণ বাসাবাড়ির জন্য ছিল খুবই বিরল, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও দু'একটি ছোট খাট ডিপার্টমেন্টে দেখেছি খোলা কয়েলের ইলেকট্রিক হীটার জ্বালিয়ে সেটি একটু বেশি উত্তাপ পাওয়ার জন্য নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কেউ কেউ অফিস করছে। আমাদের বাসায়ও সেরকম ইলেকট্রিক হীটার ছিল। তবে তার চেয়ে সাশ্রয়ী ছিলো কেরোসিনের (সঠিক ভাবে বলতে গেলে প্যারাফিনের) হীটার। রাতে বাসায় ফিরে প্রথম সেটি জ্বালাতে হতো, যতক্ষণ যথেষ্ট গরম হয়ে না উঠতো ততক্ষণ গায়ের গরম কাপড় ছাড়া যেতো না। শনি বা রোববারের ছুটির দিনে দুই হাতে দুটি জেরিক্যান নিয়ে দূরের একটি পেট্রোলপাম্পের মত মেশিন থেকে কয়েন ঢুকিয়ে এই প্যারাফিন কিনে বহন করে আনতে হতো। দৃশ্যগুলো অনেকটা চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসে বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সঙ্গে মিলে যায়। ছাত্রদের নানা আবাসে দেখেছি আরো মজার ব্যাপার—শিলিং মুদ্রা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে ঘর গরম করতে হতো। এগুলো ছিল পাবলিক টেলিফোনের মত কয়েন-অপারেটেড হীটার। একটি শিলিং মুদ্রা ফেললে কয়েক ঘণ্টার জন্য হীটার কাজ করতো, ইতোমধ্যে আবার আর একটি কয়েন না দিলে ঘর দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে পড়তো। শীতের রাতে শিলিং কয়েন ফুরিয়ে গেলে জমে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। মনে রাখতে হবে তখনো কিন্তু বৃটেন পাউন্ড-শিলিং-পেন্সের দেশ। বারো পেন্সে এক শিলিং এবং বিশ শিলিং এ এক পাউন্ড। শিলিংটাই মোটামুটি আমাদের টাকার মত ব্যবহৃত হতো, আর পেন্সটি আনার মত। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে দশমিক

মুদ্রা চালু হয়ে একশত নিউ পেন্সে এক পাউন্ডের হিসেবটা চালু হয়। শিলিং জিনিসটি উঠেই যায়।

সাউদাম্পটনে এসে অবধি অধিকাংশ সময় একাকী কাটাতে হচ্ছিল মণিকে। উপযুক্ত একটি চাকরির সন্ধান করতে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জসহ অনেক জায়গায় ধরনা দিতে হলো তাকে, আর স্থানীয় পত্রিকা 'সাউদাম্পটন একো'তে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোও দেখছিলো। শেষ পর্যন্ত বেশ চমৎকার একটি চাকরি পাওয়া গেলো—সাউদাম্পটন থেকে বাসে ঘণ্টা খানেকের দূরত্বে টটন গ্রামার স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরিতে টেকনিশিয়ানের কাজ। পদার্থবিদ্যার ছাত্রী হলেও তার চাকরি হলো জীববিজ্ঞানের ল্যাবে। ওখানকার পোকা মাকড়, ছোট ছোট পশু পাখির রক্ষণাবেক্ষণ, এদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করা, ছোট ছোট মৃত পশুপাখির চামড়া-পালক ইত্যাদি ব্যবহার করে আবার এর হুবহু অবয়ব সৃষ্টি করা—শিগ্‌গীর এসব কাজে দক্ষ হয়ে উঠলো সে। সেই স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের বেশ পরিচিত মানুষ—মিসেস বেগম। আমি কালে ভদ্রে ওই স্কুলে গেলে সবাই আমাকে মিস্টার বেগম বলে ডাকতে চাইতো। মণি বিয়ের পর নিজের পূর্বতন নাম শামসুন্নেসা বেগম অক্ষুণ্ন রাখায় এই বিপত্তি।

ল্যাবোরেটারিতে একটানা কাজের মধ্যে সেই মর্নিং'টি, লাঞ্চ, আর আফটারনুন টি'র সময়গুলো বেশ একটু বিরতি এনে দিতো। ওই টি-টাইমে বিভাগের শিক্ষক, টেকনিশিয়ান ও গবেষণা ছাত্রদের প্রায় সবাই চায়ের ধূমায়িত কাপ হাতে আরাম করে পাঁচ দশ মিনিট গল্প করে যেতো আমাদের ওই দরাজ টি' রুমে। কারো সঙ্গে যদি জরুরি আলাপ থাকতো তা হলে ওই টি' রুমেই অল্প ক্ষণের জন্য হলেও তাকে ধরা যেতো—প্রফেসর, সহকর্মী, টেকনিশিয়ান যেই হোক না কেন। লাঞ্চের সময়টি আরো হতো আরো মজার সময়—স্টুডেন্টস ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে যে বিশাল ক্যাফেটেরিয়া সেখান অবধি সামান্য পথ হেঁটে যেতাম লাঞ্চ খেতে। একটু চড়াই উৎরাই পথে ঝুলে থাকা পাতার উইপিং উইলো গাছের তলা দিয়ে ঝিরঝিরে ঝরনার প্রবাহ অনুসরণ করে ওদিকে হেঁটে যাওয়াটাও ছিল বেশ আনন্দদায়ক। ওখানে ছাত্র ছাত্রীদের কলকাকলির মধ্যে সময়টি কাটাতে খুব ভাল লাগতো। ওদের সঙ্গে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে আড্ডা দেবার মত যুৎসই কারো সঙ্গ বেছে নিতাম ওই বিশাল খাবারের হল ঘরে। অনেক দিন যাবার সময় আসগর সাহেব ও তাঁর কাছেই থাকা গ্রাহাম মাউন্টফোর্ডকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম—তাঁরা দু'জনেই নিচের তলায় কাজ করতেন। গ্রাহামের কাজ ছিল চুম্বকের যে নানা ভাগে বিভক্ত হওয়া 'ডোমেইন' থাকে তার তলের পরিবর্তনগুলো মাইক্রোস্কোপে দেখে ছবি নেয়া। আর আসগার সাহেব কাজ করতেন বিশাল বৈদ্যুতিক চুম্বক নিয়ে—যেটি তাঁকে এদিক ওদিক ঘোরাতেও হতো। গ্রাহাম আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা বড়, একটু দার্শনিক ধরনের মানুষ। আসগর সাহেবও এদিক থেকে কম যাননা। কাজেই আমাদের লাঞ্চকালীন আলাপে উচ্চ

মার্গীয় বিষয়বস্তুর অভাব হতোনা। কিন্তু ইতোমধ্যে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় আমার পরিচিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অনেকের সঙ্গে এই ক্যাফেটেরিয়াতেই আলাপ হয়েছে, অন্যদের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে। এদের মধ্যে স্থানীয়দের চেয়ে আর্ন্তজাতিক ছাত্রদের সঙ্গেই পরিচয় গড়ে উঠেছে দ্রুততর লয়ে। লাঞ্চের সময় এদের অনেকের সঙ্গেও প্রায়ই সংক্ষিপ্ত আড্ডা হতো। এসব বন্ধুর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি ছিল, এবং তাদের মাধ্যমে আমরা অনেক গুণী মানুষের বেশ জমজমাট একটি উপমহাদেশীয় সংহতি গড়ে তুলতে পেরেছিলাম।

সাউদাম্পটনে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওই রকম ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষের একটি ছোটখাট অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম—জামিলুর রেজা চৌধুরীর (পরে বুয়েটের প্রফেসর, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ ও তাঁর বিদায় উপলক্ষে। জামিল ভাই সাউদাম্পটনে বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন তখন সুউচ্চ ভবনের প্রকৌশল নিয়ে গবেষণা করছিলেন প্রধানত কম্পিউটার মডেলিঙের সাহায্যে। তিনি সাউদাম্পটন ইউনির্ভাসিটি পাকিস্তান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ছিলেন এক সময়। আমি যখন যাই তখন আসগর সাহেব এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তারপরই ওই পদটি পশ্চিম পাকিস্তানি এক জনের হাতে চলে যায়।

এরকম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বড় সুবিধা ছিল এর অনুষ্ঠানাদির জন্য আমরা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থেকে অর্থ বরাদ্দ পেতাম। আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল প্রায়শ দল বেঁধে বাস ভাড়া করে দূরে কোন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণে যাওয়া। নিজেরা অল্প কিছু টাকা দিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যেতে পারি, বাকি টাকা আসে ইউনিয়ন থেকে। আর এটি যে শুধু পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে পারতাম তা নয়, বরং অন্যান্য কয়েকটি সমিতিও এরকম ভ্রমণের ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতো—তাতে তাদেরো বাস পূর্ণ করতে সাশ্রয় হতো বলে। এভাবে আমরা প্রায় রোববারেই দিনব্যাপী দীর্ঘ ভ্রমণে থাকতাম—ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, আরব স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা নিজেদের এসোসিশেনের সৌজন্যে। বাসে ঝুম ঝাম করে গান হচ্ছে, কখনো নিজেরাও দল বেঁধে গান গাইছি, আর বাস ছুটে চলেছে ইংল্যান্ডের ঢেউ খেলানো প্রান্তরে গ্রাম-শহর-খেত খামার পার হয়ে—আমাদের গন্তব্যে। পথে কোথাও নেমে হৈচৈ করে চা-নাশতা খাচ্ছি; সাধারণত ভোরে রওয়ানা হয়ে বেশ রাত করে ফেরা হতো। বাসার সবাই, অন্যান্য বন্ধু বান্ধব বা পরিবারগুলো মিলে সাধারণত এটি করতাম বলে দারুণ একটি পিকনিকও হয়ে যেতো। ভাল রাস্তা হওয়াতে অনেক দূরে দূরে চলে যেতে পারতাম। ব্রাইটন, বোর্নমাউথ, পোর্টসমাউথ এসব জায়গাগুলোতো কাছেই ছিল, তাছাড়াও স্যালিসবারি ক্যাথিড্রাল, লংলীট লায়ন পার্ক, বিভিন্ন বিখ্যাত কান্ট্রি হাউস, লন্ডনের কাছে কিউ গার্ডেন্স, হ্যাম্পটন কোর্ট, আবার কখনো খোদ লন্ডন

শহরে—এমনি চলতেই থাকতো। গবেষণা ছাত্রদের সপ্তাহের পাঁচদিন দারুণ খাটা খাটনি করে, শনিবারটি বাজার ইত্যাদি সাংসারিক কাজ করে, রোববারটি এভাবে কোন না কোন ভ্রমণে গিয়ে কাটতো; আর নইলে ঘনিষ্ঠ পরিচিত কারো বাসায় গিয়ে দাওয়াত খেয়ে আড্ডা দেয়া, বা অন্যদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো।

আমাদের অ্যাসোসিয়েশনগুলো যার অধীনে ছিল সেই স্টুডেন্টস ইউনিয়নটি ছিল এক এলাহি ব্যাপার—প্রতি বছর নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠিত হতো। আমাদের দেশের মতো রাজনীতির সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে না গেলেও এখানেও ছাত্রদের দল রয়েছে। ছাত্রদের একটি ছোট অংশই এসব দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বাকিদের সমর্থন থাকলেও সক্রিয়তা কম থাকতো। ইয়ং কনজারভেটিভ, ইয়ং লেবার, ইয়ং লিবারাল এরকম দল তো ছিলই, নানা মতবাদের বামপন্থী দলগুলোও ছিল। ছাত্রদের যে দলটিকে সব চেয়ে মুখর ও সক্রিয় দেখতাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি ছিল ট্রটস্কীবাদী বামপন্থী দল। তারা প্রায়ই ক্যাম্পাসে মিছিল-সভা করতো—অন্যান্য জায়গা থেকেও তাদের বড় নেতারা এসে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতো, আমরা এর ঘোষণা পত্র পেতাম। একবার তাদের নেতা তারেক আলী এসেছিলেন, সেবার তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। এই তারেক আলীর কথা বহু আগে দেশেই শুনেছিলাম—বৃটেনের একজন খুব বাগ্মী ছাত্র নেতা হিসেবে। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এই পাকিস্তানি যুবক (পাঞ্জাবি)। 'ছাত্ররা রাণীর জন্য যুদ্ধ করতে রাজি নয়', এই রকম একটি প্রস্তাবনাকে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বিতর্কের বিষয় করে তিনি বেশ বিখ্যাত এবং সমালোচিতও হয়েছিলেন।

তবে সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নে রাজনীতির চেয়েও এর দেয়া সার্ভিসগুলোই মুখ্য ছিল। ওই বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতার কথা তো বলেছিই। ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা; স্থানীয় ভাবে বা দূরপাল্লায়, এবং দেশে বিদেশে সাশ্রয়ী ভ্রমণের নানা সুযোগ সুবিধা; ইত্যাদি এই ইউনিয়ন সৃষ্টি করতো। তা ছাড়া ক্যাফেটারিয়াগুলো চালানো, নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন, সাপ্তাহিক ডিস্কো নাচের আয়োজন, ও অন্যান্য নানা বিনোদন ছিল ইউনিয়নের বড় কাজ। ছাত্র ছাত্রীদের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য অনেক দায়িত্ব একে পালন করতে হতো। এই সব কাজ এত পেশাদারী মনোভঙ্গি নিয়ে বাস্তবায়ন করা হতো যে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কল্পনাও করতে পারবোনা। গভীর বেইসমেন্টে থেকে শুরু করে কয়েক তলা বিশাল এলাকা জুড়ে তার কাজ। যেই ছাত্র স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়, সে যে কেন ওই বছরটি পড়াশোনা থেকে বিরতি নিয়ে, পূর্ণকালীন প্রেসিডেন্টের কাজই করে তা এসব কাজের দায়িত্ব দেখেই বুঝতে পেরেছি।

যে কোন সূক্ষ্ম পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সব সময় নাজুক অবস্থায় থাকে, আমার ক্ষেত্রে সেটি একটু বেশি নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। এর কারণ হলো আমার এক্সপেরিমেন্টের প্রধান যন্ত্র ব্যবস্থাটি প্রায় আগাগোড়া কাচে তৈরি এবং এর একটি বড় অংশ আমার আনাড়ি হাতের গ্লাস ব্লোয়িঙেই গড়ে উঠেছে। এই অংশের কাচ পাত্রগুলোর উপর নানা মেরামত, সংযোজন, বিয়োজন করতে গিয়ে এখানকার কাচের জোড়াগুলোর বস্তু গুণ ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। কাচকে বার বার গলিয়ে তাতে এভাবে হস্তক্ষেপ করলে ওখানে নানা রকম টানা-পোড়েন সুপ্ত ভাবে থাকে, ওতে লুকিয়ে থাকতে পারে খুব ক্ষুদ্র সব ফাটল 'মাইক্রো-ক্র্যাক'। পরে উত্তাপের তারতম্য হলে, বা চাপ পড়লে কোন রকম নোটিশ না দিয়ে ওখানে ফেটে যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে খুব বড় লীক দেখা দিতে পারে। বারবার এটি হয়েছে এবং এক্সপেরিমেন্টে সংকট সৃষ্টি করেছে। ওই যে বলেছি দিনের পর দিন ওভেন দিয়ে ঢেকে উত্তপ্ত করা ও একই সঙ্গে পাম্প করা অব্যাহত রাখা, উত্তাপের হেরফেরে তখনই এটি ঘটে বেশি। এমনটি হলে মাসাধিক কাল ধরে সযত্নে অতি বায়ুশূন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেছি তা নিমেষেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ক্ষতিকর ঘটনাও ঘটতে পারে।

ওরকম ঘটনাই আমার ঘটেছে পর পর দু'বার। ওই উচ্চ বায়ুশূন্যতা সৃষ্টির জন্য আসল যে দুটি পাম্প উপর-নিচ পরস্পর সংলগ্ন সেগুলোও পুরোপুরি কাচের তৈরি। এতে একটি কাচপাত্রকে হীটার দিয়ে সব সময় উত্তপ্ত করে তার ভেতরে পারদকে টগবগ করে ফুটানো হয়। পারদ বাষ্প ওপরে ওঠে কিন্তু ওখানে কাচের দেয়ালের বাইরে চারদিকে প্যাচানো কাচ নলে প্রবাহিত পানির কারণে ঠাণ্ডা ও ঘন হয়ে আবার ওই নিচের পাত্রে পড়ে যায়। এই পড়ার সময় ভারি পারদ অণু অল্প স্বল্প যে বাতাসের অণু আমার কাচপাত্রের সিস্টেমের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে তাদেরকে ঝেটিয়ে বের করে দেয়—এজন্য এই পাম্পকে বলে মার্কারি ভেপর পাম্প। ওই যে পানিবাহী প্যাঁচানো কাচ নল—একবার গভীর রাতে সেটি গেল ফেটে। ফলে ক্রমাগত প্রবাহমান পানি সমানে সেখান দিয়ে বের হয়ে মেঝেতে পড়লো, ঠাণ্ডা হতে না পেরে পারদ বাষ্প ঢুকে গেল আমার এক্সপেরিমেন্টের আসল পাত্রে—সব কিছুকে দূষিত করে নষ্ট করলো তা। সেটা যাই হোক আমি পরে আবার নতুন করে করতে পারবো, কিন্তু মেঝেতে যে পানি পড়লো সেটিই হয়ে পড়লো সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আমার জানাই ছিলনা যে এখানকার এত সুন্দর ভবনগুলোর সব তলায় মেঝেগুলো একেবারেই সছিদ্র। সেখানে কোন পানি গড়ালেই সেটি দিব্যি চলে যায়—নিচের তলায়, তারপর সুযোগ পেলে আরো নিচের তলায়। আমার ঘরের নিচের তলায় ছিল আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ল্যাবোরেটরি— সেখানকার সব যন্ত্রপাতি ভিজে এক শা, অনেকগুলো নাকি নষ্টই হয়ে গেলো। প্রথম বার এটি যখন ঘটলো অল্প ক্ষতি হয়েছিলো বলে রক্ষা পেয়ে

গেলাম। দ্বিতীয়বার যখন ঘটলো তখন মাথার ওপর কেয়ামত নেমে এলো। নিচের ওই ল্যাবোরেটরির ভারপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের রুদ্র মূর্তি দেখার মতো ছিল। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নামে নালিশ করলেন। আমি ক্ষমা চেয়ে এর ভবিষ্যত পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু সেটি নিশ্চিত হবে কী ভাবে?

নানা জায়গায় ফোন করে পরামর্শ চাইলাম, দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কী ভাবে পানির প্রবাহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যায়। সাউদাম্পটনের কাছের একটি ওয়াশিং মেশিন তৈরির ফ্যাক্টরি থেকে বল্‌লো তারা ওয়াশিং মেশিনে পানির প্রবাহ চালু বা বন্ধ করার জন্য এমন একটি ভাল্ব বা কপাট ব্যবহার করে যা বিদ্যুৎ ভোল্টেজ অন্ বা অফ্ করে খোলা বাঁধা করা যায়। ওরা ওরকম একটি ভাল্ব আমাকে বিক্রি করলো। এখন এমন ব্যবস্থা যদি করতে পারি যে পানির কাচনল ফেটে গেলে ওই ভোল্টেজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে অফ্ হয়ে যায় তা হলেই হলো, সেটি পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেবে। এই কাচনল ঘুরে পানি চলে যাবার সময় তা যেন একটি ছিদ্রওয়ালা পাত্রকে সর্বদা ভরে রাখে সেই ব্যবস্থা করলাম। নল ফেটে বের হয়ে যাবার কারণে এই পানি না এলে এই পাত্রটি হালকা হয়ে হেলে পড়ে এবং তার চাপে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভোল্টেজ যাবার প্রেশার সুইচটিকে অফ্ করে দেয়। বারবার পরীক্ষা করে দেখলাম ঠিক তাই হয়, ফাটা নলের কারণে পাত্রে পানি না ঢুকলেই এভাবে কপাট বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বহুদিন পরে সত্যিসত্যি একদিন গভীর রাতে আবার কাচনল ফাটলো। কিন্তু এবার আর মেঝেতে পানি গড়ালোনা—কারণ আমার হাতে তৈরি ওই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পানি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমার মূল এক্সপেরিমেন্টের মতিগতি আমাকে যতটা না ভাবিয়েছে এই কাচ ফাটা দুর্ঘটনা তার চেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছিলো। আমার তখন ওই ড্যানিশ ছাত্রটির কথাটি মনে পড়তো, যে একদিন বিষণ্ন বদনে বিদায় নিতে এসে বলেছিলো 'আমার যন্ত্র ভেঙ্গে গেছে, তাই আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি'। এরই নাম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, এতে সংকট শুধু সদর রাস্তাটি দিয়ে নয়, অলিগলি হাজারো পথ দিয়ে আসতে পারে।

এই সব কিছু কিন্তু আমাদের মূল আলোচনার তেমন কিছু বিষয় ছিলনা। ব্রায়ান হপকিন্সকে কেন্দ্র করে আমাদের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা সভাটি যখন বসতো তখন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো নিয়ে বেশি কথা হতো, যার কিছু কিছু আমাদের কাজের ফলে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হবে এটিই ছিল আশা। এসব সভায় মাঝে মাঝে বেশ নাম করা বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পেতাম—তাঁরাও ওই ভাবে একেবারেই ঘরোয়া ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে এসব তত্ত্বকথা আলোচনা করতেন, তাঁদের ল্যাবোরেটারিতে কী হচ্ছে সে সব খবর দিতেন। তাঁদের মধ্যে বয়সে একেবারে তরুণী অথচ বিখ্যাত একজন ছিলেন জোসেলীন বেল। ১৯৬৮ তে আমি যখন সাউদাম্পটনে যাই জোসেলীন তখন সদ্য ক্যাম্ব্রিজ থেকে ডক্টরেট করে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগে স্পেস ফিজিক্স শাখায় গবেষক

হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তিনি আরো বিরাট কিছু করেছিলেন, পি এইচ ডি'র জন্য কাজ করার সময়ই এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আবিষ্কার করেন 'পালসার' নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী জিনিস—এগুলো হলো বার বার একই তালে কিছুক্ষণ পর পর রেডিয়ো তরঙ্গ সম্প্রচারকারী বিশেষ রকমের তারা। এই তারা শুধু নিউট্রনে গড়া অত্যন্ত ঘন ও ভারি নিউট্রন-তারারই একটি রূপ; পরিণত বয়সে শক্তি হারিয়ে নিজের উপর ধস নামিয়ে অতি সংকুচিত হয়ে কোন কোন সাধারণ তারা এ ধরনের নিউট্রন-তারায় পরিণত হয়। জোসিলীনের এই আবিষ্কার শতাব্দীর একটি সেরা জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কার বলে উল্লেখিত হয়। এ আবিষ্কারের জন্য নোবেল কমিটি তাঁর পিএইচডি সুপারভাইজার প্রফেসর হিউইশকে নোবেল পুরষ্কার দিলেও জোসিলীনকে দেয়নি। নোবেল কমিটির এই সিদ্ধান্তটি এরপর থেকে সব সময় দারুণ সমালোচিত হয়ে এসেছে। পরে অবশ্য তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো; এবং ও বি ই পেয়ে ডেইম জোসিলীন বলে পরিচিত হয়েছিলেন। নাইটহুড পেয়ে 'স্যার' হবার বিষয়টি যেমন পুরুষের, 'ডেইম' উপাধি তেমনি মহিলাদের। এ অবশ্য পরের কথা; কিন্তু তখনই পালসার আবিষ্কারের পরপরই ওই ছাত্রী অবস্থাতেই জোসিলীন বৃটেন জুড়ে দারুণ খ্যাতি পেয়েছিলো। আমার থেকে মাত্র দু'এক বছর বড় একটি মেয়ে আমার একই বিভাগে, একই ভবনে কাজ করছে। আমাদের ঘরোয়া আলোচনায় স্পেস ফিজিক্সে তার কাজের সর্বশেষ ব্যাখ্যা দিচ্ছে—দারুণ লাগতো এতে।

প্রায় সপ্তাহেই ওই ঘরোয়া আলোচনার পর আমাদের 'কফি মানির' ভাণ্ডারে কত জমলো তা দেখা হতো। প্রায় প্রতিদিন আমাদের দলভুক্ত সবার যন্ত্রপাতি থেকে বেশ কিছু ফেলনা ধাতু পরিত্যক্ত হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হতো উচ্চ বায়ু শূন্য করার জন্য ব্যবহৃত গাস্কেট—বিশুদ্ধ তামার তৈরি। এগুলো বিক্রি হয়ে ওই 'কফি মানি' জমতো। এ পয়সা দিয়ে কফি-বিস্কুটের মজুদ হতো—কাজ করতে করতে যখন তখন দিব্যি খাওয়া হতো। শুধু তাই নয়, ল্যাবোরেটারির একটি ঘরে যেখানে কফির সরঞ্জাম থাকতো, সেখানে তাজমহল রেস্টুরেন্টের একটি মেনু ঝোলানো থাকতো। এটি সাউদাম্পটনের একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট—সত্যি ভারতীয়, সিলেটি নয়। এখানকার কুইক লাঞ্চ ব্রায়ান আর তাঁর ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। যখন তখন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ওখানে আমরা পুরো গ্রুপ লাঞ্চ খেতে চলে যেতাম, তার আগে তর্ক বিতর্ক করে মেনু ঠিক করে ফেলতাম।

প্রথম দিকে সারফেস ফিজিক্সের আমরা ক'জনের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের বলতে আমিই শুধু ছিলাম। কিন্তু এর পর ডক্টর রঙ্গ এলেন, মূল বাড়ি ভারতের কর্ণাটকে, কিন্তু এখন বৃটেনে থাকেন। তিনি দেখলাম বিদেশে থাকলেও মনে প্রাণে খুবই ভারতীয়, তাই আমার সঙ্গ পছন্দ করতেন বেশি, এক একটি পরিস্থিতিকে আমরা উপমহাদেশীয়রা কী ভাবে সামাল দিই তিনি আমার সমর্থন নিয়ে সেগুলো সবার কাছে বলতেন। ড. রঙ্গ ছিলেন আমাদের

থিওরিটিশিয়ান—সারফেস ফিজিক্সের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতেন। তবে আরো কিছু পরে অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে এলো নতুন পিএইচডি ছাত্র শাহ—পুরো নাম গুণবন্ত রঙ্গলাল শাহ। এর মধ্যে ব্রায়ান উইলিয়াম্সের ডিগ্রি শেষ হওয়ায় তিনি চলে গিয়েছিলেন। শাহ আর আমার কাজের ঘর ও বসার ঘর একই হলো। শাহের পরিবার আদিতে গুজরাট থেকে এলেও তারা বহুকাল ধরে তানজানিয়ার বাসিন্দা—ওখানেই তার জন্ম, স্কুলের লেখাপড়া; তারপর ভারতে গিয়ে বরোদা স্টেটে পড়াশোনা করেছে; অবশেষে ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। ওয়েল্শের মেয়ে ক্রিষ্টিনকে বিয়ে করেছে, তাদের চার-পাঁচ বছরের ছেলে পল আবীর শাহ। ওদের সবার সঙ্গে আমার খুব খাতির হয়ে গিয়েছিলো, মাঝে মাঝে মণি আর আমি সাউদাম্পটনের বাইরে গ্রামের দিকে ওদের বাসায় চলে যেতাম। দিনে-রাতে যখন ল্যাবে দু'জনে কাজ করতাম শাহের সঙ্গে অনেক গল্প হতো; তানজানিয়ার মোয়ানজোতে তার বাল্যকালের কাহিনীও শুনেছি। ওখানে ভারতীয় বিশেষ করে গুজরাটি অভিবাসীদের সুখ-দুঃখের আলেখ্য শাহের কল্যাণে আমার জানা হয়ে গিয়েছিলো। ওদেশে ব্যবসা বাণিজ্য তখন বহুলাংশে ভারতীয়দের হাতেই ছিল। তারা বংশানুক্রমে বহু প্রজন্ম ওখানে থাকলেও ঠিক তানজানিয়ান বা আফ্রিকান হয়ে ওঠতে পারেনি; কেন পারেনি শাহের কথা শুনে আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। সে তার দেশের ভাষা সোয়াহিলি শিখেছে পারিপার্শ্বিকতায় তার ব্যবহার করতে হয় বলে, বিশেষ করে কর্মী-কর্মচারী গোছের স্থানীয় যাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হতো তাদের কারণে। আসলে তার মাতৃভাষা গুজরাটি, কাজের ভাষা ইংরেজি। ভারতকেও এক রকম আসল মাতৃভূমি মনে করে; আফ্রিকার সঙ্গে কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই।

ল্যাবোরেটরিতে আমাদের বসার ঘরে শাহ আর আমার সঙ্গে কয়েক মাসের জন্য যোগ দিয়েছিলেন রাশিয়া থেকে আসা বিজ্ঞানী ওলেগ আর্টমানোভ। তাঁর ইংরেজিটি একটু আড়ষ্ট হলেও আমাদের কথোপোকথনে ওলেগও দিব্যি যোগ দিয়েছিলেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী বা অন্য কোন বিদ্বজ্জন খুব সহজে দেশের বাইরে যেতে পারতেন না। ওলেগকে নিয়ে তাই সবার কৌতূহলের সীমা ছিলনা। আমরা দু'জন কিন্তু ওলেগকে পেয়েছিলাম খুব উষ্ণ হৃদয় মানুষ হিসেবে। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল খুবই গভীর। আমাদের সঙ্গে নৈকট্যের কারণে গবেষণার কাজেও তাঁর খুব সহায়তা পেতাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেখানকার নেতারা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে আমাদের কাছে কড়া সমালোচনা করতে ছাড়তেন না তিনি। এসব নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে তিনি খুব মজা পেতেন। পরে বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য সোভিয়েত বিজ্ঞানী এবং ছাত্রকে দেখিছি; কিন্তু তাদের কাছে ওলেগের মত মুক্ত মনা আচরণ পাইনি। ইতালিতে ত্রিয়েস্তের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সে (আই সি টি পি) একবার সেন্টারের কমন রুমে 'ডক্টর জিভাগো' সিনেমাটি ভিডিও ক্যাসেটে

দেখার সময় একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীকে দেখেছিলাম বেশ চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে সিনেমার মাঝখানে বেরিয়ে যেতে। কারণ এই কালজয়ী উপন্যাসের চিত্র রূপে সোভিয়েত বিপ্লবকে নেতিবাচক ভাবে দেখানো হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। মজার ব্যাপার হলো ওলেগ যে সময় বৃটেনে এসেছেন আমাদের কাছে মন খুলে কথা বলেছেন—তখন কিন্তু একটি গুপ্তচর কেলেঙ্কারি নিয়ে বৃটিশ ও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের মধ্যে দারুণ বাদানুবাদ চলছে, আর সেই কথিত গুপ্তচরের নামও ওলেগ।

ল্যাবে আমাদের কক্ষে একটি পুরোনো কিছুটা ভাঙ্গা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো ছিল। হয়তো কবেকার কোন ছাত্র এটি ব্যবহার করতো, যাবার সময় ফেলে রেখে গিয়েছিলো, ল্যাবের পড়ে থাকা নানা যন্ত্রপাতির সঙ্গে। এই পুরোনো রেডিয়োটি কিন্তু আমাকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছে—বিশেষ করে যখন একা কাজ করতাম, অনেক সময় রাত বিরেতেও। বিবিসি'র রেডিয়ো ওয়ান, রেডিয়ো টু এই দুটি স্টেশন যথাক্রমে পপ গান এবং লোকজ গান 'ডিস্ক জকি'র সারাক্ষণ কথাবার্তা সহযোগে সমানে বাজিয়ে চলতো, আর রেডিয়ো ত্রি একটানা ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। এই প্রথম পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হলাম। ল্যাবে এই রেডিয়োতে এবং রাতে বাসায় ফিরে টেলিভিশনে, বিশেষ করে 'টপ অফদি পপ' এবং বিখ্যাত পপ গায়ক-গায়িকাদের একক অনুষ্ঠানে ষাট ও সত্তর দশকের কয়েকটি বছরের জনপ্রিয় গানগুলো যেন রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এখনো বহু দশক পর যখনই সুযোগ ঘটে আমি সেই বিশেষ যুগের 'ওল্ডিজ'গুলো (পুরোনো দিনের গান) বার বার শোনতে থাকি। যখনই শুনি তখনই মনটি উদাস হয়ে ভেসে যায় সেই অদ্ভুত অনুভূতির দিনগুলোর কাছে। এসময় পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শোনাতেও আমার কিছুটা দীক্ষা ঘটে বাসায় সুলতান স্যারের কাছে—এটি ছিল তাঁর নেশার মত। তাঁর রেকর্ড প্লেয়ারে পাশ্চাত্য সংগীত গুরুদের সিম্ফোনি, কোরাস ইত্যাদির এক একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড চাপিয়ে তিনি তন্ময় হয়ে শোনতেন, আমাকেও সঙ্গে রেখে শোনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে চাইকোভোস্কির 'নাট ক্রেকার' বা বিটাফোনের 'মুন লাইট সোনাটা'র মত সংগীত বার বার শোনতে শোনতে সুরগুলো মাথায় গেঁথে গিয়েছিলো। সুলতান স্যার কিন্তু রেকর্ড প্লেয়ার শুনেই ক্ষান্ত হতেন না; ওই অল্প স্কলারশিপের টানাটানির সংসারেও তিনি প্রচুর খরচ করে সত্যিকার কনসার্টে যেতেন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শোনতে; অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়াতে অধিকাংশ সময় স্ট্যান্ডিং টিকেট কিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও তাঁকে কনসার্ট শোনতে হয়েছে।

সুলতান স্যার এসময় সংগীতের আর একটি দিকে আমাকে পথ চিনিয়েছিলেন। ষাটের দশকের ওই সময়টি ছিল পাশ্চাত্যে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের সময়—হিপ্পি, ফ্লাওয়ার চিল্ড্রেন আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো আমেরিকার তরুণদের রাজনৈতিক-সামাজিক বিদ্রোহ—ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী, বর্ণবাদ

বিরোধী, পরিবার ও সমাজের কড়া নিয়ম নিগড় বিরোধী। এই বিদ্রোহের বংশীবাদকের কাজ করছিলো বেশ কিছু গায়ক-গায়িকা। সুলতান স্যার তাদের গান শুধু পছন্দই করতেন না; তাদের পরিচয়, তাদের বক্তব্য, তাদের নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখতেন ও আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করতেন। তখনই তাদের মধ্যে একজনের গান আমারো খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলো; তিনি হলেন তরুণী শিল্পী জোয়ান বায়েজ যাকে আমার কাছে মনে হতো পুরো আন্দোলনটির চারণ-গায়িকা। তাঁর কথায় ও সুরে আমি বাংলাদেশের লোকগীতির আভাস পেতাম। ভাল লাগে যে সেদিনের বংশীবাদকদের অনেকেই হারিয়ে গেলেও—যেমন বীটলদের জন লেনন—জোয়ান বায়েজ এখনো গাইছেন, একই ধরনের গান গাইছেন।

পাশ্চাত্য সংগীতে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কিত হলাম দেশে ফিরে এগুলো কোথায় পাব। তাই একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিলাম। মণি তার চাকরীতে বেতন পাওয়ার পর পরই একটি চমৎকার ফিলিপ্‌স টেইপ রেকর্ডার কিনে দিয়েছিলো। এটি ব্যবহার করে আমি সমানে পছন্দের গান ও সংগীত টেইপ করতে আরম্ভ করলাম, রেকর্ড প্লেয়ার থেকে, রেডিয়ো থেকে, এমনকি টেলিভিশন থেকেও। এতে ব্যয় সংকোচের একটি রাস্তাও পেয়ে গেলাম। আমাদের বিভাগে স্পেস ফিজিক্স গবেষকদের কাজ ছিল তাদের ভ্যানে বহনযোগ্য রেডিয়ো টেলিস্কোপ নিয়ে সাউদাম্পটনের আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দিনের পর দিন মহাশূন্য থেকে আসা নানা সিগন্যাল রেকর্ড করা। প্রধানত তাদের প্রয়োজনে বিভাগের যন্ত্রপাতি-যন্ত্রাংশের দোকানে বিশাল পরিমাণ রেকর্ডিং টেইপ মজুদ থাকতো। শোনলাম ছাত্ররা ওখান থেকে যে কোন পরিমাণ টেইপ ওই ল্যাবোরেটারির সুলভ মূল্যেই কিনে নিতে পারে। কাজেই আমার টেইপ কেনার আর রেকর্ড করার কোন সীমা পরিসীমা রইলনা। ওদের একটি যন্ত্র ছিল যেখানে বিরাট রোলার থেকে দ্রুত শত শত গজ টেইপ মেপে কেটে নিতো, এবং টেইপ রেকর্ডারের ব্যবহার করার মত বিভিন্ন স্পুলে জড়িয়ে দিতো। আমি নানা স্পুলের কোনটিতে টপ অব দি পপ, কোনটিতে অন্য জনপ্রিয় পপ গান, আবার অন্যগুলোতে ফোক্, কান্ট্রি মিউজিক, রক এন রোল, ক্ল্যাসিকাল, জাজ ইত্যাদি আলাদা আলাদা করে রেকর্ড করেছি। দেশে ফেরার সময় অনেক বই, ব্যবহার্য জিনিস যেমন জাহাজে করে এসেছিলো তেমনি এসেছিলো অনেকগুলো গানের টেইপও।

সাউদাম্পটনে থাকতে খুব বড় আকারের একটি ফ্লাওয়ার চিল্ড্রেন ধরনের মিউজিক ফেস্টিভ্যালে যোগদানের সুযোগ এসেছিলো, কিন্তু নানা কারণে যোগ দেয়া হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বব ডিলন এসেছিলেন সাউদাম্পটনের খুব কাছের আইল অব ওয়াইট দ্বীপে এই ফেস্টিভ্যালটির জন্য। আসলে তিনিই ছিলেন এর মধ্যমণি। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের যে বংশীবাদকদের কথা বলেছিলাম তাঁদের নাটের গুরু ছিলেন এই বব ডিলন। আইল অব ওয়াইট দ্বীপটি নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমুদ্র বেলাভূমির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। সাউদাম্পটনে যত

বন্ধুবান্ধব বেড়াতে আসতো তাদের সবাইকে আমরা এখানে নিয়ে যেতাম ফেরি বোটে অথবা সেযুগের অভিনব উভচর যানবাহন হোভার ক্রাফটে—যেটি ভূমি বা পানি উভয়ের মাত্র কয়েক মিটার উচ্চতায় প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে যেতে পারতো। হয়তো ওই শব্দের কারণেই এটি শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়নি। বব ডিলনের আগমন উপলক্ষে শ্লোগান হয়েছিল 'লেট বব ডিলন সিঙ্ক দি আইল অফ ওয়াইট'। বব ডিলন একা গানের তোড়ে আইল অব ওয়াইট দ্বীপকে ডোবাতে না পারলেও, ওই উপলক্ষে সারা বৃটেন ও সারা ইউরোপ থেকে এত তরুণ তরুণী সাউদাম্পটন হয়ে ওখানে গিয়েছিল যে তাদের সম্মিলিত ওজন ডোবাবার মতোই হবে। ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে না পারলেও তার মুগ্ধ অংশগ্রহণকারী তরুণ তরুণীদের অনেককে সাউদাম্পটনের রাস্তায়, বন্দরে মহাভীড় করে আসতে দেখলাম। যাদের একাংশ শুধু সংগীতের টানেই ওইমুখী, কিন্তু আর এক বিরাট অংশ নিজেরাও ওই সাংস্কৃতিক বিদ্রোহী—হিপ্পি, ফ্লাওয়ার চিল্ড্রেন যাই বলি না কেন। অনেকে খুবই তরুণ বাবা-মা, ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়েও চলেছে ওখানে।

মানুষের চাঁদে অবতরণের দিনটি

সাউদাম্পটনে ল্যাবোরেটরিতে কাজ করতে করতেই খবর রেখেছি মানুষের প্রথম চাঁদে পদার্পন করার নানা আয়োজনের কথা। ১৯৬৯ সাল, জুলাইয়ের ১৬ তারিখ কেনেডি উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে অ্যাপলো-১১ উৎক্ষিপ্ত হবার মুহূর্ত থেকে আমাদের উত্তেজনার সীমা ছিলনা। ল্যাব থেকে মাঝে মাঝেই চলে যেতাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নে যেখানে বড় কালার টেলিভিশনে এই ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসরণ করা হচ্ছিল। বিবিসি টেলিভিশন দারুণ আয়োজন করেছিল এই উপলক্ষে—একটি বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর প্যানেল সারাক্ষণ আলোচনা ও ধারা বর্ণনা দিয়ে চলেছিলেন—এই যাত্রার নানা খুঁটিনাটি; মহাশূন্য থেকে আসা ছবি সহযোগে। সেই সঙ্গে সিম্যুলেশনের ব্যবস্থা করে প্রাঞ্জল করে তুলেছিলেন সব পদক্ষেপকে। তাঁদের একজন নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও সম্প্রচারক হিসেবে এই ধারা বর্ণনার সঙ্গে এতই একাত্ম হয়ে সারাক্ষণ টেলিভিশন জুড়ে ছিলেন যে আমরা হাসাহাসি করে বলছিলাম যে তিনি যখন এতই জানেন তাঁকেই আগামী বার চাঁদে পাঠাতে হবে। ষোল তারিখ উৎক্ষিপ্ত হবার পর এপলো-১১ যতই চাঁদের কাছে চলে যেতে লাগলো আমাদের উত্তেজনা ততই বেড়ে চলেছিলো। বিজ্ঞান সাময়িকীতে লেখার কারণে এবং সেই স্পুটনিকের কাল থেকে আমার নিজের দারুণ আগ্রহের কারণে মহাশূন্য ভ্রমণের আগাগোড়া ঘটনাপঞ্জি আমার পর্যবেক্ষণে ছিল। সেদিক থেকে এটি আমার জন্যও একটি ক্লাইম্যাক্স মুহূর্ত বলা যায়। অবশেষে ২০ জুলাইয়ের সেই ক্ষণটি চলে এলো। মূল মহাশূন্যযান কমাণ্ড মড্যুলে মাইকেল কলিন্স যখন চাঁদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, অন্য একটি অংশ লুনার মড্যুলে নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন তখন এই প্রদক্ষিণ কক্ষ পথ ছেড়ে

চাঁদে নেমে আসছিলেন। চাঁদের পূর্ব নির্ধারিত সেই 'শান্তির সাগরে' (সী অফ ট্রাঙ্কুয়েলিটি) পৌঁছে নিজেদের গতিবেগ সংযত করে আগাগোড়া পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক গুণে গুণে আর্মস্ট্রং যখন 'টাচ ডাউন' কথাটি বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন, তখন আমাদের মত সারা দুনিয়ার বহু কোটি টিভি দর্শক ও রেডিয়ো শ্রোতা একই সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলো। আমরা বাসা থেকে সবাই চলে গিয়েছিলাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর মাঝখানে বসে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উপভোগ করতে। খুব ভাল লাগলো যে আন্তর্জাতিক পরিবেশে অনেক তরুণ তরুণীদের মধ্যে বসে এক সঙ্গে করতালি দিয়ে চিৎকার করে হর্ষধ্বনি দিয়ে ওই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পেরেছিলাম। আমাদের ঘড়িতে রাত আটটা আঠার মিনিট। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যখন প্রায় ছয় ঘণ্টা পর লুনার মড্যুল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন মণি আর আমি কিন্তু আর দেখতে পাইনি, কারণ আমাদেরকে ছুটতে হয়েছে সাউদাম্পটন রেলওয়ে স্টেশনে—সুইজারল্যান্ড যাওয়ার জন্য।

সেটি এক কাকতালীয় ব্যাপার। ওই যে বলেছিলাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সঙ্গে মিলে ছাত্রদের জন্য সস্তায় বহু ভ্রমণের ব্যবস্থা করে তারই একটিতে মণি আর আমি সুইজারল্যান্ডের লাউজানে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। পরিকল্পনাটি ছিল গরমের ছুটির সপ্তাহ দুয়েক ইউরোপে ঘুরে বেড়াব, নানা দেশের নানা শহরে স্থানীয় 'ইয়ুথ হোস্টেলে' থেকে থেকে—যেখানে নামে মাত্র মূল্যে থাকা যায়। এজন্য দুজনেই আগে থেকে আন্তর্জাতিক ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম। ভ্রমণের এই ভরা মৌসুমে ইয়ুথ হোস্টেলে জায়গা পাব না এই ভয়ে আগে থেকেই পুরো ভ্রমণ পরিকল্পনা করে জেনেভা, মন্ট্রো, ইন্টারলেকেন, বাসেল (সব সুইজারল্যান্ডে), এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট', কোবলেন্‌ৎস, মাইন্‌জ, কোলন, (সব জার্মানিতে) এবং আমস্টার্ডাম ইয়ুথ হোস্টেলে সীট বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম। থাকার খরচ নাম মাত্র। সুইজারল্যান্ড যাওয়ার ট্রেন ভাড়াও খুবই কম। ওখানকার স্থানীয় ভ্রমণগুলো ট্রেনে ও রাইনের স্টিমারে করবো ঠিক করেছিলাম। লন্ডন থেকে ট্রেন যাবে সোজা লাউজানে, এজন্যই ওই গন্তব্যকে বেছে নেয়া। শুধু ছাত্রছাত্রীর জন্য এই ট্রেনে অধিকাংশের সঙ্গে ছিল স্কী করার সরঞ্জাম। স্পষ্টত এই ট্রেনটির আয়োজনই হয়েছে তাদেরকে সুইজারল্যাণ্ডে পর্বতের উপর গিয়ে স্কী করার জন্য।

সাউদাম্পটনের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের টেলিভিশনে চাঁদের বুকে আর্মস্ট্রং আর অলড্রিনকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলাম, পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে তাদেরকে আবার দেখতে পেলাম জেনেভার ইয়ুথ হোস্টেলে। ইতোমধ্যে ফেরিতে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের ক্যালেতে গিয়ে ওদিককার অন্য একটি ছাত্র-ট্রেনে ওঠে প্যারিসের 'গারে ডু নর্দ' স্টেশন। সেখান থেকে সব ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে ভো দৌড় দিয়ে প্যারিসের মেট্রো অর্থাৎ পাতাল রেলে

অন্য আর একটি রেলওয়ে স্টেশন 'গারে ডু লিঁয়'তে', এবং সেখানে অপেক্ষমান আরেকটি ছাত্র-ট্রেনে। ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে যাত্রা শুরু ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে। ইতোমধ্যে ট্রেনের লোকজনের পোষাক বদলে গেছে, ভাষা বদলে গেছে। লাউজানে সকালে পৌঁছে, খানিক ঘোরাঘুরি করে সুইস ট্রেনে জেনেভা। জেনেভা লেকের পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন যাচ্ছি তখন ওখানে পর্যটকদের আকাশের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলতে শোনলাম ওরা অর্থাৎ চন্দ্র অভিযানকারী দু'জন ওইখানে আছে, কিছুক্ষণ পর চাঁদের বুক থেকে ফিরতি পথে রওয়ানা হবে। জেনেভার ইয়ুথ হোস্টেলে পৌঁছে দেখলাম আমাদের মতো অনেক বাউন্ডুলে ভ্রমণকারী তরুণ তরুণী মাটিতে বসে টেলিভিশন দেখছে। একুশে জুলাই বিকেল ছয়টার কাছাকাছি সময় তখন। ওরা চাঁদের বুকে তখন প্রায় বাইশ ঘণ্টার মতো কাটিয়েছে—ওখানে হাঁটাহাঁটি করে, পতাকা গেড়ে দিয়ে, ছবি তুলে, চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে এবং দু' একটি ছোট ছোট এক্সপেরিমেন্ট করে। এবার ওখান থেকে ফেরার সময়ে আবার আমরা দু'জন তাদের দেখলাম। লুনার মড্যুলের ওপরের অংশের রকেট হঠাৎ ছাঁৎ করে চালু হলো আর কী অনায়াসে ওই ওপরের অংশ ওদের নিয়ে চাঁদের অল্প মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ূশূন্য অবস্থায় ওড়ে গেল—আবার গিয়ে মূল যান ও সহকর্মী কলিন্সের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

তাদের মহাজাগতিক ভ্রমণ চল্‌লো, আর আমাদের চল্‌লো ভারী আনন্দের জাগতিক ভ্রমণ—জেনেভা লেকের ওপর দিয়ে বারোয়ারি স্টিমারে; জাহাজশুদ্ধ বালক বালিকা, তরুণ তরুণীদের সঙ্গে গানের গলা মিলিয়ে লেকের আরেক প্রান্তে মন্ত্রোতে। সেখান থেকে পরের দিন আল্পসের গোড়ায় ইন্টারলেকেন। এখানে পরিকল্পনা আছে বিখ্যাত মাউন্টেন ট্রেনে তুষার ঢাকা পর্বত শৃঙ্গে যাব ইয়ুংফ্রাউ ইয়োখ নামের বিখ্যাত শৃঙ্গে। প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি অ্যাপলো-১১ এর যাত্রাকে, ইয়ুথ হোস্টেলের নানা দেশ থেকে আসা সহ-পর্যটকদের সঙ্গে এ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। যেদিন জার্মান সীমান্তে বাসেলে এলাম সেদিন ২৪ জুলাই দেখলাম সারা দুনিয়ার মানুষের রুদ্ধ শ্বাস অপেক্ষাকে স্বস্তিতে এনে চাঁদ ফেরতা মহাশূন্যচারী তিনজন খোলা প্যারাস্যুটে প্রশান্ত মহাসগরের বুকে নেমে এলেন—পৃথিবীর আলো বাতাসে। ওদের চাঁদে ভ্রমণ আর আমাদের প্রাকৃতিক শোভার ইউরোপ ভ্রমণ এভাবে একাকার হয়ে কয়েকটি দিনের জন্য ল্যাবোরেটরির খাটাখাটনিতে একটু যতির ব্যতিক্রম এনে দিল।

প্রতীচী-১

যুগ-সন্ধির দর্শক

স্কুলে থাকতে বার্মা, ফিলিপাইন, জাপান ইত্যাদি দেশে বেশ কিছুদিন কাটানোতে বালকের চোখে প্রাচীর যে ধ্যানধারণা জন্মোছিলো তার অনেকটাই দীর্ঘস্থায়ী ধারণায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে প্রতীচী অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশের সমাজের সঙ্গে নানা ভাবে পরিচিতি শুরু হয়েছে সাউদাম্পটনে গিয়ে সেখানে বছর চারেক কাটানোর সময় থেকে। সাউদাম্পটন থেকে তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘুরে ওখানকার নানা জায়গা সম্পর্কেও কিছু ধারণা জন্মেছে, যা পরবর্তী জীবনে কাজে এসেছে। এসব নিয়েই এই অধ্যায়। এই সময়ের পরে একই ভাবে প্রতীচীর যে অন্যান্য অংশকে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি তা পরবর্তী ভিন্ন অধ্যায়ে বলা যাবে।

আমরা যখন সাউদাম্পটনে কয়েকটি বছর কাটাচ্ছি সে সময় ইংল্যান্ডের সমাজে অনেক কিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছিল যা চোখের সামনে না দেখে উপায় ছিল না। দেশ থেকে যেদিন প্রথম লন্ডনে আসি নগরীর কেন্দ্রে কেনসিংটন নামক অভিজাত এলাকায় পাকিস্তান স্টুডেন্ট হোস্টেলে গিয়েই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে জানালা দিয়ে নিচের রাস্তায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। অফিসগামী অনেক মানুষ প্রায় একই রকমের পোষাক পরিহিত—মাথায় বোলার হ্যাট (সনাতন মধ্যবিত্ত ইংরেজের সব সময় মাথায় থাকা শক্ত টুপি), সবারই প্রায় স্যুট টাই, হাতে খুব সরু করে গুটানো ছাতা—যদিও বৃষ্টির লক্ষণ ছিলনা। সব চেয়ে বড় কথা সবাই নিঃশব্দে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল বিশেষ ভঙ্গিতে, অনেকটা পুরোনো দিনের ভিন্ন স্পীডের সিনেমার মত। বইপত্র থেকে এরকম একটি ইংল্যান্ডের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও দৃশ্যটি চমকে দেবার মত—যেন উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান লন্ডনের ডিটেকটিভ শার্লক হোম্‌সের সিনেমা দেখছি, তখনকার ঘোড়ার গাড়ির বদলে বাস ও মোটর গাড়ি চলছে, যেন এইটুকুই শুধু পার্থক্য। হয়তোবা কেনসিংটন এলাকার মানুষের

যে সামাজিক মর্যাদা ও কাজ সে কারণে তাদের মধ্যে এই সনাতনী দৃশ্যটি তখনো স্বাভাবিক ছিল।

একদিন পর সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এসে পড়লাম মনে হলো ক্যালেন্ডারের পাতা এক চোটে বহু বহু পরিমাণে ঘুরে গেছে। ষাটের দশকের 'পারমিসিভ সোসাইটির' (চরম উদার সমাজ) হাওয়া তরুণ তরুণীদের মধ্যে তখন তুঙ্গে। 'মন্টিফিউর হাউস' নামের যে হোস্টেলে আমার ঠাঁই হলো তাতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য সংলগ্ন দুটি আলাদা ভবন থাকলেও সাপ্তাহিক ছুটি শনি ও রোববার তারা একে অন্যের ঘরে কাটাতে পারতো বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড হিসেবে। তরুণতর ছাত্র ছাত্রীদের অধিকাংশকেই পেলাম জোড়ায় জোড়ায়, এবং তাদের ভালবাসা প্রকাশ যথেষ্ট প্রকাশ্যে। এসব এবং আরো অনেক কিছুর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড কেন, আমার পড়াশোনা থেকে জানা সাম্প্রতিক ইংল্যান্ডেরও কোন মিল নেই। শুনছিলাম এখানকার তরুণ সমাজে একটি 'বিপ্লব' চলছে। ইউরোপ আমেরিকাতে আরো মুক্ত সমাজের যে হিপ্পি আন্দোলন চলছিলো আমার কাছে তা স্পষ্ট হতে অবশ্য আরো কিছু সময় লেগেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্ররা সরাসরি তার সদস্য ছিলনা, শুধু বিশেষ গোষ্ঠী-বন্ধরাই ছিল। হিপ্পিদের মধ্যে পারমিসিভ সোসাইটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলো। কোথাও কোথাও ওরা স্ত্রী-পুরুষ একত্রে 'কম্যুনে' বাস করছিলো এবং সেখানে জন্ম লাভ করা ছেলে মেয়েদেরকে কম্যুনের সবার ছেলেমেয়ে হিসেবে লালন পালন করছিলো। গাঁজা ইত্যাদি হালকা মাদক এবং পপ্ সংগীত তাদের জীবনে একটি বড় ভূমিকা রাখছিলো, যেমন রাখছিলো সনাতন সমাজের সব কিছু আচার আচরণের বিরুদ্ধাচরণ। কিন্তু তাদের নিজেদের আচরণ ছিল একেবারেই অহিংস, শান্তিবাদী, কোন রকম ঝগড়া বিবাদের একেবারে উর্ধ্বে—এ জন্যই বোধ হয় তাদেরকে 'ফ্লাওয়ার চাইল্ড' বলা হতো। তাদের জীবনযাত্রাও ছিল একেবারে সহজ সরল, সকল বাহুল্য বর্জিত।

পারমিসিভ সোসাইটির সাধারণ তরুণ তরুণীদের সঙ্গে হিপ্পিদের একটি জায়গায় দারুণ মিল—তা হলো পপ সংগীত প্রীতি এবং বিভিন্ন পপ্ সংগীত দল নিয়ে নিজেদের অকল্পনীয় মাতোয়ারা ভাব। বীটল্‌স, রোলিং ষ্টোন্‌স প্রভৃতি সংগীত দলের তখন পুরো পাশ্চাত্য জোড়া খ্যাতি, এবং তাদের কল্যাণে এই সংগীতের উপর ইংল্যান্ডের একটি বড় প্রাধান্য স্বীকৃত। আর হয়তো তাদের কারণেই সে সময় এখানে ছেলেদের মধ্যে লম্বা চুলের খুব প্রাধান্য ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে দাড়িরও—বিশেষ করে হিপ্পিদের মধ্যে। সাউদাম্পটনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র ছাত্রীদের এমনি আবহের মধ্যেই আমরা বাস করছিলাম। মেয়েদের মধ্যে দলগতভাবে না হলেও কয়েকজন বৃটিশ গায়িকা তখন সারা পাশ্চাত্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো—যেমন সিলা ব্ল্যাক, স্যাণ্ডি শ', লুলু।

তরুণ তরুণীদের মধ্যে পপ্ কালচার প্রবল ভাবে দেখা দিলেও সাধারণ বৃটিশ সমাজ কিন্তু তখনো আগের মতই দুই প্রধান শ্রেণী বিভাজনে বিভক্ত ছিল। এ দুটি হলো মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য থাকাতে বিভাজনটি বেশি চোখে পড়তোনা। কিন্তু এর বাইরে গেলেই মনে হতো দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সমাজ পাশাপাশি বাস করছে। তাদের পোষাক, মুখের ভাষা, আচার আচরণ, বিনোদন, পছন্দের জিনিস সবই আলাদা। ব্যাপারটি বিত্ত থাকা না থাকার বিষয় খুব একটা ছিলনা। শ্রমিক শ্রেণীর অনেকেই বহু মধ্যবিত্তের চেয়ে অধিক রোজগার করতো। কিন্তু কী ভাবে তা ব্যয় করবে সেই ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত ছিল। পোষাকের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল টুপি। একটু উচ্চবিত্ত এবং রক্ষণশীল বৃটিশ মধ্যবিত্তরা তখনো শক্ত বোলার হ্যাট, লম্বা ওভারকোট, সরু করে পাকানো ছাতার সনাতন বৃটিশ পোষাকে থাকলেও (যাদেরকে লন্ডনে ওই প্রথম দিন দেখেছিলাম) সাধারণ মধ্যবিত্তরা অধিকাংশ এখন টুপিহীন, ওরকম পাকানো ছাতাহীন। শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝা যায় তাদের কাপড়ের টুপি দেখে—নরম এই টুপি সামনের কপালের দিকে একটু নামানো, লেনিনের অনেক ছবিতে তাঁর মাথায় যেটি দেখা যায়। অতিরিক্ত বিয়ার পানে 'পাব' গুলজার করাটি শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান বিনোদন; মধ্যবিত্তের মত এতটা সংগীত, নাটক, বই ভিত্তিক বিনোদন নয়। পাবলিক হাউস বা সংক্ষেপে 'পাব' জিনিসটি নেহাত একটি পানশালা নয়, বরং বৃটেনের একটি ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান। এক একটি পাব এক একটি বৈশিষ্ট মাফিক হতো, যেখানে নানা খাবার পাওয়া যেতো, গল্প গুজব চলতো। কোন কোন পাবে মধ্যবিত্তরা কোন কোনটিতে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা বেশি যুৎ বোধ করতো। আমাদের ল্যাবোরেটরির অনেক সামাজিক পার্টি ওখানেই হতো।

এই দুই শ্রেণীই নাচের আসরে যায়, কিন্তু তাদের নাচঘর আলাদা; উভয়ে পত্রিকা পড়ে, কিন্তু তাদের পত্রিকা আলাদা। তাদের রাজনীতিও স্পষ্ট আলাদা। শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি তাদের বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলো, আর তখনো এই ট্রেড ইউনিয়নের উপর ভিত্তি করেই সংগঠিত ও সমৃদ্ধ ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই সেই যুদ্ধের বিজয়ী কিংবদন্তিতুল্য নেতা উইনষ্টন চার্চিলকে নির্বাচনে বিপুল ভাবে হারিয়ে ক্লেমন্ট এটলীর নেতৃত্বে লেবার পার্টি ক্ষমতায় গিয়েছিলো—ভারতের স্বাধীনতা প্রদান, স্বদেশে সার্বজনীন সরকারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা (হেল্‌থ কেয়ার) এবং বেকার ভাতা চালু করার মত যুগান্তকারী সব পরিবর্তন এনেছিলো। কিন্তু এরপর পঞ্চাশের প্রায় পুরো দশক এবং ষাটের দশকের প্রথম চার বছর আবার রক্ষণশীল কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় থেকে ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি আবার বৃটেনের শাসনভার নিয়েছিলো। উইলসনের এই সরকারে নিজেরা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এমন মন্ত্রীরা যেমন ছিলেন, তেমনি মধ্যবিত্ত বামঘেঁষা

বিদ্বজ্জনেরাও ছিলেন। ইতোমধ্যে অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রবণতা অনেকখানি দেখা দিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠী ও পরিচিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অনেকের পরিবার শ্রমিক শ্রেণীর, এখনো পেশাগত ভাবেও তা। পরবর্তী কালে এই শ্রেণীবিভাজনের বহিপ্রকাশটি তত স্পষ্ট আর না থাকলেও ওই সময় কথাবার্তায় অকপটে নিজেদের সামাজিক পটভূমিগুলো তুলে আনতে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কোন কার্পণ্য ছিলনা।

উইলসন সরকার সে সময় শিক্ষার ব্যাপারে একটি বড় পরিবর্তন এনেছিলো যা শ্রমিক শ্রেণীর সহায়ক হয়েছিলো। তখন এগার বছর বয়সে সব ছাত্রকে একটি কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো যাতে অকৃতকার্য হলে উচ্চশিক্ষার ও উন্নততর পেশার সুযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যেতো। এ পরীক্ষার নাম ছিল 'ইলেভেন প্লাস'। এ পরীক্ষা তুলে দিতে সরকারের প্রস্তাব কোন কোন মহলের প্রবল আপত্তির মুখে পড়তে দেখেছি। কিন্তু উইলসন দৃঢ়তার সঙ্গে এই পরিবর্তন এনেছিলেন। এর ফলে অধিকতর কুলীন স্কুল 'গ্রামার স্কুলে' কম ভর্তি হতে পারলেও আর একটু সাধারণ সেকেণ্ডারী মডার্ন স্কুলে ভর্তি হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও উচ্চ শিক্ষার হার অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাজনৈতিক ভাবে না হলেও পেশাগত ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্রদেরকে মধ্যবিত্তে পরিণত করতে শুরু করেছিলো। বৃটেনের সমাজ এই রকম নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সেই ষাটের দশকে চলছিলো তা বেশ স্পষ্ট ছিলো। টেলিভিশনে যে সব নাটক, সিরিয়াল, এবং বিশেষ করে হাস্য-রসের কমেডি অনুষ্ঠানগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল তাতে এই শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী রূপান্তর, আর এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা যথেষ্ট থাকতো। স্পষ্টত পুরোনো শ্রেণী বিভাজন ক্রমাগত ফিকে হয়ে গিয়ে একটি বৃহত্তর নানা মতের প্রতিফলনকারী উন্নততর মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল; কিন্তু যেহেতু বৃটেন তখনো ভারী শিল্প ও খনির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, তাই প্রাচীন সেই শ্রেণী বিভাজন তখনো ছিলো স্পষ্ট দৃশ্যমান।

আমাদের সঙ্গে শিল্প বা খনির পেশাগত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের দেখা কম হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই এ শ্রেণীর নানা কর্মীর কারো কারো সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে, বিশেষ করে লন্ডনে গেলে সেখানকার রাস্তাঘাটে শ্রমিক শ্রেণীর এক ধরনের তরুণের সঙ্গে দেখা হতো যা আমাদের জন্য সুখকর ছিলনা। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে প্রচুর অভিবাসী মানুষ প্রথমবারের মত বড় সংখ্যায় বৃটেনে আসছিলো। তাদের কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল করা শুরু করলেও অধিকাংশ কলে কারখানায় এবং শহরের নানা রকম সেবামূলক কম দক্ষতার কাজ করতো—বিশেষ করে বাস, টিউব ট্রেন ইত্যাদিতে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশের প্রচুর মানুষ আসছিলো—ওয়ার্ক পরিমিটে। রক্ষণশীল কনজারভেটিভ পার্টির একটি অংশ এর ঘোরতর বিপক্ষে ছিল। অদ্ভুত ভাবে তারা কিন্তু সমর্থন পেতো শ্রমিক শ্রেণীরই

একটি উগ্র অংশের থেকে। রাস্তাঘাটে এ অংশের তরুণরা সন্ত্রাস করে বেড়াতো। আমি ইংল্যান্ডে যাবার ঠিক আগে আগে এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও রক্ষণশীল দলের নেতা ইনোক পাওয়েল উলভারহ্যাম্পটন শহরে এক তীব্র বর্ণবিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে চারদিকে ঝড় তুলেছিলেন। ইনোক পাওয়েল বলেছিলেন এ ভাবে অভিবাসন ঘটতে থাকলে বৃটেনে শিগ্‌গীর রক্ত গঙ্গা বয়ে যাবে। এ ধরনের বক্তৃতা বৃটিশ রাজনীতিতে খুবই অপ্রত্যাশিত। তাই দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদ উঠলো, কনজারভেটিভ পার্টি তাদের এই জ্যেষ্ঠ নেতাকে দল থেকে বের করে দিলো। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি বক্তৃতার সপক্ষেও আলোচনা চলতেই থাকলো। দরিদ্র কমনওয়েলথ দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির কাজে এই বক্তৃতার উস্কানি, ইনোক পাওয়েলের পরবর্তী ভূমিকা, এবং উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান পরের কয়েক বছরে সামাজিক পরিস্থিতিতে বেশ ভূমিকা রেখেছিলো, মাঝে মাঝে আমরাও তার ভুক্তভোগী হয়েছি।

এ সময় সাধারণ ভাবে উগ্র কিছু মস্তান গোছের তরুণরা সুযোগ পেলেই ভারতীয় বা পাকিস্তানি চেহারার লোকজনকে আক্রমণ করতে থাকে। বিশেষ করে শনিবার রাতে মদ পান করার হুজুগ থাকতো বলে তখনই আক্রমণ বেশি হতো। 'স্কিন-হেড' বলে পরিচিত কয়েকটি বখাটে দল এ কাজে অগ্রণী ছিল। আমাদের সাউদাম্পটনেই তাদের দ্বারা একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল সে সময়। ওদের দেখাদেখি বয়সে ছোট কিছু বখাটে বালক বালিকাও উপহাদেশীয় চেহারার মানুষ দেখলে টিটকারি দিতো, গালাগালি করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের বন সাউদাম্পটন কমনের ভেতর দিয়ে যাওয়া হাঁটা পথে আমরা যাতায়াত করতাম। এখানে হাঁটার সময় মণি আর আমাকেও এরকম এক দঙ্গল বখাটে বালকের পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো। লন্ডনের রাস্তায় হাঁটার সময় একবার রাতের বেলায় বড়সড় বখাটেরা আমাদের পথ আগলে রেখেছিলো বেশ খানিক্ষণ, তবে গালাগালি দেয়া ছাড়া আর কিছু করেনি। যদিও পাকিস্তানি, ভারতীয় কিংবা শ্রীলংকার লোককে তারা যে সব সময় আলাদা করতে পারতো তা নয়, কিন্তু কেন জানি বিশেষ করে পাকিস্তানি হওয়াটাই তাদের কাছে বড় অপরাধ ছিলো—হরে দরে সবাইকেই 'ব্লাডি পাকি', 'পাকি পক্স' (তারা পক্স অসুখ বহন করে অপবাদ দিয়ে) ইত্যাদি বলে গালাগালি করতো; সুযোগ বুঝে এবং গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করতো যাতে আরো বড় আক্রমণের সুযোগ ঘটে। এ ধরনের ঘটনা সে সময় পাকি-বেইশিং (পাকিস্তানি পেটানো) নামে পরিচিত ছিলো। পুলিশ আসার উপক্রম হলে অবশ্য তারা পালিয়ে যেতো। মাঝে মাঝে ঘটনাগুলো এত অল্পে শেষ হতোনা গুরুতরভাবে আহত হবার কারণ ঘটাতো এসব, এমনকি মারা যাওয়ারও। আশ্চর্য হবার বিষয় হলো ক্যারিবিয় অঞ্চল থেকে আসা কৃষ্ণকায়দের কোন কোন তরুণ গোষ্ঠীর আক্রমণেও ভারতীয় বা পাকিস্তানিরা হতাহত হতো।

যদিও সময়টা ইতোমধ্যেই ষাটের দশকের শেষের দিকে পৌঁছে গিয়েছিল, তবুও তখনো বৃটেনের কিছু বয়স্ক লোকদের মধ্যে উপনিবেশ হারাবার দুঃখটি খুব

বড় করে বাজতো। আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের দবদবার দিনগুলোর কথা নানা ভাবে স্মরণ করিয়ে দিতো। এদিক থেকেও সে সময়টি এক রকম মানসিক রূপান্তরের কাল ছিলো—কারণ এমন মানসিকতা দ্রুত লোপ পেতে যাচ্ছিল। ক্রমবর্দ্ধমান পাকিস্তানি অভিবাসীদের মধ্যে বাঙালিদের একটি আলাদা সত্তা গড়ে উঠছিলো—বিশেষ করে সিলেটিদের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, এবং অন্যান্য নানা ব্যবসা ও পেশাতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। অন্যদিকে বৃটেনে পেশাজীবীদের মধ্যেও বাঙালি মধ্যবিত্তদের একটি নিজস্ব ভুবন তখন সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সাউদাম্পটনে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন ডক্টর খলিলুর রহমান—একজন বাঙালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বৃটিশ কোম্পানিতে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের মেয়ে মুন্নিকে নিয়ে এই পরিবারটির সাহচর্যের মাধ্যমেও এখানকার নতুন বৃটিশ বাঙালি মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পাচ্ছিলাম। এরকম বাংলাদেশী ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপকদের প্রায়ই দেখা পাচ্ছিলাম। লন্ডনে গেলে আমাদের একটু সিনিয়র বাঙালি অনেক ছাত্রদের এবং পূর্বতন ছাত্র নেতাদের সঙ্গে দেখা হতো; তাঁদের অধিকাংশই ব্যারিষ্টারি পড়ছিলেন; কেউ কেউ অনেক দিন ধরেই পড়ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজনীতির বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের ব্যাপারে বেশ সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ওখান থেকে আইনজীবী পাঠানো ইত্যাদিতেও তাঁদের অবদান ছিল।

প্রথম সাউদাম্পটনে এসে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু ধারণা লক্ষ্য করলাম সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে। দেখলাম খুব কাছাকাছি জায়গায় বাস করেও, একই ভাষাভাষী হয়েও আমাদের সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণাই নেই, আগ্রহ ভরে কোন খবর আগে নেবার চেষ্টা করেছে তাও মনে হয়না। তাই এখানে এসে তারা যখন দেখে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মুসলিম ছেলেরা কেউ মোল্লা-মৌলভি মোটেও নয়, বরং তাদের অধিকাংশ খুবই আধুনিক, কেউ কেউ বামপন্থী ধ্যানধারণায় গড়া, কেউ রীতিমত বোহেমিয়ান, সেটি তাদের কাছে খুবই অবাক লেগেছে। পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ মানুষের মত আমার নতুন বন্ধু গৌতম বসু ও কুনাল ঘোষও এতদিন নাকি জানতো যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা সবাই গোঁড়া মোল্লা ধরনের মানুষ, সবারই কমবেশি দাড়ি আছে। মনে হয় আমাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা বহু কাল আগে লেখা সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের থেকে পাওয়া চিত্রের মধ্যেই আটকে আছে।

প্রধানত টেলিভিশনের মাধ্যমে বৃটেনের রাজনীতির খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছিলাম; তাদের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের বক্তৃতা, তাদের বিতর্ক ইত্যাদি শুনে রাজনৈতিক কালচারটিও বুঝতে পারছিলাম। এখানকার রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক বিভাজন ও অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতগুলো বেশ জড়িয়ে থাকতে

দেখলাম। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির নেতাদের বাচনভঙ্গি ও কথার টান থেকে বুঝতাম তাদের মধ্যে কারা সরাসরি শ্রমিক শ্রেণী থেকে এসেছে, কারা নিজেরা মধ্যবিত্ত হয়েও লেবার রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছে। কনজারভেটিভ পার্টির অধিকাংশ কেতাদুরস্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত, অথবা ডানপন্থী অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণমনা শ্রমজীবীরা। এসব তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যেতো। মজার ব্যাপার হলো ১৯৭০ সালে বৃটেনে যে সাধারণ নির্বাচন হলো সেখানে আমরা ভোট দেবার অধিকারী হলাম। আমরা ভিন্ন দেশের নাগরিক এখানে অস্থায়ী ভাবে বাস করা সত্ত্বেও এই ভোটাধিকার আমাদেরকে দেয়া হলো। বিভিন্ন দলের কর্মীরা যথারীতি আমাদেরকে বাসায় কাগজপত্র দিয়ে গিয়েছিলো। ভোটের দিন এসে বার বার তাগাদাও দিয়েছে যাতে যথাসময়ে গিয়ে ভোট দিই। সাউদাম্পটন এলাকায় দুটি পার্লামেন্ট আসন রয়েছে। আমাদের অংশে সাউদাম্পটন-ইচেন নামের আসনটিতে নির্বাচন হয়েছে। 'ইচেন' আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দিয়ে বয়ে যাওয়া খুব ছোট একটি নদী। কিন্তু অন্য আসনটি পূর্বেকার পার্লামেন্টের স্পীকারের আসন হওয়াতে তাতে ভোট হয়নি, স্পীকারকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করাটাই নিয়ম। আমাদের এলাকার আসনটিতে লেবার পার্টির প্রার্থী জিতেছে। কিন্তু সার্বিক নির্বাচনে লেবার পার্টি হেরে যাওয়াতে উইলসন সরকারের বদলে ক্ষমতায় এলো এডওয়ার্ড হীথের নেতৃত্বে কনজারভেটিভ পার্টি। কাজেই আমরা দুই প্রধান দলেরই শাসন দেখলাম।

সরকার বদল হলেও উইলসনের ও তাঁর আগের লেবার সরকারের সমাজবাদী নীতিগুলো যে বদলে গেলো তা কিন্তু নয়। বৃটিশ জনগণ এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে সরকারের বিরোধ বাড়লো। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বড় বড় দাবি আদায় করতে দেশব্যাপী নানা ধর্মঘট দেখা দিলো। এসময় কয়লা শ্রমিকদের, পোস্ট অফিস কর্মচারীদের, এমনকি ময়লা নিষ্কাশন কর্মীদের ব্যাপক ধর্মঘটে এক এক সময় আমাদেরকেও প্রচুর ধকল পোহাতে হয়েছিলো। দীর্ঘদিন পোস্ট অফিস ধর্মঘটে চিঠিপত্র দেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো—ও সময় তাই ব্যক্তি মালিকানায় অনেক কুরিয়ার সার্ভিস রাতারাতি সৃষ্টি হয়েছিলো, যার অনেকগুলো পরে ডাক বিভাগের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মজার ব্যাপার হলো এমনি একটি কোম্পানি কবুতরের ডাকেরও নাকি প্রচলন করেছিলো। সেটি কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিলো তা অবশ্য জানতে পারিনি।

আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো স্বল্পস্থায়ী বিদ্যুৎ ধর্মঘট। এর ফলে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছিলো এবং আমার এক্সপেরিমেন্ট বিপর্যস্ত হচ্ছিলো। এটি কখনো হয়না বলে বিকল্প কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিলনা। দিনের বেলায় ল্যাবোরেটরিতে থাকা অবস্থায় এটি ঘটলে ব্যবস্থা নেয়া যেতো আমার যন্ত্রপাতির কোন কোন অংশের কপাট বন্ধ করে দিয়ে। কিন্তু অন্তত দুবার এটি রাতের গভীরে ঘটেছে। বাসা থেকে দৌড়ে গিয়ে ক্ষতি কিছুটা

কমানো গেছে বটে, কিন্তু পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিনের পর দিন চেষ্টায় যে অতি বায়ুশূন্য অবস্থা আমি যন্ত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলাম, তা অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

লেবার সরকারের বড় বড় নীতিগুলো অক্ষুণ্ন থাকলেও ট্রেড ইউনিয়নের দর কষাকষি সহ অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছিলো। যেমন নতুন শিক্ষামন্ত্রী মার্গারেট থেচার স্কুলে সব ছাত্রকে বিনামূল্যে দুধ পান করতে দেবার রীতিটি বন্ধ করে দিলেন, সরকারী ব্যয় হ্রাসের জন্য। তাঁকে নিয়ে সে সময় ছড়া কাটা হতো 'মার্গারেট থেচার, মিল্ক স্নেচার'। মার্গারেট থেচার অবশ্য পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে জনগণের আরো অনেক বড় বড় সরকারী সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

উইলসনের ও হীথের প্রধানমন্ত্রীত্বের আগাগোড়া এই সময়টিতে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের গৃহযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংঘাত টেলিভিশন ও পত্রিকার খবর দখল করে ছিলো বলে আমাদের মনেও খুব দাগ কাটতো। উত্তর আয়ারল্যান্ড গ্রেট বৃটেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও তার পৃথক প্রাদেশিক সরকার ছিলো যাতে শক্তিশালী ক্যাথলিক সংখ্যালঘুর অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ ছিলোনা। ক্যাথলিকরা আই আর এ (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) নামের মিলিশিয়া গঠন করে সংলগ্ন স্বাধীন অন্য দেশ ক্যাথলিক প্রধান আইরিশ রিপাবলিকের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে সারাক্ষণ সংঘাতে ছিল প্রটেস্ট্যান্টপন্থী পুলিশ রয়্যাল আইরিশ কনষ্টাবুলারি এবং প্রটেস্ট্যান্টদের নানা সশস্ত্র দল। এখানকার বেলফাস্ট, লন্ডনডেরি ইত্যাদি শহরগুলো এলাকাগত ভাবে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক এই দুই অংশে স্পষ্ট ভাবে বিভক্ত ছিল, এক পক্ষের লোক অন্য পক্ষের এলাকায় গেলে বিপদ ঘটতো। বিশেষ বিশেষ দিনে প্রটেস্ট্যান্টদের মার্চ ক্যাথলিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠতো। অবস্থার এত অবনতি হয়েছিলো যে পরে নিয়মিত ভাবে বৃটিশ সেনাবাহিনী ব্যবহার করতে হয়েছিলো—এবং সেনাবাহিনীর হাতেও রাস্তায় অনেক আইআরএ সমর্থক নিহত হয়েছে—বিশেষ করে 'ব্লাডি সান ডে' বলে একটি দিনের এরকম লোকক্ষয় খুবই কুখ্যাতি পেয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে আইআরএ তৎপরতা যেমন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বাইরে ইংল্যান্ডের নানা শহরে সন্ত্রাসী কাজে বিস্তৃত হয়েছিলো সেই ১৯৬৮-৭২ সালের আমাদের অভিজ্ঞতার সময় তা ঘটেনি।

আইরিশরা যে আলাদা জাতি, ইংরেজদের দ্বারা ঐতিহাসিক ভাবে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত জাতি, এবং তারা যে অপেক্ষাকৃত গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত, এ কথা ওই সময় নানা ভাবে আমার কাছে ধরা পড়ছিলো। এটি স্বাধীন আইরিশ রিপাবলিক এবং বৃটেনের অংশ উত্তর আয়ারল্যান্ড (আলষ্টার) উভয় এলাকার আইরিশদের জন্যই সত্য ছিল। শুরুতে কিছুদিন আমরা এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের বাসায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকতাম। তাঁর আর একজন ভাড়াটিয়া ছিল

একজন আইরিশ তরুণ। রান্নাঘরে এই তরুণের সঙ্গে দেখা হলে গল্প হতো। তাঁর কাছে শোনেছি তিনি ভাগ্যান্বষণে কাজের সন্ধানে ইংল্যান্ডে এসেছেন। তাঁর মতো অনেকে সাধারণ কায়িক শ্রমের কাজের জন্য এখানে আসতে বাধ্য হয়। আইরিশদের মুখে ইংরেজির বিশেষ উচ্চারণ বুঝতেও সে সময় অভ্যস্ত হয়ে যাই। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র বছর চল্লিশেকের ব্যবধানে সম্প্রতি আইরিশ রিপাবলিকের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটেনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে সাময়িক ভাবে। ইউরোপের যাবতীয় অভিবাসীদের ভীড় তখন সেখানেও দেখা দিয়েছে।

আমাদের সময় সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বেশ সিনিয়র রীডার ছিলেন ডক্টর ম্যাকলিন। তিনি জাতিতে আইরিশ—আমার সঙ্গে বিশেষ ভাবে গল্প করতেন আইরিশ ইতিহাস নিয়ে। এই ইতিহাসে আগ্রহ ছাড়া আমার সঙ্গে খাতিরের একটি বিশেষ কারণ ছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খুব তরুণ একজন সামরিক অফিসার হিসেবে তিনি কিছুদিন কুমিল্লায় ছিলেন, সে কথা তাঁর খুব মনে আছে। নিজের দেশ সম্পর্কে তিনি কথায় কথায় বলতেন 'ইংরেজরা পাঁচ শত বছর আয়ারল্যান্ডকে অত্যাচার ও শোষণ করেছে; এখনো তাতে ক্ষান্ত দেয়নি'। এখানকার মানুষদের সমালোচনা শোনার ও আত্মসমালোচনা করার অভ্যাস এত বেশি যে তারা ড. ম্যাকলিনের আলোচনায় সোৎসাহে যোগ দিতো। একদিন বিভাগের চায়ের ঘরের নোটিশ বোর্ডে হাতে লেখা একটি চিরকুট দেখলাম তাতে লেখা আছে 'আমি মেজর ম্যাকলিন আজ অবসরে যাচ্ছি, এবং আজ থেকে ফিজিক্সের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজ বাড়ি বেলফাষ্টে (উত্তর আয়ারল্যান্ডে) যুদ্ধাবস্থার মধ্যে কাটাতে মনস্থ করেছি। এজন্য আমার ফিজিক্সের সব বই বিলিয়ে দিতে চাই। দরকার মনে করলে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে আমার রুম থেকে নিয়ে যেতে পারেন।' বুঝলাম অভিমানী এই পদার্থবিদ তাঁর উপাধিতেও ডক্টরের বদলে এক কালের তাঁর সামরিক পদবি 'মেজরে' ফিরে যেতে চেয়েছেন। চা না খেয়ে দ্রুত তাঁর রুমে গেলাম, বই পাওয়ার চেষ্টা করতে ও তাঁকে বিদায় জানাতে। তাঁকে পেলাম, কিন্তু যুৎসই বই পেলাম মাত্র দু'টি। বাকিগুলো ইতোমধ্যেই অন্যরা নিয়ে গেছে।

এখন স্কটিশ ন্যাশনালিস্টদের কথা অনেক শুনি, স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সপক্ষে গণভোটে তাদের প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি চলে যেতে দেখি। সে সময় স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি থাকলেও তা তত চোখে পড়তোনা। তবে একদিনের কথা মনে পড়ে সাউদাম্পটন ডকসে বেড়াতে গিয়ে সেখানে অলস ভাবে জাহাজ দেখছি। সাউদাম্পটনের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো এর এই বন্দর—যা সাউদাম্পটন ডক্স বলে পরিচিত। সমুদ্র ভ্রমণের গৌরবময় যুগে এখান থেকেই দীর্ঘ পথের জাহাজগুলোর যাত্রা শুরু হতো। 'টাইটানিক' জাহাজটিও এই ডক্স থেকেই তার প্রথম এবং একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক যাত্রাটি শুরু

করেছিলো। এখন শুধু বিলাসবহুল নতুন জাহাজ 'কুইন এলিজাবেথ টু' (কিউ ই টু) মাঝে মাঝে ডকে নোঙ্গর করা দেখি। অন্যগুলো মামুলি জাহাজ অথবা পণ্যবাহী জাহাজ। ওভাবে জাহাজ দেখার সময় হঠাৎ কাঁধে একটি হাতের স্পর্শ পেলাম—একজন বেশ দার্শনিক চেহারার বুড়ো মানুষ বলছেন : 'ফ্রেরন্ড, তোমাদেরকে যে ভাবে ইংরেজরা অন্যায় ভাবে দখল করে শোষণ করেছে, স্কটল্যান্ডকেও করেছে। এখন তোমার মত আমাকেও তাদের উন্নতি শুধু এভাবে তাকিয়ে দেখতে হয়'। ইংরেজি 'আর' অক্ষরের আওয়াজটিকে স্কটিশরা এমন ভাবে লম্বা করে ঘষে ব্যবহার করে তিনি বলে না দিলেও বুঝতাম যে তিনি একজন স্কটিশ। ভদ্রলোক অবশ্য বল্লেন না যে ভারতবর্ষের উপর শোষণ চালাবার সময় বৃটেন থেকে ঔপনিবেশিক শাসক ও বণিক হিসেবে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে ইংরেজদের থেকে স্কটিশরা কম ছিলো না।

ওয়েল্শরা দেখলাম তাদের জাতীয়তার স্বকীয়তা নিয়ে আইরিশ ও স্কটিশদের চেয়ে আরো বেশি সচেতন, যদিও তাদের থেকে ওই রকম দখল বা শোষণের ইতিহাস তেমন শুনিনি। ওয়েল্শের উত্তরে ব্যাঙ্গোর, ক্যানারভন, স্নোডনিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি সেখানে দোকান-পাট অফিস আদালতে ওয়েল্শ পতাকা উড়ছে। এটি ওয়েল্শের সনাতন পতাকা—সাদা ও সবুজ দুটি সমান আড়াআড়ি আয়তাকার জমিনের উপর একটি লাল ড্রাগন। ড্রাগনটি ওয়েল্শের অতি প্রাচীন প্রতীক। তার চেয়েও বড় কথা এখানে ছোট ছোট জায়গাগুলোতে দেখলাম সবাই ওয়েল্শ ভাষায় কথা বলছে—দোকান পাটে, রাস্তা ঘাটে, বাসের মধ্যে। ভাষাটির সঙ্গে ইংরেজির কোন মিল নেই—না শুনতে, না শব্দের মিলে। আসলে এটি প্রাচীন ব্রিটনদের গেইলিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইংল্যান্ডের লাগোয়া এই ওয়েল্শের মানুষের অনেকেই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই ভাষা ব্যবহার করে তা ওখানে না আসলে জানতে পারতামনা—কারণ ওয়েল্শের এই অভ্যন্তরীণ অংশে ছাড়া অন্যত্র ওয়েল্শরা এটি ব্যবহার করেনা। কিন্তু এখানে ওরা হরদম এ ভাষা ব্যবহার করছে, এই ভাষাকে বলছে কাইমারিগ এবং নিজেদের দেশ ওয়েল্শকে বলছে কাইমারু। এখানে কেনারভনে প্রাচীন একটি দুর্গ কেনারভন ক্যাসেলে গেলাম কিছুদিন আগে প্রিন্স চার্লসকে এই দুর্গেই 'প্রিন্স অব ওয়েল্শ' হিসেবে অভিষিক্ত করার ছবি টেলিভিশনে দেখেছিলাম বলে। ওয়েল্শের মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য সেই প্রায় সাত শ' বছর আগে থেকে ইংল্যান্ডের যুবরাজকে 'প্রিন্স অব ওয়েলশ' উপাধি দিয়ে তাদেরই একজন করে নেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিলো। কিন্তু তাই বলে ওরা এখনো স্বকীয়তা ছাড়েনি।

ইংল্যান্ডের নিজেরই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করছিলাম। আমরা যেখানে থাকছিলাম সেটি দক্ষিণ ইংল্যান্ড—এর মধ্যে সাউদাম্পটন নিজে হ্যাম্পশায়ার কাউন্টিতে। হ্যাম্পশায়ার, সাসেক্স, ডেভন, কর্নওয়াল এগুলো ইংল্যান্ডের একেবারে দক্ষিণের অঞ্চল। তাছাড়া লন্ডনের দক্ষিণে

বা পূর্বের আরো জায়গাগুলো এতে পড়ে। এখানে শীতের চরম ভাবটি কিছুটা কম, তাই ধনী মানুষরা, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ বয়সের ধনী মানুষরা বেশি এদিকে বসবাস করতে পছন্দ করে। এখানকার মুখের ভাষা মোটামুটি প্রমিত ইংরেজি, যাকে কুইন্স ইংলিশ বা বিবিসি ইংলিশ বলেও অনেকে উল্লেখ করে। তুলনামূলক ভাবে এখানকার মানুষ অতীতের শিল্প কারখানার দূষণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত। এখানে রয়েছে ব্রাইটন, বোর্নমাউথ, ওয়েমাউথ, পোর্টসমাউথ, লিমিংটন, স্যালকোম্ব, প্যানজান্স ইত্যাদি সব সমুদ্র তীরের বেড়াবার জায়গা। ঘুরে ফিরে একাধিক বার এসব জায়গায় গিয়ে প্রায় একই দৃশ্য দেখেছি, বিত্তবান মানুষের থাকার জায়গা ও অন্য সবার বেড়াবার নানা আয়োজন।

মণির ভাবীর বোন শহিদা তাঁর পরিবার সহ থাকেন উত্তরের কাউন্টি ল্যাঙ্কাশায়ারে রচডেল নামের একটি পুরোনো শিল্প শহরে। সারা দিন ধরে ইংল্যান্ডের নানা অঞ্চলের উপর দিয়ে বাসে গিয়ে ওখানে পৌছলাম। মনে হলো উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের যুগের কোন শহরে এসে পৌঁছেছি। নানা ইটের বাড়িগুলোর উপর যুগ যুগের কালো ধোঁয়ার আস্তরণ। কারখানার চিমনিও প্রচুর। ম্যাঞ্চেস্টার শহর খুব কাছে এখান থেকে। শিল্প বিপ্লবের সময় এখানেই বিকাশ ঘটেছিল বস্ত্র শিল্পের। এখনো সনাতন নানা শিল্প এখানে। পরের দিন টের পেলাম বাতাসে এখনো কী পরিমাণ কালো-ধূলোর দূষণ রয়েছে। বাড়ির পেছনে যে দড়ির উপর ধোয়া কাপড় শুকাতে দেয়া হয় কাপড় সেখানে দেয়ার আগে দড়িটি প্রতিবার পরিস্কার করে নিতে হয় একটি মোছার কাপড় দিয়ে ঘষে। আর ঘষলেই উঠে আসে ভূষা কালি—যা মাত্র এক দিনেই এখানে জমেছে। আশপাশে যা দেখলাম তাতে এখানকার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রা দক্ষিণে আমাদের হ্যাম্পশায়ার অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি সেকেলে ও কঠিন মনে হলো—এই ১৯৭০ সালেও। এই ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার উত্তরাঞ্চলের মুখের ভাষাটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেকটি শব্দই যেন সেখান অদ্ভুত উচ্চারণ লাভ করে—এমনকি জিনিসের নাম, জায়গার নাম, মানুষের নাম সহ। কাজেই রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের কথা বোঝা বেশ কঠিন। খুব সাধারণ শব্দই তাদের মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নেয়। যেমন হ্যাঁ অর্থে 'ইয়েস' এর বদলে ওরা বলে 'আয়ে' এবং না অর্থে 'নো' এর বদলে 'ন্যা'। তুমি অর্থে সাধারণ 'ইউ' শব্দটির বদলে তারা অহরহ বলছে 'দা' অথবা 'দী' শব্দটি, অথবা মেয়ে অর্থে 'গার্ল' এর বদলে 'ল্যাস'। কিছুটা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অবশ্য দিব্যি বোঝা যায়।

ইংল্যান্ড যে কয়লার দেশ সেটি এখানে উত্তরাঞ্চলে আসলে বোঝা যায়। শিল্পবিপ্লবে এই কয়লার ব্যবহারই উত্তরাঞ্চলে ইয়র্কশায়ার, শর্পশায়ার অঞ্চলে উন্নত মানের লোহা তৈরির মাধ্যমে সেতু নির্মাণ, স্টিম ইঞ্জিন, রেলওয়ে, কল কারখানা ইত্যাদির দ্রুত বিকাশ ঘটেছিলো—তার ঐতিহাসিক পটভূমি এখানে টের পাওয়া যায়। পরে শর্পশায়ারের কোল ব্রুকডেল অঞ্চলে আয়রন ব্রিজ এলাকায়

গিয়ে এর জ্বলজ্যান্ত নমুনাগুলো এখনো সংরক্ষিত আছে দেখতে পেয়েছি। খনি-শ্রমিকরা তখনো ইংল্যান্ডে একটি বড় শক্তি—তাদের মাইনার্স ইউনিয়ন লেবার পার্টির পেছনে বড় একটি সমর্থক ও অর্থ যোগানদাতা, আবার বড় বড় ধর্মঘটের মাধ্যমে লেবার সরকারের একটি বড় মাথা ব্যথাও বটে। কিন্তু ওই ষাটের দশকে শহরে বন্দরে ঘর গরম করার জন্য কয়লার ব্যবহার উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল যার ফলে বাতাস থেকে কালিঝুলি অনেক কমে গিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি তো হয়েছেই, কালো হয়ে যাওয়া বাড়িগুলোকে ঘষে মেজে সাদা করা এবং সাদা রাখা সম্ভব হয়েছে। শহরে রান্না ইত্যাদি কাজে যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় এতদিন তার উৎস ছিল কয়লা থেকে উৎপাদিত কোল গ্যাস—আমাদের চট্টগ্রাম কলেজে ল্যাবোরেটরিতে গ্যাস সরবরাহের জন্য এরকম কোল গ্যাস প্ল্যান্ট দেখতাম, বাংলাদেশের সব বড় বড় কলেজে এক সময় এটি ছিল। সত্তরের দশকের ওই একেবারে শুরুতে মহাউৎসাহে ইংল্যান্ডে সর্বত্র প্রচার করা হলো এখন থেকে বাসায় আসছে হাই স্পীড ন্যাচারাল গ্যাস—নর্থ সীতে তেল-গ্যাস আবিষ্কার হবার পর ওই একেবারে পরিস্কার জোরালো প্রাকৃতিক গ্যাস সাউদাম্পটনের বাসায় পেতে আরম্ভ করলাম। কিছুদিন আগে ইসলামবাদে এই রকম 'সুই গ্যাস' দেখে এসেছিলাম।

ইয়ুথ হোস্টেল

ছুটিছাটায় বৃটেনের এদিক ওদিক কিছুটা দেখতে পারার ক্ষেত্রে, এবং তার চেয়েও বেশি প্রতি বছর গ্রীষ্মে ইউরোপে বাউন্ডুলের মত কিছুদিন ঘোরাফেরা করার ক্ষেত্রে, দারুণ কাজে এসেছিলো ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে পরিচয়। সারা ইউরোপ জুড়ে রয়েছে এদের অসংখ্য ইয়ুথ হোস্টেল—যেখানে তরুণ তরুণী ভ্রমণকারীরা খুব অল্প পয়সায় দু'একদিন থাকতে পারে, খেতে পারে, নিজেরা রান্না করেও খেতে পারে, তারপর চলে যেতে পারে অদূরের আর এক জায়গায়, অন্য একটি ইয়ুথ হোস্টেলে। অ্যাসোসিয়েশনের দেয়া ইউরোপের ম্যাপ খুলে দেখলেই বোঝা যায় কত অসংখ্য ইয়ুথ হোস্টেল ইউরোপের প্রত্যেকটি আনাচে কানাচে, বিশেষ করে দর্শনীয় স্থানগুলোতে গিজ গিজ করছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় তো মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধানেই রয়েছে আর একটি ইয়ুথ হোস্টেল; হাইকাররা তো হেঁটেই চলে যায় একটি থেকে আর একটিতে। থাকার ব্যবস্থা খুবই মামুলি ধরনের—বড় হলঘরে পাশাপাশি অনেক ক'টা দোতলা বা তিন তলা সরু খাট, ট্রেনের বাঙ্কের মতো। তবে প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে—বাথরুম, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর—সব কিছু। সব চেয়ে মজার জায়গা হলো রাতে সবাই গল্প করার, অভিজ্ঞতা বিনিময় করার, গান গাওয়ার মিলন কেন্দ্র। একই ইয়ুথ হোস্টেলে সাধারণত একাক্রমে তিন রাতের বেশি থাকার নিয়ম নেই। তাছাড়া সকাল দশটার মধ্যেই সবাই বেরিয়ে পড়বে, বিকেল পাঁচটার আগে ফিরে আসবেনা সেরকমই আশা করা হয়। ইয়ুথ কথাটিকে খুব আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয়না

এখানে। যদিও বালক বালিকা তরুণ তরুণীরাই এগুলো বেশি ব্যবহার করে, তবে বয়স্ক মানুষও কম নয়—মনের তারুণ্যকেই ওরা গুরুত্ব দেয়, যারা এমনি ভাবে ভ্রমণের আনন্দের জন্য অনেকের সঙ্গে অনাড়ম্বর ভাবে এখানে থাকতে রাজি আছে।

ইয়ুথ হোস্টেলের অবস্থানও এই মনের তারুণ্যকে দাবি করে। বড় বড় নগরে ইয়ুথ হোস্টেলগুলো সাধারণত বড় এবং নগরের কেন্দ্রীয় জায়গায় থাকে; সেখানে হোস্টেলারদের ভীড়ও খুব বেশি। কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণত ইয়ুথ হোস্টেলগুলোর অবস্থান হয় চমৎকার সব জায়গায়—হয়তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পাহাড়ে, সাগরতীরে; অথবা কোন ঐতিহাসিক দুর্গ, প্রাসাদ কিংবা এমনিতরো জায়গার। সেজন্য ওখানে পৌছতেও অনেক সময় বেশ হাঁটতে হয়, পাহাড়ও বাইতে হতে পারে। অনেক সময় ইয়ুথ হোস্টেল নিজেও এরকম কোন দুর্গের, প্রাসাদের, কিংবা প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক বাড়ির অংশ বিশেষে হয়ে থাকে—অথবা অন্য দিকে নেহাত পাহাড়ি বা বনাঞ্চলের কুটিরের মতোও হতে পারে। অবশ্য আধুনিক ভবনের রূপেও এটি কম নেই। তবে সাধারণ ভাবে এটি প্রায় নিশ্চিত যে ইয়ুথ হোস্টেল নিজেও একটি খুব দর্শনীয় স্থান, অথবা খুবই দর্শনীয় এলাকার মধ্যেই হয় তার অবস্থান। যে কোন জায়গায়, এমনকি বেশ দুর্গম জায়গায় থাকলেও, ইয়ুথ হোস্টেলকে চিনে নিতে অবশ্য মোটেই অসুবিধা হয় না। ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশনের যে বইগুলো বিভিন্ন দেশের জন্য রয়েছে (অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো মহাদেশের জন্য) তাতে প্রত্যেকটি হোস্টেলের ঠিকানা ও যাবার রাস্তা ও উপায় (বাস, ট্রেন, বোট প্রভৃতি) স্পষ্ট করে বলা আছে। তাছাড়া অনেক দূর থেকেই ইয়ুথ হোস্টেলের অতি পরিচিত চিহ্ন (একটি কুটির ও একটি গাছ) নানা জায়গায় তীরচিহ্ন সহ লাগিয়ে দেয়া থাকে। সেগুলো অনুসরণ করে হেঁটেই একে বের করে ফেলা যায়। কাছাকাছি গেলে তো হোস্টেলারদের দেখাই যায় দলে দলে ইয়ুথ হোস্টেলের দিকে যাচ্ছে। তাদের চিনতে ভুল হবার কারণ নেই—সবার পিঠে রুকস্যাক বহন করা, অনেক ক্ষেত্রে রুকস্যাকের উপর তার দেশের পতাকা লাগানো, এসব দেখেই বোঝা যায়। ওদের সঙ্গে জুটে গেলেই হলো।

ইয়ুথ হোস্টেল হলো ব্যয় সাশ্রয়ের চমৎকার উপায়। ছোট একটি ফি দিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম—তার বিনিময়ে চলে এসেছে সদস্য কার্ড—যেটি এক ধরনের দুই পাতার পাসপোর্টের মত; আরো এসেছে বই, ম্যাপ ইত্যাদি। ওই কার্ডগুলোকে আমি পরে খুব যত্ন করে সংরক্ষণ করেছি—কারণ যেই ইয়ুথ হোস্টেলেই গিয়েছি তার নিজস্ব লোগো ছবি এবং নাম সহকারে একটি সিল ওই কার্ডের উপর পড়তো। এরকম বেশ কিছু কার্ড মণির আর আমার জমেছিলো, ইউরোপের নানা দেশের অনেক ইয়ুথ হোস্টেলের সুন্দর সুন্দর সিল মণ্ডিত হয়ে বাউন্ডুলে পর্যটকের উপযুক্ত স্বারক চিহ্ন। গরমের দিনে হোস্টেলাররা বেশি ভ্রমণ করে বলে থাকার জায়গা নিশ্চিত করার জন্য, আগে থেকে রিজার্ভও করা যায়

অ্যাসোসিয়শনে চিঠি লিখে, বিশেষ করে বড় নগর ও বেশি জনপ্রিয় হোস্টেলগুলোর জন্য। প্রতি রাতের জন্য খুবই সামান্য একটি ফি হোস্টেলকে দিতে হতো। প্রায় সব হোস্টেলেই সকালে রুটি-মাখন-কফির সাধারণ নাশতা পাওয়া যায় স্বল্প মূল্যে। সেই মূল্যটাও যদি না দিতে চাই তা হলে জার্মান ইয়ুথ হোস্টেলগুলোতে কিছুটা কাজের বিনিময়ে তা পাওয়া যায়। কাজটি হলো হাউস ফাটারকে (হোস্টেল-পিতা) নানা কাজে সাহায্য করা—বিশেষ করে রান্না ঘরে ধোয়া মোছায়, এবং হোস্টেল পরিস্কার রাখার কাজে। রাতের খাবারও অনেক হোস্টেলে পাওয়া যায়; তাও কাজের বিনিময়ে বিনে পয়সায় নিয়ে আসা যায়। তাছাড়া রান্নাঘরে নিজেও নিজের সামান্য খাবার তৈরি করে নিয়ে খায় অনেকে, আমরা প্রায়ই তা করেছি।

ইয়ুথ হোস্টেলের ব্যবহার সব চেয়ে বেশি করেছি জার্মানিতে, এবং সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার নানা জার্মানভাষী অঞ্চলে। আসলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে চমৎকার সৌকর্যে নিয়ে গিয়েছিলো জার্মানরাই। সাউদাম্পটনে নানা সৌখিন কাজে রত হবার মত আর একটি কাজ করেছিলাম বিবিসি টেলিভিশনের একটি জার্মান ভাষা কোর্সে নিয়মিত প্রতি শনি ও রোববার ভোরে যোগ দিয়ে। এর জন্য টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি দেখতে হতো, রেকর্ড প্লেয়ারে এর জন্য কেনা রেকর্ড বাজিয়ে তা অনুশীলন করতে হতো, এবং সঙ্গের বই পড়েও শিখতে হতো। শেখার কায়দাটিও খুব চমৎকার—প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মূল অংশটি হতো একটি সিরিয়াল নাটকের পর পর পর্ব। ফ্রাউলাইন শ্রোয়েডার নামের এক তরুণী হামবুর্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর প্রতিদিনকার নানা ঘটনা ও হামবুর্গ শহরে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদি থেকেই শিখতে হতো। এটি অনেকটাই পর্যটকদের উপযোগী একটি সহজ কোর্স। ওখানে ভ্রমণের সময় কিছুটা কাজে এসেছিলো বৈকি। তবে শেখার মজাটাই হয়েছে বেশি।

ইয়ুথ হোস্টেলের বড় আনন্দটি ছিল রাতের বেলা ঘরে ফিরে এসে নানা দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করা। এ কায়দায় ভ্রমণের জন্যও এই গল্প করাটি খুব কাজে আসতো। আমরা এর পর যেখানে যাবো, দেখা গেলো সেখান থেকেই সদ্য আসছে কয়েকজন। তাদের কাছেই ওখানকার সব খবর পাওয়া যাবে—দেখার মত কিছু আছে কিনা, কীভাবে যেতে হবে, কোন ঝামেলা হবার আশঙ্কা আছে কিনা, সস্তা খাবারের কোন জায়গা আছে কিনা, ইত্যাদি জরুরি সব খবর। এভাবে নানা ইয়ুথ হোস্টেলে কাটাতে কাটাতে বিভিন্ন দেশের তরুণদের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে এক রকম ধারণা হয়ে গিয়েছিল। জার্মানিতেই সব চেয়ে বেশি ইয়ুথ হোস্টেলে গিয়েছি বলে ওখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি হয়েছে বটে, তবে সব চেয়ে অন্তরঙ্গতার সুযোগ ঘটেছে আমেরিকানদের সঙ্গে। ওই দিনগুলোতে এসব জায়গায় ইয়ুথ হোস্টেলারদের একটি বড় অংশই ছিল আমেরিকান তরুণ তরুণী, অধিকাংশই খুবই অল্প পয়সা খরচ করে ইউরোপ

চষে বেড়াচ্ছে। অনেকের কাহিনী শুনে দেখলাম এরা কিছুদিন নানা জায়গায় ছোট ছোট কাজ নেয়, হয়তো গ্রামে মৌসুমি ফল পাড়ার কাজ, বা শহরে কোন দোকানে বিক্রেতার কাজ। কিছু পয়সা হাতে জমলেই আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে হয়তো মাস ছয়েকের জন্য এভাবে বেরিয়ে পড়েছে। আমেরিকানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত ইউরোপের নানা অপরিচিত ভাষার কোলাহলের মধ্যে মনে হতো আমরা একই ভাষা বলছি বলে আমেরিকানদের খুব আপনজন। সেটি অবশ্য বৃটিশ ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল, যদিও ওরা কাছের জায়গা থেকে অল্প দিনের জন্য আসতো বলে আমেরিকানদের মতো এমন বাউন্ডুলে প্রকৃতির হতো না, মিশতোও কম। আমাদের অবস্থার মিল আর মনের মিল হতো অনেকটা হিপ্পি গোছের আমেরিকান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওরাও সব সময় সস্তায় চলার ফিকিরে থাকতো, আমরাও তাই। তাছাড়া কোথায় যেন আমাদের মধ্যে ভাল লাগা-খারাপ লাগা, হাসি-ঠাট্টা করা—ইত্যাদি চিন্তা ধারায়ও একটা দারুণ মিল লক্ষ্য করতাম। ইতালিতে সে সময় একটি নিয়ম ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি জায়গায় ছাত্র ছাত্রীরা দুপুরে বিনে পয়সায় ভাল লাঞ্চ খেতে পারতো। ওই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্র-সম অন্যান্য তরুণ তরুণীরাও সেখানে ওই সময় গেলে সেই ফ্রি লাঞ্চে লাইন ধরতে পারতো, সে রকম যেতোও অনেকে। ইতালিতে ইয়ুথ হোস্টেলিং করার সময় ওখানে আমেরিকান হোস্টেলারদের থেকে নির্ঘাৎ খবর পেতাম ওরকম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কাছে কোথায় আছে; তারা আগে থেকেই এ সম্পর্কে ভাল রিসার্চ করে রাখতো।

এভাবে ইয়ুথ হোস্টেলিং করে ইউরোপে ঘোরার সময় বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হতো। মণির ক্ষেত্রে আলাদা ভাবেও কিছু অভিজ্ঞতা হতো। হোস্টেলে ছেলেদের শোয়ার হল এবং মেয়েদের শোয়ার হল আলাদা দু'জায়গায় হতো, যদিও বাকি সব কিছু একই সঙ্গে। সুইজারল্যাণ্ডের এক ইয়ুথ হোস্টেলে রাতে মণির ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলো—খুব ছোট ছোট কিছু মেয়ে গুটি গুটি এসে টর্চ জ্বেলে তাকে দেখছে। তাদের স্কুল শিক্ষিকা এরকম বেশ কিছু মেয়েদের নিয়ে ইয়ুথ হোস্টেলে গিয়েছিলেন। ওই মেয়েরা বোধ হয় মণির মত কাউকে আগে কখনো দেখেনি বিশেষ করে শাড়ি পরা কোন মহিলাকে। বলা বাহুল্য ইয়ুথ হোস্টেলে দল বেঁধে আসার তালিকায় থাকতো এ রকম স্কুল শিক্ষকদের অধীনে ছোট ছেলেমেয়েরা—গরমের ছুটির সময় এভাবে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তারা দেশ দেখতে বের হয়ে যায়। একটু বড় হলে এই অভ্যাসটাই তাদেরকে জার্মানির বিখ্যাত 'ভানডার ফোগেলে' (ওয়ানডারিং বার্ড বা ঘুরে বেড়ানো পাখি) পরিণত করে।

বড় বড় জনপ্রিয় শহরগুলোর ইয়ুথ হোস্টেলের চরিত্র যে আলাদা সে কথা বলেছি। ওখানে সব সময় প্রচণ্ড ভীড়—রিজার্ভ করা না থাকলে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অপরিকল্পিত বাউন্ডুলে যাত্রায় রিজার্ভ করা অধিকাংশের পক্ষে

সম্ভব হতোনা। তারা এমনিতেই চলে আসতো। প্যারিসের ইয়ুথ হোস্টেলে এমন ভীড় দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম। ভোরে যখন শোয়ার হলঘর থেকে বের হয়ে ব্রেকফাস্ট অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি দেখলাম বারান্দা, উঠান সব জায়গায় মাটিতে অসংখ্য স্লিপিং ব্যাগ পেতে ওর ভেতর ছেলেরা মেয়েরা ঘুমাচ্ছে—সাবধানে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হচ্ছিল। সীটে জায়গা না পেয়ে ওরা এভাবেই হোস্টেলে কোন রকমে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। সব হোস্টেলে এভাবেও থাকতে দেয়া হতোনা, তাই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হতো। রোমের ইয়ুথ হোস্টেল করা হয়েছিলো ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত রোম অলিম্পিকের অলিম্পিক ভিলেজে। পুরো ভিলেজটাকেই ইয়ুথ হোস্টেলে পরিণত করা হয়েছিলো। বাসে করে কাছাকাছি পৌঁছে হোস্টেলের দিকে হাঁটছি দেখলাম বেশ কিছু ছেলেমেয়ে ওদিক থেকে আসছে এবং হাত নেড়ে জানাচ্ছে যে ওখানে জায়গা নেই, আমরা যেন আর কষ্ট করে না এগোই। দেখলাম তারা কানাডিয়ান ও আমেরিকান ছেলেমেয়ে—একই ফিরতি বাসে সবাই উঠলাম। বাসের মধ্যে কথা হচ্ছিল এবার কোথায় থাকতে যাবো। দেখলাম কানাডিয়ান ও আমেরিকান ছেলেমেয়ে সবাই ঠিক করেছে রোম রেলওয়ে স্টেশন টার্মিনিতে চলে যাবে। সেখানে অনেক প্লাটফর্মের একটিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে; আমাদেরকেও আমন্ত্রণ জানালো তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। আমাদের এতটা বাউন্ডুলে হতে উৎসাহে কুলালোনা, সবিনয়ে জানালাম যে আমরা ভিন্ন ব্যবস্থা করবো; স্টেশনের কাছেই সস্তা দামের একটি 'পেনসিয়োনেতে' আশ্রয় নিলাম। ইংল্যান্ডে এ জাতীয় সস্তা থাকার জায়গাকে বলে 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'; তবে সেগুলো সাধারণত কারো বাড়ির সঙ্গে হয়, এবং মান বেশ ভাল। রোমের পেনসিয়োনগুলোর অবস্থা বেশ শোচনীয়।

কিন্তু ভীড়ের হোস্টেলেও অনেক সময় ভাল আতিথ্যের চেষ্টা দেখতে পেয়েছি। ভেনিসে মূল ইয়ুথ হোস্টেলে যখন জায়গা মিল্‌লোনা তখন তারাই মণি আর আমাকে পাঠিয়ে দিলো দূরে বিকল্প একটি হোস্টেলে। এর জন্য ওয়াটার-বাসে করে কাছের একটি দ্বীপে যেতে হলো। ভেনিস পুরোটাই সমুদ্র-সৃষ্ট একটি লেগুনে কিছু ডাঙা কিছু পানির ওপর। রাস্তার বদলে এখানে আছে খাল, সদর রাস্তার বিকল্প হলে গ্র্যাণ্ড ক্যানাল যেটি আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। খালের পাড়ে পাড়ে ফুটপাথ দিয়ে অবশ্য হেঁটে বেড়ানো যায়, সুন্দর সব সেতু দিয়ে খাল পার হওয়া যায়। ওর মধ্যেই প্রাচীন সব অলঙ্কৃত ভবন, যার সর্ব নিম্নের তলাটি পানির মধ্যেই—কখনো পানির উচ্চতা বাড়লে ভেতরে ঢুকেও যাচ্ছে পানি। যানবাহন বলতে 'গন্ডোলা' নামের চিত্রিত নৌকা ভাড়া করা যায়—খরচ খুব বেশি। নতুবা রয়েছে লঞ্চের মত 'ওয়াটার বাস' অথবা ছোট 'ওয়াটার ট্যাক্সি'। আমাদের ওয়াটার বাস ছোট খাল দিয়ে গ্র্যাণ্ড ক্যানালে এসে তারপর সমুদ্রে গড়ালো। বেশ খানিক্ষণ ওখানে চলে নিয়ে এলো ওই দ্বীপের হোস্টেলে। হোস্টেলের মধ্যে আমার জায়গা হয়ে গেলেও মণির হলোনা। তাকে নিয়ে গেলো অন্যান্য ক'জন

মেয়ের সঙ্গের এক চার্চে। মণি ভোরে বল্‌লো তাকে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খৃষ্টের মূর্তির নিচেই মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে দেয়া হয়েছিলো। ঘুম না আসাতে যখনই চোখ মেলছিলো যীশুকে দেখতে পাচ্ছিল।

ইতালির উত্তরের শহর মিলান থেকে গিয়েছিলাম আরো উত্তরে হ্রদের পাড়ের ছোট্ট সুন্দর শহর কোমোতে যা ইতালি-সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে। ওখানটায় সীমান্ত পার হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের ইতালীয়ান ভাষী অঞ্চল তিচিনোর বড় শহর লুগানোতে গেলাম। পিকচার পোস্টকার্ডে সুইজারল্যাণ্ডের বরফ ঢাকা পাহাড়ের নিচে সুন্দর হ্রদের যে ছবি দেখা যায় লুগানোও অবিকল সেই ছবির মতো। সেবার তখনো শীতের প্রকোপ কাটেনি—সেই হ্রদ, সেই বরফ ঢাকা সাদা পর্বত। সারাদিন এসব দেখে সন্ধ্যার দিকে ইয়ুথ হোস্টেলের খোঁজ করছিলাম। কিন্তু যে বাসে সেখানে যাওয়ার কথা গাইড বইতে পড়েছি সেই বাস খুঁজে পাচ্ছিলামনা। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলে ইংরেজি না জানা নানা জন একই শব্দ শুধু বলছিলো—'পে তে তে'। এভাবে ঠেকে ঠেকে শেষে বুঝলাম এর মানে 'পি টি টি' অর্থাৎ পোস্ট, টেলিগ্রাম, টেলিফোন অফিস। সেটি দেখিয়েও দিলো একজন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওই বাসটি চালায় এই পোস্ট অফিস, তাদের প্রয়োজনে। ওই পার্বত্য অঞ্চলের বেশ উঁচুতে ও ভেতরে রয়েছে একটি ছোট্ট গ্রাম, তারই কাছে সুন্দর দৃশ্যের একটি প্রায় নির্জন জায়গায় রয়েছে ইয়ুথ হোস্টেলটি। বাসটি এখন দিনে শুধু দুবার ওই গ্রামে যায় আর ফিরে আসে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পেয়ে গেলাম বাসটি। আমরা ছাড়া যাত্রী আর কেউ ছিলোনা। বরফ ঢাকা পথে আঁকা বাঁকা চড়াই উৎরাই পার হয়ে এক সময় রাতে পৌঁছে গেলাম ওই ইয়ুথ হোস্টেলটির সামনে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলেন কাল কখন ফিরবো। সকালে বলাতে বল্‌লো আটটার সময় এসে আমাদেরকে তুলে নেবেন। হোস্টেলটি চালাচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী দু'জন। ওই রাতে আমরাই একমাত্র অতিথি। রাতে খাইনি শুনে মহিলা আমাদের জন্য ইতালীয় খাবার ম্যাকারনি রান্না করলেন। খেতে আসতে দেরি করছিলাম বলে তাড়া দিলেন—খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে। মোট কথা সেই শীতের রাতে দু'জন অতিথির সঙ্গ পাওয়াতে তাঁরাও ভীষণ খুশি। পরদিন ঠিক আটটায় দেখলাম সেই শূন্য বাসটি ইয়ুথ হোস্টেলের দিকে নেমে আসছে ওপরের গ্রাম থেকে, আমাদেরকে আবার লুগানোতে নিয়ে যাবার জন্য।

জার্মানিতে রাইন নদীর বোটে করে এগোচ্ছিলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মাইন্‌জের দিকে। ঠিক করেছিলাম মাঝ পথে কোবলেন্‌ৎস শহরে নেমে ওখানকার ইয়ুথ হোস্টেলে রাত কাটাবো। এখানে রাইন নদীর পাড় থেকে সোজা উঠে গেছে উঁচু পাহাড়—তার ওপরে মধ্যযুগীয় এক দুর্গ—সেটাই আমাদের ইয়ুথ হোস্টেল। অনেক্ষণ ধরে হেঁটে পাহাড় বেয়ে পৌঁছতে হলো সেখানে। ওপর থেকে চমৎকার দৃশ্য—বিশেষ করে রাইন নদী যেখানে মোজেল নদীর সঙ্গে মিশেছে সেই সঙ্গম

স্থলটি। পরের দিন দুপুরে আবার রাইনের বোট ধরবো বলে নেমে আসছিলাম। আঁকাবাঁকা রাস্তা অনেকটাই জংলা জায়গার মধ্য দিয়েই। সেখানে কোন এক জায়গায় কেমন করে জানি মৌমাছির কোন চাকে তাদের শান্তিতে আমরা বিঘ্ন ঘটিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে এক ঝাঁক মৌমাছির আক্রমণে বেশ পর্যুদস্ত হয়ে পড়লাম—গায়ের বিভিন্ন জায়গায় তার হুলের ব্যথায় পরের কয়েকদিন বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিলো। এটিও ইয়ুথ হোস্টেলিঙের একটি আসল রূপ, দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে বাস। প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক—প্রতীচীর এতগুলো রূপের সঙ্গে অল্প সময়ে এতটা অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব হতো না যদি ইয়ুথ হোস্টেলিঙের অভিজ্ঞতাটি না পেতাম।

নতুন নতুন বিষয়ে উৎসাহ

সাউদাম্পটনে লাইব্রেরি সিস্টেমটির সুযোগটি নেবার চেষ্টা করছিলাম প্রথম থেকেই। নিজেদের পাড়ায় তো বটেই, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল পাবলিক লাইব্রেরির নানা শাখা। যে কোনটা থেকেই এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি করে বই ধার করতে পারতাম। তাছাড়া ছিল ইউনিভার্সিটির বিশাল লাইব্রেরি—গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে; এখান থেকেও বই ধার করা যায়। ফলে নানা জায়গায় ভ্রমণের আগে সে সব স্থান সম্পর্কে পড়ার সুযোগ যেমন হয়েছিলো, তেমনি নতুন কিছু দিকে সখ বিস্তৃত করার সুযোগও ঘটেছিলো এ সময়। আমার একটি অভ্যাস ছিলো (এখনো কিছুটা রয়েছে) তা হলো মাত্র দু'একদিনের জন্যও যদি কোথাও যাই চেষ্টা করি এর ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জেনেশুনে নেয়া আগেভাগে। সে সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ যে ভ্রমণের সময় খুব একটা পেতাম তাও নয়, কিন্তু তবুও মনে হতো যা দেখছি, যাদের দেখছি, তাদের সম্পর্কে কিছুটা জানি। এসব নানা বিষয়ে জানার সুযোগ লাইব্রেরিতে প্রচুর ছিলো।

খুবই সমৃদ্ধ এসব লাইব্রেরির বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এসময় কয়েকটি নতুন দিকে আমার উৎসাহ সম্প্রসারিত হয়েছিলো। এভাবেই এসময় পাশ্চাত্য চিত্রকলা ও স্থাপত্যে আমার বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। চমৎকার সব চিত্রকর্ম ও তাদের সম্পর্কে আলোচনাসহ বই পড়তে শুরু করে দেখলাম, এটি মোটেই অগম্য একটি বিষয় নয়—বোঝা যায়, উপভোগও করা যায়। চিত্রকলা বা স্থাপত্যকে উপভোগ করারও যে একটি ব্যাকরণ রয়েছে তারও কিছু অ আ ক খ জাতীয় বই এখানে হাতে পেলাম। চিত্রকলার যে ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রাচীন কাল থেকে হয়েছে—গ্রিক ক্ল্যাসিকাল, রোমান, বাইজানটাইন, গথিক, বেরোক, আধুনিক—তাও বেশ জানার মতো। মজার ব্যাপার হলো এগুলো শিগ্‌গীর আর বইয়ের পাতায় রইলোনা, সহজেই সুযোগ এলো সত্যিকার জায়গাগুলোতে গিয়ে, মিউজিয়ামগুলোতে গিয়ে, প্রাচীন ক্যাথিড্রাল ইত্যাদিতে গিয়ে, এদের দেখার। ওই যে বই পড়ার, বইয়ের

ছবি দেখার, এবং সুযোগ মত সত্যিকার জিনিসগুলো দেখার, অভ্যাস সাউদাম্পটনে যাবার পর পর গড়ে উঠেছিলো তা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, এবং অনেক আনন্দ দিয়েছে। এজন্য নিজেও কিছু কিছু বই কিনতে আরম্ভ করেছিলাম, যদিও অন্য সব বইয়ের তুলনায় আর্ট প্লেটের কারণে এই বইগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি দামী হতো। ইংল্যান্ডের সব শহরেরই নিজস্ব দুর্মূল্য চিত্রকলার সংগ্রহশালা রয়েছে। সাউদাম্পটন টাউন হলের একটি অংশ এমনিতরো সংগ্রহশালা। অনেকদিন সাপ্তাহিক ছুটিতে ছোটখাট কাজে শহরের কেন্দ্রে গেলে ওখানে চলে যেতাম।

লন্ডনে প্রায়ই যাওয়া হতো, আর সে সময় সুযোগ হলেই ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে ন্যাশনাল গ্যালারিতে ঢুঁ মারতাম—চিত্রকলার সেটি এক বিশাল আকর। বইপড়া বিদ্যা থেকে বেশ নতুন চোখ দিয়ে সেগুলো দেখতে অভ্যস্ত হলাম। সে সময় একটি বড় সুবিধা ছিল যে এরকম জাতীয় আর্ট গ্যালারী সহ বৃটেনে অধিকাংশ গ্যালারি, মিউজিয়াম ইত্যাদি সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকতো, কোন রকম টিকেটের প্রয়োজন হতোনা। পরের দিকে রক্ষণশীল সরকার টিকেট প্রবর্তন করতে চাইলে এ নিয়ে দারুণ সমালোচনা হয়েছিলো। ইউরোপে বাকি দেশগুলোতে বিষয়টি এত সহজ ছিলোনা, বেশির ভাগ জায়গায় উচ্চ মূল্যে টিকেট করতে হতো; কিন্তু এতদিনে আগ্রহ এত বেড়েছিলো যে প্যারিসের লুঁভ, ফ্লোরেন্সে উফিজি গ্যালারি, কিংবা আমস্টার্ডামের রাইখ্‌সম্যুজিয়ামের মত দারুণ সব চিত্রকলা-তীর্থগুলোর টিকেট কাটতে কার্পণ্য বোধ হয়নি। বই পড়ে এবং মিউজিয়ামগুলোতে দেখে দেখে এমন অভ্যাস হয়েছিলো যে তখন থেকে আগেকার বিভিন্ন ধারার বড় শিল্পীদের ছবি অপরিচিত হলেও দেখেই মোটামুটি বলতে পারি এটি কোন শিল্পীর আঁকা, অন্তত এটি কোন ঘরানার ছবি; প্রত্যেকের বৈশিষ্টগুলো, এমনকি একেবারে আধুনিক শিল্পীদের বিমূর্ত ছবিগুলোর ক্ষেত্রেও। দেখতে দেখতে সবগুলোরই একরকম উপভোগের ক্ষমতা জন্মে গিয়েছিলো। এর মধ্যে ইতিহাসের ব্যাপারে আমার পুরোনো নেশার বিষয়টিও কাজ করেছে। চিত্রকলার অনেক কিছুর সঙ্গে সমকালীন ইতিহাস জড়িত ছিল, আর স্থাপত্যের সঙ্গে তো বটেই। কখনো কখনো ইতিহাস আমার জন্য খুবই ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ নিয়ে আসতো। উদাহরণ স্বরূপ তেমনটিই ঘটেছে মাইন্‌জের গুটেনবার্গ মিউজিয়ামে। গুটেনবার্গ প্রথম আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে আধুনিক মুদ্রণের সূত্রপাত করেছিলেন জার্মানির এই মাইন্‌জ শহর থেকেই। তাঁর সেই প্রথম যুগের অক্ষর সাজানো, তার পৃষ্ঠা তৈরি, তারপর অনেকটা বড় স্ক্রু ঘুরিয়ে টালি বানাবার চাপ দেবার যন্ত্রের মত আদি ছাপাখানায় কাগজের উপর তার ছাপ নিয়ে মুদ্রণ, এসব দেখে চমৎকৃত হলাম। ওই যে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য বাসায় অক্ষরের কেইস বসিয়েছিলাম, সে তো এরই সাক্ষাৎ বংশধর। গুটেনবার্গ মিউজিয়ামে দেখলাম ওখানে মুদ্রিত আদি বইগুলো চতুর্দশ শতাব্দীর। প্রথম মুদ্রিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বইগুলোর মধ্যে ছিলো জার্মান ভাষায় বাইবেল।

ইউরোপে দেশ থেকে দেশে গেলে এক এক অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমিগুলো তার পুরোনো স্থাপত্যের মধ্যে বেশ ধরা পড়ে। ইতালিতে রোমান ধরনের স্থাপত্যের প্রাচীনত্বের পর রেনেসাঁস কালের ব্যতিক্রমগুলো বেশ চোখে পড়েছে। কোন কোন শহরতো আগাগোড়া এক এক রকম বৈশিষ্ট্যময়—যেমন ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রালের মধ্যযুগের রোমানেস্ক ধারার সঙ্গে সেখানে রেনেসাঁস কালের নতুন সব রীতি যা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো—ওদের অপূর্ব ভাস্কর্যে গরিমাপ্রাপ্ত হয়েছে। মিলানে দেখেছি রোমানেস্ক পরবর্তী সুঁচালো উর্ধ্বমুখী খিলানের (আর্চ) বৈশিষ্ট্যময় গথিকের একটি চমৎকার রূপ মিলান ক্যাথিড্রাল। ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডে এই গথিকের অনেক চমৎকার নমুনা দেখেছি—ফ্রান্সে নটারডাম বা শারত্রের মত বিস্তৃত কাজের ক্যাথিড্রালের আকারে অথবা ইংল্যান্ডে উইনচেষ্টার বা কেম্ব্রিজের ক্যাথিড্রালে অপেক্ষাকৃত সীমিত অবয়বের নানা কাজে। এ সব অধিকাংশ ১২ শতক থেকে ১৪ শতকের মধ্যযুগের তৈরি কীর্তি। জার্মানিতে আবার বেশি দেখলাম ফুলেল ঢেউ খেলানো বেরোকের প্রাধান্য যা গথিকের সুউচ্চ গম্ভীর কড়া শাসন এমনকি রেনেসাঁস ভবনগুলোর আয়তাকার সারল্যের তুলনায় জটিল, অথচ হালকা মেজাজের। পূর্বে অষ্ট্রিয়ায় এসেও এই বেরোকের প্রাধান্য বজায় থাকলেও ইতোমধ্যেই যেন এখানে অপেক্ষাকৃত পূর্বদেশীয় প্রাচীন বাইজেনটাইনের ভাব চলে এসেছে কিছুটা, যার আরো ভাল প্রকাশ দেখতে পেরেছি যুগোশ্লভিয়ায় এসে। উৎসের দিকে তাকালে এরা বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের রোমকেন্দ্রিক ধারা অনুসরণ না করে করেছে বাইজানটিয়াম (যা পরে কনষ্টান্টিনোপল ও আরো পরে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত) কেন্দ্রিক ধারাকে। গম্বুজ, অর্ধ-গম্বুজ, পাশ থেকে বাঁকা ভাবে দেয়া ঠেকনা এ সবের ভিত্তিতে এ স্থাপত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন—গ্রিক অথবা রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চের সঙ্গেই যার সম্পর্ক। পরবর্তী কালের রেনেসাঁস স্থাপত্যে (যেমন ভেনিসের ডিউকের প্রাসাদে) অথবা অটোমান তুর্কী স্থাপত্যেও (যেমন ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোতে) এই বাইজেনটাইন ধারার স্পষ্ট প্রভাব দেখেছি।

ভ্রমণের আগে তার পটভূমি সম্পর্কে পড়ালেখা করার ব্যাপারে আমি সবচেয়ে মনোযোগী হয়েছিলাম যুগোশ্লাভিয়ার ব্যাপারে। গোড়াতে স্টালিনের কট্টর ও নিষ্ঠুর সোভিয়েত কম্যুনিস্ট ইতিহাসের তুলনায় মার্শাল টিটোর সাহসী পদক্ষেপে ভিন্নতর কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে আমার কাছে ভাল লেগেছিলো। জার্মান নাৎসী-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে টিটোর পার্টিজান জনযুদ্ধকে আমি খুব রোমান্টিক চোখে দেখতাম। তাই টিটোর শাসিত যুগোশ্লভিয়ার নানা বৈশিষ্ট্যের কথা যথেষ্ট পড়েছি। জোট নিরেপক্ষ আন্দোলনের একজন বড় ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তাঁকে আলাদা চোখে দেখেছি। তখনকার দিনেও সোভিয়েত ও চীনপন্থী কম্যুনিজমের মাঝখানে টিটো একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য কম্যুনিজম প্রবর্তন করেছেন, কারখানার শ্রমিকদের কমিটির কাছেই কারখানার মালিকানা ও পরিচালনা দায়িত্ব দিয়েছেন, এমন কথাও

পড়েছি। যখন দেখলাম লন্ডন থেকে একটি ছাত্র-ট্রেন পুরো ইউরোপের উপর দিয়ে এসে সোজা যুগোশ্লাভিয়ার রিয়েকা নামের ছোট্ট শহরে যাত্রা শেষ করবে, তখন আর লোভ সামলাতে পারিনি। রিয়েকা আদ্রিয়াটিক সাগর পারের একটি বন্দর, ইতালির খুব কাছে। পরে এখান থেকে সহজে ইতালির ত্রিয়েস্তে যাওয়া যাবে, যেখানে আবদুস সালাম সাহেব আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের জন্য এক চমৎকার ফিজিক্স কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জন্য। ওখানে তখন আমার সহপাঠী আহমেদ শফি ও সুলতানা শফি কেম্ব্রিজ থেকে এসে সাময়িক ভাবে কাজ করছিলো।

ত্রিয়েস্তে যাওয়ার আগে যুগোশ্লোভিয়াকে আরেকটু ভাল ভাবে দেখার জন্য রিয়েকা থেকে যুগোশ্লাভিয়ার অঙ্গরাজ্য ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেভে গেলাম বাসে। দীর্ঘ বাস ভ্রমণ। কিছু দূর যাওয়ার পরেই ড্রাইভার উচ্চ শব্দে সাউণ্ড সিষ্টেম চালু করে দিলেন—আর বেশ জোরেশোরে ভেসে এলো টিটোর বক্তৃতা; দীর্ঘ বক্তৃতা, প্রায় পুরো ভ্রমণে সবাইকে শুনতে হলো; বুঝলাম এটিই নিয়ম। সার্বো-ক্রোয়াট ভাষায় বলে কিছুই বুঝিনি, শুধু কিছুক্ষণ পর পর 'নারোদনি যুগোশ্লাভিয়া' অর্থাৎ 'যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ' কথাটি শুনতে পাচ্ছিলাম। চারদিকে ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের খুব আধিক্য দেখছিলাম আর পথে পথে দেখলাম সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কগুলোকে লম্বা হলারে চড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জাগ্রেভে ইয়ুথ হোস্টেলে থেকে শহরটি ভাল করে দেখলাম। কিছু সুন্দর বাইজানটাইন স্থাপত্য ছাড়া সব কিছু খুব নিরানন্দ ও কর্তৃপক্ষীয় মনে হলো, যেন সামরিক বাহিনীর শাসন চলছে—আর চারদিকে মার্শাল টিটোর বড় বড় ছবি, পোস্টার—এক-নায়কত্বের ভাবটি খুব স্পষ্ট। ইয়ুথ হোস্টেলে ও অন্যত্র স্থানীয় যাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম তারা তেমন কিছু বল্‌লোনা, যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে প্রশংসাসূচকও কোন কিছু তাদের মুখে শোনলামনা। তবে এখানে খাবার দাবার খুব সস্তা এইটুকুই ভাল ব্যাপার চোখে পড়লো। ফেরার সময় ট্রেনে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো, বল্‌লো তারা স্থানীয় মুসলিম। কিন্তু জানিয়ে দিলো টিটোর রাজত্বে তাদের ধর্মকর্মের কোন অধিকার নেই। আসলে তাঁর কম্যুনিস্ট ধারা থেকে ভিন্নমত পোষণকারী কারো অস্তিত্বই তখন যুগোশ্লোভিয়াতে নাকি সম্ভব ছিলনা। কাজেই কোন্ দিক থেকে এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা গণচীন থেকে ভাল তা ঠিক বুঝতে পারছিলামনা এ পর্যন্ত। তবে পার্থক্য যে নেই তাও ঠিক নয়। যুগোশ্লোভিয়ায় আমরা অনায়াসে ভিসা নিয়ে আসতে পেরেছি, নিজের মত করে থাকতে পেরেছি, ঘুরতে পেরেছি। সোভিয়েতে এত সহজে যাওয়া যায়না, গেলেও থাকতে হয় তাদের সরকারী সংস্থা ইনটুরিষ্টের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে। গণচীনে সরকারের আমন্ত্রণ ছাড়া যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। যুগোশ্লোভিয়ার সর্বত্র ইয়ুথ হোস্টেল আছে, নানা দেশের ছেলেমেয়েরা আসছে, আমেরিকানরাও আসছে। হোস্টেলে ও অন্যত্র কোথাও কোথাও খুব জনপ্রিয় পপ গান বাজতে শোনলাম,

মনে হলো কিছু সাংস্কৃতিক বাতায়ন এখানে খোলা আছে, যা সোভিয়েতে নেই, গণচীনে তো নেইই।

সাউদাম্পটনে আরো একটি নতুন বিষয়ে আগ্রহ বিস্তৃত করতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটি কিছুটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে অন্য বইয়ের খোঁজে গিয়ে ফিলসফি সেকশনে একটি ছোট বই হাতে পড়েছিলো—এ জে আয়ারের লেখা 'ল্যাংগুয়েজ, ট্রুথ অ্যান্ড লজিক'। ওখানে বসে বইটির খানিকটা পড়ে আমি শুধু এই বইটির দ্বারা নয়, এর যে বিষয় সেই দর্শনের দ্বারা ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হলাম। দার্শনিক কথাবার্তার সঙ্গে এতদিন যে দূরত্ব ও অনাবশ্যকতার ভাব অনুভব করতাম, যেন নিমেষের মধ্যে তা দূর হয়ে গেলো। এত ঝরঝরে লেখা, এবং বক্তব্যগুলো এত স্পষ্ট, নায্য, ও আবশ্যক মনে হলো যে ওখানকার শেলফে আরো কিছু বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। সে আমলের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক আয়ারের (ওই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক) যুক্তিগুলো এমন সহজ ও স্বচ্ছ মনে হয়েছিলো যে বইটি লাইব্রেরি থেকে এনে দ্রুত পড়েই ক্ষান্ত হলামনা, বইয়ের দোকানে গিয়ে এটি কিনেও ফেল্‌লাম; কারণ মনে হয়েছিলো এর মাধ্যমে আধুনিক দর্শনের একটি চাবিকাঠি হাতে পেয়ে গেছি। আসলেও পরে দেখেছি ১৯৩৯ সালে তরুণ আয়ারের রচিত এই বই তখনই একটি ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত। বইটি লেখার কালে আয়ার সে সময়ের দার্শনিক গোষ্ঠী 'ভিয়েনা সার্কেলের' একজন হিসেবে দর্শনের 'লজিক্যাল পজিটিভিজম্' নামক মতবাদের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন এতে। কিছুটা চরম মতবাদ হলেও একে আমার কাছে চিন্তার ক্ষেত্রে খুব সোজাসাপটা স্পষ্টবাদী ধারা মনে হয়েছে। বিশ্লেষণ-মূলক যে কোন কথা আসলে নতুন কোন জ্ঞান দেয়না—শুধু একই বক্তব্যকে ভিন্ন ভাবে, হয়তো আরো সুবিধাজনক ভাবে, প্রকাশ করে মাত্র। লজিক, গণিত—এ জিনিসগুলো শুধু বিশ্লেষণ করে, জ্ঞানকে প্রাঞ্জল করলেও এদের কথাগুলো নিজেরই নির্দিষ্ট করা সংজ্ঞা ইত্যাদিতে আবদ্ধ, নতুন কোন জ্ঞান সৃষ্টি করেনা। অন্যদিকে জ্ঞান আসে সংশ্লেষণমূলক (বাইরে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে) কথা থেকে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আসতে হয়। এই অর্থে বাস্তব অভিজ্ঞতার ধার না ধেরে শুধু চিন্তার মাধ্যমে দর্শনের যে বক্তব্যগুলো সৃষ্টি হয় সেই মেটাফিজিক্সকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। লজিক্যাল পজিটিভিজম এমন কথাই বলে।

সংশ্লেষণমূলক কোন কথা সত্য কি মিথ্যা তা অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে প্রমাণিত হবে—যাকে বলা যায় যাচাই নীতি। যে সব কথার সঙ্গে তার যাচাই এর শর্তগুলো জোড়া থাকে সে সব কথাই শুধু অর্থপূর্ণ, অন্য কোন কথাই অর্থপূর্ণ নয়। আমার কাছেও মনে হয়েছে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি কড়াকড়ি ভাবে মেনেই এগোনো উচিত—তা হলে দর্শনে মেটাফিজিক্সের আকারে সব রকম ভাবনার ঘুড়ি উড়ানো

আর সম্ভব হবেনা; লজিকাল পজিভিষ্টরা চিন্তার ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে অন্তত। এ প্রসঙ্গে আগের যুগের একজন বড় মাপের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের প্রসঙ্গটি জানলাম। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা যাচাই না করে শুধু চিন্তার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সম্ভাবনার কথা বলতেন, যেমন স্থান ও কালের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান। আমরা ধরে নিই যে সব কিছুর অস্তিত্ব হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থান আর একটি সতত বহমান কালের মধ্যে—যার উভয়েই নিজেই নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দুটি পরম জিনিস। কান্ট মনে করতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েও স্থান আর কাল চিন্তাজাত পরম সত্য জ্ঞান—তখনকার (নিউটনীয়) বিজ্ঞানের জন্যও তা অত্যন্ত আবশ্যিক ছিল। আয়ারের মত লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা এমন কিছুকে অস্বীকার করেন, আইনস্টাইনের নতুন বিজ্ঞানে পরম স্থান বা পরম কালের ধারণা পরিত্যক্ত হওয়াতে অন্তত এদিক থেকে শুধু চিন্তার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের অপরিহার্যতা থাকেনা। যেমন এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু স্থান আর কালের জন্ম হয়েছে, মহাবিশ্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ও কাল বিস্তৃত হয়েছে। আলাদা ভাবে ইতোমধ্যে থাকা পরম স্থানে বা পরম কালে মহাবিশ্ব আসেনি। কিন্তু তাই বলে লজিক্যাল পজিটিভিষ্টদের চরম দৃষ্টিভঙ্গি যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা নয়। আয়ারের মত লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের মতে নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন কথাও নেহাত ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল বলে তাতেও নতুন জ্ঞান নেই। যেমন 'মিথ্যা বলা পাপ' এটি অভিজ্ঞতাজাত কোন কথা নয়; যেহেতু এতে যাচাইয়ের শর্ত দেয়া নেই, তাই তা জ্ঞানের অংশই নয়। অন্য দার্শনিকরা অবশ্য বলেন এত কড়াকড়ি মতবাদ মানলে অনেককিছুই দর্শন থেকে বাদ পড়ে যায়, এমনকি বিজ্ঞান থেকেও। যেমন আধুনিক বিজ্ঞানে অনেক সত্য বিশুদ্ধ গাণিতিক যুক্তি থেকে এসেছে, তা হলে এদের জ্ঞানকে কোথায় স্থান দেয়া হবে? তবে আমার মন বলছিলো আয়ারের মত কড়াকড়ি দৃষ্টিভঙ্গিটি থেকেই শুরু করা ভাল, নইলে দর্শনের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকেনা, সব রকমের মনগড়া কথাকে দর্শন বলে চালানো যাবে।

সাউদাম্পটনের ওই লাইব্রেরিতেই এই নিয়ে অন্যদের চমৎকার যুক্তিগুলোও আমাকে বেশ আকৃষ্ট করেছিলো। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'দি প্রবলেমস অব ফিলসফি' বইটি একটি ছোট বই, কিন্তু ওই সমস্যাগুলোরই সুন্দর আলোচনা রয়েছে, সামাধান দেবার চেষ্টাও রয়েছে। আরো সাম্প্রতিক সময়ে কার্ল পপারের লেখাগুলো এদিক থেকে খুবই চিন্তা উদ্রেককারী। তিনি লজিক্যাল পজিটিভিষ্টদের ধারণাকে খুবই কড়া সমালোচনার সম্মখীন করেছেন। কিন্তু যে কারণে তারা ওরকম চরম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তারও একরকম সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। ওই চিন্তার সূত্র ধরে তাঁর দুটি বই 'লজিক অব ডিসকভারি' এবং 'কনজেকচার অ্যান্ড রিফিউটেশন' দারুণ মনে হলো। এগুলো আমার জন্য বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বুঝতে খুবই সহায়ক হলো। বিজ্ঞান-দর্শনের এই দিকগুলো নিয়ে এতটা

উৎসাহিত হয়েছিলাম যে এর ভিত্তিতে আমি একটি বড় লেখা বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লিখেছিলাম 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা কেন?'—এই নামে। সব কিছু মিলে আয়ারের বইটি 'ল্যাংগুয়েজ, ট্রুথ অ্যান্ড লজিক' আমার চোখ খুলে দিয়েছিলো। আগে দর্শনকে সব সময় লাগামহীন অবোধ্য কচকচানি মনে করে এসেছিলাম। দেখলাম সেটি একেবারেই ভুল ধারণা। বরং অযৌক্তিক লাগামহীনতার দাওয়াই দর্শনের ভেতরেই রয়েছে। আর সেগুলোর মধ্যে না ঢুকলে বোঝার ব্যাপারটিকেই বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই থেকে অন্তত মেটাফিজিক্স বর্জিত সোজাসাপটা দর্শন আমার খুব প্রিয় বিষয়, বিশেষ করে বিজ্ঞানের দর্শন। আকস্মিক ভাবে তখন যার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল সে বিষয়টি নিয়ে পরে সব সময় আমি পড়াশোনা করেছি; এখন ছাত্রদের পড়াতেও সাহস করছি, নিজের মতো করে তাদের কাছেও বিষয়টির সৌন্দর্য তুলে ধরার চেষ্টা হিসেবে।

আটলান্টিকের অপর পারে

১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে সস্তায় আমেরিকা যাবার একটি ব্যবস্থা করেছিলাম। ইউনূস ভাই বলছিলেন সুযোগ পেলে মণি আর আমি যেন তাঁর ওখানে বেড়িয়ে আসি। সে সুযোগ মিল্‌লো আইরিশ এয়ার লাইন্‌স এরোলিঙ্গাসের সহযোগিতায় ছাত্রদের জন্য একটি বিশেষ বিমান নিউয়র্ক যাবার খবরে—যারা যাবে তাদেরকে মাসখানেক আমেরিকায় থেকে তারপর ফিরতে হবে। বিমান ভাড়াটি আশ্চর্যরকম কম, আমাদের দু'জনের আসা-যাওয়ার ভাড়া অনায়াসে দেয়া সম্ভব। সবদিক থেকে আমাদের জন্য এটি বেশ যুৎসই হলো বলে দ্রুত এতে শামিল হয়ে গেলাম। বৃটেনের নানা জায়গা থেকে যাত্রী ছাত্ররা লন্ডনে জড়ো হলাম এই ফ্লাইট ধরার জন্য। এর আগে আর একবার লন্ডনে গিয়ে আমেরিকান ভিসা নিয়ে এসেছিলাম। সেই আমলে কি আমেরিকান, কি ইউরোপিয়ান দেশগুলোর ভিসা বৃটেনে পাকিস্তানি ছাত্রের জন্য মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিলনা—অনায়াসে পাওয়া যেতো। কোন কোন দেশে ঢোকার জন্য ভিসা লাগতইনা। বৃটেন থেকে ইউরোপে যাবার সময় অথবা ওখানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সময় পাসপোর্টে ভিসা পরীক্ষার জন্য কোথাও থামতে হতোনা, ট্রেনে বা স্টিমারে চলতে চলতেই সব চেকিং হয়ে যেতো। একবার ইউরোপে ঘুরে স্টিমারে ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেলের বন্দর লেহাভর থেকে সরাসরি সাউদাম্পটন বন্দরে ফিরছিলাম। স্টিমারে ওরা দেখলো যে বৃটেনে আমাদের ভিসার মেয়াদ আর বেশি দিন ছিলনা, তাই পাসপোর্টে স্ট্যাম্প করার সময় নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আরো তিন বছরের ভিসা ওই স্টিমারেই দিয়ে দিলো—সেই ক্ষমতা ওই স্টিমারে থাকা কর্মকর্তাদের ছিলো।

স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ওই আমেরিকা যাওয়ার টিকেটের সঙ্গেই সব যাত্রীকে নিউইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে একেবারে মূল নিউইয়র্ক শহর মানাহাট্টানের কেন্দ্রে

হোটেলে নিয়ে গিয়ে এক রাত ফ্রি সেখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল। কথা ছিল পরদিন যে যার মত চলে গিয়ে এক মাস পর নির্দিষ্ট দিনে আবার এয়ারপোর্টে সবাই একত্রিত হবে। কী মজা, হোটেলটি ছিল আম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিঙের ঠিক সামনে ম্যাকালপাইন হোটেল। নিউয়র্কের যে দর্শনীয় স্থানের কথা সব চেয়ে আগে মনে আসে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তা দেখা হয়ে গেল। হোটেলেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো টেনেসিতে ন্যাশভিল শহরে যাওয়ার বিমান টিকেট। ইউনূস ভাই পরের বিকেলের জন্য এই টিকেট কিনে হোটেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আগেই চিঠিতে এসব জানিয়ে দিয়েছিলেন; তা ছাড়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন কেমন করে 'কালেক্ট' টেলিফোন কল্ করতে হয়। এরকম কলে ফোনটি করার সময় একজন অপারেটরকে জানিয়ে দিতে হবে যে আমি এর জন্য দাম দেবোনা, সেটি পরে 'কালেক্ট' করে নিতে হবে যাঁর কাছে করেছি তাঁর থেকে। অপারেটর আবার অন্য প্রান্তে ফোন তুললে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেবেন তিনি আমার 'কালেক্ট' ফোনটি ধরতে রাজি আছেন কিনা। এভাবে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে দূর পাল্লার টেলিফোনে কথা বলতে পারলাম।

একই সঙ্গে কালেক্ট ফোনের মতো আমার অজানা নতুন নতুন আমেরিকান বিষয়ের সঙ্গে এখন থেকেই পরিচয় হতে আরম্ভ হলো। যেই একদিন সময় নিউইয়র্কে পাওয়া গেলো মণি আর আমি হেঁটে হেঁটে মানহাট্টানে ঘুরে তার সদ্ব্যবহার করলাম। বড় নগরীর মধ্যে লন্ডনের তুলনায় নিউইয়র্ককে খুব সহজ সরল মনে হলো নানা দিক থেকে। গ্রাফ পেপারের মত ছক কাটা শহর লম্বালম্বি রাস্তাগুলো এভেন্যু—এক নম্বর এভেন্যু, দুই নম্বর এভেন্যু—এমনি করে। আর আড়াআড়ি গুলো ষ্ট্রিট—এক, দুই , তিন করে। উভয়ের প্রত্যেকটাই নাক বরাবর সোজা, রাস্তাঘাট চেনার কোন বালাই নেই, বা হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয়ই নেই। সোজা রাস্তা বলে লম্বা পথকেও আসলে কম মনে হয়। তাই হেঁটেই অনেকখানি দেখে ফেল্লাম—মিডটাউন, ডাউনটাউন অনেক দূরে দূরে চলে গেলাম। নিজেরাই ম্যাপ দেখে চলে গেলাম ব্রডওয়ে থিয়েটার পাড়া, টাইমস স্কোয়ার—এরকম কিছু কিছু জায়গায় যেগুলোর কথা ছোটবেলা থেকে অনেক শোনেছি। আগাগোড়া সব আকাশচুম্বি দালান, যার উপরের দিকটা দূরে না গেলে দেখা মুশকিল। এভাবে দীর্ঘ পথ হাঁটার অভ্যাসতো আমার আগে থেকেই আছে—সম্প্রতি ইয়ুথ হোস্টেলিং করে প্রচুর হাঁটার কারণে মণিরও এটি বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। এর একটি লাভ হলো দ্রুত আমেরিকার হালচাল সম্পর্কে একরকমের ধারণা জন্মাতে শুরু করলো।

মনে হলো বৃটেনের তুলনায় মানুষগুলো বেশ মিশুক—হরেক রকমের মানুষ; একেবারে সাদা থেকে একেবারে কালো, এর মাঝে প্রায় সব রকম গায়ের রঙের দেখা মেলে, ভাষার টানটোনের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য শোনা যায়। লন্ডনেও বহু জাতের মানুষের সমাগম দেখি, তবে পার্থক্য হলো নিউইয়র্কের এদের চালচলনে মনে হয়না এদের কেউ নিজেদেরকে বিদেশী বা বিজাতীয় মনে করে—সবাই

আমেরিকান। হাঁটতে হাঁটতে খাওয়ার জায়গা ইত্যাদিতে থেমে থেমে বিশ্রাম নিচ্ছি আর এদেরকে দেখছি, শুনছি। চট্ করে যেটি মনে হলো এরা পোষাক পরিচ্ছদে, আচার আচরণে বা আলাপ শুরু করতে লৌকিকতা বা আনুষ্ঠানিকতার তেমন কোন ধার ধারেনা—যা বৃটেনের ক্ষেত্রে বলা যাবেনা। খুব কেতাদুরস্ত পোষাকের মানুষ বেশি চোখে পড়লোনা। গরমের দিন হওয়াতেই বোধ হয় স্বল্প বস্ত্রেই সবাই চলাফেরা করছে তরুণদের মধ্যে হাফপ্যান্ট, টি শার্ট এসবই বেশি—বড়রাও ঢিলে ঢালা। থ্রি-কোয়ার্টার লম্বা প্যান্ট এই প্রথম দেখলাম। টয়লেটকে যে 'রেষ্টরুম' বলা হয় তাও এই প্রথম শোনলাম—সেভাবেই লেখা আছে দেখলাম।

রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার কাল চট্ করে শেষ হয়ে গেলো যখন বিমানে সুদূর দক্ষিণে (আমেরিকানরা বলে ডীপ সাউথ) টেনেসির ন্যাশভিল শহরে গিয়ে পৌছলাম। ওখানে অনেকটা মফস্বল শহরের পরিবেশ—ইউনূস ভাইয়ের ঠাঁইতে পৌছে একেবারে বাড়িতেই যেন চলে এলাম। এয়ারপোর্টে ইউনূস ভাই ছাড়াও শাহগির ভাইকে দেখলাম; শাহগির শাহ আমাদের ছোটবেলার পাবিবারিক বন্ধু, তুখোড় স্কাউট। বহুকাল ধরে তাঁর আমেরিকায় আসার স্বপ্ন ছিল। এর জন্য যাত্রা করে চট্টগ্রামের বাড়ি ছেড়েছিলেন, কিন্তু পথে করাচিতেই আটকে গিয়েছিলেন বহু বছরের জন্য, ছোটখাট কাজ শিখে এবং কাজ করেই কেটেছে। অবশেষে কেমন করে জানি সত্যি সত্যি আমেরিকাতে কয়েকদিন আগে হাজির হয়ে আপাতত ইউনূস ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন (পরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে লাস ভেগাসে হোটেল পরিচালক ও হোটেল ব্যবসায়ী)। ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে মণির এই প্রথম সাক্ষাত। আমার সঙ্গেও তাঁর বহু বছর পর দেখা। হৈচৈ করে কাটলো বেশ ক'টি দিন। এই বাড়িতে বিশেষ উপভোগ্য জিনিস হলো এয়ার কন্ডিশনিং এবং কালার টেলিভিশন—সাউদাম্পটনের বাসায় যেটি থাকার জো ছিলনা। অবশ্য ইংল্যান্ডে কখনোই এয়ার কন্ডিশনিং লাগেনা—শুধু শীতে হীটার লাগে; অল্প দু'একদিন যা গরম তাও নামেমাত্র—কুলার, ফ্যান কিছুই লাগেনা। কিন্তু এখানে, আমেরিকার এই দক্ষিণে, গরম যথেষ্ট, বাড়িতে ও গাড়িতে কুলার প্রয়োজন। ইউনূস ভাইয়ের একটি ছোট্ট ফোক্সভাগন গাড়ি, এ গাড়িতেই প্রায় এক মাস ধরে আমেরিকার এদিক ওদিক চষে বেড়ালাম।

ন্যাশভিল দারুণ স্নিগ্ধ একটি শহর। আমরা অবশ্য এখানে থাকছিনা, কারণ ইউনূস ভাই এখানকার ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে কিছুদিন ধরে এর কাছে আর একটি ছোট শহর মারফ্রিসবরোতে মিডল টেনেসি ষ্টেট ইউনিভার্সটিতে শিক্ষকতা করছেন। তবে প্রায়শ আমরা সেখান থেকে ন্যাশভিলে আসছি। এখানে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা রয়েছেন—বিশেষ করে ডক্টর আতাহার এবং তাঁর ইতালীয় স্ত্রী ও তাঁদের ছোট্ট মেয়ে। ন্যাশভিল হলো আমেরিকার ক্যান্ট্রি মিউজিকের রাজধানী। প্রধানত দক্ষিণের লোকজ সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে যে কান্ট্রি মিউজিক তার সঙ্গে আমি সাউদাম্পটনেই কিছুটা পরিচিত হয়েছিলাম। এর

বড় বড় গায়ক তারকাদের উত্থান ঘটেছে এই ন্যাশভিলে। এর কেন্দ্রে হলো এখানকার বিখ্যাত 'গ্র্যান ওলে অপরি' (গ্র্যাণ্ড ওল্ড অপেরার দক্ষিণী অপভ্রংশ)। ন্যাশভিলে থাকতে রেডিয়োতে (গাড়িতে) এবং টেলিভিশনে গ্র্যান ওলে অপরির অনুষ্ঠানের নমুনা কিছু শুনেছি, আর বেশ কয়েকবার এর প্রাচীন ঢঙের ইংরেজি অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড খচিত কেন্দ্রের সামনে দিয়ে গিয়েছি। ন্যাশভিলে থাকাকালে এবং ডীপ সাউথের নানা জায়গায় ভ্রমণের সময় আমি এখানকার মানুষের মুখের কথার ভঙ্গিটি খুব উপভোগ করেছি—আমার কাছে এটি বেশ শ্রুতিমধুর ও সারল্য-ভরা মনে হয়েছে—এরা একে বলে 'সাদার্ন ড্রল'। এখানকারই কৃতী সন্তান নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামের নাটক অবলম্বনে হলিউডের বিখ্যাত ছবি 'অ্যা ষ্ট্রিটকার নেইমড ডিজায়ার' অথবা 'ক্যাট অন্ অ্যা হট টিন রুফ' যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এই ভাষা অপরিচিত নয়। শেষের ছবিটিতে অভিনয় করার জন্য এলিজাবেথ টেইলরকে বেশ কষ্ট করেই সাদার্ন ড্রলে কথা বলতে শিখতে হয়েছিলো।

ইউনূস ভাই তাঁর পিএইচডি করার বিশ্ববিদ্যালয় ভেন্ডারবিল্ট ক্যাম্পাসটি ঘুরিয়ে দেখালেন। শহরের মধ্যেই গাছপালা ঘেরা সুন্দর পুরোনো ক্যাম্পাস, দক্ষিণ অঞ্চলের অত্যন্ত নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর শিক্ষক, পিএইচডি সুপার ভাইজার—জর্জেস্কু রোগেনের সঙ্গে দেখা করলেন আমাদের নিয়ে। মূলত রুমানিয়ার অধিবাসী এই বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক আমেরিকার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের একজন। সেবার আলাপ ছলে তিনি কেন জানি বলছিলেন যে নিউইয়র্ক শহরটি এত বেড়ে গেছে, এত তার জনসংখ্যা ও সমস্যা যে এটি একটি টাইম বোমার মত, শিগ্‌গীর বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করছে। সদ্য এই সুন্দর শহরটি এক ঝলক দেখে আসা আমার কাছে বোধগম্য হলোনা কেন তিনি এ কথা বলছেন। তবে আমি কীই বা দেখেছি এর?

সাদার্ন ড্রল নাকি এসেছে এই অঞ্চলে বৃটেন থেকে আসা আদি অভিবাসীদের ভাষার সঙ্গে আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে আনা কালো মানুষদের ক্রেয়ল নামের খিচুড়ি ভাষার প্রভাবে। কিন্তু এখন সে রকম প্রভাব ঘটার লক্ষণ তেমন কিছু দেখছিলামনা, কারণ ক'দিন আগেও কালোরা এখানে যে একেবারে বর্ণবাদী আচরণের মধ্যে বাস করেছে তার নমুনা তখনো প্রচুর রয়েছে। ইউনূস ভাই কয়েক বছর আগে যখন প্রথম এখানে এসেছেন তখন চোখের সামনেই দেখেছেন কী ভাবে কালোদের নাগরিক অধিকারগুলো সংগ্রামের পর সংগ্রামে ওরা অর্জন করছিলো। এখনো দেখলাম আইনগত ভাবে অর্জন করেছে বটে, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগে অনেক বাকি। ন্যাশভিলে সর্বত্র প্রচুর কালো মানুষ দেখেছি—কিন্তু ওরা যেন নিজেরা নিজেদের মধ্যে রয়েছে; যেখানে দেখছি এক সঙ্গে অনেককে দেখছি, পোষাকে পরিচ্ছদে প্রায় সবারই দৈন্য ও নির্লিপ্ততার ছাপ, আচার-আচরণেও কিছুটা তাই, অনেকটা বেপরোয়াও। তাদের ইংরেজি ভাষা, শব্দ চয়ন,

উচ্চারণ সবই আলাদা—মনে হয় একটু প্রাচীন ধাঁচের ইংরেজি শব্দগুলো ব্যবহার করছে, যে সব শব্দ আজকাল সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়না। সাদাদের সাদার্ন ড্রলের সঙ্গে মিল আছে, কিন্তু তার মধ্যে কালোদের এই ভাষার ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা।

ন্যাশভিলে পৌছার কয়েকদিন পরই ইউনূস ভাই আমাদেরকে নিয়ে তাঁর সেই ফোক্সভাগন বীটলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। শুরুতে আমরা ওই ডীপ সাউথের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে ঘুরলাম—টেনেসি থেকে আলাবামা, মিসিসিপি, লুজিয়ানা, জর্জিয়া ইত্যাদি। ওই নামগুলো সঙ্গে সঙ্গেই মনে করিয়ে দিচ্ছিলো গত এক দশক ধরে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এখানকার নানা ঘটনাতেই উদ্বেলিত হচ্ছিলাম—এখানকার কালো মানুষদের অভাবনীয় বঞ্চনা নিয়ে, তার বিরুদ্ধে ওদের আন্দোলন নিয়ে, আর একটু একটু করে সে আন্দোলনের ফলপ্রসুতা নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে ওই বঞ্চনার ও ওই নিষ্ঠুরতার ঘটনাগুলোকে চরমে নিয়ে যেতে আবার এই দক্ষিণেই গড়ে উঠেছিলো কুক্লাক্স ক্ল্যানের মতো সাদাদের সন্ত্রাসী সংগঠন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো দিনের বেলার সাধারণ প্রতিবেশী, চেনা জানা সাদারাই গোপন কুক্লাক্স ক্ল্যানের সদস্য হয়ে রাতে সাদা মুখোশ ও লম্বা টুপি পরে, সাদা আলখাল্লা পরে, জ্বলন্ত ক্রুশ হাতে নিয়ে, অনেকটা ধর্মীয় আনুষ্ঠনিকতার ভঙ্গিতে কালোদের উপর চড়াও হতো; তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিতো, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কাউকে মেরেও ফেলতো। ১৯৭০এ আমরা যখন গিয়েছি তখন সবে এ সবের শেষ ছিটেফোটার অবসান হচ্ছে—পরিস্থিতি তখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়।

ওখানে গিয়ে কালোদের সংগ্রামের সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়লো। শতাব্দীর শুরু থেকেই ওখানে চলছিলো সেই 'জিম ক্রো' আইন নামের স্থানীয় আইন—যাতে সাদাদের সঙ্গে কোনভাবে মেলামেশা; একই পাবলিক যানবাহন, রেস্টুরেন্ট, বিনোদনের জায়গা, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহার করা; কালোদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কালোদের ভোটাধিকার আইনে থাকলেও কার্যত তার প্রয়োগ খুব কঠিন করে তোলা হয়েছিলো। এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ এসেছে—অধিকাংশই ষাটের দশকে বা তার কাছাকাছি সময়ে। আলাবামায় গিয়ে মনে পড়লো এখানে কালো মহিলা রোজা পার্ক সাদা মানুষদের জন্য বাসের সীট ছেড়ে না দেয়াতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, প্রতিবাদে মন্টোগোমারি শহরে কালোদের দীর্ঘ বাস বয়কটে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিলো। এই ডীপ সাউথের শহরগুলোর মধ্য দিয়ে কালোদের সমর্থনে সহানুভূতিশীল সাদারাও 'ফ্রীডম রাইড' করেছিলো বাসে করে দলে দলে প্রতিবাদী যাত্রায়। কিন্তু এই বাসগুলোর উপর কুক্লাক্স ক্ল্যান ও তাদের সমর্থকরা আক্রমণ করে, পেট্রোল বোমা ছুড়ে, নির্মম ভাবে পিটিয়ে যাত্রীদের আহত করে। এখানে মন্টোগোমারি, বার্মিংহাম শহরে ফ্রীডম রাইডারদের ওপর এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিলো। স্থানীয় পুলিশ ওদেরকে রক্ষা করার বদলে বরং ফ্রীডম রাইডারদেরকেই দলে দলে গ্রেপ্তার

করেছিলো। আলাবামা , মিসিসিপি এবং আরকানসাসে সরকারী স্কুল ও কলেজে ফেডারেল আইন অনুযায়ী কালো ছাত্র ভর্তি করালে তাদের ক্লাসে ঢুকতে ষ্টেট ট্রুপার সৈন্যরা বাধা দিয়েছে, বর্ণবিদ্বেষী সাদারা বাধা দিয়েছে—শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ফেডারেল সৈন্য পাঠিয়ে তাদের পাহারায় কালো ছাত্রদের ক্লাস করার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। এভাবে একটির পর একটি নাগরিক অধিকারের আইন সংস্কার হয়েছে এবং সাংঘাতিক বাধার মুখে সেই আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলাবামায় মন্টোগোমারিতে একটি চার্চের যাজক ছিলেন মার্টিন লুথার কিং। মাত্র ২৬ বছর বয়সের এই পাদরি ১৯৫৫ এর সেই মন্টোগোমারি বাস বয়কটে নেতৃত্ব দিয়ে প্রথম কালোদের নাগরিক অধিকারের সংগ্রামে আসেন। তাঁর অহিংস পদ্ধতি সংগ্রামের পর সংগ্রামে একটি নতুন মাত্রা এনে ১৯৬৩ সালের বিখ্যাত ওয়াশিংটন মার্চে তা তুঙ্গে তোলে। চারদিক থেকে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে যেখানে তাঁরা 'উই শ্যাল ওভারকাম' গান গেয়ে অহিংসভাবে সমান অধিকারের দাবি তুলেছিলেন। কিং সেখানে 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম' নামে বিখ্যাত সেই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি উদ্যোগটি শুরু করলেও ১৯৬৪তে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনই শেষ পর্যন্ত অনেক বাধার মুখেও সিভিল রাইট বিলটি (নাগরিক অধিকার আইন) কংগ্রেসে পাশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সংগ্রামের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এর পরেই মার্টিন লুথার কিং এবং ম্যালকম এক্সের মতো নেতাদেরকে নিহত হতে হয়েছিলো। মন্টোগোমারির ডেক্সটার এভেন্যুতে সেই ব্যাপটিস্ট চার্চটি দেখলাম যেখানকার তরুণ যাজক হিসেবে কিং এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেছিলেন।

ন্যাশভিল, মারফ্রিজবরোতে থাকার সময় এবং ডীপ সাউথের যেখানে যেখানে গিয়েছি সাদা অধিবাসীদের মধ্যে সিভিল ওয়ারে তাদের হেরে যাওয়া রাষ্ট্র কনফেডারেসি নিয়ে আশ্চর্য রকম মাতামাতি লক্ষ্য করেছি, এই এক শ' বছর পরেও। আমেরিকান সিভিল ওয়ারের (১৮৬১-৬৫) সময় দক্ষিণের বিদ্রোহী রাজ্যগুলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের হয়ে গিয়ে এই কনফেডারেসি (কনফাডেরেট ষ্টেটস অব আমেরিকা) গঠন করেছিলো। গৃহযুদ্ধ চলাকালে মাত্র বছর পাঁচেক স্থায়ী হয়েছিলো ওই রাষ্ট্র—তাও দুনিয়ার কোন দেশই তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও মনে হয় প্রজন্মের পরে প্রজন্ম দক্ষিণ-বাসী আমেরিকানদের কাছে এখনো তার স্মৃতি জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে। মাতামাতিটি সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে এখানকার সর্বত্র কনফেডারেট পতাকা ওড়াবার ধুম দেখে। এটি বর্গাকার পতাকা যাতে লাল জমিনের উপর রয়েছে একটি সাদা পেড়ে নীল কোনাকুনি ক্রস, যার দুই বাহুর মধ্যে প্রত্যেক ষ্টেটকে প্রতিনিধিত্বকারী সাদা তারকার দুটি সারি। আসলে এটি ঠিক ওভাবে কনফেডারেসির জাতীয় পতাকা ছিলনা, ছিল তার যুদ্ধের পতাকা। এটি বিদ্রোহীদের পতাকা, সিভিল ওয়ারে ওরা

পরাজিত হবার পর পর যা ওড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছিলো। অথচ সেটিই পরে এখন পর্যন্ত দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোতে সব চেয়ে জনপ্রিয় পতাকা হিসেবে ওড়ানো হচ্ছে—ব্যক্তিগত পর্যায়ে তো বটেই, এমন কি স্থানীয় সরকারী ভাবেও। গাড়িতে, বাড়িতে, দোকানে, অফিসে কোন কারণ ছাড়া যত্রতত্র এই পতাকা উড়ছে দেখতে পেলাম। সিটি হল, এমনকি কোন কোন অঙ্গরাজ্যে ষ্টেটের নিজস্ব পতাকার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে ষ্টেট ক্যাপিটলের (ষ্টেটের কংগ্রেস ভবন) ওপর ওড়ানো হচ্ছে। মনে হলো সে তুলনায় আমেরিকার জাতীয় পতাকা তেমন দেখছিলামনা কোথাও। শহরের মাঝখানে সর্বত্র এই পতাকা বিক্রিও হচ্ছে দেখলাম। আসলে এই পতাকাটি গৃহযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার নামে প্রকারান্তে বর্ণবাদী মনোভাবটি জিইয়ে রাখারই একটি প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

তাছাড়া নানা কিছুর নামে কনফেডারেসির বীরদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখা হয়েছে। ন্যাশভিলে ও তার আশপাশে যেখানে আমরা ঘুরলাম প্রায় দেখার জায়গাগুলো হলো সিভিল ওয়ার স্মৃতি—যেখানে তাদের বিদ্রোহী কনফেডারেট সেনাবাহিনী কীভাবে উত্তর থেকে আসা আমেরিকার ফেডারেল সৈন্যবাহিনীকে (ওরা যাদেরকে বলে ইয়াংকি সৈন্য) দীর্ঘ সময় পর্যুদস্ত করে রেখেছিলো সেই কাহিনী নানা ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ন্যাশভিল শহরের সঙ্গেই রয়েছে ১৮৬৪ সালের ডিসেম্বরে এখানে বড় ধরনের একটি যুদ্ধের স্মৃতিগুলো। টেনেসিতেই আরো ভয়াবহ দুটি যুদ্ধের এলাকাকে জাতীয় স্মৃতি চিহ্নের মর্যাদায় সংরক্ষণ করা হয়েছে শিলহ এবং চ্যাটানুগা নামে জায়গায়—উভয়েই কনফেডারেট বাহিনীর বীরত্বকে ও যুদ্ধ-কৌশলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। পরাজিত পক্ষ যে এভাবে এত বছর পরে পরাজয়কেও গৌরবে পরিণত করে নিজেদের ও অন্যদেরকে বোঝাতে পারে সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবেনা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এসব জায়গায় গিয়ে, এবং স্থানীয় পত্রিকায় যে বিষয় নিয়ে হরদম লেখা হচ্ছে তার কিছু কিছু পড়ে, মনে হলো যে দক্ষিণের বাসিন্দাদের ধারণাতে সিভিল ওয়ারের ইতিহাস মূলস্রোত আমেরিকার ইতিহাসের সিভিল ওয়ার থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। তারা মনে করে কনফেডারেসি আলাদা হয়েছিলো দাস প্রথাকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে নয়, বরং ষ্টেটের অধিকার সম্পর্কে স্বীকৃত চুক্তি কেন্দ্র লঙ্ঘন করাতে সেই অধিকার রক্ষার সংগ্রামেই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ তারা দেখাতে চায় অনেক কালো মানুষও (অধিকাংশই দাস) যুদ্ধে তাদের হয়ে লড়েছে। পরে দেখেছি কথাগুলো ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়, দক্ষিণের লোকদের নিজেদেরকে প্রবোধ দেয়ার জন্য সৃষ্ট ইতিহাস মাত্র। অন্যত্র কেউ এ সব বিশ্বাস করেনা, দক্ষিণের কালো মানুষরাও করেনা। সেই ১৯৭০ এর পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণের সাদাদের মধ্যেও এই ভুল ভেঙ্গে গেছে—এখন কনফেডারেসি নিয়ে ওই মাতামাতিও কিছুটা কমে গেছে। ভুলে গেলে চলবেনা ওই ষাটের দশকেও দক্ষিণের ডেমোক্রেটিক পার্টি জর্জ ওয়ালেস প্রমুখ কট্টরবাদিদের

নেতৃত্বে ওখানে বর্ণ বৈষম্য চালু রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছিল। গভর্নর হিসেবে ওয়ালেস নিজে কালো ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দিতে দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, এবং এসব নীতির ভিত্তিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার নির্বাচনে পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন।

আমাদের ভ্রমণে জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টা শহর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আটলান্টার মাঝখানে অন্যতম দর্শনীয় স্থান হচ্ছে 'কনফেডোরামা'—সিভিল ওয়ারে 'ইয়াংকিরা' এসে (মার্কিন ফেডারেল সৈন্যবাহিনী) কী ভাবে এই সুন্দর শহরকে আক্রমণ করেছিলো, ওরা প্রবল বাধা দিয়েছে, কিন্তু নিষ্ঠুর ইয়াংকিরা কীভাবে শহরটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তা এখনে ডায়ারেমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে—যা কিনা ছোট আকারের মডেলে যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিমাত্রিক প্রকাশ, সেই সঙ্গে বড় বড় দেয়ালজোড়া চিত্র ইত্যাদি। দক্ষিণের মানুষের কাছে এসব ইতিহাস যে এখনো কত নাড়া দিচ্ছে এও তা মনে করিয়ে দিলো। বিখ্যাত হলিউড সিনেমা 'গন উইথ দি উইন্ড' সিভিল ওয়ার কালীন এই আটলান্টারই একটি পরিবারের কাহিনী নিয়ে তৈরি। ন্যাশভিলে এসেছি অবধি ১৯৩৯ সালে নির্মিত এই সিনেমার কথা শোনছি—সেই ১৯৩৯ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় প্রতি দিনই দক্ষিণের শহরে শহরে কোন না কোন প্রেক্ষাগৃহে এটি চালু রয়েছে। লাইন দিয়ে এটি দেখার জন্য দর্শকের অভাব এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয়নি। দর্শকরা নাকি বার বার এটি দেখে, আর দক্ষিণের শহর বন্দরগুলো ইয়াংকিরা কীভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে, তাদের জীবন ধারাকে কীভাবে চিরতরে বদলে দিয়েছে সে দৃশ্য আবার নতুন ভাবে দেখে তাদের অন্তর কাঁদে, অনেকে সত্যি সত্যি কাঁদে।

সিভিল ওয়ারের শত বার্ষিকী উপলক্ষে সাম্প্রতিক কালে (ষাটের দশকে) নাকি এই ছবির জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে উঠেছিলো। এত সব শুনে সিনেমাটি দেখতেই হলো, তবে পুরো মনোযোগ চার চার ঘণ্টার কাছাকাছি সময় দীর্ঘ (দৈর্ঘের দিক থেকে খুব সম্ভব এটি তখন পর্যন্ত হলিউডের রেকর্ডধারী) এর জটিল প্লটের সব বুঝতে পারিনি। যা স্পষ্ট ভাবে বুঝেছি তা হলো এই উপন্যাসের লেখক, এই ছবির নির্মাতা এবং এর দর্শকের অধিকাংশ সাদা দক্ষিণ-বাসীদের জন্য সিভিল ওয়ারে রুখে দাঁড়ানোর এবং পরে পরাজয়ের মাধ্যমে দক্ষিণের সুবর্ণ দিনগুলো হারিয়ে ফেলার কাহিনীটি কিছুটা কৃত্রিম ভাবেই তুলে ধরেছে। কৃত্রিম এই জন্য যে মুদ্রার অপর পিঠটি দেখাতে এটি কার্পণ্য করেছে—দেখিয়েছে সেখানে দাসপ্রথার নিষ্ঠুরতার বদলে হাসিখুশি কালো দাসরা রয়েছে, চরম বৈষম্যগুলোকে ঢেকে দুই বর্ণের মানুষের, অর্থাৎ দাস ও মনিবের, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার কথা রয়েছে—যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। ষাটের দশকের শেষেও এমন অসত্যকে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে দিব্যি জিইয়ে রাখা কীভাবে সম্ভব হয়েছিলো, তা অবাক হবার মতো।

দক্ষিণে ভ্রমণের সময় শুধু যে অতীত নিয়ে যে নানা কিছু দেখেছি তা নয় ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখেছি—যেমন আলাবামার হান্টসভিলে গেলাম এর 'স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টার' দেখতে। মাত্র বছরখানেক আগে মানুষ চাঁদে পা রেখেছে—মহাশূন্য নিয়ে উৎসাহ তখন তুঙ্গে। এই সেন্টারে গিয়ে মহাশূন্য ভ্রমণের সত্যিকারের কিছু কিছু জিনিস নিজের চোখে দেখতে পেলাম—আগেকার জেমিনি এবং অ্যাপলো মহাশূন্যযানগুলো, যার অতি ছোট্ট আঁটোসাটো পরিসরে বসে মহাশূন্যচারীরা চাঁদে যাবার মহড়া দিয়েছেন, চাঁদের কাছে ঘুরে এসেছেন, যে স্যাটার্ন রকেট তাদেরকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপ করেছে তেমনি নানা দৈত্যাকার রকেট, চাঁদ থেকে আনা মাটি, মহাশূন্যযাত্রীর পোষাক, ইত্যাদি নানা রকম জিনিস। ছোটবেলায় স্পুটনিকের দিন থেকে শুরু করে এই বিষয়ে আমার কৌতূহলের শেষ ছিলনা। এতদিন এদেরকে সিনেমায়, টেলিভিশনে, ছবিতে দেখেছি; এবার হান্টসভিলে এসে সত্যিকারের জিনিস কিছু দেখলাম।

টেনেসিতে দেখলাম ওকরিজ ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরি, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সব চেয়ে পুরাতন গবেষণা কেন্দ্রগুলোর একটি—যেখানে প্রথম যুগে পরমাণু বোমা নিয়ে কাজ হয়েছিল; তখনকার রিয়্যাকটরটি এখনো রয়েছে। এখন শান্তির প্রয়োগে পরমাণু গবেষণা হচ্ছে। এসব নিয়ে অনেক সুন্দর বই পেলাম এখানে। দক্ষিণের প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই খুব বৈচিত্রময়, টেনেসির গ্রেট স্মোকি মাউন্টেন যেমন, তেমনি আবার লুজিয়ানার একেবারে দক্ষিণে নিউ ওরলীন্সে মিসিসিপি মোহনা—অনেকটা বাংলাদেশের দক্ষিণের নদী জালের মত। তাছাড়া এখানকার কালো বাসিন্দাদের একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ করা যে সংগীত তার পরিচয় নিউ ওরলীন্সে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি; এটিই যে শতাব্দীর শুরুতে জাজ সংগীতের জন্ম দিয়েছিলো একথা এরা ভুলতে দেয়না।

সেই ফোক্সভাগন বীটলে চড়ে দূরপাল্লার ভ্রমণে দক্ষিণ থেকে ক্রমে উত্তরে এসেছি—উভয়ের মাঝামাঝি জায়গা হলো ভার্জিনিয়া। মজার ব্যাপার হলো ভার্জিনিয়া বলতে যা প্রথম মনে আসতো সিগারেটের বিজ্ঞাপনে ভার্জিনিয়া টোবাকো কথাটি বার বার আসতো বলে এখানে গ্রামাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঠিক তাই দেখলাম—তামাক গাছের চাষ, বেশ উঁচু উঁচু তামাক গাছ। ভার্জিনিয়ার পথ এক সময় শেষ হলো ওয়াশিংটন ডিসিতে রাজধানীতে এসে। ওয়াশিংটনের বিস্তীর্ণ মাঠের মত ন্যাশনাল মল এলাকায় এসে মনে হলো সেই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া অবধি ইউএসআইএস লাইব্রেরিতে গিয়ে রোজ যে সিনেমা দেখতাম, তারই অনেক কিছু মূর্তিমান হয়ে এসেছে—ওয়শিংটন মনুমেন্ট, লিংকন মেমোরিয়াল, কেপিটোল (কংগ্রেস ভবন), হোয়াইট হাউস—সব প্রায় একই জায়গায়। লিংকন মেমোরিয়ালে লিংকনের 'গেটিসবার্গ এড্রেস' বক্তৃতাটি দেয়ালে পুরো খোদাই করা রয়েছে বলে বেশ মজা পেলাম—কারণ ওটি আমার মুখস্থ ছিলো, কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পাঠ্য ছিলো, তখন মুখস্থ করেছিলাম, আর

কখনো ভুলিনি—'ফোর স্কোর অ্যান্ড সেভেন ইয়ারস এগো,...থেকে শুরু করে 'গভর্নমেন্ট অফ্ দি পিপল, বাই দি পিপল, অ্যান্ড ফর দি পিপল শ্যাল নট প্যারিশ ফ্রম দি আর্থ' পর্যন্ত। কিন্তু লিংকন মেমোরিয়ালে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের দিকে বিশাল মাঠের পানে তাকিয়ে কিন্তু এই বক্তৃতা নয়, বরং মনে পড়ছিলো আরো সাম্প্রতিক অন্য একটি বক্তৃতা যা ঠিক এ ভাবে এখানটায় দাঁড়িয়েই দেয়া হয়েছিলো—মার্টিন লুথার কিঙের ওয়াশিংটন মার্চের সমাবেশে (১৯৬৩) 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম' বক্তৃতা। কারণ আমার ভ্রমণ কালের সাম্প্রতিক আবহও ছিল এখানে এমনিতরো ঘন ঘন নানা সমাবেশের—বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সমাবেশের। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধিতা নিয়ে তখন পুরো আমেরিকা উত্থাল। এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো বিশাল সংখ্যক তরুণদের বিদ্রোহী মনোভাব—কালোদের 'ব্ল্যাক পাওয়ার' আন্দোলন; ফ্লাওয়ার চিল্ড্রেনদের হিপ্পি আন্দোলন; জন লেনন ও অন্যান্যে বীটলদের ও পপ তারকাদের নেতৃত্বে পীস মুভমেন্ট; ভিয়েতনাম ফেরত, আহত, হাত-পা হারানো হুইল চেয়ারে বসা তরুণরা সহ অনেকের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন—সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

ষাটের দশকে ম্যালকম এক্সের বিদ্রোহী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ ষ্টোকলী কারমাইকেল এবং অন্যান্য তরুণ কৃষ্ণকায় নেতারা নরম পন্থা বাদ দিয়ে এই 'ব্ল্যাক পাওয়ার' আন্দোলন শুরু করেছিলো। পরে আর এক কদম এগিয়ে হুয়ে নিউটন, ববি সিল প্রমুখ গঠন করেছিলেন 'ব্ল্যাক প্যানথার পার্টি' যা সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো—পরস্পর দেখা হলেই এ তরুণ তরুণীরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে ব্ল্যাক প্যানথার স্যালুট দিতো। ১৯৬৮তে মেক্সিকো অলিম্পিকে দু'জন কালো আমেরিকান এথলেট অলিম্পিকের বিজয় মঞ্চে মেডাল নেবার সময় ব্ল্যাক প্যানথার স্যালুট দিয়ে সারা দুনিয়ার হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো। স্যালুট ছাড়াও তাদের বেশ কিছু বিদ্রোহী প্রতীক কালোদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলো—যার মধ্যে রয়েছে তাদের কোঁকড়ানো চুল মাথার উপর ফোলানো ও উঁচু করে রাখা, যাকে অ্যাঞ্জেলা ডেভিস চুলও বলা হতো। কৃষ্ণকায় মহিলা অ্যাঞ্জেলা ডেভিস ছিলেন ১৯৬৯ থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে কালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির দর্শনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পরের বছর কম্যুনিস্ট পার্টি ও ব্ল্যাক প্যানথার সমর্থক হবার কারণ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বরখাস্ত করে, কিন্তু কোর্টের আদেশে এ পদ তাঁকে ফেরত দিতে হয়। আমরা যখন আমেরিকায় ভ্রমণ করছি সত্তরের সেই আগস্টে অ্যাঞ্জেলা ডেভিসকে সব চেয়ে বিপজ্জনক দশ অপরাধীর একজন হিসেবে ঘোষণা করেছিলো এফবিআই, কারণ তিনি নাকি কালো যুবকদের সন্ত্রাসে সহায়তা দিয়েছিলেন। সেই থেকে অন্যদের সঙ্গে অ্যাঞ্জেলা ডেভিসও বিখ্যাত নাম, তাঁর চুলও সর্বত্র অনুকরণীয়। ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলনের একটি শ্লোগান ছিলো 'ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল'। ওরা নতুন করে কালোদের আত্মপরিচয় ও আত্মসম্মানের অনুসন্ধান করছিলো, যা প্রয়োজনে সহিংস হতেও রাজি ছিলো।

মাথার চুল অবশ্য শুধু ব্ল্যাক পাওয়ারের প্রতীক ছিলনা, সে সময় বিশেষ ধরনের লম্বা চুল আরো অনেক কিছুর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আমেরিকাতে, তার নমুনা পেলাম কয়েকদিন নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে 'হেয়ার' মিউজিক্যালটি দেখলাম। ১৯৬৭ সালে প্রথম অভিনীত এই মিউজিক্যালটি ইতোমধ্যে প্রচুর হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। ষাটের দশকের ওই যে হিপ্পি সংস্কৃতি তরুণ তরুণীদের মধ্যে উঠেছিল 'হেয়ারের' অভিনয় ও গানগুলো যেন তারই প্রধান ঘোষকের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলো। লম্বা-চুল ওই হিপ্পিদের একটি ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি (সাব-কালচার) খোদ এই নিউইয়র্ক শহরে তাদের যে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম চালাচ্ছে এই কাহিনীরই সংগীত-নৃত্য রূপ এটি। ওরা ওদের মতো করে শান্তির সন্ধানে রয়েছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের তীব্র বিরোধী তারা, তরুণদেরকে এযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করার সরকারী নীতির সঙ্গে তাদের তীব্র বিরোধ। তখনকার দিনে হিপ্পিদের দেখাদেখি অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে সম্ভাষণ করতো 'পীস্ ম্যান পীস'—একথা বলে। আসলে ওদের একটি আলাদা ভাষাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো নতুন নতুন শব্দের, যা আগে ইংরেজি ভাষায় ছিলনা, অথচ তখন অনেক তরুণের মুখে মুখে; যেমন ভাল অর্থে 'গ্রুভি' পছন্দ করা অর্থে 'ডিগ' (ডু ইউ ডিগ ইট?) ইত্যাদি। ওদের মধ্য থেকে শুরু হলেও 'মেইক লাভ, নট ওয়ার', 'ডোন্ট হেইট, কম্যুনিকেট'—ইত্যাদি শ্লোগান তখন সাধারণ তরুণ তরুণীদের মধ্যেও দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিলো। হেয়ারের গানগুলো ছিলো তার মূল সুর। মিউজিক্যাল নাটকটি ষ্টেজ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল হলঘরে দর্শকদের মধ্যেও, এবং এক পর্যায়ে দর্শকরাও এর নাচ-গানে অংশ নিয়েছে। বাস্তবে হিপ্পিদের বিদ্রোহ যতগুলো দিকে বিস্তৃত হয়েছিলো এই মিউজিক্যালেও তার সবই অন্তর্ভুক্ত করাতে অনেকে এর বিরূপ সমালোচনাও করেছে। এতে খিস্তি কাটা, প্রচলিত সংস্কৃতির ধারকদের প্রতি গালি বর্ষণ, যৌনতার নগ্ন প্রকাশ, ড্রাগের নেশার নিত্য ব্যবহার (অবশ্য গাঁজার মতো অপেক্ষাকৃত নরম ড্রাগ), মার্কিন জাতীয় পতাকার অপমানজনক ব্যবহার যেমন প্যান্টের কাপড় হিসেবে, এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলে নগরীর মধ্যে সম্পূর্ণ বোহেমিয়ান জীবন যাপন, কিছুই বাদ যায়নি।

আসলে তখন তরুণ সমাজে যা হচ্ছিলো—হেয়ারে তাই প্রতিফলিত হচ্ছিলো; আর হেয়ারে যেমনটি দেখানো হচ্ছিলো তরুণ সমাজের অনেকে অন্তত তখনকার কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত সেদিকে ধাবিত হচ্ছিল। মনে হয়েছিলো তাদের উপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধিতা আর ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। 'হেয়ার' মিউজিক্যাল নাটকে যেমন তখন চলমান একটি সাব-কালচারের মূর্তিমান প্রতিফলন দেখেছি, তেমনি ওই সময় নিউয়র্কে একটি ডকুমেন্টারি সিনেমা দেখেছিলাম তাতেও চলমান ওই সাব-কালচারেরই আর একটি দিক উঠে এসেছে—এটি হলো 'উডস্টক'। এক বছর আগে ১৯৬৯ তে নিউয়র্ক ষ্টেটের বেথেল নামের জায়গার বিস্তীর্ণ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তিন দিন ব্যাপী চার লক্ষ হিপ্পি সহানুভূতিশীল তরুণ তরুণীর উডস্টক মিউজিক ফ্যাস্টিভাল। ভিয়েতনাম

যুদ্ধ বিরোধী, বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী এবং নব্য পপ সংগীত প্রেমিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনটি দিন ওরা সংগীতে মাতোয়ারা হয়ে আন্দোলনের মূলসুরকে তুঙ্গে তুলে ধরেছিলো—দিন রাত ওখানেই কাটিয়েছে, শোনেছে, গেয়েছে, নেচেছে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করেছে। হিপ্পি, হিপ্পিধর্মী, হিপ্পি-সহানুভূতিশীল যেই বড় বড় গায়ক ও সংগীতগোষ্ঠীর নাম সে সময় তুঙ্গে ছিলো, তাদের অনেকেই সেখানে অনেকগুলো করে গান গেয়েছেন। তার মধ্যে ছিলেন জিমি হেনড্রিক্স, জোয়ান বায়েজ, রিচি হাভেন্স, মেলানি, সান্‌তানা, রবি শংকর এবং আরো অনেকে। উডস্টক সিনেমাটি দেখে একটি ধারণা পেয়েছি যে কী বিশাল আয়োজন ছিল এটি, আর কত সহজ ভাবে, কত শান্তিপূর্ণ, অথচ কত আবেগ ও উচ্ছাসের সঙ্গে চার লক্ষ তরুণ তরুণী সংগীতের জগতে মাতোয়ারা হয়ে ছিলো। ওখানকার ব্যতিক্রমী আবহ, ওখানকার নব সংগীতের কথা ও সুর; ওখানকার যাবতীয় ঘোষণা; ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বর্ণবৈষম্য, পুঁজিবাদ, মার্কিন কপট রাজনীতি, পোষাকী সমাজ, সব কিছুর বিরুদ্ধে ওখানকার প্রতিবাদী আওয়াজ এসব তিনদিন ধরে চলেছে চার লক্ষ ছন্নছাড়া দেখতে তরুণ তরুণীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ভাবে—যেন সেই হিপ্পি সম্ভাষণের কথাটিই তারা বলতে চেয়েছে 'পীস ম্যান পীস'।

আমাদের আমেরিকায় যাওয়া সেই সত্তর সালে আর যে দু'জন বিখ্যাত মানুষ প্রতিবাদী গানে গানে অবস্থান ধর্মঘটে (যাঁকে তাঁরা বলতেন বেড-ইন) ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন পপগোষ্ঠী বীটলদের একজন জন লেনন এবং তাঁর জাপানি স্ত্রী ইউকো ওনো। তাঁদের বিখ্যাত গান 'অল উই আর সেইং ইজ গিভ পীস এ চান্স' (আমরা শুধু এটুকুই বলছি, শান্তিকে একটু সুযোগ দাও) তখন লোকের মুখে মুখে। উনসত্তর সালে রচিত এই গান ইতোমধ্যে আর গান থাকেনি, হয়ে পড়েছিলো প্রতিবাদী তরুণ তরুণীদের সাধারণ শ্লোগান। যেখানেই তারা প্রতিবাদ সমাবেশে একত্র হয়েছে—দুলে দুলে মন্ত্রের মত বার বার অনেক বার বলতে থেকেছে—'অল উই আর সে-ইং, ইজ গিভ পীস এ চান্স'। ১৯৭০ এর সেই আগস্টে আমেরিকার সর্বত্র অনেকগুলো কলেজ ক্যাম্পাস কিন্তু অশান্ত ছিলো। ভিয়েতনাম যুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে তরুণদের যোগ দেবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখন চরমে উঠেছিলো। এর একটি বড় কারণ মাত্র কয়েক মাস আগে মে মাসের চার তারিখ ওহাইয়োর কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে নিরস্ত্র ছাত্রদের একটি যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশে ওহাইয়ো ন্যাশনাল গার্ড গুলি বর্ষণ করেছিলো। মাত্র ১৩ সেকেন্ডে গার্ডরা ৬৭ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছিল—মোট চার জন ছাত্র নিহত ও নয় জন আহত হয়। নিহত ছাত্রদের দু'জন ওই সমাবেশে ছিলো, বাকি দু'জন তখন এক ক্লাসের থেকে অন্য ক্লাসে যাচ্ছিল। এ ঘটনার আগেপরে আমেরিকার আরো বেশ কিছু ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশের উপর নৃশংস আক্রমণ হয়েছে, যেমন নিউ মেক্সিকো ইউনিভার্সিটিতে এরকম সমাবেশে ন্যাশনাল গার্ডের বেয়নেট চার্জে ১১ জন ছাত্র

গুরুতর আহত হয়। মে থেকে আগস্ট সারা দেশে ক্যাম্পাসগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল—প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ ঘটনার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন ইত্যাদি গঠন করে নিস্তার পাননি—তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন সহকারীর মতে খোদ ওয়াশিংটনেই আন্দোলন এমন উত্তাল হয়েছিলো যে নিক্সন প্রশাসন একে আন্দোলন হিসেবে দেখেনি—গৃহযুদ্ধ হিসেবে দেখে সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। নিরাপত্তার খাতিরে প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউস থেকে ক্যাম্প ডেভিডে সাময়িক ভাবে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। প্রশাসনিক ভবনকে রক্ষা করার জন্য একটি প্যারাট্রুপার বাহিনী এই অফিসের নিচেই পূর্ণ সামরিক কায়দায় পজিশন নিয়ে রেখেছিলো। নিউইয়র্ক ইউনির্ভাসিটির সামনে একটি বিরাট ব্যানার বহুদিন টাঙ্গানো ছিল যা আন্দোলনকারীদের আসল বক্তব্যটিই তুলে ধরেছিলো 'দে কান্ট কিল আস অল্'।

এসব উত্তেজনাকর সব ঘটনা আমরা টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকায় দেখছিলাম বটে—কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমাদের আমেরিকা ভ্রমণ এতে পণ্ড হয়ে গেছে। আমরা বরং ইউনূস ভাইয়ের সেই ফোক্সভাগন বীটলে করে ম্যাপ ধরে ধরে আমেরিকা চষে বেড়িয়েছি, আর নবাগতের চোখে ওদেশের মানুষের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে চমৎকৃত হয়েছি। যেই দক্ষিণে সব চেয়ে বেশি ঘুরলাম, সেখানকার বর্ণবাদ ইত্যাদির বাজে ঐতিহ্য ও তার অবশিষ্টাংশ নিয়ে এতো কথা বলল, দেখলাম ওখানকার মানুষই সব চেয়ে বেশি অতিথিপরায়ণ এবং চমৎকার বিনয়ী আচরণের। এর অনেকটা গুণ আমেরিকার অন্যান্য জায়গায়ও কমবেশি দেখেছি, কিন্তু এসবে দক্ষিণের কোন জুড়ি নেই। নিজের চেয়ে একটু বেশি বয়সের মানুষ হলেই সে যেই হোকনা কেন, যতই অপরিচিত হোক না কেন স্যার অথবা ম্যাম এই সম্বোধনেই তার সঙ্গে কথা বলবে। পেট্রোল স্টেশনে (ওখানকার ভাষায় গ্যাস স্টেশন) থামলেই ওখানে কাজ করা ছেলে বা তরুণরা যথারীতি লেগে যাচ্ছে গাড়ির উইন্ডশীল্ড, জানালা ইত্যাদির কাচ একেবারে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দেয়ার কাজে। এটি সৌজন্যমূলক কাজ, এর জন্য কোন মজুরি চাইবেনা; ইতোমধ্যে অন্য কেউ জিজ্ঞেস করছে কতখানি পেট্রোল দেবে। ইউনূস ভাইয়ের মুখে (আর বাকি সব মোটরিস্টের মুখে) এ প্রশ্নের শুধু দুটি বিকল্প উত্তরই শুনতে পেয়েছি—হয়তো বলছেন 'ফিল হার আপ' (পুরো ট্যাংক ভরে দাও), অথবা 'ডলার-ওয়ার্থ' (এক ডলারে যত তেল পাওয়া যায় তাই দাও)। হায় ওই সার্ভিস, পেট্রোলের ওই সস্তা দাম, এখন আর নেই। সব কিছু চলতো খুব আন্তরিকতার মধ্যে—যারা মুছছিলো আর যারা পেট্রোল দিচ্ছিলো একই সঙ্গে তারা নানা সৌজন্যমূলক ছোট ছোট আলাপও চালিয়ে যাচ্ছিলো—কোনদিকে যাবো, সামনে রেষ্টিং প্লেইস বা মোটেলের অবস্থান কত দূর, এদিকটা কেমন লাগছে ইত্যাদি। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে এমনি আলাপটিও এখানকার কালচারের অংশ—যা ইউরোপে দেখিনি, বৃটেনে তো নয়ই। ছোট বড় যে কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসা মাত্র, খাবার সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে প্রথমেই প্রত্যেকের জন্য টেবিলে রেখে যাবে বড় বড় গ্লাসে বরফ দেয়া পানি। এটি আমাদের দেশের

মতোই সৌজন্য হলেও ইউরোপে পানি চেয়েও পাওয়া যায়না, কিনে খেতে হয়। ডীপ সাউথের জীবনধারা মনে হলো তুলনামূলক ভাবে শান্ত সমাহিত, গরমের ও আর্দ্রতার আবহাওয়া আমাদের মতো অলস দুপুর এখানেও যেন ঝিমুনি সৃষ্টি করে। বাড়িগুলো বড় গেরস্ত বাড়ির মত—প্রত্যেকটিতে সামনে বিশাল বারান্দা, উঠোন ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে ওই বারান্দায় রয়েছে বড় একটি কাঠের হেলানওয়ালা কাঠের বেঞ্চ, তবে তা দোলনার মতো ঝোলানো। ওতে হয়তো একটু একটু দুলতে দুলতে ঝিমুচ্ছে কোন বয়স্ক মানুষ।

মোটর গাড়ির সঙ্গে আমেরিকানের আত্মার সম্পর্ক, কখনো মনে হয় গাড়িটি তার বাড়ির, এমনকি শরীরের বোধ হয় একটি বর্ধিতাংশ। দস্তুর মতো আমরাও অনেক সময় খাবারের জন্য আর গাড়ি থেকে নামছিলামনা। অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান এবং রেস্টুরেন্ট আছে যার সামনের গাড়ির জায়গায় গাড়ি গেলে সামনেই একজন পরিচারিকা খুবই বিনয়ের সঙ্গে হাতে কাগজ কলম নিয়ে এসে অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে চলন্ত গাড়িতে বসে খাওয়ার এবং পান করার উপযুক্ত (গরম বা ঠাণ্ডা যাই হোক) পাত্রে তা দিয়ে যাচ্ছে, টাকা নিয়ে যাচ্ছে। ফাস্ট ফুডের রাজত্ব তখনই আমেরিকায় যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে, যদিও এখনকার মতো এতোটা নয়। আর ম্যাগডোনাল্ডসের মত একই কোম্পানির শত দোকানের চলও হয়েছে—সে সময় প্রত্যেকটি ম্যাগডোনাল্ডস দোকানের উপর বিরাট করে লেখা থাকতো 'ওয়ান মিলিয়ন হ্যামবার্গার সোল্ড'। তখন সবে এর শুরু মাত্র; আর কিছুটা পুরোনো ছিল সেই একই কর্নেল স্যান্ডার্সের ছবি বা মূর্তি সম্বলিত কেনটাকি ফ্রাইড চিকেন (কে এফ সি)। এরকম পরিচিত সব খাবার দোকানের আর পরিচিত সব অন্যান্য বড় কোম্পানির বিলবোর্ডে হাজার হাজার মাইল চলে যাওয়া হাইওয়ের দুই পাশ আকীর্ণ করে রেখে তার প্রাকৃতিক দৃশ্য ঢেকে দেয়ার অভ্যাস তখন কিছুটা শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

এসব কৃত্রিম জিনিস সত্ত্বেও সেই ন্যাশভিল থেকে রওয়ানা হয়ে দক্ষিণের নানা রাজ্য তারপর উত্তর পূর্বে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি হয়ে উত্তরের নানা অঙ্গরাজ্য পাড়ি দিয়ে একেবারে কলোরাডোতে রকি মাউন্টেন পার্ক; সেখান থেকে আবার ফিরতি পথে বহু হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে লন্ডনের বিমান ধরার জন্য নিউইয়র্কে ফেরা—এর মধ্যে আমেরিকার বহু বিচিত্র প্রায় সকল রকমের ভূগোল দেখা হয়ে গেছে। সীমাহীন সমতল প্রান্তরের কৃষি-সমৃদ্ধ অঞ্চল মিডওয়েস্ট থেকে রকি পার্বত্য অঞ্চল, ফ্লোরিডার পেন্সাকোলার কাছে মেক্সিকো উপসাগরের সমুদ্র, সবই দেখা হলো। বাকি রইলো শুধু পশ্চিমের মরুভূমি, লবণহ্রদ এবং কালিফোর্নিয়া প্রশান্ত সাগরতীর, সময়ের অভাবে আর ওদিকে এগোনো গেলোনা। এর মধ্যে কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়ে গেলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত। সে আমলে আমেরিকা জুড়ে বাঙালিদের বসত ছিলনা যে যেখানে যাব সেখানেই পরিচিত কাউকে না কাউকে পাব। তবুও কেন জানি তারেক আলী ও ফৌজিয়ার কথা মনে পড়লো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় উভয়ে আমার

সহকর্মী ছিলো, এখন আমেরিকায় কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে—কোনটিতে তা আমার জানা ছিলোনা। আমেরিকায় অবশ্য তা নিয়ে কোন অসুবিধা নেই—যে বিরাট বিরাট বালামের টেলিফোন ডাইরেক্টরি রয়েছে তাতে অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী দেশের সব মানুষের ফোন নম্বর আছে। ওখানে তারেক আলী এই নামে বেশি মানুষ ছিলোনা (সে সময় কম থাকারই কথা), ফলে সহজেই ওদের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে সোৎসাহ নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম, আর আমরাও দিক পরিবর্তন করে চললাম নিউইয়র্ক স্টেটের একেবারে উত্তর প্রান্তে রচেষ্টার শহরে ওদের বাড়িতে। ওখানে দারুণ কাটলো—ফৌজিয়ারা পুরো এলাকা ঘুরে দেখালো, এখানে ফটোগ্রাফি ও রসায়ন শিল্পের বিখ্যাত বড় কোম্পানি কোডাকের হেডকোয়ার্টার তাও দেখলাম; আর তারপর কাছেই নায়াগ্রা জলপ্রপাত, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে দেখা। জলপ্রপাতের ওই দিকটা কানাডা, ওখান থেকে নাকি আরো ভাল দেখা যায়।

চারদিক ঘুরে একটি জিনিস বুঝলাম আমরা যে কথায় কথায় আমেরিকার কথা বলি, আমেরিকা কিন্তু একটি নয়। দক্ষিণ, উত্তরপূর্ব, মধ্য-পশ্চিম, পার্বত্য পশ্চিম—এসবে দুস্তর পার্থক্য, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল অনেক দূর—স্থানের দিক থেকেও, মন-মানসিকতার দিক থেকেও। এক জায়গার মানুষ যে অন্য জায়গায় সে সময় খুব বেশি যেতো তাও নয়। নানা জায়গায় এমন অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—যারা জীবনে নিউইয়র্ক যায়নি, সেখানকার ভাবসাব কী রকম তার খবরও রাখেনা। এটি আরো বুঝলাম যখন দেখলাম ইনটারস্টেট হাইওয়ে ধরে যখন উত্তরের নানা জায়গায় যাচ্ছি তখন হঠাৎ হঠাৎ করে আশপাশের অন্য কোন গাড়ির হর্ন বাজানো শুনে। প্রথমে বুঝতেই পারছিলামনা যে কী এমন হলো যে কেউ হর্ন বাজাচ্ছে। এদের এখানে হর্ন বাজানোরতো কোন চল নেই, কেউ যদি আমাদের কাছে এসে বাজায় তা হলে বুঝতে হবে খুব বড় ধরনের কোন ট্রাফিক-অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু ইউনূস ভাই বুঝিয়ে দিলেন আমাদের প্রতি এই হর্ন বাজানোগুলো আসছে সব টেনেসি অথবা কাছাকাছি ষ্টেটের নম্বর প্লেট লাগানো গাড়ির থেকে, যেমনটি আমাদের নম্বর প্লেটটিও। এত দূরের বিজাতীয় জায়গায় বিরল দেশী মানুষের দেখা মিলেছে বলে আনন্দের এই সম্ভাষণ জানাচ্ছে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে যেন বলছে 'কী খবর দেশী?'। প্রত্যুত্তরে আমরাও হর্ন বাজাতাম।

আমেরিকানদের কথাবার্তা থেকেও তাদের আঞ্চলিক দূরত্বগুলো ধরা পড়ে। যেমন নিউয়র্কে এক দোকানে কিছু কেনাকাটা করে দাম দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, শুনছিলাম পেছনে দু'জন কথা বলছে একজন টেক্সাসের মানুষ, অন্যজন স্থানীয় মানুষ, নিউইয়র্কের। টেক্সাসের মানুষটি টেক্সাস অঞ্চলের বর্ণনা দিচ্ছে যেন কোন এক রূপকথার রাজ্যের কথা বলছে—মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ খালি জমি, মাঝে মাঝে বাড়িঘর—রাস্তা সবই বিশাল বিশাল দশাসই; এর মধ্যে হাজার হাজার গরুর খামার ক্যাটেল র‍্যাঞ্চ, চারদিকে সব মানুষের দারুণ প্রাচুর্য, দেদার খাবার দাবার ইত্যাদি। হয়তো বেশ বাড়িয়েই বলছিলো, কিন্তু নিউইয়র্কবাসী সেভাবে নিচ্ছিলেন না; তিনি অবাক বিস্ময় প্রকাশ করে আরো

জানতে চাচ্ছিলেন। মনে হলো আমেরিকার এক অঞ্চলের মানুষের জন্য অন্য অঞ্চল তখন বেশ একটি অজানা রাজ্য।

সেবার নিউইয়র্কে গেলে শহরটি আরো মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। এখানে প্রথম বারের মত আমার দেখা হলো মণির মেজভাই ইমাম হোসেনের সঙ্গে। তিনি ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে কানাডায় চলে গিয়েছিলেন পিএইচডি করতে। সেটি করে এখন নিউইয়র্কবাসী। নিউইয়র্কে তাই একটু বৃহত্তর পারিবারিক মিলন হলো। ইমাম হোসেন তখন আমেরিকায় জীবন সংগ্রাম শুরু করছেন মাত্র, একজন সেতু বিশেষজ্ঞ তরুণ প্রকৌশলী হিসেবে এবং একই সঙ্গে একজন পেশাদার পারফরমিং ম্যাজিশিয়ান হিসেব (ঢাকা থেকে তাঁর যে চর্চা ছিল)। এর পরের চল্লিশ বছরে একজন বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে এই উভয় বিষয়ে তিনি সে দেশে সাফল্যের তুঙ্গে উঠেছিলেন; তাঁর কোম্পানির হয়ে দেশে বিদেশে বিখ্যাত সব সেতু নির্মাণ করেছেন, আবার আমেরিকান ম্যাজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন মধ্যমণি হয়ে সংক্ষেপে ইমাম নামে খ্যাত হয়েছেন (সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুতে এই অ্যাসোসিয়েশন নানা ভাবে শোক প্রকাশ করেছে)।

চমৎকার একটি মাস আমেরিকায় কাটিয়ে ঠিক নিউইয়র্ক জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের একেবারে কাছাকাছি এসে একটি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা দেখতে হলো। দেখলাম বিশাল একটি বিমান রানওয়েতে নামার অল্প কয়েক শত ফুট মাত্র ওপরে থাকতেই হঠাৎ করে এক পাশে হেলে পড়লো, মনে হলো আবার সোজা হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা করতে করতেই এটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ওঠে আগুনে আর ধোঁয়ায় পুরো জায়গাটি আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমরা এটি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এয়ারপোর্টের ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর লোকমুখে শোনলাম এ দুর্ঘটনায় বিমানের কেউ বাঁচেনি, তবে এতে কোন যাত্রী ছিলোনা, টরেন্টো থেকে শুধু চালকরা আর বিমানবালাদের (মোট ছয় জন) নিয়ে নিউইয়র্কে আসছিলো যাত্রী নিয়ে রওয়ানা হবার জন্য। এরপর আমরা যখন সেই স্টুডেন্ট ফ্লাইটে এ্যারোলিঙ্গাসের বিমানে লন্ডনে ফিরছিলাম—ছাত্রদের হৈচৈ মোটেই ছিলনা, ছিল খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত পরিবেশ, এই দুর্ঘটনার কারণে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নিজেদের ছয় ছয় জন সহকর্মীকে এভাবে প্রাণ দিতে দেখে আমাদের বিমানের বিমানবালারা অত্যন্ত বিমর্ষ ছিল, আমরাও সে দুঃখে শরিক হলাম।

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ

প্রবাস থেকে দেশের ঘটনাবলী

১৯৬৮এর সেপ্টম্বর সাউদাম্পাটনে চলে যাওয়ার পর দেশের পরিবেশ ও ঘটনাবলীর আবহ থেকে হঠাৎ দূরে সরে গেলাম। ছিলাম সবকিছুর বেশ কাছাকাছি—ঘটনার অনেকটা যেখানে ঘটছিলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই হল, সেই শিক্ষক ক্লাবে; অথচ এখন সে সব কত দূরে। মাঝে দু'টি সপ্তাহ দেশে কাটিয়ে ঊনসত্তরের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন মণিসহ দ্বিতীয়বার ঢাকা ছাড়লাম ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে গণ অসন্তোষের বারুদে আগুন লেগে গেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে ক্ষোভ দারুণ দানা বাঁধছিলো। ছাত্রদের বড় দলগুলো সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছে, ক্রমে তারাই আন্দোলনের প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠেছিলো।

জানুয়ারির একেবারে শুরুতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগার দফা দিলে তা ছয় দফার সঙ্গে যোগ হয়ে আন্দোলন দ্রুত অনেক বেশি বেগবান হয়েছিল। অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন একে একটি বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক রূপ দিলো। ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের আসাদ এবং ২৪ জানুয়ারি স্কুল ছাত্র মতিউর মিছিলে নিহত হলো। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় খুন করা হলো (পালাচ্ছিলেন এই অপবাদ দিয়ে), ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিলের ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রক্টর ড. শামুজ্জোহা মিলিটারি বেয়নেটে নিহত হলেন।

পরপর এসব আঘাত আন্দোলনকে এমন উত্তাল করে তুললো যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হলো। অভূতপূর্ব গণ সংবর্ধনায় ছাত্ররা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিলো। আইয়ুবের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিলো; রাজনীতিবিদদের গোলটেবিল বৈঠক সফল না হওয়াতে তিনি

পদত্যাগ করে সেনা-প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসন ভার তুলে দিলেন। দেশ দ্বিতীয়বারের মত মার্শাল ল'র অধীনে চলে গেলো; তবে ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি হলো ১৯৭০ সালের শেষের দিকে প্রথম বারের মত সরাসরি নির্বাচিত গণপরিষদের নির্বাচন হবে—যে গণপরিষদ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করবে। এত সব চাঞ্চল্যকর খবর—অথচ প্রবাসে এসব খবর আমরা দ্রুত পাচ্ছিলাম না। মিডিয়া জগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন এখনকার মতো ছিলোনা। বৃটেনের পত্রিকায় খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোই শুধু আসতো—তাও ছোট করে। টেলিভিশনে আসতো খুবই কালেভদ্রে, তাও শুধু চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগুলো; যেমন দুই একবার দেখানো হলো আন্দোলকারীরা কেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে বাসে-ট্রেনে আগুন জ্বালিয়ে, এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে সম্পত্তি ধ্বংস করছে। কিন্তু পুলিশের গুলিতে মানুষ হতাহত হবার খবর কখনো কখনো দিলেও তার কোন চিত্র দিতে পারেনি। আসলে আন্দোলনের খবর থাকতোই ছিটেফোটা, মিডিয়াগুলো এখনকার মত এমন বৈশ্বিক হয়ে ওঠতে পারেনি; আইয়ুব খান পদত্যাগ করেছে, দেশে মার্শাল ল' হয়েছে—এরকম বড় বড় ঘটনাগুলোই শুধু লন্ডন টাইমস বা টেলিগ্রাফে খবর হতো; খুঁটিনাটি বিষয় মিডিয়া থেকে জানার খুব একটা উপায় ছিলনা—লোকমুখে বা চিঠিতেই কিছুটা বিস্তৃত পেতাম। লোকমুখে খবরগুলো প্রধানত লন্ডনে থাকা বন্ধুদের কাছ থেকেই পেতাম, সাউদাম্পটনে দেশের মানুষ সে রকম বেশি ছিলনা, যাও ছিল তাদের রাজনীতি সম্পৃক্ততা ছিল কম।

খবরের অভাব মেটাবার জন্য অন্য অনেক বাংলাদেশীর মতো আমিও একটি বিশেষ রেডিও কিনেছিলাম লন্ডন থেকে। এটি রাশিয়ার তৈরি একটি শক্তিশালী রেডিয়ো, রাশিয়ায় নির্মিত বলেই যার দাম কিন্তু খুব বেশি ছিলোনা। এতে শর্ট ওয়েভ রিসেপশান এতো ভাল ছিল যে সাউদাম্পটনে বসে ঢাকা রেডিয়ো স্টেশনে বেশ ভাল শুনতে পারতাম। কিন্তু সে স্টেশনে শুধু সরকারী খবর পাওয়া যেতো—তার থেকেই অবশ্য ঘটনার কিছু কিছু আলামত আঁচ করা যেতো এবং অন্য ভাবে সেগুলো জানার চেষ্টা করতে পারতাম।

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকায় খুব রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম—বলতে গেলে আন্দোলনের চাবিকাঠি যে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজের কাছে চলে গিয়েছিলো তাতে খুব আশান্বিত হয়েছিলাম। ডাকসুর ভিপি হিসেবে এর নেতৃত্বে তোফায়েল আহমদের কথা তখনই শুনি; আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সময়টিতেও ওখানে ছাত্র রাজনীতিতে থাকা তোফায়েলের সঙ্গে কেন জানি তখন পরিচয় হয়নি। তবে উনসত্তরের অভ্যুত্থানে মাহবুবউল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের খবরও পেয়েছিলাম, যেমনটি পেয়েছিলাম ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আরো অনেকের অংশগ্রহণের কথা। তখন ছাত্রদের নেতৃত্ব যে কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিলো প্রবীণ মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিমের (এক সময় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, আদি বাড়ি পশ্চিম

বঙ্গের বর্ধমান, উনসত্তরে 'ডাকের' গুরুত্বপূর্ণ নেতা) একটি কথা লোকমুখে শুনে তা কিছুটা আঁচ করেছিলাম, তিনি এক বক্তৃতায় বলছিলেন—'আমার নেতা এখন তোফায়েল।' পরের বছর যখন আমেরিকা গিয়েছি ন্যাশভিলে ইউনূস ভাই এবং ওখানকার আরো কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে উনসত্তরের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করছিলাম। ওখানে কারো কারো মনে হয়েছিলো সেটি দেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মুহূর্ত ছিলো। হয়তো আইয়ুব খানকে আর একটি মার্শাল ল'র হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সুযোগ না দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উচিত ছিলো জনগণের পক্ষ থেকে ক্ষমতা নিজেদের অর্থাৎ আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে নেয়া। কেউ কেউ পরিস্থিতিটাকে তুলনা করলেন বৈপ্লবিক সুযোগ সৃষ্টি হবার মুখে লেনিনের সেই 'অল পাওয়ার টু দি সোভিয়েত' এমন ঘোষণা করে বিপ্লব শুরু করার সঙ্গে। আমি নিজে কিন্তু সন্দিহান ছিলাম, নিজেদের ছাত্র আন্দোলনকে যতখানি দেখেছি তাতে সেটি অতখানি ঐক্যবদ্ধ ও বৈপ্লবিক হবে এমন আশা করিনি। কিন্তু হয়তো তাঁরাই ঠিক, আমার চিন্তাই ভুল; উনসত্তর সাল আমার দেখা ছাত্র নেতৃত্বকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো তা হয়তো আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনগুলো

সত্তরের একেবারে শেষে এসে ঘূর্ণিঝড় ও জল-প্লাবন এবং নির্বাচন আমাদের প্রবাস জীবনকে আবার বড় নাড়া দিয়েছিলো—অবশ্য দুটি দু'ভাবে। উনিশশ' ষাটের চট্টগ্রাম ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে এরকম দুর্যোগের পরিণতির সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিন্তু সত্তর সালে যা ঘটলো তা আমাদের দেশের সকল দুর্যোগকে তো বটেই, সারা বিশ্বের লিখিত ইতিহাসে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও ছাড়িয়ে গেল; মনে করা হয় তিন থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনহানি হয়েছিলো দক্ষিণ বঙ্গে—যার প্রকৃত সংখ্যা কোনদিন জানা যাবেনা। এবার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিস্তারিত খবর এলো। দুর্যোগ পরবর্তী ধ্বংসলীলার খবর ও ছবি তো এলোই, পরবর্তী ত্রাণ কার্যেরও কিছু কিছু খবর এলো; আর এলো ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের এ সম্পর্কে চরম উদাসীনতা ও ব্যর্থতার খবর। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি দেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটিও কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে; তা ছাড়া বিদেশী ত্রাণদাতারাও সরকারের এই মনোভাব নিয়ে দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

এমন ধ্বংসলীলার ঠিক পরেপরেই ছিলো নির্বাচনের তারিখ। এত বড় প্রলয়ংকরী ঘটনা ও অসংখ্য মানুষের এমন দুর্দশার মধ্যে নির্বাচন হওয়া ঠিক হবে কি হবেনা এ নিয়ে নানা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতান্তরের খবর পাচ্ছিলাম। এটি ছাড়া আমার আরো সংশয়ের কারণ ছিল ইয়াইয়া সরকার নির্বাচনের জন্য লীগাল ফ্রেইম ওয়ার্ক (এল এফ ও) নামের যে আটঘাঁট বেঁধে

দিয়েছিলো সেটি। এর ফলে বড় দলগুলো তাদের জনপ্রিয় বক্তব্য নিয়ে মানুষের কাছে যেতে পারবে কিনা এমন সন্দেহ হবার কারণ ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো আমাদের সব সংশয় মিথ্যা প্রমাণ করে যথাসময়ে নির্বাচন হলো এবং তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ একেবারে বিপরীতমুখী রায় দিলো প্রায় নিরঙ্কুশ ভাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবাই প্রায় একযোগে ছয়দফার পক্ষে ভোট দিলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ফলাফল বলে দিচ্ছিলো যে দেশব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠের ম্যান্ডেট ছয়দফার পক্ষে হলেও এর বাস্তবায়নের পথ মসৃণ হবেনা। একাত্তরের মার্চের প্রথম দিন সংসদের অধিবেশনের ঘোষিত তারিখ (৩ মার্চ) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব পাকিস্তান যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো, এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে মুহূর্তের মধ্যে তাদের দাবিকে স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে পরিণত করেছিলো সে সংবাদ আমরা ধীরে ধীরে পেয়েছি, এবং তাও এর পুরো তীব্রতাটি সে সময় অনুভব করতে পারিনি।

৩রা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ ঢাকায় বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন, লাগাতার হরতাল এ সবের খবর এখানকার পত্রিকায় কিছু কিছু পাচ্ছিলাম বটে কিন্তু তার থেকে এর পুরো মাত্রাটি বোঝা যাচ্ছিলনা। টেলিভিশনে মাঝে মাঝে বিক্ষোভের চিত্র দেখেছি; ডামি রাইফেল কাঁধে করে তরুণ তরুণীদের মার্চ পাস্টে সালাম নিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান এমন চিত্রও কখনো কখনো দেখানো হয়েছে। এসময় দেশে যা ঘটছিলো বিদেশী মাধ্যমগুলোতে তার খণ্ড চিত্রই শুধু আমরা পাচ্ছিলাম। লোক-মুখে কিছু কিছু শুনছিলাম—কিন্তু কার মুখে সে অনুযায়ী নানা কথায় গরমিল পাচ্ছিলাম। সাতই মার্চের ভাষণের পুরো ধারণা পেতে সময় নিলো। এসময় লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে, হাইড পার্কে বড় বড় বিক্ষোভ হয়েছে। তবে দেশে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর সামরিক বাহিনী যে অনেক জায়গায় গুলি চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে, তার খবর বা ছবি বিদেশী মাধ্যমে তেমন আসেনি। বরং বৃটেনের ইন্ডেপেন্ডেন্ট টেলিভিশন আইটিভিতে এমন কিছু চিত্র খুব দগদগে ভাবে দেখানো হলো যা সাংঘাতিক ভাবে আমাদের বিপক্ষে যায়। বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে দেখা গেলো দেশের কোন এক জায়গায় বেশ কিছু বিহারি ছেলে-যুবক-বুড়োকে একই দড়িতে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কিছু জনতা। তার কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো সেই একই মানুষগুলো রক্ত রঞ্জিত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এ ধরনের দৃশ্য প্রবাসী বাঙালিদেরকে খুবই চিন্তিত করে তুললো, এখানে আন্দোলনের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ওদিকে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের কথা শুনছিলাম—আমার সেই রাশিয়ান রেডিয়োতে ঢাকা বেতারে আলোচনার সরকারী ভাষ্যটি শুনতে পেতাম, অন্যদিকটা জানার তেমন উপায় ছিলনা। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার কোন শেষ ছিলোনা। আব্বার চিঠি পেলাম তাতে চারদিকে খুব সহিংসতার সংবাদ ছিল, বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষের কথা ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কোন বিশ্লেষণ ছিলনা। তিনি বরং খুব উদ্বেগ প্রকাশ

করেছিলেন আমাদের বাসা নিরিবিলির উপরের তলায় উর্দুভাষী ভাড়াটিয়াকে নিয়ে। চট্টগ্রামের বেঙ্গল বেল্টিং কোম্পানির মালিক আমাদের বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ভাড়াটিয়া পরিবার তখন খুব অনিরাপদ বোধ করছিলেন।

ঠিক এ সময় আমাকে দু একদিনের জন্য বৃটিশ ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিসের শরণাপন্ন হতে হলো চোখে একটি সিষ্ট (ছোট ফোড়া) দেখা দেয়ার জন্য। জানানো হয়েছিলো যে এটি অপারেশন করে দূর করতে হবে। এরকম সাধারণ অপারেশনের জন্য—ওয়েটিং লিষ্টটি খুব লম্বা হতো। পঁচিশে মার্চের কালরাতের খবর যখন কিছু কিছু পেতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার একটি চোখ ব্যান্ডেজ করা।

পঁচিশে মার্চ রাতে কী হয়েছিলো তা প্রথম পরোক্ষভাবে কিছুটা আঁচ করতে পারলাম পরের দিন ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনে। আমার রাশিয়ান রেডিয়োটিতে ঢাকা বেতারে পুরো বক্তৃতাটি শোনলাম। যেভাবে ভীষণ রাগত কণ্ঠে তিনি বলছিলেন "দি ম্যান অ্যান্ড দি পার্টি (শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ) আর ট্রেইটরস টু দি কান্ট্রি"—তখনই বুঝেছিলাম ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে। এরপর যখন ঢাকা থেকে ফিরে করাচি গিয়ে ভুট্টোর 'থ্যাংক গড, পাকিস্তান হ্যাজ বিন সেইভ্ড' বক্তব্যটি রেডিয়ো সংবাদে শোনলাম তখন সন্দেহটি আরো ঘনীভূত হলো। আমার রেডিয়োতে চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কিছু ধরতে পারিনি, কিন্তু পরদিনই এর খবর এবং এতে মেজর জিয়া বলে একজন বাঙালি সামরিক অফিসারের ঘোষণার কথা লন্ডনের বন্ধুদের কাছে জানতে পারলাম—তারা অনেকে নাকি এটি শুনেছে। খুব সম্ভব সমুদ্রে থাকা কোন বিদেশী জাহাজে শোনার পর কয়েকটি বিদেশী রেডিয়ো স্টেশন তাদের আন্তর্জাতিক ব্রডকাষ্টে এটি সম্প্রচার করেছিলো। এটি এমন চাঞ্চল্যকর ছিলো যে বৃটেনের পত্রিকায়ও এটি এসেছিলো। এভাবে আমরা যা জানতে পারলাম একজন মেজর জিয়া, মতান্তরে 'জিয়া খান' নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এরপর এ নিয়ে নানা রকম কথা শুনতে পাচ্ছিলাম এলোমেলো ভাবে—একটার সঙ্গে একটার মিল নেই। এক ভাষ্যে শোনলাম জিয়া আসলে এক 'হিন্দু বিপ্লবী'র ছদ্মনাম। তবে এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ওই রেডিওতেই আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যা আমরা পরে শুনেছি। সে যাই হোক, একাক্রমে শুধু রেডিয়ো পাকিস্তানের 'সব বিশ্বাসঘাতকদেরকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছি' এরকম ভাষ্যের মধ্যে এই খবরটি প্রতিরোধের একটি আভাস অন্তত নিয়ে এসে খুব শান্তি দিয়েছিলো। তাছাড়া মনটি খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যখন খুব সম্ভব ২৭ মার্চের বৃটেনের বড় বড় বিভিন্ন পত্রিকায় পাকিস্তান বার্তা সংস্থার পাঠানো একই ছবি ছাপানো হয়েছিলো—করাচি এয়ারপোর্টে দু'জন পুলিশ অফিসার দুপাশে দাঁড়ানো এবং গ্রেফতারকৃত শেখ মুজিব একটি সোফায় উপবিষ্ট, তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

২৫ শে মার্চ কাল রাতের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পেলাম ৩০ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিরাট করে দেয়া একটি রিপোর্টে—এটি লিখেছেন তরুণ বৃটিশ

সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। অসহযোগ আন্দোলন এবং ইয়াইয়া-মুজিব বৈঠকের শেষের দিকে ঢাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন অনেক বিদেশী সাংবাদিক, সবাই থাকতেন ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলে। তাঁদেরই একজন ছিলেন সাইমন ড্রিং। তাঁর রিপোর্ট থেকে জানলাল ২৫ শে মার্চের রাতে এই প্রায় ২০০ জন সাংবাদিককে হোটেলে আটকে রাখা হয়েছিলো এবং পরের দিন দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সাইমন ড্রিং হোটেলের রান্নাঘর ইত্যাদি নানা জায়গায় লুকিয়ে থাকেন। ২৭ মার্চ কারফিউ সাময়িক ভাবে তুলে নেয়া হলে তিনি লুকিয়ে শহরে বের হয়ে পড়েন ও ২৫ মার্চ রাতের ও পরের হত্যাযজ্ঞের তখনো তরতাজা আলামতগুলো দেখে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো (ইকবাল হল, জগন্নাথ হল), রাজার বাগ পুলিশ লাইন এবং পুরোনো ঢাকার কোন কোন জায়গায় গিয়ে সরাসরি দেখে এ খবর সংগ্রহ করেন। বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরাও হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতার একটি সার্বিক চিত্র পেলাম। এর মধ্যে অবশ্য খণ্ড খণ্ড খবর পেতে আরম্ভ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। নিরস্ত্র মানুষের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই রাতের পরিকল্পিত হত্যা-অভিযান 'অপারেশন সার্চ লাইটের' ভয়াবহতায় আমরা তখন স্তম্ভিত।

কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে থাকার সময় তখন ছিলোনা। একদিকে চেষ্টা করছিলাম লন্ডনের নেতৃস্থানীয় বাঙালি ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, অন্য দিকে সাউদাম্পটন থেকে আমাদের করণীয় স্থির করতে। সাউদাম্পটনে বাঙালি ছাত্র যারা ছিলাম তারা সবাই বুঝতে পারছিলো যে আমাদের বাঁচা-মরার যুদ্ধটি দেশে শুরু হয়েছে। সাউদাম্পটনের বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে যদিও সবাই এই যুদ্ধকে সমান উৎসাহের সঙ্গে নেয়নি, কিন্তু কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করেনি। এ সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সেই পিএইচডি করতে আসা আমীর হোসেন খান (পরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)—কাজেই অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা ব্যবহার করতে পারলাম এর নেতৃত্বে থাকার কারণে। অ্যাসোসিয়েশনের জরুরি প্রতিবাদ সভায় এমনকি আমরা কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিকেও সঙ্গে পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে কথা বল্লাম—আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিবাদ তুলতে তারা কতখানি সাহায্য করতে পারবে তা জানতে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী কী ভাবে নিজের দেশের মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা তুলে ধরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম বটে কিন্তু নিজেরা ভুগছিলাম এক বিরাট শূন্যতায়। কারণ আন্দোলনের নেতাকে দেখেছি গ্রেফতার বরণ করতে—কিন্তু সক্রিয় কোন নেতৃত্ব এখনো গড়ে ওঠতে দেখিনি। মেজর জিয়ার বিদ্রোহের কথা শুনলেও সেদিক থেকে কতটুকু কি দানা বেঁধেছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না।

তবে ছিটোফোটা খবর থেকে এবং লোকমুখে যা জানতে পারছিলাম তাতে বুঝতে পারছিলাম যে এখনো দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেনা বাহিনীর আক্রমণ মুক্ত রয়েছে; ঢাকা থেকে মানুষ গ্রামাঞ্চলের দিকে পালাবার চেষ্টা করছে। যাওয়ার পথে, বিশেষ করে ঢাকার চারদিকে নদীগুলো পার হবার সময় সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিতে বহু মানুষ মারা গিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাউনি থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই পি আর এর সৈন্যরা মুক্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, কোথাও সীমানা অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে একত্র হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে মুজিব নগরে অস্থায়ী সরকার গঠনের খবর না পাওয়া পর্যন্ত এমনি অনিশ্চয়তা ও জল্পনার মধ্যে কাটাতে হয়েছে আমাদেরকে।

এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠনের ও সেক্টরে বিভক্ত মুক্তিবাহিনী সক্রিয় হবার পর থেকে আমাদের কাজের মধ্যেও একটি ধারা আসে। লন্ডনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। সেখানে ছাত্রদের একটি 'স্টুডেন্স অ্যাকশন কমিটি' গঠিত হয়েছে। তারা অন্তত যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বেশি খবর পাচ্ছে। আমার পরিচিতদের মধ্যে এই কমিটিতে খোন্দকার মোশাররফকে (সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র, তখন ছাত্র লীগ নেতা, পরে বি এন পি মন্ত্রী) পেলাম। তা ছাড়া ফিজিক্সের ছাত্র হুজ্জত আলী প্রামাণিককে এর গণসংযোগের দিকে বেশ গুছিয়ে কাজ করতে দেখলাম। মুশকিল হলো পরিচিত নেতৃস্থানীয়দের থেকে সব সময় সঠিক খবরটি পাচ্ছিলামনা, তাঁদের দল বা রাজনৈতিক গ্রুপ অনুযায়ী যার যার মত করে বলার চেষ্টা করছিলেন যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্পর্কে। অনেক সময় নিজের বা নিজেদের দলের যুদ্ধ-অবদান স্পষ্টতই বাড়িয়ে বলছিলেন অনেকে। একজন বললেন এই যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নতুন ট্রান্সমিটারটি, সেটি তো আমরাই চাঁদা করে পাঠালাম। আমার বন্ধু রসায়ন বিভাগের (ফজলুল হক হল) বামপন্থী ছাত্র নেতা শফিউল্লাহ বল্লো আই আর এর সঙ্গে (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, যারা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে সশস্ত্র আন্দোলন করছিলো তখন) একটি বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করেছি, ওরা অস্ত্র সাহায্য পাঠাচ্ছে।

কিছু অতিকথন সত্ত্বেও অন্যদের তৎপরতা ও উৎসাহ আমাকেও উজ্জীবিত করে তুলেছিলো। লন্ডনের এবং মাঞ্চেষ্টার, লীডস, বার্মিংহাম এসব বাঙালি অধ্যুষিত জায়গাগুলোর তাৎক্ষণিক উদ্যোগ দেখে মুগ্ধ হলাম, সাউদাম্পটনেও আমরা আমাদের কাজকে সেভাবে সংহত করার চেষ্টা করলাম। বৃটেনের সর্বত্র তখন 'বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি' গড়ে উঠছে—এটি ছাত্রদের মধ্যে যেমন, তেমন বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, রেস্টুরেন্টের কর্মীদের মধ্যে—সব ক্ষেত্রে হচ্ছিল। সাউদাম্পটনে এই উদ্দেশ্যে আমরা স্থানীয় বাঙালি রেস্টুরেন্ট মালিক ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, কারণ এতদিন আমরা তাঁদের খোঁজ খবর মোটেই রাখিনি—কে কোথায় আছে জানতামওনা; এখন জানতে হলো। তাদেরকে

সচেতন করা ও সংগঠিত করার দরকার ছিল প্রধানত যুদ্ধের জন্য গড়ে উঠা তহবিলে দান পেতে এবং বাংলাদেশের পক্ষে বৃটেনের ও সারা বিশ্বের সমর্থন যোগাড় করতে তাদেরকেও আন্দোলনে নামাতে। ছোট বড় চাকরি করছেন যাঁরা নিজের এক সপ্তাহের বেতন দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, যা অনেকের জন্যই বেশ কষ্টকর ছিলো।

সারা বৃটেনে অনেকগুলো এ্যাকশন কমিটি নানা ভাবে গঠিত হওয়াতে লন্ডনে বিশ্বাসযোগ্য কোন কেন্দ্র সেভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারছিলোনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যেও পরস্পর অনাস্থার ভাব ছিলো। জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী এসে এই অভাবটি কিছু পূরণ করলেন, কারণ ওরকম একজন ব্যক্তিত্বের অভাবে এমন একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি দেখা যাচ্ছিলনা যা শুধু বৃটেনের জন্য নয় পুরো ইউরোপে বাংলাদেশ সংগ্রামের জন্য যার খুব প্রয়োজন ছিল। এবার তহবিল গঠন ও এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ফান্ডটি অনুষ্ঠানিক ভাবে ট্রাষ্ট হিসেবে গঠিত হলো—ট্রাষ্টি বোর্ডে আবু সাঈদ চৌধুরী, ওয়ার অন ওয়ান্টের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড চেস্‌ওয়ার্থ, এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য জন ষ্টোনহাউসকে ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য করে। তাঁরা তিন জনেই যুদ্ধকালীন সময়ে এখানকার সংগঠনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তেমনি আর একজন পার্লামেন্ট সদস্য পীটার শোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি ছাত্রের বাইরেও আমরা যথাসাধ্য অন্যদেরকে আন্দোলনে শরিক করার চেষ্টা করছিলাম। প্রাথমিক ভাবে সব চেয়ে বেশি সহায়তা পেলাম রাজনীতিতে বেশ সক্রিয় ট্রষ্টস্কিপন্থী বাম ধারার ছাত্রদের কাছ থেকে। তারা নিজেরা বেশ সংগঠিত ছিলো, এবং সেসময় তাদের প্রধান বিরোধ ছিল একই সঙ্গে মার্কিনী পুঁজিবাদ ও চীনপন্থী সমাজবাদের সঙ্গে। তারা খুব সহজেই এর সঙ্গে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সামরিক জান্তাকে যোগ করে নিতে পারলো—কারণ তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর সেক্রেটারি অব ষ্টেট কিসিঙ্গার চীন সফর করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছিলেন, আর একাজে দূতিয়ালি করছিলো পাকিস্তান। আমেরিকা ও চীন ইতোমধ্যেই যে তাদের বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছিলো এটিও ছিলো তার একটি কারণ। অতএব সাউদাম্পটন ভিত্তিক আমাদের প্রচার কাজে এই সংগঠিত ট্রটস্কীপন্থী ইংরেজ ছেলেমেয়েরা খুব কাজে এলো। এর প্রথম বড় প্রকাশ ঘটলো মে মাসের প্রথম দিন মে দিবসে তারা লন্ডনে যে শ্রমিক সমাবেশ করে তাতে বাংলাদেশ সংগ্রামকে মূল সুর করার অঙ্গীকার করে। কয়েকটা বাসে আমরা বাঙালিরা, এবং ট্রটস্কাইট ও অন্য কিছু ছাত্র সেদিন ভোরে লন্ডন রওয়ানা হলাম। ওদের কারণে 'রিকগনাইজ, বাংলাদেশ' ছাড়া এদলের আর একটি প্রধান শ্লোগান হয়ে দাঁড়ালো 'মাও, নিক্সন, ইয়াহিয়া খান—আউট আউট'। সেদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে সারা বৃটেন থেকে আসা বিশাল সংখ্যক বাঙালি ও তাদের বন্ধুদের সমাবেশ ঘটেছিলো বিশ্ববাসীর বিবেককে জাগ্রত করানোর চেষ্টায়। এই প্রথম বাংলাদেশের নতুন

পতাকা এত সংখ্যায় এবং এতো বর্ণাঢ্যতায় দেখলাম। সমাবেশ উপলক্ষে গিয়ে অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, কাজের নতুন উৎসাহ পেলাম। এরপর এই গণসংযোগ, ও প্রচার কাজ ক্রমাগত আরো চাঙ্গা হতে থাকে, সাউদাম্পটনেও।

বৃটিশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে কাজ করা, বিশেষ করে পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে, সেটি একটি বড় উদ্যোগ ছিল। যত বেশি চিঠি নানা দিক থেকে নিজের নিজের বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যকে লিখে তাঁকে আরো খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশের সমর্থনে আনা যায় কিনা সেটিই ছিল লক্ষ্য। এ কাজে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি কারো কারো সহায়তা পেয়েছিলাম—পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ট্রটস্কাইট ছাত্র গ্রুপের মাধ্যমে। তাদের সহযোগিতায় আমরা বৃটেনে ইতোমধ্যে বিখ্যাত ট্রটস্কাইট নেতা তারেক আলীকে সাউদাম্পটনে আমন্ত্রণ করে আনলাম—বাংলাদেশের সপক্ষে বক্তৃতা দিতে। এই সেই তারেক আলী যেই পাঞ্জাবি যুবক বৃটিশ বামপন্থী যুব সমাজের মন কেড়ে নিয়েছিলো। নিজে পাকিস্তানি হয়েও তারেক আলী পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ও শাসক গোষ্ঠীর প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজি কর্তৃক বাংলাদেশকে শোষণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। কেন বাংলাদেশের সামনে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ছাড়া কোন বিকল্প নেই, এবং তাদের এই জনযুদ্ধে পাকিস্তানিরা সহ সবাই কেন পাশে থাকা উচিত খুব জোরালো ভাবে তা তুলে ধরেন। পরে তারেক আলী বৃটেনের নানা জায়গা ঘুরে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটিগুলোর পক্ষে এভাবে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে গেছেন।

এ সময় আমেরিকায় ইউনূস ভাইদের কাজ আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলো। তিনি ন্যাশভিলে অন্যান্য বাঙালিদের নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য একটি অফিস খুলেছিলেন। শিকাগোর বিখ্যাত স্থপতি ফজলুর রহমান খানের সঙ্গে মিলে তাঁরা গঠন করেছিলেন 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা', যার একটি কাজ ছিল নিয়মিত 'বাংলাদেশ নিউজ লেটার' বের করে তা চারদিকে পাঠানো—সারা আমেরিকায় অনেক সমর্থক গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে। ইউনূস ভাই এই কমিটির দায়িত্ব বিশেষ ভাবে নিয়েছিলেন। নিউজলেটারের প্রায় সংখ্যাতেই তাঁর আঁকা একটি কার্টুন থাকতো—যা অঙ্কন ও কথার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের নানা উক্তি ও অক্ষম প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করতো। তাছাড়া পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, রণাঙ্গন থেকে প্রতিনিধির রিপোর্ট, আমেরিকাতে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি, ইয়াহিয়া বাহিনীর নানা নৃশংসতা ও তোগলকি কাণ্ড, এ নিয়ে সর্বশেষ সংবাদে সমৃদ্ধ থাকতো এর প্রতিটি সংখ্যা। প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যে আমার কাছে পৌঁছে যেত এর কপি। আমি সাউদাম্পটনের সবাইকে দেখিয়ে আলোচনা করতাম। ইউনূস ভাই ন্যাশভিল থেকে এই নিউজ লেটার প্রকাশনা ও বাংলাদেশে তথ্য কেন্দ্র চালাতেন তাঁর অধ্যাপনার পাশাপাশি। আমি তাঁর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে

নিত্য যোগাযোগ রাখতাম, যেটি আমাদের কাজকে সহায়তা দিতো। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সব দেশের মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে, মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেয়া সম্পর্কে, এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া সম্পর্কে। তাছাড়া মার্কিন সেনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের কাছে তাঁরা যেভাবে ধরনা দিচ্ছিলেন, এবং ওই জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব এলাকার মানুষদেরকে দিয়ে যেভাবে এঁদের কাছে চিঠি লেখাচ্ছিলেন—তার ফলাফলগুলো আমাদের জন্যও একটি দিগদর্শিকা ছিলো।

যুদ্ধকালীন পুরো সময়ে আমি একটি ব্যস্ত পোস্ট অফিস হিসেবে কাজ করেছি। আমার কাজ ছিলো বাংলাদেশের ভেতরের পরিচিত নানা মানুষের কাছ থেকে আমার পাওয়া সেন্সর কন্টকাকীর্ণ চিঠিগুলোর নানা ইঙ্গিত থেকে যথাসম্ভব আসল তথ্যটি ভারতে আশ্রয় নেয়া অথবা বিদেশের অন্য কোথাও থাকা আত্মীয় স্বজন বা প্রাসঙ্গিক মানুষের কাছে লিখে পাঠানো—কখনো বা মূল চিঠি সহ। আর উল্টো দিকেও আমি একই কাজ করতাম। যেমন মুক্তিযুদ্ধে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়া আপন জনের খবরাখবর এভাবে বাংলাদেশের ভেতরের আত্মীয় স্বজনকে ইঙ্গিতে জানাতে পারতাম। আব্বার কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পেতাম, সেন্সর সম্পর্কে খুব সচেতন থেকে লেখা। আব্বার সাবধানী চিঠিগুলো পেয়ে মজাও পেতাম। যেমন একবার লিখলেন 'এখানে আমরা ভাল আছি, তবে ধোপা-নাপিত না পাওয়াতে কিছু অসুবিধায় আছি'। আব্বা তো কখনো ধোপা-নাপিতের এত তোয়াক্কা করেননি—স্পষ্টত এর মাধ্যমে দেশত্যাগ করতে পারেনি এমন গরীব হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ও হত্যাযজ্ঞের খবরটি তিনি দিতে চেয়েছেন (সে সময় বাড়ি বাড়ি কাজ করা ধোপা, নাপিত ইত্যাদির বংশানুক্রমিক পেশা হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল)। সীমান্তের ওপার থেকে বন্ধু এবং আত্মীয় মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি পেতাম—তাতে সরাসরি নাম বা তাদের সেক্টর বা রণাঙ্গনের উল্লেখ থাকতো না—পাছে চিঠি বেহাত হয়; তবে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝে নিতাম। যেমন মণির ভাই ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন (পরে লে. কর্নেল, রাজনীতিবিদ, বিএনপি'র মন্ত্রী) পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তি যুদ্ধে ছিলেন। আবার বন্ধুদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নানা ভাবে অবদান রাখছিলেন; যেমন আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর চিঠি পেতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত দ্বারভাঙ্গা হল থেকে। বাংলাদেশের বাইরে যখনই চিঠি আদান প্রদান করেছি আমাদের সকলের চিঠির শেষ কথাটি হতো জয় বাংলা। দেশের ভেতরে যখন লিখেছি তখন সব কথায় স্বাভাবিক সতর্কতা রাখতে হতো।

বৃটেনে আমাদের বাংলাদেশ সংগ্রাম সমাবেশগুলো দিন দিন বৃহত্তর হচ্ছিল, যেমন ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সমাবেশটি অভূতপূর্ব হলো। মনে হলো

বৃটেনের প্রত্যেকটি বাঙালি নর-নারী তাদের স্থানীয় ও বিদেশী সহমর্মী বন্ধুদের নিয়ে এখানে চলে এসেছিলো। স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যাণ্ডের মতো দূরবর্তী জায়গাগুলো থেকে পর্যন্ত বাস ভর্তি করে করে তারা এসেছিলো। ট্রাফালগার স্কোয়ারের সর্বত্র দেখেছি অসংখ্য বাচ্চাদের প্র্যাম। ছোট শিশুদের রেখে আসা সম্ভব ছিলনা বলে মা বাবারা প্র্যাম ঠেলে ঠেলে এই সংগ্রাম সমাবেশে যোগ দিয়েছিলো। সবার কণ্ঠে প্রধানত একটি কথা 'রিকগ্‌নাইজ বাংলাদেশ'। এদিকে বৃটেনে কূটনৈতিক ভাবে আমাদের অবস্থানে কিছু উন্নতি হয়েছিলো। অবশেষে দেরিতে হলেও পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিবিদরা পদত্যাগ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করলেন। মুজিব নগর বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী এই কর্মকর্তাদের নিয়ে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। লন্ডনের নটিংহিল গেইট অঞ্চলে ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেনের এই বাড়িটি হয়ে উঠলো আমাদের এক রকমের দূতাবাস—যেটি পাশ্চাত্যে আমাদের সংগ্রামের প্রধান ঠিকানা হয়ে উঠলো। বৃটিশ সরকারের কাছেও এটি একটি অনানুষ্ঠানিক মর্যাদা পেতে আরম্ভ করেছিলো।

মার্চের পর কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তান দূতাবাস আমাদের স্কলারশিপগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলো—আমরা যারা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিতে ছিলাম এবং বাংলাদেশ সংগ্রামের পক্ষে কাজ করছিলাম। মণির চাকরি থাকাতে একেবারে পানিতে পড়লাম না। কিন্তু অবিলম্বে একটি আয়ের পথ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো। এদিকে আমার পিএইচডি এক্সপেরিমেন্টগুলোও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সেগুলো শেষ না করে কোন খণ্ডকালীন চাকরিও করা সম্ভব নয়। সাফল্যজনক ভাবে এক্সপেরিমেন্ট শেষ করতে পারলে পড়াশোনা ও থিসিস রচনা করার সময়ে সেটি হয়তো সম্ভব হবে। বাংলাদেশ সংগ্রামে নতুন নতুন পরিস্থিতির চাঞ্চল্য, এদিকে রাত বিরেতেও কাজ করে ল্যাবোরেটরিতে নতুন নতুন পরীক্ষণ সংকটের মোকাবেলা, সব কিছু মিলে তখন একটি অসম্ভব উত্তেজনা ও পরিশ্রমের সময় চলেছে। এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল যখন কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তখন সেই সেপ্টম্বর নাগাদ বাংলাদেশের যুদ্ধও একটি সুসংগঠিত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তখন আর একটু বেশি সময় নিয়ে লন্ডনে ও অন্যত্র বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে সভা সমাবেশে ও প্রচার কাজে যোগ দিতে পারলাম—কারণ এক্সপেরিমেন্ট ফলাফল ব্যাখ্যার জন্য ও থিসিস লেখার জন্য যা করতে হতো তা নিজের সময়মতো করা সম্ভব হচ্ছিলো।

কিন্তু চাকরির প্রয়োজনীয়তাটি এবার সামনে চলে এলো। সব চেয়ে ভাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে এবং এই পরিস্থিতিতে যুৎসই হবে মনে করে সাউদাম্পটন থেকে ট্রেনে বাসে যাতায়ত করা যায় এমন গণ্ডির মধ্যে বিভিন্ন হাই স্কুলে (বিশেষ করে যেগুলোকে গ্রামার স্কুল অথবা সিক্সথ ফরম কলেজ বলা হতো)

দরখাস্ত করলাম—খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করার জন্য অথবা স্থায়ী কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বদলি শিক্ষক হবার জন্য। এ ধরনের সুযোগ সচরাচর নানা স্কুলে থাকতো। টেলিফোনেও আলাপ করলাম কোন কোন স্কুলের হেডমাস্টারদের সঙ্গে, কয়েকটির জন্য দূরে গিয়ে সাক্ষাৎকারও দিলাম। শেষ পর্যন্ত সুবিধাজনক চাকরি যেটি পেলাম সেটি একেবারে সাউদাম্পটন শহরের কেন্দ্রে একটি 'ফারদার এড্যুকেশন কলেজের' শিক্ষকতা—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত পড়াবার খণ্ডকালীন কাজ। এই কলেজগুলো আসলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য উচ্চতর লেখাপড়ার আর-একটি সুযোগ; অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীই খুব মনোযোগী নয়, মেধাবীও নয়। এদের প্রায় সবাই ছিলো এমন ইংরেজ কিশোর-কিশোরী যারা নিজেদের খুব 'সংস্কৃত' আচরণের জন্য পরিচিত নয়। এমনিতেই সব ইংরেজের মধ্যে টিন-এজার ছেলেমেয়েদের (বিশেষ করে মেয়েদের) মুখের ভাষা আমাদের কাছে খুবই দুর্বোধ্য—বিশেষ ধরনের ভঙ্গি, উচ্চারণ এবং অদ্ভুত সব নিজেদের জগতের শব্দ ব্যবহারের কারণে। আর এই স্কুল-ফাঁকি দেয়া ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশি প্রযোজ্য। অমনোযোগের ধারাটি এত বিস্তৃত যে তা রূপ পায় ক্লাসে গণ্ডগোল করার মাধ্যমে। উচ্চারণ ও শব্দ চয়নে তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য সেও সহজেই হাসির খোরাক হতে পারতো ওদের। এ সবের মধ্যে বিজ্ঞানে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনাটিকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। তাদের কথাগুলো যথাসম্ভব বুঝতে শিখলাম, তাদের রসিকতায় যোগ দিতেও। তারপর পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের বিষয়গুলোকে যত সহজ ভাবে ও চমকপ্রদভাবে সম্ভব উপস্থাপনা করে অন্তত অনেকের কাছে ধন্যবাদ পেলাম। কাজটি আরো ভাল ভাবে করতে পারলাম প্র্যাকটিকাল ক্লাসে—যেখানে অভিজ্ঞ ল্যাবোরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট বব স্মিথের সঙ্গে মিলে আমি ছাত্রদের করার জন্য নানা কাজ খাড়া করতাম; তাদের অধিকাংশই সেগুলো বেশ আনন্দের সঙ্গে করতো, বব আর আমার সহায়তা নিয়ে।

বছর তিরিশেক বয়সী বব আমাকে খুবই মান্যগণ্য করতেন। নানা দেশে যে মানুষের নামের নানা নিয়ম একথা তাঁর মনে হতোনা। আমি তাকে বন্ধুসুলভ ফার্স্ট নেইম বব বলে ডাকি, আমাকে ফার্স্ট নেইম 'মুহাম্মদ' বলে না ডেকে 'ইব্রাহীম' ডাকতে বলাতে তিনি খুবই সংকোচ করে বলতেন যে 'আমি কখনো পারবোনা'। কারণ নামের দ্বিতীয় অংশ হিসেবে এটি হবার কথা 'সারনেইম' বা 'ফ্যামিলি নেইম'। মিস্টার, মিস্ ইত্যাদি ব্যবহার না করে কাউকে সারনেইমে ডাকা হতো ইংল্যান্ডের সনাতন সমাজে শুধু চাকর বাকর বা নিম্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষকে ডাকা। অথবা জাঁদরেল মাস্টাররা তাদের ছাত্রদেরকে ওভাবে ডাকতেন। আধুনিক কালে তা প্রায় ঘটে না বলেই চলে। কাজেই ববের কাছে 'মিস্টার ইব্রাহীম' বা শুধু 'মুহাম্মদ' ঠিক আছে; কিন্তু শুধু ইব্রাহীম কখনোই না। দুপুরে লাঞ্চের সময় ক্যান্টিন এবং টিচার রুমকে আমি বাংলাদেশ সংগ্রাম নিয়ে সর্বশেষ

বুলেটিন কেন্দ্রে পরিণত করেছিলাম। সহকর্মী শিক্ষকরা অধিকাংশ খুবই আগ্রহ দেখাতেন ও সমর্থন করতেন।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে একদিকে রণাঙ্গনে বেশ সক্রিয় হয়েছিলো, অন্য দিকে দেশের একেবারে অভ্যন্তরে পাকিস্তান বাহিনী আর তার স্থানীয় অস্থানীয় নানা মিলিশিয়াদের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছিলো তার অধিকাংশের খবর আমরা নিজেদের সূত্র থেকে পেতাম। আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কালেভদ্রে তা আসতো—সেও টিভিতে মুহূর্তের ঝলকে কোথাও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি, অথবা গেরিলাদের উড়িয়ে দেয়া কোন স্থাপনার ছবি। নামকরা পত্রিকাগুলোর ফিচারে কখনো কখনো এ সবের ধারণা মাত্র দেয়া হতো—তবে বিস্তারিত কিছু নয়। কিছুটা শুরুর দিকে টাঙ্গাইলে সখিপুরের চারদিকের জঙ্গলে কাদের সিদ্দিকী নামের এক অদ্ভুত বীর চরিত্রের সংগঠিত কাদেরিয়া বাহিনীকে যখন এখানকার মিডিয়ায় কিছুটা মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের শেরউড ফরেস্টের বীর নাইট রবিন হুডের মতো করে উপস্থাপন করলো তখন গর্বে, আশায় বুক ফুলে ওঠেছিলো। অবশ্য এই মিডিয়াই আবার তা ম্লান করে দিয়েছিলো স্বাধীনতার পরপর বিরাট জন সমাগমে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে কাদের সিদ্দিকীর ধরে ও বেঁধে আনা রাজাকারকে বেয়নেট বিদ্ধ করে মেরে ফেলার দৃশ্য বৃটেন-জোড়া টেলিভিশনে দেখিয়ে। ওই পুরোটা সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে নির্যাতন ও গণহত্যা চলেছে তার তেমন বিশদ কোন চিত্র ও বর্ণনা টেলিভিশনে ও পত্রিকায় আসেনি। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় মূলত ভারতের গোয়া-ভিত্তিক সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকারান্থাসের এই গণহত্যা নিয়ে লেখা প্রতিবেদনটি ছিল এর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

কিন্তু যে জিনিসটি বেশি বেশি করে ক্রমাগত আন্তর্জাতিক মহলের ও মিডিয়ার নজর কাড়ছিলো তা হলো কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হিসেবে জীবন্মৃত অবস্থায় ভারতের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ। যেখানে কলেরার প্রকোপ, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, তাদের আহার-বাসস্থান-চিকিৎসার সংস্থান ইত্যাদি খুব বড় আকারে এসেছিলো। মনে হলো যেন এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো এবং বৃটেনে ও অন্যত্র বিশ্ব মিডিয়া এই যুদ্ধকে ও যুদ্ধ থামাবার প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিলো।

ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর দলগুলো যখন বাংলাদেশের নানা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছিল তার দৃশ্য বৃটিশ টেলিভিশনে গুরুত্বের সঙ্গে এলো, ঢাকার ওপর বোমা বর্ষণের ছবিও। ওদিকে শুনছিলাম যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা চলছে, আমেরিকা ও চীনের পক্ষ থেকে ভারতের উপর হুমকিও নাকি দেয়া হচ্ছিল। তাই দারুণ উদ্বেগ অনুভব করছিলাম ও দুরু দুরু বুকে সকল সূত্র থেকে খবর যোগাড়ের চেষ্টা করে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলাম। একদিকে দেশের এক একটি এলাকা শত্রুমুক্ত হচ্ছে, মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ছে এমন দৃশ্য দেখে মহা

খুশি হচ্ছিলাম, অন্যদিকে অনিশ্চয়তা ও অজানা আশঙ্কায় অত্যন্ত আকুল ছিলাম। ঢাকায় বিমান আক্রমণের উপর বিবিসি টেলিভিশনে একটি প্রতিবেদন দেখলাম—যেখানে আক্রমণে একটি সাধারণ বাঙালি পরিবারের কয়েকজন নারী ও শিশু নিহতদের নিয়ে পরিবারের মাতম দেখানো হচ্ছিল। এমন কথা শুনছিলাম যে সারা দেশ থেকে পাকিস্তানি সব বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে ঢাকায় এসে জড়ো হয়েছে—ঢাকার সব মানুষকে জিম্মি করে এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। তা হলে সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হবে, অসংখ্য মানুষ মারা যাবে সেটি নিশ্চিত ছিল। এমন আশা-নিরাশার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে এলো হঠাৎ পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের চরম শিখরে পৌঁছে গেলাম সবাই; কাছাকাছি যাদের পেলাম সবার সঙ্গে গলাগলি করে সে কি উল্লাস! সেই উল্লাস কিন্তু শিগ্‌গীর প্রচণ্ড রাগ ও বিষাদে পরিণত হলো যখন এখানকার টেলিভিশনে রায়ের বাজার বধ্যভূমির বীভৎস দৃশ্য দেখার পরপর জানতে পারলাম কত বড় নৃশংসতার ঘটনা ঘটেছে সেখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আশপাশে জাতির অতি মূল্যবান, অতি আপন বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে অপহরণ ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার ঘটনা জানলাম, এবং শিউরে উঠলাম। এ ভাবেই অবশেষে পেলাম স্বাধীন বাংলাদেশকে।

কল্পনা, পরিকল্পনা

উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় থেকেই অন্যদের মত আমার মধ্যেও নিজের কল্পনার দেশের জন্য একটি সমাজ-বিপ্লবী ভবিষ্যৎ চিন্তা কাজ করে আসছিলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেই কল্পনাগুলো আরো দানা বেঁধেছে কারণ মনে হয়েছে এভাবে জনযুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশ প্রতিষ্ঠা হবে তাতে আদর্শ সমাজ আদর্শ মানুষ গড়ার কাজ আমরা এক সঙ্গে করতে পারবো। সেই সাতষষ্টি-আটষট্টি সনে ছয়দফা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি নিয়ে আমাদের ছাত্র ইউনিয়ন সহ দেশে নানা দলে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মুক্তিযুদ্ধ তার সবকিছুর সমাপ্তি ঘটিয়েছে। আমাদের জাতির নিজের প্রতিভার যোগ্য ভাবিষ্যৎ গড়ার এই সুযোগ। তাই মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় এবং তার পরপর মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে বহু রকমের চিন্তা—কেমন হবে আমাদের এই নতুন বাংলাদেশ। ছোট বেলা থেকে যা কিছু আদর্শ মনে হয়েছে, যা কিছু আনন্দের মনে হয়েছে, সেগুলোকেই মনে হয় আপন মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়েছি। এমনকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম কী হওয়া উঠিত, কাজ কী হওয়া উচিত, সে সবও ভেবে রেখেছি—যদি কোনভাবে সেগুলো সবাইকে জানাবার, এমনকি বাস্তবায়নের সুযোগ ঘটে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য দুনিয়ায় যেসব মডেলের কথা জানা ছিল, যেগুলোর কথা জেনে মুগ্ধ ছিলাম, সেগুলোর সমন্বয়েই মনের মধ্যে তৈরি করছিলাম বাংলাদেশে কী হবে তা। যেমন সর্বজনীন গণশিক্ষার কথায় চিন্তা করছিলাম ফিডেল ক্যাস্ট্রোর

কিউবার আদলে; গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার কথায় চিন্তা করছিলাম যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আদলে, শ্রেণী বিভক্তিহীন সমাজের সবার উন্নয়নের সুযোগের জন্য গণচীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন; সমবায় ভিত্তিক মালিকানার জন্য সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির উদাহরণ; শ্রমভিত্তিক মালিকানার জন্য যুগোশ্লাভিয়া; ইত্যাদি। জানতাম এর প্রত্যেকটির কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়, অনেক ক্ষেত্রেই মডেলগুলো তার আরাধ্য ফল দেয়নি, হয়তো দিতে পারেওনা; তবুও লক্ষ্য হিসেবে এদেরকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে, যদিও আমাদেরটি হবে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মৌলিক ধ্যানধারণা। খাতায় এসব টুকে টুকে রেখেছি, এমনকি কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবয়ব, সাংগঠনিক কাঠামো কী রকম হওয়া উচিত তাও পরিকল্পনা করেছি, লিখে রেখেছি, যার সঙ্গে পেরেছি এ নিয়ে আলাপ করেছি। এ যেন বাল্যকালের সেই রঙিন পরিকল্পনা; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের জ্বলজ্বলে উপস্থিতিতে এ পরিকল্পনা না করাটই বরং অবোধ শিশু সুলভ নির্লিপ্ততা মনে হচ্ছিল—সে পরিকল্পনা কাজে লাগুক বা না লাগুক।

অন্য সব ক্ষেত্রে আবছা আবছা পরিকল্পনাকে বিস্তারিত করার তেমন সুযোগ না থাকলেও একটি ক্ষেত্রে তা কিছুটা ছিল—তা হলো স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন কী হবে তার রূপরেখা তৈরি। এটি আমি নিজেই নিজের এলাকা বলে মনে করতাম, এবং বিজ্ঞান সাময়িকীর কারণে তা প্রকাশেরও একটি সুযোগ আমার ছিলো। এক্ষেত্রে নিজের ভাবনাগুলোকে বিজ্ঞান সাময়িকীতে লিখে ফেল্‌লাম 'বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান' এই নাম দিয়ে। এখন প্রবন্ধটি পড়লে বুঝতে পারি স্বাধীনতার ওই সময়টিতে কত আশাবাদী হয়ে সামনের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কত বিরাট পরিবর্তনের আশা করছিলাম। সেই কল্পনার সব কিছু বাস্তবায়িত না হলেও স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর মোটামুটি সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেস্টায় অতিবাহিত করেছি—নিজের কাজ ও সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে। সেদিক থেকে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিকে খুব সময়োপযোগী ও সার্থক বলে মনে হয়, অন্তত আমার নিজের ওপর তার প্রভাবের কারণে। এতে বিজ্ঞান শিক্ষাকে স্কুলে, বাড়িতে, খেতে-খামারে, কারখানায় ছড়িয়ে দেবার কথা বলেছিলাম। 'জীবন ও প্রকৃতির দিকে তাকাও', 'নিজে করার চেষ্টা করো' এই ভিত্তিতেই একে নেবার কথা বলেছিলাম। সর্বজনীন স্কুল শিক্ষার একটি পর্যায় থেকে ছাত্ররা একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষা এই দুদিকের যে কোন একটি যেতে পারবে নিজের ঝোঁক অনুযায়ী। ওই পেশাগত শিক্ষা হবে এমন 'পলিটেকনিকে' যেখানেও বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় অসংখ্য আধুনিক কৃষক, কারিগর, কর্মী গড়ে উঠবে এবং প্রচুর উদ্ভাবনে দেশকে ভরিয়ে দেবে। এর কথা অনুযায়ী বাগানের মালি ও গবেষণাগারের উদ্ভিদবিদ এই দুইয়ের তফাৎটি এতো কমে যাবে যে শুধু আপেক্ষিক কিছু তফাৎ থাকলেও মৌলিক কিছু থাকবেনা। শতভাগ সর্ব সাধারণকে দ্রুত শিক্ষিত করে তোলার জন্য এ ছাড়া সাময়িক কিছুকালের জন্য

সর্বত্র গণবিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে সব ছাত্র ছাত্রীদেরকে এসব গণবিদ্যালয়ে ছয় মাস শিক্ষকতা করতে হবে। গণবিদ্যালয়ে শিক্ষিত হওয়াটি সবার জন্য যাতে প্রতিযোগিতা ও সম্মানের বিষয় হয় সে জন্য দেশময় একটি উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে। জনগণের বিজ্ঞান এবং জনগণের জন্য বিজ্ঞান হবে এসব সকল প্রচেষ্টার প্রধান উপজীব্য।

দেশের জন্য নানা ভাবনার ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট ঘটনা আমার মধ্যে দারুণ আশাবাদের সৃষ্টি করেছিলো। এটি স্বাধীনতার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে অর্থাৎ বাহাত্তর সালের শুরুর দিকের ঘটনা। আকবর ভাইয়ের (মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা মণির ভাই মেজর আকবর হোসেন) কাছ থেকে চিঠি পেলাম আমাকে দু'শ পাউন্ড ধার দিতে হবে কানাডাগামী কর্নেল জিয়াউর রহমানকে। পাছে আমি না চিনতে পারি সেজন্য তিনি পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'এই সেই মেজর জিয়া যিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন—যা তোমরা শুনে থাকতে পারো'। আকবর ভাইয়ের হয়তো ধারণাই ছিলনা সেদিন বৃটেনে আমাদের মহলে ওই মেজর জিয়া, ওই অজানা চরিত্রটি কী পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো, আর কী পরিমাণ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। তিনি এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে কানাডায় একটি কমনওয়েল্থ সামরিক সম্মেলনে যোগদানের পথে লন্ডনে দু'একদিনের যাত্রাবিরতি করেছেন। সঙ্গে এমন কোন বাড়তি টাকা নেই যে কিছু ব্যক্তিগত কেনাকাটা করতে পারেন তাই দু'শ পাউণ্ডের মত সামান্য টাকাও তাঁকে পথে অপরিচিতের কাছে ধার করতে হচ্ছে (যা কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আকবর ভাইয়ের মাধ্যমে বাসায় শোধ করে দিয়েছিলেন)। দেশের কিংবদন্তির মত বীর এবং বরেণ্য একজন উচ্চ সামরিক কর্মকর্তার সাধারণ মানুষের মত এমন বিনীত জীবন, এমন সামান্য প্রয়োজনেও জাতীয় ক্ষমতা ব্যবহারে অনীহা—আমাকে দারুণ মুগ্ধ করলো; সাউদাম্পটনে আমার বন্ধুরাও শুনে অবাক। তার মানে যাঁরা কর্তৃত্বে আছেন তাঁরা সবাই যদি এই নীতিতে চলছেন ধরে নিই তা হলে তো আমাদের কল্পনার বাংলাদেশ এবার সত্যি হতে চলেছে।

জিয়া সাউদাম্পটনে আসতেও রাজি ছিলেন, কিন্তু মাত্র দু'দিনের অবস্থানে লন্ডনে তাঁর কাজ থাকবে মনে করে মণি আর আমিই বরং লন্ডন গেলাম সেই দু'শ পাউন্ড তাঁকে দেবার জন্য। পেমব্রিজ গার্ডেনের বাংলাদেশ মিশনে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আশাবাদের বাকি অর্ধেকটা খুঁজে পেলাম তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। মনে হলো একজন মাটির মানুষের সঙ্গে কথা বলছি—তিনি যে আমাদের চোখে কী রকম বীর অন্তত তাঁর আচরণ ও কথাবার্তায় তা আদৌ তিনি বোঝেন বলে মনে হলোনা। বরং সাউদাম্পটনে বা লন্ডনে বন্ধুবান্ধবরা এখন দেশ নিয়ে যেভাবে উদ্বেগ-উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছি সে রকম কথাই হলো। দেখলাম আমাদের কল্পনার সঙ্গে তাঁর কল্পনা অনেকখানি মিলে যায়। নতুন দেশের সামরিক বাহিনী গঠনে হাত লাগানোই এখন তাঁর দায়িত্ব—তাই সেটি নিয়েই কথা হলো বেশি।

জিয়ার ধারণা আমাদের সেনাবাহিনী হবে ছোট কিন্তু চটপটে ও দক্ষ, সেভাবেই একে সুসজ্জিত করতে হবে। এটি হবে জনগণের বাহিনী, ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন কায়েমী স্বার্থের নয়—মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হবে তার প্রধান উপজীব্য। ওরা হবে আমাদের সামনের কাতারের প্রতিরক্ষা মাত্র, আসলে দেশের প্রতিরক্ষা করবে উজ্জীবিত জনগণ—যেমন মুক্তিযুদ্ধে করেছে। বৈপ্লবিক ধ্যান ধারণায় আচ্ছন্ন আমার কাছে এগুলো যে অতি কাম্য কথা ছিল তা বলাই বাহুল্য। ঘরোয়া আলাপগুলোতে তাঁকে দেশের সামরিক বাহিনীর উপপ্রধান মনে না হয়ে মনে হলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র বন্ধু। বল্‌লেন তিনি আকবরের শিক্ষক—পাকিস্তানের সামরিক একাডেমির ইন্ট্রাক্টর হিসেবে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, আকবরের ভাবসাব চালচলন সব জিয়ার জানা। মণিকে বল্‌লেন 'আপনার ভাই কি বাড়িতেও এরকম পাগলাটে স্বভাবের?'

১৯৭২ এই পুরো বছরটিকে বলা যায় আমার জন্য একটি ব্যতিক্রমী তৃপ্তির বছর। আমাদের একান্ত নিজের নতুন দেশটির নানা দিক নিয়ে ভাবা, এ নিয়ে সবার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঝড় তোলা—এটিতো একটি পরম অনন্দের বিষয়। তার সঙ্গে যুক্ত হলো এ বছর আমার পি এইচ ডি লাভের আনন্দ। ওদিকে ফারদার এড্যুকেশন কলেজে আমার শিক্ষকতার কাজটিও এখন বেশ ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক কাজে পরিণত হয়েছে। এখন কিছুটা মুক্তভাবে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে নানা বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ হয়ে গেলো—বেশ রাত পর্যন্ত ওখানেই কাটাতাম, দেশে ফেরার আগে পর্যন্ত। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ক'মাস বিজ্ঞান সাময়িকীতে যে বিরতি গিয়েছে নতুন বাংলাদেশে নব উদ্যমে তা পুষিয়ে দেবার কাজটিও জোরেশোরে শুরু করলাম। ভূঁইয়া ইকবাল ঢাকায় এর সকল শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা আমাকে পাঠালো। কথা হলো আমি দেশে পৌঁছার আগেই নানা দিক থেকে কিছু কিছু উদ্যোগ শুরু হয়ে যাবে। 'বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞানের' ওই প্রবন্ধের পর আমিও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে লেখালেখি করতে থাকলাম। ঠিক করলাম ফারদার এডুকেশন কলেজে আমার চাকরির চলমান চুক্তিটি শেষ হলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের দিকে দেশে ফিরে যাব।

আসলে তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের টানে অনেকেই যে যার মতো করে দেশে ফিরছে। ইউনূস ভাই টেনেসিতে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনায় পদত্যাগ করে দেশে ফেরার পথে সাউদাম্পটনে এলেন। যে কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে কাটালেন, আমরা তাঁকে নিয়ে আইল অব ওয়াইট, অক্সফোর্ড, লন্ডন এরকম কয়েকটি জায়গায় ঘুরলাম। সাউদাম্পটনে তো বটেই, যেখানেই গেলাম তাঁকে সহ বন্ধুদের বাংলাদেশ নিয়ে পরিকল্পনায় দারুণ আনন্দ উত্তেজনা অনুভব করলাম। ইউনূস ভাই আপাতত বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশনের হয়ে কাজ করবেন—যে প্রতিষ্ঠানটি

তিনি স্থপতি ফজলুর রহমান খান ও তাঁর ভাই জিল্লুর রহমান খানের সঙ্গে মিলে আমেরিকাতে গড়ে তুলেছেন। এখন ঢাকায় এর অফিস চালাবেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা দেবার জন্য।

১৯৭২ এর একবারে শেষে এসে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু মনটা বেশ খারাপ এতো আনন্দ-উত্তেজনার মধ্যেও। পরিচিত অনেকের যুদ্ধে শহীদ হবার খবর এখনো ক্রমাগত পাচ্ছি। দেশে ধ্বংসলীলার প্রকৃত চিত্রটিও নিজের কাছে আরো স্পষ্ট হচ্ছে। ঢাকার বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, অনেক নদী বন্দর, ছোট বড় গুরুত্বপূর্ণ সেতু, রাস্তাঘাট কিছুই চালু নেই। চট্টগ্রাম বন্দরের মুখে মুক্তিযোদ্ধা ডুবুরিরা যে অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে একে যুদ্ধের সময় অচল করে দিয়েছিলো সেটি আবার সচল করার জন্য সোভিয়েত নৌবাহিনীর কুশলী টিম যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে জানতে পেরেছি। অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ, ধ্বংসস্তুপের থেকে আবার গড়ে উঠবার চেষ্টা এসবে বেদনার মধ্যেও গৌরব রয়েছে। কিন্তু মন খারাপের অন্য বিষয়গুলো ছিল শুধুই গ্লানির।

শুনছিলাম ষোলই ডিসেম্বরের পর পর কিছু নকল মুক্তিযোদ্ধা আবির্ভূত হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লুটতরাজ। সম্পন্ন উর্দুভাষী যারা দেশ ছেড়ে গিয়েছে, বা দেশে রয়ে গেছে তাদের ধন-সম্পত্তি দখল ওদের অন্যতম লক্ষ্য হলেও একমাত্র লক্ষ্য ছিলনা—অস্ত্রের জোরে বহু নিরপরাধ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে, হত্যা করে এই লুটতরাজ চলছিলো। এর মাধ্যমে এই তথাকথিত 'সিক্সটিন্থ ডিভিশনের' অনেক কথিত মুক্তিযোদ্ধা রাতারাতি ধনকুবেরে পরিণত হচ্ছিলো। তাছাড়া যুদ্ধফেরত কিছু তরুণ মুক্তিযোদ্ধাও অরাজকতার পথ বেছে নিয়েছিলো—সরকারের অস্ত্র সমর্পনের নির্দেশে মোটেই সাড়া দেয়নি। চরমপন্থী বামপন্থীদের হাতে অন্য বামপন্থী হত্যার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র পরিচিতদের মধ্যেই ঘটলো।

অন্যদিকে আবার শক্তিশালী আওয়ামী লীগেও (বিশেষ করে তার যুব শাখায়) বড় ভাঙ্গন এলো। ছাত্রদের 'চার খলিফা' আর মুজিববাহিনীর কথা শুনলাম সবিস্তারে। ছাত্রলীগের তরুণ নেতা—আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী আর আবদুল কুদ্দুস মাখনই চার খলিফা। এর মধ্যে প্রথম দুই খলিফার, আরো বিশেষ করে তাদের রাজনৈতিক গুরু সিরাজুল আলম খানের বিশেষ উদ্যোগেই শুধু ছাত্রলীগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। যেটুকু জানতে পারলাম এ ভাঙ্গন হঠাৎ করে হয়নি—মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু চার খলিফাই নয়, আওয়ামী লীগের কিছু মূল যুবনেতা মুজিবনগর সরকারের আওতার কিছুটা বাইরে থেকেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও সেদেশের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সরাসরি আলাদা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার পাচ্ছিলো। তাদের নেতৃত্বে শুধু তাদের বিশ্বস্ত তরুণদেরকে আলাদাভাবে বিশেষ সামরিক ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিলো। এটি মুজিববহিনী বলেই

পরিচিত ছিল। ভাঙ্গনের সূত্রটি মনে হলো প্রধানত মুজিববাহিনীর ভেতরেই দানা বেঁধেছিলো।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামটি শুনে চমকে উঠলাম। এ-তো হিটলারের নাৎসী দলের পুরো নাম ন্যাৎশিওনাল সোৎশিয়ালিষ্টের বাংলা অনুবাদ। ওরা কি জেনেশুনে এই নাম দিয়েছে? মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমাণ্ডার মেজর আবদুল জলিলকে সভাপতির পদে বসালেও—নতুন দলটির আসল প্রাণটি এলো আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব অংশ থেকে। একটির জায়গায় দুটি ছাত্র লীগ হলো তখন। তখনকার মতো বিদেশ থেকে নতুন দলটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আঁচ করতে পারলামনা—পরে দেশে গিয়ে এর তীব্র সরকারবিরোধী ভূমিকা দেখেছিলাম। সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনের সময় এরকম একটি বিভাজনের হিসেব মেলাতে পারছিলামনা।

বিধ্বস্ত দেশের মধ্যেও সরকারী দল, সরকার এবং স্থানীয় সরকারের বেশ কিছু নেতা ও সদস্যের দুর্নীতির ও ক্ষমতা অপব্যবহারের কাহিনী এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও এসে পৌঁছে যাচ্ছিল। ভিয়েতনাম সংহতির ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলি ও ছাত্র নিহত হবার খবরটিও সাংঘাতিক বেসুরো মনে হলো। স্বাধীন বাংলাদেশে এসবের হিসেবও কিছুতেই মেলাতে পারছিলামনা। কিন্তু এগুলো মাঝে মাঝে মন খারাপ হবার কিছু কিছু উপাদান মাত্র ছিল। মনে যে মূল সুর বেজে চলেছিলো তা হলো সদ্য স্বাধীন দেশে তখন আমাদের সবাইকে দরকার। চিরকাল নিজেদের যেমন দেশের কথা কল্পনা করে এসেছি তাকে রূপ দেবার চেষ্টার এখনই সময়।

ঝড়ো হাওয়ায় নতুন আবাদ

১৯৭২ এর ওই সময় তখনো দেশের সঙ্গে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। মণি আর আমার ফেরার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হলো, সে আগে চলে গেলো। তখন 'এয়ার বাংলাদেশ' নামে একটি চার্টার্ড ফ্লাইট কোম্পানি সদ্য লন্ডন-ঢাকা যাতায়ত শুরু করেছে, 'বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন' গঠিত হলেও তার নিয়মিত আন্তর্জাতিক চলাচল শুরু হয়নি। মণি যেই ফ্লাইটে গেলো, দেখলাম তাতে মালের সঙ্গে মানুষও ওজন করা হলো—যাতে বিমানের মোট ওজন বেশি হয়ে না যায়। আমি গেলাম নতুন বছর ১৯৭৩ এর তৃতীয় দিন—বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনের চার্টার করা উড়োজাহাজে।

ফেরার পরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে আবার যোগ দিলাম; উঠলাম আপাতত ইন্টারন্যাশনাল হলে বন্ধুদের কক্ষে। আমার দুই পূর্বতন ছাত্র আনিস সাবেত (অকাল প্রয়াত) ও আবু সাঈদ খান (পরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) তখন পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করার সুবাদে এই হলে

এক কক্ষে থাকতো। আবু সাঈদ তখন দেশের বাড়িতে যাওয়াতে তার বিছানাটি খালি ছিলো। তাই বেশ কয়েকদিন ওখানেই থাকলাম। কাছেই এক কক্ষে থাকতো আহমদ ছফা (পরে খ্যাতনামা লেখক, চিন্তাবিদ)। তার মাধ্যমে পরিচয় হলো তখনো ছাত্র কিন্তু ইতোমধ্যে প্রথম বই 'নন্দিত নরকে' লিখে হৈচৈ ফেলে দেয়া হুমায়ুন আহমদের সঙ্গে। নতুন-পুরাতন বন্ধুদের মাধ্যমে দ্রুত একাত্তরের বহু ঘটনাবলী, তাদের নিজেদের সব অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলাম, আর মর্মে মর্মে আরো অনেক গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম তখন দেশ নামক বন্দী শিবিরে যারা ছিলো তাদের কথা; ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিয়ে সীমান্তের ওপারে যারা গিয়েছে, যারা সংগ্রাম করেছে, যারা আপনজন হারিয়েছে, তাদের কথা। ১৯৭৩ সালের শুরুতে চোখের সামনে যে বাস্তবতাকে দেখছিলাম তাকে মিলিয়ে নিতে হচ্ছিল ওই সব খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার পটভূমিতে। কিছুদিন পর ওই বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি দিনের একটি বড় সময় বাঙলা একাডেমিতে কাটালাম। এর কারণ ছিলো ওখানে ওই দিন একে একে অনেক বন্ধু ও পরিচিত মানুষের সঙ্গে, আমার চেনা নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। অল্প সময়ে অনেকের কাছে জানতে পারছিলাম কে কী ভাবছে।

প্রথম কিছুদিন দেশের বাতাস গায়ে লাগতেই প্রতিকূল সব আবহ ভুলে থাকলাম। মনের মধ্যে নতুন স্কুলে যাওয়া কিশোরের মতো শুধু গুঞ্জরিত হচ্ছিলো আমরা নিজেদের দেশ পেয়েছি, বঙ্গবন্ধু সবাইকে নিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য করে এগোলে সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসবে। বর্তমানে তাঁর যেই অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্ব—তাঁর পক্ষে এটি খুবই সম্ভব। তাই বঙ্গবন্ধু কী বলছেন খুবই আগ্রহ নিয়ে শোনতাম। তাছাড়া বিশেষ মুগ্ধতার সঙ্গে শোনতাম তাজউদ্দিন আহমদের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে এই মানুষটির নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বিদেশের আশ্রয়ে নানা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে তিনি একটি জনযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। মনে হয়েছে এই টিমের পক্ষে সম্ভব দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের কাঙ্খিত বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বর্তমানের সকল আপাত সমস্যা অতিক্রম করে। এ নিয়ে আমার এপসুর বন্ধুদের সঙ্গে মহাতর্কে জড়াতেও আমি রাজি ছিলাম। তারা হেসে বলতো আমি কল্পনার রাজ্যে বাস করছি।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের নানা সম্ভাবনা নিয়ে খুবই উৎসাহজনক ভাবে ভাবাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের পারিপার্শ্বিকতা সব সময় ওভাবে ভাবতে দিচ্ছিলনা। ইতোমধ্যে শহরের কয়েকটি ভিন্ন এলাকায় অল্প কিছু দিন করে বাস করে আজিমপুরে শেখ সাহেব বাজার রোডে মোটামুটি স্থিত হয়েছি। সবখানেই দেখেছি বেশ অস্থিতিশীল পরিবেশ। সন্ধ্যার পর গোলাগুলির শব্দ পাওয়া নিত্যকার বিষয় ছিল—আর পত্রিকায় ও লোকমুখে খুন-খারাবির খবর ক্রমাগত শুনছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মুড এখনো মুক্তিযোদ্ধার মত—স্বাভাবিক আচরণ করতে অনীহা তাদের। সেখানে ও অন্যত্র কিছু তরুণ সামান্য কথা

কাটাকাটিতেই পিস্তল বের করে ফেলছিলো, কোন কোন ক্ষেত্রে ফায়ারও করে দিচ্ছে, তাক করে বা না করে। মানুষের মধ্যে আশা ও উৎসাহ যেমন ছিল, তেমনি ছিল আতঙ্ক।

খুন-খারাবির ঘটনাগুলো বেশির ভাগ অরাজনৈতিক হলেও রাজনৈতিক খুন-খারাবিও ক্রমে বাড়ছিলা। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি আসছিলো প্রধানত তিন দিকের সংঘাতে—আওয়ামী লীগ, জাসদ এবং চরম বামপন্থী দলগুলো। জাসদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বটিই বোঝা বড় শক্ত ছিলো—কারণ ক'দিন আগেও তারা এক সঙ্গেই ছিলো। দেশে ফিরে কয়েক দিনের জন্য চট্টগ্রামে বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে দ্বিতীয় দিনেই বাসার সামনে দিয়ে একটি মাইক-ফিট করা রিক্সা থেকে চলতে চলতে একটি সভার ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে কিছু শ্লোগানও ঘোষণাকারী নিজে নিজেই দিয়ে চলেছিলো। একটি শ্লোগানে খুবই হকচকিয়ে গেলাম—'মুজিববাদ কায়েম কর, বৈজ্ঞানিককে লাথি মারো'। নিজকে বৈজ্ঞানিকদের সমগোত্রীয় মনে করি বলে বুঝতে পারছিলামনা আমরা কী অপরাধ করলাম। বাসায় অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তারা বল্‌লো 'ও জানোনা, জাসদ আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা হবার কারণ হিসেবে বলেছে আওয়ামী লীগ যে সমাজতন্ত্রের কথা বলে সেটি বিজ্ঞানসম্মত নয়, তাই জাসদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করা'। এটি মূলত জাসদের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খানের চিন্তা। সেই থেকে বিশেষ করে বিভক্ত ছাত্রলীগের দুই দলের একটিকে 'মুজিববাদী' ও অন্যটিকে 'বৈজ্ঞানিক' বলা হয়। দেশে ফিরেই এভাবে টের পেলাম যে অনেক কিছু বুঝতে আমার এখনো বাকি।

ঐ যে মানুষের আতঙ্কের কথা বল্‌লাম তা এমন ছিল যে অন্য রকম কোন শব্দ যেমন গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়া বা বিয়েতে বাজি ফোটানো তাতেই সবাই ভয় পেয়ে যেতো অজানা আশঙ্কায়। তার চেয়েও বড় রকমের একটি ভুল কারণে ভয় পাওয়ার ঘটনা করে ঘটছিলো। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তার সদ্য পাওয়া মিগ ফাইটার বিমানে প্র্যাকটিস করার জন্য মাঝে মাঝে শব্দের গতির সীমা অতিক্রম করে শব্দোত্তর গতিতে (সুপার সোনিক) চলে যাচ্ছিল। তখন কামান দাগার মত শব্দ হচ্ছিলো। সর্বসাধারণের এই ভয় ভাঙ্গাবার একটি নাটকীয় উদ্যোগের সঙ্গে নিজকে জড়িত করার সুযোগ আমি এ সময় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সাধারণ গতি থেকে বিমান যখন শব্দ-গতির মধ্য দিয়ে শব্দোত্তর গতিতে যায় একে বলা হয় শব্দ-বাধা (সাউন্ড বেরিয়ার) অতিক্রম করা, কারণ ওসময় বিমানের সামনে ক্রমে সংকোচিত হওয়া বাতাসের একটি বড় বাধা জমে ওঠে এবং শব্দের গতি অতিক্রম করে যাবার মাধ্যমে এর যখন মোচন ঘটে তখন কামানের গোলার মত পর পর বুম বুম কিছু বিকট শব্দ (সোনিক বুম) হয়, যা পুরো শহরে শোনা যায়। সে সময় এই শব্দ মানুষ যখন মাঝে মাঝে শুনছিল—ওপরে আকাশে বিমান যে রয়েছে এবং তার থেকে যে এরকম কামানের মত শব্দ হতে পারে এটি তেমন

কারোই বোঝার কথা নয়। তাই কর্তৃপক্ষের অজান্তেই তা শহরে বেশ বড় আতঙ্কের সৃষ্টি করে চলেছিলো এবং নানা গুজবের জন্ম দিচ্ছিলো। এর নিরসনে বাংলাদেশ টেলিভিশন গণসংযোগের একটি দারুণ পদক্ষেপ নিলো। ওখান থেকে প্রযোজক নওয়াজেশ আলী খান সাহেব (টেলিভিশনের একেবারে প্রথম যুগের পথিকৃৎদের একজন, পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ও এ টি এন বাংলার ঊর্ধ্বতন কর্ণধার) খবর পাঠালেন সোনিক বুমের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চিত্র ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সঙ্গে টেলিভিশন স্টেশনে (তখন বর্তমান রাজউক ভবনে) দেখা করতে হবে। আমার দেয়া রেখাচিত্রগুলো টেলিভিশনের আর্টিস্টরা দেখাবার মতো সুন্দর করে এঁকে দিলেন। অনির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানে সব চেয়ে দর্শকপ্রিয় একটি সময়ে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার শওকতের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে আমাকে ব্যাপারটি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়া হলো। তখন সব অনুষ্ঠানই লাইভ অনুষ্ঠান ছিল, আগে রেকর্ড করার কোন সুযোগ ছিলোনা। স্কোয়াড্রন লিডার শওকত সাউন্ড বেরিয়ার অতিক্রমণে তাঁর অনুভূতির কথা বল্লেন—কারণ যে দু'একজন পাইলট ঢাকার আকাশে এটি করছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বল্লেন 'কাল সকাল ঠিক ন'টার সময় আমি বিমান নিয়ে আকাশে যাব আর পর পর কয়েকবার সোনিক বুম সৃষ্টি করবো।' আমি এই কথাটিকে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে নিইনি, ভেবেছি তিনি বলেছেন বটে লোকে খেয়াল করবেনা, ভুলে যাবে।

পরদিন সকাল ন'টায় ওই কথা মনে না রেখে রিক্সা করে আজিমপুর কলোনির পাশ দিয়ে শেখ সাহেব বাজার থেকে কার্জন হলে যাচ্ছিলাম। দেখলাম কলোনির নানা ভবনের ছাদে ও মাঠে অনেকে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, মহিলা ও তরুণরাই বেশি—বুঝলাম স্কোয়াড্রন লিডার শওকতের অপেক্ষা করছে তারা। ঠিক ওই সময়ে আকাশে ভীষণ শব্দ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল একটি মিগ ও পরক্ষণই সেই বুম বুম। বুঝলাম আজিমপুরের এই দৃশ্য ঢাকা শহরের সব জায়গারই ছবি। তার মানে টেলিভিশনের পর্দা থেকে রঙ্গমঞ্চ চলে গেছে আকাশে, আর তা নিরসন করেছে অন্তত একটি বড় অহেতুক আতঙ্কের ঘটনা। আমার কাছে এই ঘটনাটিকে এখনো মনে হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইতিহাসে সফলতম গণ-সংযোগগুলোর একটি।

ফেরার কয়েক মাসের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন হতে দেখলাম। এ ছিলো একেবারেই নিরুত্তাপ একটি নির্বাচন—প্রতিযোগিতার তেমন পরিবেশ ছিলো বলে মনে হয়নি আর সে রকম কোন প্রতিযোগিতা সৃষ্টিও করতে পারেনি কোন বিরোধীদল—না জাসদ, না ভাসানী ন্যাপ, না মুজফ্ফর ন্যাপ বা অন্য কেউ। আসলে গোড়া থেকেই রাজনৈতিক আবহাওয়াটি কর্তৃত্ববাদিতার দিকে চলে যাচ্ছিলো। এর আগের বছর (১৯৭২) খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে সংবিধান

রচনা করা হয়েছিলো এবং শিগ্‌গীর তাতে যে সংশোধনী নিয়ে আসা হয়েছিল তাতেও ক্রমাগত এই মূল সুরটিই প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। দেশে ফেরার পর থেকেই এই দিকটি লক্ষ্য করে ক্রমাগত নিরাশ হয়েছি। ছোট বেলা থেকে এমনকি রাজনীতির বিশেষ কিছু বোঝার আগে থেকেই একটা জিনিস সব সময় আশেপাশে ঝড় তুলতে দেখেছি তা হলো সংবিধান বিতর্ক। সেই বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যখন তাঁর মাসিক ভাষণে বোঝাবার চেষ্টা করতেন কী ভাবে নানা ভারসাম্য রক্ষিত হবে—এক কক্ষ না দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ হওয়া উচিত; সেই যুক্তফ্রন্টের চুয়ান্নোর আগেপরে মানুষের ঘরে ঘরে আলোচনার ঝড় ওঠেছিলো—যুক্ত নির্বাচন না পৃথক নির্বাচন, কতখানি স্বায়ত্তশাসন হবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট হ্যাঁ কি না; এসব নিয়ে দলগুলোর মধ্যে কখনো সমঝোতা হয়েছে, কখনো দারুণ বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এসবের অনেক কিছু নিয়েই হয়তো অনেকে নেহাত রাজনীতিই করে গেছে—তবুও এমন একটি ধারণার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেছিলাম যে সংবিধান চটপট লিখে ফেলার জিনিস নয়, সংগ্রামের মধ্যে দেশ কায়েম হলে তার দোহাই দিয়েও নয়, অন্য কোন দেশেরটি মোটামুটি অনুকরণ করে গিয়েও নয়, জনজোয়ারের একক নেতৃত্বের বর্তমান বাস্তবতাকে লক্ষ্য করেও নয়; বরং সাবধানে, কোন বিতর্ককে এড়িয়ে না গিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এমন জনগোষ্ঠীর নায্য মতামতকেও ধারণ করবে সে ব্যবস্থা রেখে, নানা দিক থেকে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে, দীর্ঘমেয়াদী সুশাসনের কথা চিন্তা করেই তা তৈরি করতে হয়। তাই বাহাত্তরে কাজটি যে ভাবে হয়েছে এবং তারপর তাতে পরিবর্তনগুলো দ্রুত লয়ে যেভাবে আনা হয়েছে, তাতে এমন কোন দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা করা হয়েছে বলে মনে হয়নি। এক তরফা জোরের শাসনের বিপরীতে বিরোধীদের হিংসাশ্রয়ী বিরোধিতা আর তার হিংসাশ্রয়ী (অনেক ক্ষেত্রে আইনের বাইরে গিয়ে) দমনই শিগ্‌গীর দেশের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তরে এটি প্রকটতর হলো, পঁচাত্তরে আরো।

এর মধ্যে অবশ্য আমার জগতটি তখন রাজনীতির জগত থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে হল জীবনে এবং তার পরে পরে যতটুকু কাছে ছিল সে তুলনায় তো বটেই। আমি বরং রাজনীতির বাইরে যে মানুষরা নতুন দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের কিছু সান্নিধ্য পাচ্ছিলাম। ইউনূস ভাই দেশে ফিরে এসে আমেরিকায় তাঁদের সংগঠিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ফাউন্ডেশন মুক্তিযুদ্ধ কালে ও তার পরপর দেশে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেবার চেষ্টা করছিলো। এর মধ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান ব্যক্তিত্ব স্থপতি ফজলুর রহমান খান আমেরিকা থেকে এলে তাঁকে সহ ইউনূস ভাই এমনি কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় গেলেন—বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমিও আগ্রহী হয়ে গেলাম। সাভারে ডা. জাফরুল্লার নেতৃত্বে গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যাত্রা ওই নামে সবে শুরু হয়েছে—যদিও মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশ ফিল্ড

হসপিটাল হিসেবে বহু আগেই তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আজ সাভারে যেখানে গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নানা স্থাপনা রয়েছে সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে খাটানো বেশ কিছু তাঁবু থেকেই তখন চলছিলো এর কার্যক্রম। এখানেই দেখলাম নারী-পুরুষ-শিশুর সুশৃঙ্খল লাইন চিকিৎসার জন্য বা ওষুধ নেবার জন্য। কাছে গাছের ছায়ায় ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি সহ বড় ক্লাস চলছে। বাঁশের তৈরি বেঞ্চিতে বসে এখানে প্যারামেডিক ট্রেনিং নিচ্ছে গ্রামের তরুণ তরুণীরা। ডা. জাফরুল্লাহ সহ যে অল্প কয়েকজন ডাক্তার নার্স আর ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক আছেন তাঁরাও এই তাঁবুতেই বাস করেন। গ্রাম্য যে হাতুড়ে ডাক্তার আছেন তাদেরকেও এখানে গড়েপিটে নেয়া হচ্ছে। তরুণ ডা. জাফরুল্লাহকে দেখলাম প্রাণশক্তিতে ভরপূর; নতুন দেশের সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য তাঁর যে চিন্তা ভাবনা তা সনাতন চিন্তা ভাবনা থেকে অনেক এগিয়ে—তবে তা সরকারের ওপর সরাসরি নির্ভর করে নয়। তাঁর মতো মানুষদের দেখে ভরসা হলো দেশে সব কিছু একমাত্রিক ভাবে সরকারের করার ব্যাপার নয়, আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রকাশের একমাত্র কর্মক্ষেত্রও রাজনীতি নয়। এর মধ্যে কী ভাবে জানি একটি সুন্দর পত্রিকা 'মাসিক গণকেন্দ্র' পেতে থাকলাম যার সংবাদগুলোও রাজনীতির থেকে অনেক দূরে—এটি 'বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদের' (বাংলাদেশ রুর‍্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি, সংক্ষেপে ব্র্যাক) মুখপত্র। 'আমরা ফসল ফলাই', 'মাছের দেশ বাংলাদেশ', 'গ্রীষ্ম ও বর্ষার সব্জি','গভীর পানির ধান'—এমনটিই বিভিন্ন লেখার শিরোনাম। চমৎকার আঙ্গিকে প্রকাশিত হলেও শহুরে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি-সেবীদের অধিকাংশ হয়তো এসবকে স্থূল মাটি-কাদার জিনিস মনে করে সরিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু স্পষ্টত তাদের সেই দিন গত হয়েছে। কারণ এগুলো এখন কথার কথা নয়, গ্রামের মানুষের সংগঠন এগুলো বাস্তবায়ন করছে। বড় বড় কথা ও খুন-খারাবির খবরের বিপরীতে এ যেন পল্লীর এক রাশ স্নিগ্ধ হাওয়া। আমাদের সহজ সরল মানুষের জীবন সংগ্রামে তাদেরকে নতুনভাবে সংগঠিত করছে আমাদেরই শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা। আজ ব্র্যাক নিজেকে তার ওই পুরোনো পুরো নামে না বলে শুধু ব্র্যাক হিসেবেই চিহ্নিত করছে—কিন্তু সেই পল্লী প্রগতি পরিষদ নামটিই আমার স্মৃতিতে গেঁথে রয়েছে—মূলত তার পত্রিকাটির নানা লেখার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম অন্য একটি স্বপ্নের বাংলাদেশকে। সেই সঙ্গে মুগ্ধ হয়েছিলাম এর পেছনের সেই নিবেদিত ব্যক্তিত্বটির দ্বারা—ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হোসেন আবেদ (পরে নাইট উপাধি পেয়ে স্যার আবেদ)।

অন্য রকম বিশ্ববিদ্যালয়

যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ফিরলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তা আর আগের মত ছিলনা। প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি হল, প্রতিটি অফিস শহীদ শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীর শোক করছে। আমাদের বিভাগে আমার শিক্ষক খান খাদেম ২৫ শে

মার্চের রাতেই শহীদ হয়েছিলেন। ভাবুক আপন মনে থাকা এই মানুষটি কারো সাতেপাঁচে কোনদিন ছিলেননা। এত বেদনার মধ্যেও ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কোন শেষ ছিলনা—নতুন দেশের প্রথম যুগের বিজ্ঞানী হয়ে শুরু করবে এমন স্বপ্ন তাদের চোখে মুখে। শুরুর দিকে মুক্তি যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে অটো-প্রমোশন ইত্যাদির দাবি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও শিক্ষার মান কমিয়ে ফেলার উপক্রম করলেও অন্তত আমাদের বিভাগে সেটি আমরা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। তিন বছরের পর পরীক্ষা দেবার বৃটিশ কায়দার বদলে আমেরিকার মত কোর্স সিষ্টেমে যাবার জন্য আমরা বিভাগেই একটি প্রক্রিয়া শুরু করলাম—যেটি এখানকার পড়াশোনায় একটি শৃঙখলা স্থাপনে খুব সহায়ক হয়েছিলো, এবং পরে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়েছে। সাউদাম্পটনে আমার ল্যাবোরেটরিতে যে পরীক্ষার কাজ করেছি তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো এটি কোন অসম্ভব ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির ব্যাপার ছিলোনা—অনেকটাই ছিলো আমার নিজের তৈরি অথবা ছোট খাট যন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি। আসলে ব্রায়ান হপকিন্সের নেতৃত্বে কাজ করা অধিকাংশ ছাত্রেরই এমনটি ছিল। অন্যদিকে সুলতান স্যারের ক্ষেত্রেও ছিল কথাটি সত্য। স্যারের নেতৃত্বে সলিড ষ্টেট ফিজিক্সের একটি কার্যকর গবেষণা ল্যাবোরেটরি গড়ে তোলা আমাদের জন্য কঠিন হলোনা। শুরুতে আমরা দু'জনেই ছিলাম এর শিক্ষক—পরে আরো তরুণতর দু'একজন এতে যোগ দিয়েছিলো। প্রধানত সুলতান স্যারের নেতৃত্বের গুণেই আমার নানা রকম কাজের মধ্যেও গবেষণার দিকটি সব সময় ভাল ভাবেই চালু রাখতে পেরেছি যার ফলে আন্তর্জাতিক অন্যান্য কিছু ল্যাবোরেটরিতে গবেষণার কাজ করার ও গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করার একটি সুযোগ বরাবর ছিল। সুলতান স্যার অকাল প্রয়াত না হলে হয়তো গবেষণার জগতে তিনি আরো অনেক বড় স্বীকৃতি লাভ করতে পারতেন। সুলতান স্যার ও আমার যৌথ তত্ত্বাবধানে প্রথম যে ছাত্রকে এই ল্যাবোরেটরিতে আমরা পি এইচ ডি গবেষণা শুরু করিয়েছিলাম সেই বাবুল আনাম ভাল গবেষক হওয়া ছাড়াও ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং জেলখাটা বামপন্থী ছাত্র। পরে সুইডেনে চলে গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলো এবং বিজ্ঞানী হিসেবেই কর্মরত ছিলো।

বাবুল আনামের উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ফিজিক্সের ছাত্রদের চোখে-মুখে স্বপ্ন থাকলেও তাদের অনেকের জীবন আগের মত ছিলোনা। কোন কোন অত্যন্ত কৃতী ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে এই একাডেমিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কই ত্যাগ করেছিলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল মেনন ভাইয়ের ভাই শহীদুল্লাহ খান বাদল (পরে সফল ব্যবসায়ী)। বাদল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট হওয়া সেই বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন, যথারীতি পদার্থবিদ্যায় ভর্তি হয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিল, ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলো। আমি যখন ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছি তখন সে বিভাগের তুখোড় ছাত্র; মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বিভাগে

আর ফেরত আসেনি, চলে গিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেও অনেকের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত জীবন বদলে গেছে। আমি ফিরে এসে বিভাগে যখন যোগ দিয়েছি তখন পদার্থবিদ্যার একজন মনোযোগী ও শান্তশিষ্ট ছাত্রকে পেয়েছি সে সবার সঙ্গে বন্ধুসুলভ ও হাসিখুশি। তবে জেনেছিলাম যে তার জীবনটাও একেবারে বিপর্যস্ত। তার বাবা কক্সবাজার থেকে সেই যুক্তফ্রন্টের সময় থেকে নির্বাচিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য, যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা মৌলভি ফরিদ আহমদকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সহায়তাকারী হবার অভিযোগে ১৬ ডিসেম্বরের পরপর জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, তুখোড় পার্লামেন্টেরিয়ান, বিখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক ফরিদ আহমদের এই পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ছেলেকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করেছিলো—কিছুদিন পরেই সে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলো।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনে একটি বড় পরিবর্তন আসছিলো প্রধানত শিক্ষকদেরই দাবির কারণে। আইয়ুবী শাসন আমলে ভিসি ওসমান গণির পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষদেরকে সব ক্ষেত্রে একক কর্তৃপক্ষের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলতে হতো। ভিসি, ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হলের প্রভোস্ট সবাই প্রায় স্থায়ী ভাবেই থেকে যেতেন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকতেন, আর তাঁদের ক্ষমতাও ছিল অনেক ক্ষেত্রে সীমাহীন। যদিও এঁরা সবাই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন এ কথা বলা যাবেনা, তবুও অন্য শিক্ষকরা মনে করতেন তাঁদের স্বাধীনতা যথেষ্ট খর্ব হচ্ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে বলা হলো তাঁরা কী ধরনের আইন চান তার খসড়া করতে। শিক্ষক সমিতির নেতা হিসেবে যাঁরা এটি করছিলেন তাঁদের দু'জন আমার ঘনিষ্ঠ ছিলেন—আমার শিক্ষক ড. অজয় কুমার রায় এবং সম্প্রতি পরিচয় গড়ে-ওঠা ভূগোলের শিক্ষক ড. মনিরুজ্জামান মিয়া। তাঁদের কাছে কিছু কিছু শোনতাম কেমন করে রচিত হয়েছে সেই পরে বহুল আলোচিত তিয়াত্তরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। সব কিছুতে নানা স্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো—সেনেট, সিন্ডিকেট, ডীন, ভিসি—কোন কোনটি অবশ্য আংশিক ভাবে। এতে শিক্ষকরাই মূলত নিজেরা ভোট দিয়ে তাঁদের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে নির্বাচিত করছেন। স্থায়ী বিভাগীয় প্রধানের বদলে অপেক্ষাকৃত সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে প্রত্যেকে তিন বছর করে আবর্তিত হওয়া চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা হলো। তাঁরাও আবার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন নিজেরা একা তেমন করতে পারবেননা, করতে হবে শিক্ষকদের দুটি কমিটির সঙ্গে মিলে। রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে তার নানা পদে থাকার অধিকারও পেলেন শিক্ষকরা। তবে এভাবে সব দাবি মেনে নিয়েও সংসদ নির্বাচন করার অধিকারটুকু দেয়া হলোনা। এ সম্পর্কে শুনেছিলাম

আল-মুতী শরফুদ্দীন সাহেবের কাছে—তিনি শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ রচনায় কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান সাময়িকী ও বিজ্ঞান জনপ্রিয় করণের নানা কাজে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো সেই ফাঁকে অধ্যাদেশ নিয়েও নানা কথা জানতে পারতাম। তিনি বল্লেন "খসড়াটির একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়েও সংসদ নির্বাচন করতে পারার কথাটি ছিল। কিন্তু ওটি বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়ে আনতে গেলে তিনি বল্লেন 'সব ঠিক আছে, শুধু নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে হবে এ কথাটি জুড়ে দাও।" সেটিই করা হয়েছিলো।

এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের অধীনেই সেই থেকে ২০১২ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা জীবন কেটেছে—এর যাবতীয় সুফল কুফল সব ভোগ করে। শুরুতে কর্তৃপক্ষের যাঁরা আগের সিষ্টেমে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা শিক্ষকদের এত স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারছিলেন না; অপর পক্ষে শিক্ষক সমিতি একে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত ফসলের একটি মনে করে এই অধ্যাদেশের অধীনে শিক্ষকদের প্রত্যেকটি অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত কড়া নজর রেখে সক্রিয় থাকতো। তখন ভিসি হয়েছেন আমার শিক্ষক প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী। নিজে এক সময় বিরোধী রাজনীতিতে ভাল ভাবে জড়িত থেকে তৎকালীন ভিসি ওসমান গণির সঙ্গে লড়েছেন। এখন তরুণতর শিক্ষকরা যখন ওই অধিকারগুলোই আদায় করে ভিসি'র অগাধ ক্ষমতাকে বার বার চ্যালেঞ্জ করছিলেন তখন তিনি খুবই বিরক্ত ছিলেন। আমাকে একদিন দুঃখ করে বল্লেন 'ওই যে শিক্ষক সমিতির নেতারা রয়েছে আর কোন বই হাতে নিক আর না নিক, তাদের কাছে সব সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বইটি দেখতে পাবে। এর সব আইন তাদের মুখস্থ, কথায় কথায় ওটি দেখায়।'

তিয়াত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার বাইরে যত অনিয়ম, সংঘাত, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সহিংসতা হচ্ছিল তাকে আমরা কেউ কেউ অনেকটা বোঝার চেষ্টা করেছি—মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ফল হিসেবে। তাই তখন ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলো নিয়ে যথেষ্ট বিভোর ছিলাম। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল জিনিসগুলো ভিন্ন প্রকটতর মাত্রা পেতে আরম্ভ করেছিলো। রাজনৈতিক খুন-খারাবি অসম্ভব পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। বিরোধী দল ও গোষ্ঠীগুলোর লোকদের আইন বহির্ভূত গুম-খুনের ঘটনা জনে জনে আলোচিত হচ্ছিল—রক্ষীবাহিনীর আচরণ বেশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দেশে ফেরার পরদিন থেকে অনেকেই আমাকে এই বিশেষ মিলিশিয়া বাহিনীটি দেখিয়ে বলার চেষ্টা করেছে যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে এটিই সরকারের প্রধান অস্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন হলে একই সঙ্গে সাত জনকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখার ঘটনাও ঘটলো, যা সরকারী ছাত্র লীগেরই অভ্যন্তরীণ কারণে সংগঠিত হয়েছে বলে পরে দেখা গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী রাজনীতির সৃষ্ট অরাজকতা যে কোন পর্যায়ে

পৌঁছে গিয়েছিলো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো তিয়াত্তর সালের ডাকসু নির্বাচনের সময়। পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার শিক্ষক কৃতী তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ড.রফিকউল্লাহ ছিলেন ওইসময় ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট। তিনি নির্বাচন পরিচালনায় তাঁকে সহায়তা দেবার জন্য বিভাগে আমরা তাঁর কয়েক জন তরুণ সহকর্মীর নাম পাঠিয়ে দিলেন। এই সুবাদেই সেই ঐতিহাসিক দুঃখজনক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হলো।

এ নির্বাচনে মুজিববাদী ছাত্রলীগ জোটবদ্ধ নির্বাচন করেছিলো ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সঙ্গে। এর কারণ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দেশব্যাপী প্রবল দাপটের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহাত্তর সালের ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলো, ভিপি হয়েছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (বর্তমানে কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতি)। ছাত্র ইউনিয়নের সেই জোরালো অবস্থান এবং ওই সময় সরকারের প্রতি প্রায় নিশর্ত সমর্থনের কারণে এবার ছাত্র লীগ তার সঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচনে গেলো। সরকার সমর্থক জোটের ভিপি প্রার্থী হলো ছাত্র ইউনিয়নের নূহ উল আলম লেনিন (পরে আওয়ামী লীগের সিনিয়র কেন্দ্রীয় নেতা) এবং জি এস প্রার্থী ছাত্রলীগের ইসমত কাদির গামা—এটি 'লেনিন-গামা পরিষদ' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো। তার বিপক্ষে ভিপি প্রার্থী মাহবুবুল হকের নেতৃত্বে জাসদ ছাত্রলীগের জোরালো অবস্থান। মাহবুবুল হকের সেই মুক্তিযোদ্ধাসুলভ লম্বা চুল, লম্বা গোঁফ-দাড়ি। সে সময় হাইকোর্টে'র মাজারের বিখ্যাত দেওয়ানা ফকির (মতান্তরে গাঁজার আসরের) নূরা পাগলার চেহারার সঙ্গে এদিক থেকে তার সাদৃশ্য ছিল বলে ছাত্র মহলে 'নূরা পাগলা' নামেই খ্যাত ছিল এই জনপ্রিয় ছাত্র নেতা। তখন সরকার সমর্থক জোটের একটি প্রিয় শ্লোগানই ছিল 'গামা রে গামা, নূরারে থামা'—গামা মানে তাদের জি এস প্রার্থী ইসমত কাদির গামা।

নির্বাচনের দিন ফজলুল হক হলের অডিটোরিয়ামে ভোটের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুব ভাল লাগলো, মনে হলো সেই সলিমুল্লাহ হলে আমাদের নির্বাচনের দিনগুলোতে ফিরে গেছি—সবই ওরকম, শ্লোগানে শ্লোগানে উৎসব মুখরিত পরিবেশ। শুধু একটি দৃশ্য আমাদের নির্বাচনের সঙ্গে মিল্‌লোনা—বিভিন্ন হলে পরিদর্শন করে জি এস প্রার্থী ইসমত কাদির গামা যখন অডিটোরিয়ামে ভোট কেন্দ্র দেখতে এলো সকল শিক্ষক, প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, নির্বাচনে জড়িত কর্মচারীরা সশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন, যে অনেক্ষণ তিনি রইলেন তাঁর সমাদরে ব্যস্ত রইলেন। ভাবলাম এই টুকু পরিবর্তন তো হবেই, মুক্তিযুদ্ধই ছাত্র নেতাকে দেশ শাসনের অবস্থায় এনে দিয়েছে। নির্বাচন শেষে ভোট গণনা তদারকের দায়িত্ব পালন করছিলাম বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে ঘুরে। দেখলাম জাসদ ছাত্রলীগের পুরো প্যানেল শুরু থেকেই এগিয়ে, শেষ হতে হতে বিপুল ভোটে এগিয়ে—আর মাহবুবুল হক নিজের এগিয়ে থাকার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশি। ফলাফলের পূর্ণ শীট তৈরি করে প্রভোস্ট রফিক উল্লাহ স্যার তাতে স্বাক্ষর

ইত্যাদি করেছেন, এবং সামনে গিয়ে তা ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় ঘটলো সেই ঘটনা।

হঠাৎ খুব কাছাকাছি থেকে অটোমেটিক ফায়ারিঙের কানফাটা শব্দ শোনতে লাগলাম—এত কাছে থেকে এরকম শব্দ আগে কখনো শুনিনি (স্কুলের ওই জেসিসি ক্যাম্পের কথা বাদ দিলে)। তখন রাতের বেলা, গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সব বাতি বন্ধ হয়ে গেলো, দেখলাম অন্যরা সবাই শুয়ে পড়েছে ক্রলিং করে যে যেখানে পারছে টেবিলের তলা ইত্যাদিতে আশ্রয় নিচ্ছে, আমিও তাই করলাম। দু'তিন মিনিট পরে গুলির শব্দ থেমে গেলো বাতি চলে এলো—শোয়া অবস্থাতেই দেখলাম নিজেদের মুখ আংশিক রুমালে ঢাকা কয়েকজন তরুণ প্রভোস্ট রফিকউল্লা স্যার ও তাঁর সিনিয়র হাউস টিউটরকে দাঁড় করিয়ে তাঁদের মাথার খুব কাছে পিস্তল তাক করে আছে, এবং অত্যন্ত কর্কশ স্বরে বলছে 'রেজাল্ট শীটগুলো এবং ভোট গণনার সব কাগজ এক্ষুণি হাতে দে, নইলে জানে মেরে ফেলবো'। স্যার একে ওকে ডাক দিয়ে সব কাগজ এই পিস্তলধারীদের হাতে তুলে দিলেন, ওরা ভাল করে দেখে নিলো। ইতোমধ্যে একই রকম মুখ বাঁধা অস্ত্রধারী আরো বেশ ক'জন তরুণ সকল ব্যালট ও অন্যান্য কাগজ একটি বাক্সে ঢুকিয়ে তা অডিটোরিয়ামের সামনে দাঁড়ানো একটি জিপ গাড়িতে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কাজ হয়ে গেলো, তারপর ওরা সবাই সামরিক কায়দায় ওপরের দিকে ফায়ার করতে করতে বের হয়ে গেলো। জিপের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই বিধ্বস্ত ও সম্বিতহারা আমি দ্রুত হল ত্যাগ করে বাড়ির দিকে যাবার জন্য একটি রিক্সা নিলাম। কিন্তু ওদিকে কিছুটা এগিয়ে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত পৌঁছতেই জগন্নাথ হল এলাকা থেকে প্রচণ্ড ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনতে পেলাম—বুঝলাম ওখানেও আলাদা ভাবে আর একটি দল একই রকম অপারেশন চালাচ্ছে। আর ওদিকে এগোতে সাহস হলোনা। স্পষ্টত ওদিকে সলিমুল্লাহ হল, জহুরুল হক হল সব জায়গাতেই একই সঙ্গে একই ঘটনা ঘটছে। তাই রিক্সাওয়ালাকে বল্লাম চানখার পুল হয়ে পুরোনো ঢাকার দিকে চলে যেতে, তারপর ওই দিক থেকে শেখ সাহেব বাজারে বাসাতে। পরে শুনেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হলে সেদিন সামরিক কায়দায় এই রকম অভিযান প্রায় একই সঙ্গে চালিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাগজ ও দলিল অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গায়েব করে ফেলা হয়েছিলো। পরিচিত শিক্ষকরা যারা বিভিন্ন হলে দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের কাছে জেনেছি প্রায় প্রত্যেকটি হলে জাসদ ছাত্রলীগের প্যানেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো। আমার একটি বাড়তি দুঃখ হলো যে যার পরাজয় এড়াবার জন্য নির্বাচনকে এভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে অস্ত্র প্রয়োগে ভেস্তে দেয়া হলো তার মধ্যে আমার পুরোনো প্রিয় সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নও রয়েছে।

চুয়াত্তরের শুরুর দিকে অবশ্য সব কিছু এমন নৈরাশ্য জনক ছিলনা। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন ড. মাজহারুল ইসলাম। তিনি একুশে

ফেব্রুয়ারির আগে একটি খুবই জমজমাট বাংলা সাহিত্য সম্মেলন করলেন—বাংলাদেশের ও পশ্চিম বঙ্গের অনেক খ্যাতনামাদের সমন্বয় ঘটালেন সেখানে; অন্যান্য দেশ থেকেও কেউ কেউ এসেছিলেন। খুব উপলব্ধি করেছিলাম যে আমরা বাংলাভাষীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হচ্ছি, একদিন আমরাই পৃথিবীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জয়জয়কার ঘটাবো। কিন্তু এর মধ্যেও অসহিষ্ণুতার রোগ আমাদের পিছু ছাড়ছিলোনা। একুশের আয়োজনের একটিতে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিলো দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি চর্চা নিয়ে। ওই অধিবেশনের জন্য মঞ্চে ব্যানার ও কিছু পোস্টার লাগানো হয়েছিলো। সামনের সারিতে গণ্যমান্যদের মধ্যে বসেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। আমাদের বক্তৃতার পর তিনি খুব রাগত ভাবে মঞ্চে উঠে ব্যানার ও পোস্টারগুলো ছিড়ে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন 'আবার ইংরেজির গোলামি করার জন্য আমরা স্বাধীনতা আনিনি'।

আমাদের সলিমুল্লাহ হলের পুরোনো বন্ধুদের ও অগ্রজদের অনেকে এখন সেক্রেটারিয়েটে জাঁকিয়ে বসেছে সিএসপি অফিসার হিসেবে। শাকুর ভাইতো বল্‌তে গেলে তখন বেশ সিনিয়র, আমার সমসাময়িকরাও অধিকাংশ মুজিব নগর সরকারে কাজ করার সুবাদে তখন ডেপুটি সেক্রেটারি অথবা সম পর্যায়ের। কার্জন হল থেকে অনেক সময় সেক্রেটারিয়েট যেতাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে, কাজও পড়তো কখনো কখনো। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক কিছু মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান বা অনুমোদন ছাড়া হতোনা; আমলাতন্ত্র আরো বরং বেড়েছিলো এবং এককেন্দ্রিক হয়েছিলো। আমার লাভের মধ্যে যা হয়েছে তা হলো এখন এসব বন্ধুবান্ধবদের হাতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খসরুজ্জামান ও শহীদুল আলম ছিলো। ওদিকে এক অদ্ভুত যোগাযোগে রেজাউল হায়াত তখন গোপালগঞ্জের এস ডি ও (মহকুমা প্রধান) এবং বোরহান ওখানেই এস ডি পি ও (মহকুমা পুলিশ প্রধান)। ঢাকায় এলে অনেক সময় দু'জনে এক সঙ্গে আমাদের শেখ সাহেব বাজারের বাসায় চলে আসতো। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ গোপালগঞ্জ সমস্যার কথা আলোচনা করতো—তার সবই বিরোধীপক্ষের ও সরকার পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ প্রসঙ্গেই, ওদের মধ্যে কাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হবে সেই বুদ্ধি-পরামর্শ। এই দুই অতি তরুণ অফিসারকে যে কী সামাল দিতে হচ্ছে তা শুনে অন্য জায়গাগুলো সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ ধারণা হলো।

চুয়াত্তরের এপ্রিল-মে মাস থেকে এই ঢাকায়, এমন কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর বৃক্ষ-সুশোভিত অঞ্চলেও খাদ্যাভাবের দৃশ্য দেখলাম। আমার সেইসব বন্ধুরা যারা শুধু আমলা ছিল না, অর্থনীতির ছাত্রও ছিল, তাদের কাছে এর কোন জবাব ছিলোনা, মনে হলো তাদের পেছনে যে সরকার তার কাছেও কোন জবাব ছিলোনা। 'তেমন কিছু নয়; এটি সাময়িক অসুবিধা মাত্র;

আমরা সবাইকে লঙ্গরখানায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি'—এমনিতরো বুঝদেয়া কথাবার্তা শুধু তাঁদের কাছে শুনছিলাম। বাইরে রাজনৈতিক হানাহানি বরাবরের মতে চলছিলো; আমরা শুধু দেখছিলাম রাজধানীতে চলে আসছে অসংখ্য মানুষ—কিসের আশায় কে জানে? হয়তো যেখান থেকে তারা আসছে সেই গ্রামাঞ্চলে বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই—তাই বাঁচার এই অসম্ভব আশা। চোখের সামনেই দেখছিলাম বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য সেই আশা দুরাশাই ছিল। প্রত্যেক দিন রিক্সা করে শেখ সাহেব বাজার থেকে যখন কার্জন হলে আসতাম প্রয়ই দেখতাম ফুটপাতে লাশ, সেই লাশ তুলে নিচ্ছে আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলামের গাড়ি। আর ফুটপাতে বহু স্ত্রী-পুরুষ শিগ্‌গির শুধু এই পরিণতির অপেক্ষায় থাকছে। বোঝাই যাচ্ছিল এর সমাধান আমাদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের হাতে ছিলনা। বাইরের উন্নত রাষ্ট্রের বা জাতিসংঘের কোন সংস্থারও কোন উপস্থিতি সেদিন চোখে পড়েনি। তবে কি আমরা আন্তর্জাতিক 'খাদ্য রাজনীতি বা 'খাদ্য-কূটনীতি'-এর শিকার হতে যাচ্ছি। পত্র-পত্রিকায় যা পড়ছিলাম দেশের একটি বিশাল অংশে অসংখ্য মানুষের হাতে এমন কোন পয়সাকড়ি ছিলনা যা দিয়ে চাল কিনে জীবন রক্ষা করতে পারে—চাল বা যে কোন খাবার এমন দুর্মূল্য হয়েছিলো তখন।

চুয়াত্তরের প্রায় প্রথম থেকেই, বা তারও আগে থেকেই খাদ্যদ্রব্যের অভাবের একটি আলামত আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি নিজে শেখ সাহেব বাজারের রেশনের দোকানে রেশন কার্ড দিয়ে সীমিত আটা, চাল, চিনি ইত্যাদি লাইন ধরে তুলে আনতাম। ঢাকায়, এবং খুব সম্ভব পুরো দেশেও মধ্যবিত্ত ঘরেও এক বেলা রুটি খাওয়া তখন একেবারেই নিয়মে পরিণত হয়েছিল; যদিও এটি স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ কিছু নয়, কিন্তু মূল কারণটি ছিল আটার দাম তুলনামূলক ভাবে কিছু কম ছিল। শুধু তাই নয় তখন ঢাকা শহরের ঘরে ঘরে টবে, ছাদে, বারান্দায় সবজি লাগাবার ধুম পড়ে গিয়েছিলো এসবের অত্যধিক মূল্যের কারণে। শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর কলোনিতে প্রত্যেক ভবনের বারান্দায় কার্ণিশে টবে এসব সবজি দেখতাম। কেন জানি মরিচের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছিলো—তাই মরিচের গাছই দেখতাম সব চেয়ে বেশি। এ সবকে তখন আমরা সবাই বেশ একটু ফাইটিং স্পিরিট নিয়ে দেখেছি, মানুষ যে খুব অভিযোগ করেছে বা মিছিল করে বেরিয়ে এসেছে তা কিন্তু নয়।

কিন্তু এবার যে কারণে মানুষের মিছিল ঢাকা শহরে দেখতে হলো তাকে কোন ফাইটিং স্পিরিট দিয়ে তুচ্ছ করা সম্ভব ছিলোনা। শুনছিলাম শহরের নানা অঞ্চলে একটানা লঙ্গরখানায় মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে, অথচ দেশের অনেককে অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকতে হচ্ছে। বছর যত গড়ালো খাদ্যাভাব চরমে উঠে কিছুটা কমে এলো। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে এই বছর বর্ষা নামলো খুব জোরেশোরে। কোন কোন এলাকায় প্রবল

বন্যা দেখা দিয়েছে বলে খবর আসছে। মানুষকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হলো।

এর মধ্যে আমাকে যেতে হলো কিশোরগঞ্জে গুরুদয়াল কলেজে বি এস সি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে; ট্রেনে গেলাম ভৈরব বাজার স্টেশনে ট্রেন বদলিয়ে। বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা চল্‌লো, এর ফাঁকে ফাঁকে নরসুইন্দা নদীর দুই পারের এই শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানেও শিক্ষকদের মধ্যে সলিমুল্লাহ হলের আমার পরিচিতদের কয়েকজনকে খুঁজে পেলাম। শহর দেখাতে দেখাতে তারা বললো 'এই সুন্দর শহরটিকে আমরা বলি আমাদের বুদাপেস্ট—দানিয়ূব নদী যেমন হাঙ্গেরির ওই সুন্দর শহরকে বুদা আর পেষ্ট এই দুই অংশে ভাগ করেছে, তেমনি নরসুইন্দা নদী কিশোরগঞ্জকে—আমাদের কলেজের দিকের অর্ধেককে আমরা বলি বুদা আর সেতু পার হয়ে অন্য পারের শহরকে বলি পেস্ট'। কিশোরগঞ্জ ক্লাবে নিয়ে গেলো তারা আমাকে, ওখানে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সমাবেশ ঘটে—উচ্চ সরকারী কর্মচারী, কলেজের শিক্ষক, সফল উকিল, সবারই বয়স তারুণ্যের দিকে। সবাই মিলে তাঁরা টেলিভিশন দেখেন, কেউ কেউ টেনিস খেলেন, বাকিরা আড্ডা দেন। চরম সংকটের মধ্যেও ওখানকার জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হলোনা—যদিও এর কথা ঘুরে ফিরে আসছিলো। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখলেও মনে হয়না যে দেশে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, যার রেশ এখনো চলমান। তবে শোনলাম কয়েক দিন আগে দুর্ভিক্ষের ও বন্যার অবস্থা দেখতে এখানকার গর্ব বর্তমান মন্ত্রী এবং মুজিব নগর সরকারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এসেছিলেন। কিন্তু আবহাওয়া ও বন্যার কারণে তাঁর হেলিকপ্টার নামতে পারেনি, তাই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে। শহর থেকে একটু দূরে গিয়েই দেখলাম কিশোরগঞ্জে জন্ম নেয়া বড় ধনী জহিরুল ইসলামের দেয়া লঙ্গরখানায় খাচ্ছে খাদ্যাভাবের শিকার অনেক মানুষ। এই লঙ্গর নাকি একটানা দুইবেলা খাবার বিলিয়ে চলেছে এভাবে অনেক দিন ধরে। হয়তো গ্রামেগঞ্জে এরকম আরো মানুষের বদান্যতায় নিঃস্ব মানুষ দুমুঠো খেয়ে জীবন বাঁচাতে পেরেছে, নইলে ঢাকায় মানুষদের মিছিল হয়তো আরো দীর্ঘ হতো।

গুরু দয়াল কলেজে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু আমি কিশোরগঞ্জ থেকে তক্ষুণি ফিরতে পারলামনা। বন্যার অবস্থায় হঠাৎ খুব অবনতি হলো, নরসুইন্দার পানি ছাপিয়ে গিয়ে এমন অবস্থা করলো যে যাতায়তের কোন রাস্তা রইলোনা। ওই সময়টা এখানে হোস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করেই প্রধানত কাটলো। এরা অধিকাংশ আশপাশের এলাকা থেকে এসেছে—ইটনা, কটিয়াদি, নিকলি, যশোদল ইত্যাদি নাম এবং এদের বিচিত্র বৈশিষ্টের কথা এই প্রথম শোনলাম; এমনকি কোথায় বিখ্যাত কোন মানুষের জন্ম, কোন খাবারটি কোথায় প্রসিদ্ধ তাও। এসব জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যার একটি স্থানীয় বর্ণনা পেলাম তাদের মুখে। চার পাঁচ দিন

পর বন্যার অবস্থা ভাল হলে বাসে শম্ভুগঞ্জ এসে, সেখানে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আরেক বাসে ময়মনসিংহ এলাম। তিনচার ঘন্টা এখানে অপেক্ষা করে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা আসার বাস পেলাম। রওয়ানা হবার পর আবিষ্কার করলাম ওই বাসে আবার হেডলাইট নেই। অথচ অধিকাংশ পথ চলতে হলো রাতের বেলায়। অন্য গাড়ির পেছন পেছন চলে কোন রকমে এটি ঢাকা পৌঁছলো। আগাগোড়া পথে দেখলাম বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডব। খাদ্যাভাব ও বন্যা একত্র হয়ে চুয়াত্তর সনটিকে একটি চরম সংকটের বছরে পরিণত করলো।

ইংল্যান্ড থেকে ফেরার কিছুদিন পর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার সুযোগ হয়েছিলো। বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের কাজ অল্পদিনের মধ্যে শেষ করে ইউনূস ভাই বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানত তাঁর শিক্ষকদের অনুরোধে যাঁরা কমিশনের ডেপুটি চেয়াম্যান ও সদস্য পদে ছিলেন। কিন্তু এখানে করার মত কাজ কর্ম তেমন না থাকাতে এতে পদত্যাগ করে তিনি আবার অধ্যাপনায় যোগ দেন, এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ভিন্ন। গ্রামের মধ্যে হওয়াতে গ্রামের মানুষের সঙ্গে একটি সম্পর্ক বরাবর এর ছিলো, আর এ সম্পর্ক সব চেয়ে বেশি ছিল অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে। ইউনূস ভাই এখানকার ছাত্র শিক্ষকদেরকে নিয়ে পল্লী অর্থনীতির গবেষণাকে জোরদার করলেন, এবং ছাত্রদেরকে স্থানীয় পল্লীবাসীর কৃষি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করলেন। সে সময় শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে বোরো ধানের চাষ এবং তাতে উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গ্রামগুলোতে পানি সার ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার করা, সঠিক দূরত্বে সারিবদ্ধ করে ধান লাগানো ইত্যাদি আধুনিক নিয়মগুলো কৃষকদের মধ্যে চালু করার ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হলো; এমন কি রোপন ও কাটার সময় ছাত্র-শিক্ষকরা অংশ গ্রহণও করলো। এই সব কর্মযজ্ঞ দেখা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার পূর্বতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিভিন্ন ছুটিতে বাড়ি গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করেছি। আলমগীর ভাই (ইউনূস ভাইয়ের পুরোনো বন্ধু, আমাদের ঘনিষ্ঠ, পরে উপাচার্য) এবং তাঁর পাঞ্জাবি স্ত্রী আসমা ভাবী এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক। সলিমুল্লাহ হলে এপসু সহকর্মী আমাদের পরের ব্যাচের হায়াৎ হোসেনও এখানে শিক্ষক। বাহাদুর এখানকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে পাশ করে ইতিহাস বিভাগের গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর ইত্যাদি স্থাপনের কাজে ব্যস্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার খ্যাতনামা শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান এখানে চলে এসেছেন, ইকবালের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল। পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার শিক্ষক প্রফেসর শামসুল হক প্রধান হয়ে এসেছেন। সেই ছোটবেলায় আমাকে উৎসাহ দেয়া, চিরকাল ফার্স্ট হওয়া, কালী নারায়ণ বৃত্তি

পাওয়া কৃতী ছাত্র এখলাস ভাই ও তাঁর স্ত্রী হামিদা বানুও অধ্যাপক হিসেবে এখানে। কাজেই তখন চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনেক আকর্ষণ। এই আকর্ষণ আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিলো যখন ইউনূস ভাই এখানে কাছের জোবরা গ্রামে তেভাগা খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাঁর ছাত্রদের সহায়তায় গ্রামের কৃষকদেরকে সংগঠিত করে। জমির মালিক এক ভাগ; শ্রমদানকারী কৃষক এক ভাগ; এবং পানি, সার, কীট নাশক ইত্যাদির খরচ যুগিয়ে ইউনূস ভাইয়ের সংগঠিত তেভাগা কর্তৃপক্ষ পেতো এক ভাগ। ইউনূস ভাই ও তাঁর সহকর্মীদের এসব কাজ ওখানে থাকা কালে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম। আমার জন্য এ ছিলো এক নতুন জগত, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে যে গ্রামের মানুষের এত কাজ হতে পারে তা ছিল একটি বিস্ময়। এভাবেই কিছুদিন পর এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিলো।

বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব

বিজ্ঞান সাময়িকীর দশক পূর্তি

চুয়াত্তর সনে কিছুটা দেরীতে হলেও আমরা মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর এক দশক পূর্তি অনুষ্ঠান করলাম। কাজী মোতাহার হোসেন সভাপতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। ইকবাল, বাহাদুর, ইউনূস ভাই সহ এর পেছনে মূল সকল মানুষের উদ্যোগ আয়োজনে আমরা বিজ্ঞান সাময়িকীর গত দশ বছরেরও বেশি সময়ের প্রকাশনা কাহিনী আলোচনা করলাম। শাহ ফজলুর রহমান, দ্বিজেন শর্মা, পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ড. শমসের আলী এঁদের বক্তৃতায়ও সমৃদ্ধ হলো অনুষ্ঠানটি। এটি ছিল আমাদের জন্য একটি খুশির মুহূর্ত। চট্টগ্রাম কলেজে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাউদাম্পটনে এমনি নানা জায়গায় নানা পরিস্থিতিতে এই সময়টি কাটিয়েছি বটে কিন্তু সর্বত্র বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লেখা, অন্যের লেখা সম্পাদনা করা, প্রকাশনার অন্য সব খুঁটিনাটির ব্যবস্থাপনা করা আমার দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলো। ব্যবস্থাপনায় অনেকখানি সহায়তা ইকবাল ও বাহাদুরের কাছ থেকে এসেছিলো, বিশেষ করে আমি দেশের বাইরে থাকার সময়ে তো মুদ্রণের দেখাশোনা প্রায় এক হাতে ইকবালকে করতে হয়েছে। কোন কোন সময় মাসিক ভিত্তিতে বের করা সম্ভবও হয়নি—মুক্তিযুদ্ধের সময়তো বন্ধই ছিলো। কিন্তু বিজ্ঞান সাময়িকীর ভক্ত একটি সমাজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এই সাময়িকীটিকে কম বেশি আদরে রেখেছিলো এমন অনেকে আমাদের সঙ্গে বয়সে বেড়ে ওঠেছিলো বটে, কিন্তু আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটদের মধ্যেও এটি আদর পেয়েছে। আবার বয়োজেষ্ঠ্যদের অনেকে তাদের ছোট ভাই, ছেলে-মেয়েকেও এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

নানা বয়সী এসব মানুষের অনেকে এতে লিখেছেন, অনেকের লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি। এর চেয়ে বেশি সংখ্যায় অনেকে চিঠিপত্র লিখেছেন ছাপাবার জন্য, অনেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। বাকি অনেকে শুধু এটি পেতে দেরি হলে অভিযোগ

করেছেন। এভাবেই গড়ে ওঠেছিলো এর পাঠক-লেখক সমাজ। কিছুদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিখ্যাত লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'পূবালী' নামক তখনকার জনপ্রিয় মাসিক পত্রে 'ঢাকায় থাকি' বলে একটি কলাম লিখতেন। ঢাকায় তখনো প্রচুর থাকা লেভেল ক্রসিংগুলোর (যেখানে ঝাপ ফেলে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে ট্রেনকে যেতে দেয়া হয়) মোটিফকে এই কলামের শিরোনাম ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হতো ঢাকা শহরের একটি পরিচিত প্রতীক হিসেবে। এর একটি কলাম তিনি শুরু করেছিলেন এই ভাবে—'যেই পত্রিকাটি আমার সব চেয়ে ভাল লাগে সেটি ছোট একটি পত্রিকা যা শুধু বিজ্ঞানের কথা বলে।' তাঁর বক্তব্য ছিলো বিজ্ঞান সাময়িকী পত্রিকাটি সিরিয়াস ধর্মী পত্রিকা, বস্তুনিষ্ঠ কথাবার্তা বলে, হাওয়াই কথা নয়। ফেনিল কথায় ভর্তি কিছু সাহিত্য সাময়িকীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই হয়তো তিনি এটি লিখেছিলেন—কিন্তু এতে নিজেদের কাজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিলো।

দশক পূর্তি অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি বিশেষ সংখ্যা বের করলাম চুয়াত্তরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। এই দশক পূর্তি সংখ্যাটিকে আমরা যথাসাধ্য সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করলাম, আগে থেকেই আমাদের পাঠক সমাজে এ নিয়ে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলাম। সুপরিচিত বেশ কয়েকজন বিজ্ঞান লেখকের শরণাপন্ন হলাম, আর আমরা নিজেরাও এর জন্য বিশেষ ভাবে লিখলাম। এই সময়টিতে বিজ্ঞান ইতিহাসের দুটি স্মরণীয় ঘটনার উদাযাপনের তারিখ ছিল। একটি হলো সৌরকেন্দ্রিক বিশ্ব ধারণার প্রবক্তা কোপারনিকাসের পাঁচ শততম জন্মবার্ষিকী, আর একটি হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কৃত বসু-সংখ্যায়নের পঞ্চাশতম বার্ষিকী। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আমরা আমাদেরই একজন মনে করি, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার দীর্ঘকালীন অধ্যাপক হিসেবে নয় (যেখান থেকেই তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত মৌলিক আবিষ্কারটি করেছেন), বিজ্ঞান সাময়িকীর একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবেও বটে। তাঁর বিষয়টির একজন বিশেষজ্ঞ ও তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠ আমাদের বিভাগের প্রফেসর হারুণ অর রশীদকে অনুরোধ করলাম সহজ বাংলায় বসু সংখ্যায়নকে উপস্থাপিত করতে। তিনি চমৎকার ভাবে সেটি করলেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি মূল ভিত্তি প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ত্রুটিমুক্ত করতে সত্যেন বসুর মৌলিক অবদানগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা কী ভাবে দেড় হাজারেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকা ভ্রান্ত পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছিলো সে বিষয়ে লিখলেন আলী আসগর। কাজী মোতাহার হোসেনের পক্ষে এ সময় লেখা সম্ভব ছিলনা বলে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলাম।

জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়ে নিয়মিত পত্রিকায় লিখে, গ্রন্থ রচনা করে, এবং বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় 'স্কাই অফ দি মান্থ' নামের আকাশ-ছবি প্রতি

মাসে প্রকাশ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার প্রফেসর আবদুল জাব্বার যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি লিখলেন ধূমকেতু সম্পর্কে। বিষয়টি নির্বাচনের একটি কারণও ছিল। তিয়াত্তর সনের প্রথম দিক থেকে 'কোহোটেক' নামের একটি নতুন উজ্জ্বল ধূমকেতু নানা জায়গায় মানমন্দিরে দৃষ্টি গোচর হয়ে আসছিল, এর গতিবিধি অনুযায়ী বাংলাদেশের আকাশে এটি ইতোমধ্যে দেখা যাওয়ার কথা—সেই মর্মে পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছিলো। চুয়াত্তরের জানুয়ারি পর্যন্ত তা দেখা না যাওয়াতে আমাদের দেশের কোন কোন পত্রিকা কোহোটেককে 'কৌতুক' বলে ব্যঙ্গ করছিলো। তারই জবাবে তাঁর এই প্রবন্ধ। আর একজন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ড. জহুরুল হক লিখলেন বাংলাদেশে শক্তি উৎসের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমার শিক্ষক প্রফেসর শাহ ফজলুর রহমান (এক সময় ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান বিচিত্রার সম্পাদক) লিখলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কী ভাবে দেশের সমৃদ্ধি বাড়াতে পারে সে সম্পর্কে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, বাস্তবতা নিয়ে লিখলেন দ্বিজেন শর্মা। 'বাংলাদেশে পদার্থবিদ্যা চর্চা' নিবন্ধে আমার শিক্ষক ও সহকর্মী ড. অজয় রায় স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশে পদার্থবিদ্যা চর্চার সমস্যাগুলোকে তুলে ধরলেন, সমাধানেরও কিছু ইঙ্গিত দিলেন। ভূগোলবিদ ড. নজরুল ইসলাম ইতোমধ্যেই নগরায়নের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন; তিনি সেই বিষয়েই লিখলেন। শান্তি নিকেতনের উদ্যান বিভাগের দেবী চট্টোপধ্যায় বিজ্ঞান সাময়িকীর একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে শিলাইদহ ও পতিসরে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ নিজে কৃষি বিজ্ঞানী হয়ে কীভাবে তার কিছু কিছু বাস্তবায়ন করেছিলেন সে বিষয়ে। আবদুল্লাহ আল-মুতী খুব সম্ভব ইতোমধ্যে সোভিয়ত ইউনিয়নে বাংলাদেশ দূতাবাসের এডুকেশন কাউন্সেলর হয়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর লেখা পাওয়া গেলোনা।

দশক পূর্তি সংখ্যায় আমি নিজে লিখেছিলাম 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা কেন' এই নামে একটি নিবন্ধ। সাউদাম্পটনে থাকা কালে বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে আমার আগ্রহ গড়ে উঠেছিলো। তাতে যে মূল একটি বিষয় অনেক দিন ধরে দার্শনিকদের ভাবিয়েছে, কিছুটা এখনো ভাবাচ্ছে, সেই ইন্ডাক্শন বা আরোহ সমস্যা নিয়ে সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। যা বার বার ঘটে তা আবার ঘটবে এই বিশ্বাসই হলো আরোহ পদ্ধতি—যা যুগে যুগে বিজ্ঞানের ভিত্তি, কাণ্ডজ্ঞানেরও ভিত্তি। অসংখ্য ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক ভাবে ঘটা ঘটনার নিয়মটিই বিজ্ঞান আবিষ্কারের চেষ্টা করে। কিন্তু দার্শনিকের এতে আপত্তি হলো বার বার ঘটলেই যে আবার ঘটবে এই বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক অনিবার্যতা নেই, যেমন অনিবার্যতা আছে মানুষ মরণশীল হলে মানুষ হিসেবে আমি মরণশীল এ রকম যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পেছনে। এটিই আরোহ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করে বিজ্ঞানে

বিশ্বাসের পেছনে যৌক্তিক অনিবার্যতা (যাকে র‍্যাশনালিটির পূর্ব শর্ত বলে মনে করা হয়) দেয়ার চেষ্টাগুলোকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি এই লেখায়। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান কাজ করে বলেই তাকে বিশ্বাস করা—এটিই তার 'র‍্যাশনালিটি'। এই কাজ করার খাতিরে বিজ্ঞানকে বহু তথাকথিত 'র‍্যাশনাল' হবার দাবি ছেড়ে দিতে হয়েছে—যেমন কার্যকারণবাদ; ক্ষুদ্র বস্তুর অবস্থান ও গতি সম্পর্কে একই সঙ্গে নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা দিতে পারা; এমন কি 'প্রকৃত রিয়ালিটি' নিয়ে কথা বলার দাবিও।

বিজ্ঞান সাময়িকীর এই দশক পূর্তি সংখ্যায় চমৎকার নিবন্ধ দিয়ে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান সাময়িকীতে নিয়মিত স্থান করে নিয়েছিলো তখনকার কয়েকজন ছাত্র ও নতুন লেখক। আতাউল করিম, সিতারা রশীদ পপি, আবুল হুশ্‌শাম প্রমুখ পরে বিদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। বিশেষ করে আতাউল করিম বিজ্ঞান সাময়িকীতে নানা রকম লেখা দিয়ে বহুদিন সমৃদ্ধ করেছিলো এবং পরে শুধু পদার্থবিদ্যা গবেষণায় নয়, বিশ্বের কয়েকটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, উপ-প্রধান (ভাইস প্রেসিডেন্ট) ইত্যাদি পদে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমার খুব ভাল লেগেছে যে বিদেশে খ্যাতির এরকম অবস্থানে থেকেও সম্প্রতি একবার সে 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা কালে ছুটিতে তার বাড়ি সিলেটের বড়লেখায় বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া একটি পোস্ট কার্ডের প্রতিলিপি ছাপাতে দিয়ে স্মৃতি চারণ করেছে।

দশক পূর্তি সংখ্যাটি যখন প্রেসে চলে গিয়ে মুদ্রণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে তখনই (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) কলকাতা থেকে সত্যেন বসুর মৃত্যু সংবাদ আসে। বসু সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষ উদযাপন উৎসবের ঠিক পরেপরেই তাঁর এই প্রয়াণ আমাদেরকে মর্মাহত করেছিলো। দ্রুত একটি বাড়তি পৃষ্ঠায় তাঁর ছবি ও শোক সংবাদটি ছাপিয়ে আমরা দশক পূর্তি সংখ্যার একেবারে শুরুতেই সন্নিবেশ করেছিলাম। পরে বিজ্ঞান সামায়িকীর এপ্রিল'৭৪ সংখ্যাটিকে আমরা 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু সংখ্যা' হিসেবে বিশেষ ভাবে সাজিয়েছিলাম। এর মধ্যে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিলো যা বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য একই সঙ্গে দুঃখের ও আনন্দের। চৌদ্দই মার্চ বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদকের কাছে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি দীর্ঘ চিঠি আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। তাঁর নিজের হাতের লেখা এই চিঠিতে কোন তারিখ নেই। কিন্তু ডাকঘরের সিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা পোস্ট করা হয়েছে জানুয়ারির বাইশ তারিখ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর মাত্র বার দিন আগে। ঠিকানার ভুলে নানা হাত ঘুরে চিঠিটি যখন প্রাপক আমার হাতে এলো বিজ্ঞানাচার্য তখন পরলোকে। এমনো হতে পারে যে এই চিঠিটি হয়তো তাঁর জীবনের শেষ চিঠি ছিলো কারণ মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন বলে শোনেছি। চিঠিটি আমাদেরকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিলো। বিজ্ঞান সাময়িকীর পাঠকদেরকেও

একই ভাবে নাড়া দেবে মনে করে এই চিঠিটিকেই পুরো ছাপিয়ে এবং তাঁর ছবি ও চিঠির প্রথমাংশের হুবহু ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে একেই আমরা আমাদের সত্যেন্দ্র নাথ বসু সংখ্যার প্রধান উপজীব্য করেছিলাম। এর ঐতিহাসিক মূল্য লক্ষ্য করে মূল চিঠিটি আমরা ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি।

'বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক মহাশয়' এই সম্বোধন করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন বিজ্ঞান সাময়িকীর সব সংখ্যা নিয়মিত পাচ্ছেন এবং এতে প্রায় ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশের সংস্কৃত চর্চা ও আলোচনাগুলো দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। এরপর তিনি চলে যান আগের স্মৃতি চারণে—কীভাবে তরুণ শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন, অন্যদের সঙ্গে মিলিত ভাবে বিজ্ঞান আলোচনার জন্য 'বারো জনা' নামে গোষ্ঠী করেছিলেন, 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে পত্রিকা বের করেছিলেন সে সব কথায়। এরপর তিনি বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য অনেকগুলো চমৎকার পরামর্শ দিয়েছেন—বিশেষ করে দেশের বিজ্ঞান চর্চার খবর, এবং দেশের নদীনালা, প্রকৃতি, সম্পদ ইত্যাদির বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল নতুন বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর উৎসাহ অপরিসীম, একই সঙ্গে তাঁর ফেলে আসা কর্মক্ষেত্রটি যেন তাঁকে এক রোমান্টিক হাতছানিতে ডাকছিলো। জীবন সায়াহ্নে এসব জানাতে তিনি যে বিজ্ঞান সাময়িকীর মানুষদেরকে বেছে নিয়েছেন তাতে আমাদের গর্বের আর সীমা ছিলনা। বিশেষ সংখ্যাটিতে আমরা শুধু সত্যেন বসুর আবিষ্কার, তাঁর জীবন এবং তাঁর সম্পর্কে স্মৃতি চারণকেই স্থান দিয়েছিলাম।

বিজ্ঞান আন্দোলনের নতুন রূপরেখা

তার প্রথম সংখ্যা থেকেই বিজ্ঞান সাময়িকী নিজকে 'বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ' বলে পরিচিত করে আসছিলো। এর প্রথম দশ বছর তার আন্দোলনটি ছিল বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা; বিজ্ঞানের একটি পত্রিকা যে সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য হতে পারে তা প্রমাণ করা; এবং সহজ বাংলায় সব রকম বিজ্ঞান নিয়ে লেখার ও কাজের চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলা। একটি তরুণ ও আগ্রহী পাঠক সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে এই আন্দোলন কিছুটা গতি পেয়েছিলো বৈ কি। তবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সব বিষয়ে নতুন চিন্তার ও নতুন কাজের যে সুযোগ করে দিয়েছে সেই পরিবেশে শুধু বিজ্ঞানকে উপভোগ্য করার চেষ্টাতেই চলবে কেন? স্বাধীনতার ঠিক পরপর 'বাংলাদেশ ও গণমুখী বিজ্ঞান' নিবন্ধটি লেখার সময়েই অনেক কিছুর খোল-নলচে পাল্টাবার চেষ্টা দেশে ঘটুক এবং তাতে বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি ভূমিকা থাকুক এমনিতরো একটি ইচ্ছে মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলো। আর খোল-নলচে যদি পাল্টাতেই হয় তা হলে তার শুরু হতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায়। ওই প্রবন্ধে গণবিদ্যালয়, সর্ব সাধারণের পলিটেকনিক, ছাত্রদের সাক্ষরতা অভিযানে দেশে ছড়িয়ে পড়া, ইত্যাদির কথা বলেছিলাম। এরকম

নিয়ম-ভাঙ্গা সংকল্প শুধু লেখায় সীমাবদ্ধ না থাকুক, কার্যক্ষেত্রেও পত্রিকা কিছু করুক, অন্তত যতটুকু পত্রিকার প্রভাব দিয়ে সম্ভব ততটুকু করুক—সেটিই হবে আমাদের উপযুক্ত আন্দোলন। তবে সে কাজ সহজ হয়নি।

চুয়াত্তরের মাঝামাঝি সময়ে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশন কাজ করার সময় বিজ্ঞান সাময়িকী নতুন দেশের পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার মতামত সাময়িকীর পাতায় বিভিন্ন ভাবে দিয়েছিলো। কিন্তু কমিশনের মতামত নেবার ব্যবস্থা ছিল অতি সীমিত। এই মতামত না-নেবার ব্যাপারটিতে আমরা সমালোচনা-মুখর ছিলাম। যেইটুকু সংক্ষিপ্তাকার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনেক ইতিবাচক প্রস্তাব ছিলো—যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক; বৃত্তিমূলক ও হাতেকলমে শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এই নীতির বাস্তবায়নে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর কোন স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ছিলোনা। বিষয়গুলোকে আরো খোলাসা করার জন্য রিপোর্ট প্রকাশের পর পর বিজ্ঞান সাময়িকীর পক্ষ থেকে আমি ও আসগর সাহেব ড. কুদরত-ই-খুদার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপারে অনেক কথা বল্‌লেন। কমিশনের সুপারিশ মতো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পর পলিটেকনিক জাতীয় নানা স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় চলে যাবে অনেক শিক্ষার্থী। তবে বর্তমানের মত এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুধু তদারকী বা শ্রমিকদের উপর খবরদারী করার জন্য হবেনা, হবে নিজে করার জন্য। এই নিজে করাটি চাকরির মধ্যে হতে পারে, তবে নিজের স্বাধীন কারিগরি পেশা হিসেবেও হতে পারে, সে জন্য সরকার তাদেরকে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

এসব কথা আমাদের মতামতের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাচ্ছিল। এর জন্য ছোটবেলা থেকে শিক্ষার মধ্যে 'নিজে করার' উপাদানটি যে থাকতে হবে তাতেও তিনি একমত হলেন। তবে তাঁর মতে পঞ্চম শ্রেণীর পর একটি সাধারণ পরীক্ষার পর ঠিক হবে কারা সাধারণ শিক্ষায় যাবে কারা কারিগরি শিক্ষায় যাবে—দেশের যে রকম প্রয়োজন সেই অনুপাতেই বিভিন্ন দিকে ছাত্রের সংখ্যা বাছাই করা হবে। আমরা এত অল্প বয়সে এরকম বাছাই সমর্থন করতে পারিনি। স্কুল ভাল না হওয়াতে, শিক্ষক ভাল না হওয়াতে, ছাত্রের পরিবেশের কারণে, অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র বাদ পড়তে পারে, এবং এ কারণে ইংল্যান্ডে একই রকমের ইলেভেন প্লাস পরীক্ষা (এগারো বছর বয়সে একাডেমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাইয়ের সাধারণ পরীক্ষা) বাদ দেয়া হয়েছে। আমাদের এমন আপত্তির উত্তরে তিনি শুধু বল্‌লেন এ জন্য স্কুল ও শিক্ষক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই সব কিছু বাস্তবায়নের কোন রূপরেখা রিপোর্টে নেই কেন জানতে চাইলে ড. কুদরত-ই-খুদা জানান কমিশন শুধু নীতিগত সুপারিশ করেছে, বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণ ঠিক করার জন্য সরকার পরে বিভিন্ন 'সেল' গঠন করবে। সরকার পরে কমিশনের বিস্তারিত রিপোর্ট জনসমক্ষে আলোচনার জন্য প্রকাশও করবে।

সরকার কখন এটি করবে এ সম্পর্কে তিনি বা কমিশন কিছু জানেননা বল্লেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সব লেখাপড়া বাংলায় করতে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি পড়াতে কমিশন যে সুপারিশ করেছে তাতে ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান ও তা ব্যবহারের দক্ষতা কতখানি অব্যাহত থাকবে, আর সেটি না থাকলে উচ্চ শিক্ষায় তার প্রভাব পড়বে কিনা এই ব্যাপারে তিনি অন্যান্য বিভিন্ন উন্নত দেশে নিজ ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার উদাহরণ দিলেন।

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে সরকারী ভাবে ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটবে, এবং তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক দিকে ঘটবে, সে রকম আশা এ মুহূর্তে করা যাবেনা। এক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনের আকারে নিচের থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে এবং নীতিগত সুপারিশ করার ব্যাপারে শিক্ষা কমিশন চমৎকার কাজ করেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের কোন দায় তার নেই। ওই ভাবে বিজ্ঞান সাময়িকীও যদি তার মতো করে শুধু কথাবার্তাগুলোই বল্‌তে থাকে তা হলে সচেতনতা সৃষ্টির দিকে লাভ হবে, কিন্তু কাজ এগোবেনা। তাই বিজ্ঞান সাময়িকীর কথাগুলোর একটি সক্রিয় রূপ থাকাও প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সীমিত সাধ্যে সেটি আপাতত কীভাবে সম্ভব তার কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। তার উত্তর বাতলিয়ে দিলো বিজ্ঞান সাময়িকীর ভক্ত পাঠক এক ছাত্র, সাময়িকীর পাতাতেই।

গোড়া থেকেই বিজ্ঞান সাময়িকীতে 'মতামত' বলে একটি ফিচার থাকতো যাতে বিভিন্ন রকম পরামর্শ ও মতামত থাকতো। সাধারণত প্রকাশিত কোন লেখা নিয়েই মন্তব্য প্রকাশ করতো পাঠকরা, বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে 'আলোচনার প্রয়োজন', 'লেখা দেখতে চাই' ইত্যাদি দাবি জানাতো। কিন্তু চুয়াত্তরের অক্টোবর মাসে নটরডাম কলেজের ছাত্র জিয়াউদ্দিন আহমেদ (কচি) একটি ব্যতিক্রমী ও জোরালো মতামত পাঠালো বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপাবার জন্য। 'স্বল্প পরিসরে মায়ের কথায় বিজ্ঞানকে আমাদের হাতে পৌঁছে দেবার' জন্য বিজ্ঞান সাময়িকীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কচি প্রশ্ন তুলেছে বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের যে লক্ষ্য তা কি বিজ্ঞান পঠনের জনপ্রিয়তা না বিজ্ঞান প্রয়োগের জনপ্রিয়তা। যদি উভয়ে হয় তা হলে তার মতে সাময়িকী শেষোক্ত পর্বটি এড়িয়ে যাচ্ছে। এজন্য তার সুস্পষ্ট প্রস্তাব বিজ্ঞান সাময়িকীর কাছে যা তার ভাষাতেই সুন্দর বোঝা যাবে :

'আমি বলি আমরা বিজ্ঞান সাময়িকীর পাঠকরা তথা বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ উৎসাহীরা বিজ্ঞানের কিছু কাজ করলে হয়না? আমরা সায়েন্স প্রজেক্ট ওয়ার্ক বা অন্য কোন নামাবলী জড়িয়ে সুচিন্তিতভাবে একটি সংঘের তত্ত্বাবধানে ছোটখাট একটা গবেষণাগার গড়ে তুল্‌লে কেমন হয়, আমাদের স্বল্প সামর্থে যা পরিচালিত হবে।...সেই গবেষণাগারে হাতেকলমে আমরা বিজ্ঞানকে চিনব। সীমিত সামর্থ্যে আপন করে নেব বিজ্ঞানকে। আসুন প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রথমে বিজ্ঞান সংঘ গড়ে তুলি।...এ ব্যাপারে বিজ্ঞান সাময়িকীকে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে

আসতে অনুরোধ করবো। কারণ আপনারা পঠনের জন্য যথেষ্ট করেছেন এবার প্রয়োগের জন্যও কিছু করুন। আপনারা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত।'

কচি শুধু অন্যকে আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি—নিজেরা এই আন্দোলনে অংশ নেবার ও অন্যদেরকে এ জন্য দিগদর্শন দেয়ারও আশ্বাস দিয়েছে : 'আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে সায়েন্স ক্লাব গড়ে তোলার। উপযুক্ত সাড়া পেলে তা পাঠকদের সমীপে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি'।

বিজ্ঞান ক্লাবের ধারণাটি আমাদের অজানা ছিলনা। দেশবিদেশের ও রকম অনেক ক্লাব বা সৌখিন তরুণ তরুণীদের বিজ্ঞান প্রজেক্টের কথা সাময়িকীতে প্রচুর লিখেছি। আমি নিজেই তো পুরো স্কুল ও কলেজ জীবনে ছিলাম একটি এক-ব্যক্তি বিজ্ঞান ক্লাব—আপন আনন্দে বিজ্ঞানের কত 'প্রজেক্ট' করে গেছি, একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী করেছি। কিন্তু একে নিয়ে আন্দোলন, বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি সক্রিয় রূপ জেলায় জেলায় দেখা—ওভাবে তো আগে ভাবিনি; কচির লেখাটি এখন ভাবালো। আমরা জোরালো ভাবে সাড়া দিলাম। বিজ্ঞান সাময়িকীতে বিজ্ঞান ক্লাবের ধারণা নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করলাম। পাঠকদেরকে অনুরোধ করলাম নিজ নিজ এলাকায় একক বা গোষ্ঠীগত ভাবে যেখানেই বিজ্ঞান ক্লাব ধর্মী কিছু মাত্র প্রচেষ্টা রয়েছে তার বিস্তারিত খবর জানাতে। কচিদের নটরডাম কলেজেই বিজ্ঞান ক্লাব ছিল, নেচার ষ্টাডি ক্লাব ছিল ফাদার টিম প্রমুখের চেষ্টায়। তবে শিগ্‌গীর দেখলাম দেশের বেশ কিছু জায়গায় কোথাও স্কুল বা কলেজের শিক্ষকের উৎসাহে, কোথাও নিজেদের উৎসাহে, বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কিছু করার চেষ্টা রয়েছে। সবাই হয়তো নিজেদেরকে বিজ্ঞান ক্লাব বল্‌ছেনা, হয়তো শুধু আলোচনা করছে, পর্যবেক্ষণ করতে বেরোচ্ছে এক সঙ্গে, কিন্তু চেষ্টা ঠিকই রয়েছে। আমরা নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে ফেল্‌লাম—এদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। এদের খবর ছাপিয়ে সেটি করা যাবে। নতুন নতুন প্রজেক্টের আইডিয়া দেবার জন্য 'বিজ্ঞান প্রজেক্ট' নামে একটি ফিচার চালু করলাম। দেশের সব জায়গায় স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরা করতে পারবে এমন প্রজেক্টই দেবার চেষ্টা করতাম। এগুলোর অনেকগুলো আমি নিজেই লিখতাম, অনেকগুলো বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে আমাদের করার উপযুক্ত করে নিতাম, অন্য কেউ কেউও চমৎকার সব প্রজেক্টের আইডিয়া দিতো। তবে বিজ্ঞান ক্লাবের সংগঠন গড়ে তোলাটাই ছিল বড় কাজ। আমরা এখন থেকে বিজ্ঞান সাময়িকীতে একটি আলাদা অংশই রাখলাম 'বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয়' এই নামে। এতে নানা ক্লাবের খবর থাকতো, তাদেরকে দেয়া পরামর্শ থাকতো। তাদের যে কোন ছোটখাট কাজের, প্রজেক্টের, প্রদর্শনীর ছবি ছাপানো হতো, 'বিজ্ঞান ক্লাব প্রজেক্ট' ফিচারটি থাকতো। বিভিন্ন ক্লাবের ঠিকানা, তাদের সংগঠনিক পরিষদ, শিক্ষক উপদেষ্টা তাঁদের কথাও আমরা যত্ন সহকারে এখানে ছাপাতাম। এ ভাবেই গড়ে ওঠছিলো আমাদের বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন।

আমরা বিজ্ঞান ক্লাবকে শুধু একটি সৌখিন আনন্দের কাজ হিসেবে দেখতামনা, বরং স্কুলের ক্লাসের একটি অতিরিক্ত ক্লাস হিসেবে দেখতাম—মনে মনে আশা ছিলো শিগ্‌গীর একদিন আমাদের স্কুলগুলোর কোন কোন দিক এমনি স্বতঃপ্রণোদিত সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে। এ জন্য বিজ্ঞান সাময়িকীতে আরো একটি ফিচার চালু করা হয়েছিলো 'আপন স্কুল' নামে। এ যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্কুল যেখানে স্কুলের লেখাপড়াগুলোই নিজেদের সৃষ্টি করা শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে ক্লাবের কাজের মতোই আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। এই ফিচারে এমন স্কুলের জন্য নানা রকম শিক্ষা উপকরণ তৈরির এবং ক্লাসের ভেতরে ও বাইরে করার মত কাজের আইডিয়া থাকতো। এসব উপকরণ ও কাজের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোই ছাত্রদের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠা সম্ভব। বলা বাহুল্য এই ফিচারেরও অধিকাংশ আমাকেই লিখতে হতো।

বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয়ের ফলে অনেকগুলো ক্লাব বা ক্লাবধর্মী প্রচেষ্টার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটলো—বিশেষ করে ঢাকা শহর ভিত্তিক ক্লাবের সঙ্গে। নটরডাম কলেজের ক্লাবগুলো তো ছিলই, অন্যান্য কিছু স্কুল কলেজের শিক্ষকরাও দেখাদেখি কিছু প্রয়াস নিয়েছিলেন। প্রধানত আকাশ দেখায় আগ্রহী হয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিলো অনুসন্ধিৎসু চক্র নামে ক্লাব। খেলাঘর তখন শিশু কিশোরদের একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত সংগঠন। নানা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া, উৎসাহ দেয়া, সংগঠিত করে তোলা ছিল এর প্রধান কাজ—অনেকটা আগেকার মুকুল ফৌজ এবং সমসাময়িক কচি কাঁচার মেলার মত। মূলত আলী আসগর সাহেবের প্রচেষ্টায় এর কার্যক্রমে বিজ্ঞানের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং কার্জন হলে ছুটির দিন এজন্য এক রকম 'ক্লাস' করারও ব্যবস্থা হয়। আমি এর কাজে কিছু কিছু সহায়তা দেবার চেষ্টা করতাম। আসগর সাহেবকে প্রস্তাব করলাম আলাদাভাবে বিজ্ঞান কার্যক্রমের জন্য 'বিজ্ঞান খেলাঘর' নামটি চালু করতে। পরে তাই করা হয়েছিলো। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান পরিষদ নামে একটি বড়দের সংগঠন তখন ধীরে ধীরে ছোটদের বিজ্ঞান ক্লাবের রূপ নিচ্ছিল। বিজ্ঞান সাময়িকীর কারণে এরকম আরো ক্লাবে আমার যাতায়ত ঘটছিলো, তাদের অনুষ্ঠানাদিতে থাকতে হতো। ছাত্রদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা এমনি একটি বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে এ সময়—এর নাম ইয়াং সীকার্স।

অনুসন্ধানী

ইয়াং সীকার্স বিজ্ঞান ক্লাবটি ১৯৭৩ সালের শুরুর দিকেই গঠিত হয়। মূলত গভর্নমেন্ট ল্যাবোরেটরি স্কুলের কিছু ছেলে ছোটখাট যন্ত্র ও খেলনা বানাবে বলে এটি গঠন করেছিলো। এর উদ্যোক্তা ছিল ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহবুবুল আলম বাবু এবং তার কয়েকজন বন্ধু। বাবুর বড় ভাই মকসুদ (পরে বিখ্যাত

অণুজীব-বিজ্ঞানী, সম্প্রতি প্রয়াত) তখন সবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছে; হয়তো সেখান থেকেই এসেছিলো এর উদ্দীপনা। ওই বয়সেই বাবুর বেশ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিলো। সে তার স্কুলের বাইরেও সমবয়সী অনেককে এর মধ্যে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলো। লালবাগ এলাকায় তার বাসার কাছের কিছু স্কুল ছাত্রদের মধ্যে তো বটেই, ঢাকা শহরের অন্যত্রও ইয়ার সীকার্সের কয়েকটি শাখা খোলা হয়েছিলো। বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয় শুরু হলে আমি ওদের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত হই। দেখলাম বাবুরা সাংগঠনিক দিকটাতে বেশ গোছানো হলেও বৈজ্ঞানিক দিগদর্শন তারা খুব একটা পাচ্ছিলনা। তাই মনে হলো বিজ্ঞান সাময়িকীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দেশব্যাপী সংগঠন গড়ার দায়িত্ব পেলে তারা ভাল করবে। সেভাবেই এটি পুনর্গঠিত হলো এবং এর নাম বদলিয়ে রাখা হলো 'অনুসন্ধানী'। ইয়াং সীকার্স নামটি খুব সম্ভব যে সময়ের বিশ্বখ্যাত পপ সংগীত গোষ্ঠীর অনুসরণে করা হয়েছিলো—তার বদলে সমার্থবোধক 'অনুসন্ধানী' যুৎসই হলো। এর পরিচালনা পরিষদে আমি ছিলাম পরিচালক আর কার্যকরী পরিষদের সংগঠক হিসেবে ছিল বাবু, আর লালবাগে তার বাসা ছিল এর কেন্দ্রীয় ঠিকানা। বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রচার কাজের ফলে পরের মাসগুলোতে দেশের বহু জায়গায় অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠে। ১৯৭৬ সনের মধ্যে শুধু ঢাকা ও তার আশপাশে ৩০টি শাখা এবং অনেকগুলো জেলাতে এমনকি বেশ কিছু থানা পর্যায়ে অনুসন্ধানী ক্লাব গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটিতে নেতৃত্ব নিয়েছে স্থানীয় কিছু স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা, এবং প্রত্যেকটি গড়ে ওঠেছে সম্পূর্ণ স্থানীয় নিজস্ব উদ্যোগে। জেলা পর্যায়ের কয়েকটি অনুসন্ধানী সংগঠন কাজের দিক থেকে ঢাকার অনুসন্ধানীকেও হার মানাতো। যেমন রাজশাহী শহরে ছিল এরকম দুটি শাখা—রাজশাহী অনুসন্ধানী এবং রাজশাহী উপশহর অনুসন্ধানী। অনুসন্ধানীর একটি গঠনতন্ত্র ছিলো : যার শিরোনাম ছিল 'অনুসন্ধানী কারা, তারা কী করে'। এর প্রত্যেকটি ক্লাবে কী ধরনের সুযোগসুবিধা স্বল্প ব্যয়ে সৃষ্টি করা হতো তার একটি চমৎকার পরিচয় এতে ছিল। তাছাড়া বিজ্ঞান সাময়িকী তাদের প্রত্যেকটির কাজগুলো তুলে ধরতো, সমালোচনা করতো, পরামর্শ দিতো। অনুসন্ধানীর একটি বড় কার্যক্রম ছিল দেশকে জানা, এ জন্য স্থানীয় ভাবে জরিপ করা, এবং জাতীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি, পুষ্টি, শিক্ষা প্রভৃতি সম্প্রসারণের কাজে অংশ নেয়া—যেমন শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা। তাছাড়া ওয়ার্কশপ গড়ে তাতে নানা যন্ত্রপাতি, প্রজেক্ট তৈরি তো আছেই। অনুসন্ধানীর একটি গান আমি নিজেই লিখে দিয়েছিলাম—সব অনুষ্ঠানে সব শাখায় গাওয়া হতো।

'ইয়াং সীকার্স, ইয়াং সীকার্স
আমরা অনুসন্ধানী।
দেশকে জানার শপথে, ওয়ার্কশপে আর জরিপে
বিজ্ঞানের কর্মী মোরা অনুসন্ধানী।...'

বছরে বার দু'য়েক অনুসন্ধানী সম্মেলন হতো ঢাকায়—তখন প্রত্যেকটি অনুসন্ধানী ক্লাব থেকে তার প্রতিনিধি দল প্রজেক্ট নিয়ে আসতো। প্রায় প্রত্যেক বার আমরা এই সম্মেলন করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবোরেটরি স্কুলের মিলনায়তনে। প্রদর্শনীতে শুধু তৈরি করা যন্ত্রপাতি দেখানো হতোনা, যারা জরিপ ইত্যাদি করেছে তাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলোও তুলে ধরা হতো। অনুসন্ধানীর যারা মূল প্রবক্তা ছিল তাদের দেখেছি স্কুল ও কলেজের গণ্ডি পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কলেজে গিয়েও অনুসন্ধানীর কাজ করে গেছে। দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং তার সমন্বয় সাধন করতে বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে সুবিধা হয়ে গেল অনুসন্ধানীর কারণে, কারণ সাময়িকী তখন শুধু আন্দোলনের সাংবাদিকতা করছেনা বা তার দিগ্‌নির্দেশনা দিচ্ছেনা, এটি নিজেই পরিচালনা করছে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন। বিজ্ঞান সাময়িকী এখন শুধুই একটি পত্রিকা নয়, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কর্মমুখরিত একটি সংগঠনের সক্রিয় সহযোগীও বটে; যারা বিজ্ঞান সাময়িকীতে লেখা প্রকাশ করে তারাই আবার সংগঠনও চালায়। মজার ব্যাপার হলো আমার চোখের সামনেই অনুসন্ধানীকে শুধু ছোটদের সংগঠন থেকে ছোট বড় সবার সংগঠনে পরিণত হতে দেখলাম যেখানে কিছু কিছু প্রজেক্ট রীতিমত মূল্যবান গবেষণার মর্যাদা পেতে পারে। দেশের বিভিন্ন অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবে সুযোগমত গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা ও কাজ দেখা আমার জন্য খুব আনন্দদায়ক কাজে পরিণত হয়েছিলো।

বৃটিশ এসোসিয়েশন সম্মেলন

অনুসন্ধানীকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আরো সাহায্য করতে পারার জন্য আমার একটি চমৎকার সুযোগ হয়ে গেলো। বিজ্ঞানকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃটেনের যে ঐতিহাসিক সংস্থা সেই বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভ্যান্সমেন্ট অফ সায়েন্স (সংক্ষেপে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন) এর বার্ষিক সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত হলাম, সেই সঙ্গে পনেরো দিনের জন্য বৃটেনের নানা অঞ্চলে সাধারণ্যের বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার যে বিচিত্র ব্যবস্থা রয়েছে তা দেখারও সুযোগ পেলাম। বাংলাদেশের বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগেই আমার এই সুযোগটি ঘটলো—যারা হয়তো নানা প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার উৎসাহের কথাটি জেনে আমাকে নির্বাচন করেছিলো। ১৯৭৫ এর যে স্বল্প সময়টিতে আমাকে এর জন্য বৃটেনে কাটাতে হয়েছিলো আমাদের দেশের জন্য সেগুলো কোন সাধারণ দিন ছিলোনা।

১৯৭৫ এর শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিক থেকে আমরা অনেক বেশি অস্বাভাবিক দিনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। বিরোধী দল এবং সরকার উভয় পক্ষ থেকে ক্রমাগত হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির সমাধান হিসেবে এলো আর একটি নতুন ধরনের গণতন্ত্র; এবার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা—বাকশালের

শাসন, যাকে বলা হলো দেশের 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। স্বাধীনতার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও অন্যান্য কারণে ওই সময় আমাদের সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অনুসারী পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বেশি কাছাকাছি ছিল তা মানতাম, কিন্তু তাই বলে একেবারে তাদের মত একদলীয় শাসনও প্রবর্তিত হবে এমনটি কখনো কল্পনাও করিনি। সংঘাত নিরসন যদি মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে তা হলে এক রকম কেন্দ্রীভূত শাসন তো তখনও ছিল—এক দলীয় শাসন করে অন্য সব দলের, অন্যমতের, ও পত্রিকার অস্তিত্ব বিলোপ করলেই সব সমাধান হয়ে যাবে এমন কথা শুনে মাথা ঘুরে গেলো। সংবিধান যেভাবে সংশোধন হলো এবং দূর ভবিষ্যতেও শাসক পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক সব পথ যে ভাবে রুদ্ধ করা হলো তাতে প্রমাদ গোণলাম। কিন্তু দেখলাম শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই তো বটেই দেশের গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তির এটি বেশ পছন্দ হয়েছে—তাঁরা সবাই পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে নতুন একমাত্র দল বাকশালের (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সদস্য হয়ে গেলেন—তার মধ্যে রাজনীতিবিদরা তো আছেনই, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা, সরকারী কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্ব কেউ বাদ ছিলেন না। শুধু গুটি কতক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব ঘোষণা দিয়ে এর বাইরে রইলেন।

এসবও হয়তো নতুন সিষ্টেমে 'সবাই একমাত্র রাজনৈতিক দলের অংশ' সেই নিয়মে মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু যোগদানকারী ওই সব রকম সম্মানিত ব্যক্তিকে যখন দেখা গেল ময়দানে সারিবদ্ধ ভাবে দলের প্রধানের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে এ দলের সদস্যপদকে জনসমক্ষে কনফার্ম করতে হলো, সে দৃশ্যটি ভাল লাগলো না। এ সারিতে অনেককে দেখলাম যাদের ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন মতামত সংরক্ষণের সুনামের সঙ্গে কাজটিকে মেলাতে পারলামনা। তারপর চারটি পত্রিকা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেবার মধ্যেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে একেবারেই কুক্ষিগত করা হলো তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা শাসনযন্ত্রকে এবার আইন করে আনুষ্ঠানিক ভাবেই সকল বিরোধী মতের প্রতি চরম অসহিষ্ণু করে তোলা হলো। একমাত্র দল বাকশাল আর সরকারকে একাকার করে ফেলা হলো—যেমন দলের নির্বাহী কমিটির সবাইকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়ে।

বাকশাল জারি করা হয়েছিলো পঁচাত্তরের ৭ই জুনে। ওই বছর বিরোধী দলের ও সরকারের নিত্য সহিংসতার মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ করে মানুষের মনে রেখাপাত করেছিলো তা হলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে সিরাজ শিকদার গ্রেফতার ও নিহত হওয়া, যা ছিলো জানুয়ারির একেবারে শুরুর দিকে। সিরাজ শিকদারের রাজনৈতিক অস্তিত্বের শুরুটা আমার সলিমুল্লাহ হল জীবনের সমসাময়িক। মেনন গ্রুপ এপসু থেকেই তিনি সে সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এপসুর কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রথম শ্রেণী পেয়ে প্রকৌশল পাশ করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন ও প্রকৌশলী হিসেবেও কাজ করেছেন। পরে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে

'সর্বহারা পার্টি' নামের একটি মাওবাদী দল গঠন করেছিলেন। চুয়াত্তরের দিকে সিরাজ শিকদারের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এই বলে যে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘাঁটি করে 'জন-গণতন্ত্রের' জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আহবান জানাচ্ছিলেন। প্রকাশ্য রাজনীতিবিদদের ওপর বিতৃষ্ণ প্রচুর মানুষ অনেকটা গল্পের নায়কের মত সিরাজ শিকদারকে মনে মনে হিরোর স্থান দিয়েছিলো বটে তবে সত্যি সত্যি কোথাও তাঁর সমর্থকদের দাবিকৃত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কোন কাজ তাঁর ছিল কিনা তা জানার উপায় ছিলনা। অথচ আমাদের সমসাময়িক অনেকে তাঁকে জানতো একজন সাধারণ ছাত্র নেতা, প্রকৌশলী এবং চাকুরীজীবী হিসেবে। কয়েক বছর পরে সিরাজ শিকদারের বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও প্রখ্যাত ভাস্কর শামীম শিকদার আমার নিকট প্রতিবেশী ছিলেন।

বাকশালে আমার পরিচিত বেশ শ্রদ্ধাভাজন কয়েক জনকে জেলা গভর্নর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সলিমুল্লাহ হলে আমাদের সিনিয়র, পরে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিসার জালাল ভাই। আমার অনেক বন্ধু বাকশালকে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ হিসেবে নেতিবাচক ভাবে না দেখে বরং সংকটময় একটি পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন ভাবে সবাইকে নিয়ে চেষ্টা করার উদ্যোগ হিসেবে দেখেছিলো। জেলা গভর্নর পদ সৃষ্টি, তাতে রাজনীতিবিদ, আমলা, মুক্তিযোদ্ধা (যেমন টাঙ্গাইলের জেলা গভর্নর হিসেবে কাদের সিদ্দিকী) ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে, এবং তাঁকেই জেলার প্রধান নির্বাহীর আসন দেয়াটিকেও তারা মনে করেছে এভাবে সবাইকে সম্পৃক্ত করার একটি প্রশংসনীয় চেষ্টা হিসেবে। ইতোমধ্যে সব মহকুমাকে পৃথক জেলা ঘোষণা করা হয়েছিলো—তাই নিযুক্ত জেলা গভর্নরের সংখ্যা কম হলোনা। আমার মস্কোপন্থী বন্ধুরা খুশি হলো যে একদলীয় শাসন, একাকার সরকার ও দল, সর্বত্র এমনকি অফিসে কারখানায় সেই দলের সেল গঠন, জেলার জেলায় বাধ্যতামূলক বহুমুখী 'সমবায়ের' প্রচলন ইত্যাদিতে হুবহু সোভিয়েত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাকশালের 'সমাজতন্ত্র' কতটা তাদের সমাজতন্ত্র হবে এই ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিলো।

পঁচাত্তরের ওই জুন ও জুলাই মাসে আমাকে বেশ কয়েকবার ঘন ঘন সচিবালয়ে যেতে হয়েছিলো বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বৃটেনে যেতে সরকারী অনাপত্তি যোগাড় করতে। যদিও কাজটি মোটেও সহজ ছিলনা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমার বন্ধু আমলারা ইতোমধ্যে এরকম কাজের মূল দায়িত্ব পেয়ে গিয়েছিলো—বন্ধু ডেপুটি সেক্রেটারিরা তাই তাদের ঘনিষ্ঠ খ্যাতনামা সেক্রেটারি মোকাম্মেল হকের কাছ থেকে এটি যোগাড় করে দিতে সময় নিলোনা। এই সুযোগ সচিবালয়ে ওদের সঙ্গে কিছুটা আড্ডাও দেয়া গেলো প্রধানত বাকশালের ফলে তাদের জীবনে যা পরিবর্তন আসছে তা নিয়ে। দেখলাম তখন ওরা খুব ব্যস্ত

হয়ে আছে জেলা গভর্নরদের জন্য নানা ট্রেনিং আয়োজন করতে। যেহেতু নানা জগতের মানুষকে জেলা গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁদের অনেকের শাসন বিষয়ে নিয়ম কানুনের জ্ঞানের অভাব ছিলো; তাছাড়া বাকশালের ও দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কেও ট্রেনিঙের দরকার ছিলো। এ জন্য বেশ কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন রকম ট্রেনিং হবে বলে জানতে পারলাম। কথা ছিলো ট্রেনিং শেষ করে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ জেলা গভর্নররা যার যার জেলায় গিয়ে শাসন ভার গ্রহণ করবেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন চলছিলো বিশেষ সমাবর্তন নিয়ে, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেয়া হবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এই আগমনকে মনে করা হচ্ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যদিও আমি ১৩ আগস্ট বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দিতে রওয়ানা হয়ে যাব, ১৫ আগস্ট সমাবর্তনের আগেই, তবুও এ সম্পর্কে উপাচার্যের ডাকা সব সভা সমিতিতে থেকেছি। তাছাড়া আসল সমাবর্তনের বেশ কয়েকদিন আগে যে পূর্ণ মহড়াটি হলো গাউন ইত্যাদি পরে, তাতে অংশও নিয়েছি। এই উপলক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করা হলো। যেমন বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তাটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যেখানে মূল শহীদ সরণির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেখানে তিন কোণা খালি জায়গাটি ওই বিশেষ ঘটনা উদযাপনের স্মারক ইত্যাদি বসাবার জন্য তখনই নতুন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো, রাতারাতি রাস্তার একটি ছোট শাখা বানিয়ে।

বৃটিশ অ্যাসোসিয়শনের বার্ষিক সম্মেলনগুলো একটি এলাহি ব্যাপার— ১৮৩১ সাল থেকে এটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে প্রত্যেক বছর বৃটেনের এক একটি জায়গায়। সেই বছর এটি হবার কথা গিল্ডফোর্ডে। সম্মেলন শুরুর আগে নানা জায়গায় আমার কয়েকটি ভিজিট ছিলো যা ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হবে। এর মধ্যে বৃটিশ কাউন্সিল প্রতিনিধি আমাকে হীথরো বিমান বন্দর থেকে নিয়ে সেন্ট্রাল লন্ডনে একটি ছোট গলিতে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট জাতীয় একটি ছোট সাদামাটা থাকার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলো। ১৫ আগস্ট সকালে ওখানে ব্রেকফাস্ট করে হেঁটে রওয়ানা হয়েছি বৃটিশ কাউন্সিল অফিসের উদ্দেশ্যে টিউব ট্রেন নেবার জন্য কাছের টিউব স্টেশনের দিকে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তায় দেখা পেলাম হৈচৈ করে কথা বলতে বলতে আসছে পাঁচ ছয় জন বাঙালি যাদের মধ্যে আমার পরিচিত একজন ছিলো। তাদের হাতে খোলা অবস্থায় ধরা রয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা। আমাকে স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক কথা বলতে দেখে আমার বন্ধু সহ ওরা খুব অবাক হলো, বল্‌লো 'আপনি শোনেননি কী হয়ে গেছে, শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়েছেন, কাগজ দেখেন নি'? আমি শুনে

সপরিবারে নিহত হয়েছে, কাগজ দেখেন নি'? আমি শুনে থ' হয়ে গেলাম, কাগজ হাতে দিলে দেখলাম সব ক'টিতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তাঁর বড় ছবি রয়েছে, যেটুকু খবর তারা পেয়েছে তা বেশ ফলাও করেই দেবার চেষ্টা করেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি শুধু হেডিংগুলো পড়তে পেরেছি, তাছাড়া ওদের দ্রুত কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম তাতেই আমার মাথা ঘুরে শরীর হিম হয়ে গেলো। ওই পাঁচ ছয় জনের দল কিন্তু খুবই উত্তেজিত ও খুশি—বোঝাই যাচ্ছিলো তারা লন্ডনের আওয়ামী বিরোধী মানুষ। শেখ মুজিব সরকার নাকি তাদের একজনের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিলো এবং তাতে লন্ডনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের হাত ছিলো, তাই এখন যাচ্ছে বাংলাদেশ হাই কমিশনের দিকে ওই রাষ্ট্রদূতকে এক্ষুণি এক হাত নেবার জন্য। রক্তগঙ্গার খবরটি এবং এই ক'জনের উত্তেজিত উল্লাস সব কিছুতে রীতিমত বমির ভাব হচ্ছিল। আমার আর টিউব স্টেশনের দিকে যাবার প্রবৃত্তি হলো না, হোটেলে ফিরে গেলাম। হোটেলের কাউন্টার থেকে পত্রিকা চেয়ে নিয়ে কাউন্টারের সামনেই ছোট যে সোফাটি ছিল তাতে বিধ্বস্ত দেহে বসে পড়লাম।

এবার নানা আশঙ্কার কথা মনে ভীড় করে এলো। কাগজে যেটুকু দেখলাম তাতে এ মুহূর্তে দেশে চরম গোলযোগ দেখা দিতে পারে, চরম অরাজকতা, গৃহযুদ্ধ, ভারতীয় আক্রমণ, সব সম্ভাবনাই মনে এলো—কারণ ১৫ আগস্ট ভোরের পর ক্ষমতার রদবদল কতখানি চ্যালেঞ্জহীন হয়েছে তার কোন ইঙ্গিত এখনো পর্যন্ত খবরের মধ্যে ছিলোনা। শুধু দেখলাম বিমান বন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই সকালে বের হয়ে একটু পরেই আবার ফিরে এসে চিন্তিত মুখে এই যে পত্রিকা পড়ছিলাম তা ওই বেড অ্যান্ড ব্রেকফাষ্টের প্রবীণ মালিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। আগেই জেনেছিলাম যে এই বৃদ্ধ একজন রুমানিয়ান—অনেক বছর আগে সেখানে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় দেশত্যাগী হয়ে বৃটেনে আছেন। তিনিই বেশির ভাগ সময় কাউন্টারে থাকেন, তাঁর মেয়েরা বাকি কাজ করে; এটি একটি পারিবারিক ব্যবস্থাপনার হোটেল। বৃদ্ধ নিজেও পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার এই বড় খবরটি দেখে নিয়েছেন, আস্তে আমার পাশে এসে বসলেন; পূর্ব ইউরোপীয় টানের ইংরেজিতে খুব মৃদু স্বরে বল্লেন, 'বাছা, ঘটনাটি তোমাদের দেশেই বোধ হয় ঘটেছে, তোমাকে খুব বিপর্যস্ত দেখা যাচ্ছে'। আমি হ্যাঁ বলাতে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরো কাছে এসে প্রায় ফিস ফিস করেই বললেন 'দেখে নিয়ো এর পেছনে নিশ্চয়ই রাশিয়ার হাত আছে। দুনিয়ার যেখানেই সহিংস কোন রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটে বুঝবে কোন না কোন ভাবে তাতে রাশিয়ার হাত আছ'। এতো চিন্তার মধ্যেও হাসি পেলো। এই বৃদ্ধ আমাদের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানেননা, কিন্তু জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে রাশিয়াকে অপছন্দ করতে শিখেছেন প্রধানত যৌবনে কম্যুনিস্টদের হাতে কষ্ট পাওয়ার কারণে। এখন সব জায়গায় রাশিয়ার হাত কল্পনা করেন।

দু'তিনদিনের মধ্যে দেশে অরাজকতা নিয়ে আমার তাৎক্ষণিক আশঙ্কাগুলো কিছুটা প্রশমিত হলো। অন্তত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান চলাচল সব চালু হয়েছে। যথারীতি আওয়ামী লীগ সরকারই চলছে, সংসদও অক্ষুণ্ন; শুধু মূল নেতৃত্ব পালটে গেছে কারণ খোন্দকার মোশতাককে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এই রক্তক্ষয়ী পরিবর্তনের নায়ক মধ্যম পদের কিছু সেনা অফিসাররা—দৃশ্যত তাদের কথাতেই দেশ চলছে এবং তা অদ্ভুতভাবে শান্ত রয়েছে। নিরাপদ পরিস্থিতি ও ঠিক সময়ে কয়েকদিনের মধ্যে দেশে যথারীতি ফিরতে পারার সম্ভাবনায় মাথা থেকে একটি বড় ভার নেমে গেলো যদিও সেই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যগুলোর কল্পনা ভুলতে পারছিলাম না এবং এমন অদ্ভুত অবস্থা কতদিন টিকবে, দেশের কী হবে, এই নিয়ে চিন্তাও বজায় রইলো। সেই অবস্থাতেই বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং বৃটেনে বিজ্ঞানকে কী ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বৃটিশ কাউন্সিলের আতিথ্যে নানা জায়গায় ঘুরে তার নানা ব্যবস্থা দেখে বেড়ালাম।

বিজ্ঞান ক্লাবের বৃহত্তর ধারণা

আমার কাছে বিজ্ঞান ক্লাব মানে হলো আমার বাল্যকালের সেই আনন্দ—নিজে নিজে, নিজের হাতে বিজ্ঞানের জিনিস তৈরির আনন্দ, করে দেখার আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন যে একে সাংগঠানিক রূপ দিতে হচ্ছে, মেলা আয়োজন করতে হচ্ছে, এগুলো এর বহিরঙ্গ—যাতে অনেককে সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। অথচ অনুসন্ধানী পরিচালনা করতে গিয়ে, কিংবা বিজ্ঞান সাময়িকীর ক্লাব সমন্বয়ের কাজ করতে গিয়ে, কারো কারো মধ্যে বিজ্ঞান-আনন্দের মূল সুরটিকে বাদ দিয়ে শুধু এর বহিরঙ্গ নিয়ে মেতে থাকার প্রবণতা দেখতাম। আমার কাজ ছিল ক্লাবের আগ্রহী সদস্যদের মধ্যে আনন্দের নেশা সঞ্চারের উপায়-উপকরণ বের করা। এ কাজে বৃটেনে এই সফর খুব কাজে লেগে গেলো। বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনের কটা দিন কত রকম মানুষের যে সমাবেশ হয়েছে তার সীমা ছিলনা—তাদের মধ্যে শুধু একটি মিল, সবাই অত্যন্ত বিজ্ঞানোৎসাহী। অনেকগুলো সমান্তরাল সেশনে নানা বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতিগুলো আলোচিত হচ্ছিলো, খুব চমকপ্রদ নতুন সব উদ্ভাবন বাস্তবে দেখানো হচ্ছিল—অনেক ক্ষেত্রে খুব সাদামাটা ভাবে। সব ক'টি যে তেমন বিজ্ঞানের ব্যাপার ছিলো তাও নয়। একটি ক্ষেত্রে দেখলাম একজন অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতার তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্যতা বোঝার জন্য সব শ্রোতাকে একটি করে বড় কিউব দিয়েছেন—যেন লুডুর ছক্কার একটি বড় রূপ। এর ছয় তলের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন রঙ করা আছে। এক একটি রং সেই শ্রোতার এক একটি মতামত প্রকাশ করে। যেমন লাল রং দেখালে বুঝতে হবে তিনি বক্তৃতার কিছুই বুঝছেন না। যে তলটি সামনে থেকে দেখা যাবে বক্তা নানা শ্রোতার ক্ষেত্রে সেটির রং এক সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বুঝবেন তাঁর বক্তৃতা ওই শ্রোতাদের বড় অংশের কাছে কঠিন না

সহজ মনে হচ্ছে, বেশি দ্রুত না বেশি আস্তে মনে হচ্ছে ইত্যাদি; যাতে তিনি প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নিতে পারেন। যতগুলো পারলাম জনপ্রিয়করণের এই বক্তৃতাগুলো শোনলাম; নানা ভাবে বলে, করে, দেখিয়ে, কীভাবে বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নেবার চেষ্টা চলছে দেখলাম। পরে সম্মেলন শেষে নানা জায়গায় গিয়ে এমন প্রচেষ্টার স্থায়ী ব্যবস্থাগুলোও দেখলাম।

বৃটেনে যে ছোটদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য এত সব ব্যবস্থা আছে তা আমার জানা ছিলনা। এর কোন কোনটি হচ্ছে নেচার স্টাডি ক্যাম্পের মত। এরকম কোন কোন ক্যাম্প গিয়ে দেখলাম বড়রা বাচ্চাদেরকে প্রকৃতির মধ্যে অভিযান চালাতে সাহায্য করছে—এঁদো জায়গায় ব্যাং আর ব্যাঙাচি পর্যবেক্ষণ করা থেকে শুরু করে উইয়ের ডিবির সন্ধান নেয়া তার মধ্যে অলিগলি, খোপখাপ, সব কিছুর সন্ধান নেয়া পর্যন্ত। আবার বিজ্ঞান যাদুঘর অথবা নেচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের মত জায়গায় নানা বয়সী ছাত্র ছাত্রীদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে নিজেরাই করে দেখার জন্য—শুধু প্রয়োজনে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সব চেয়ে দারুণ লাগলো শিল্প-প্রত্নতত্ত্ব নামের একটি বিষয় সম্পর্কে জেনে, যার চর্চা চলছে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের প্রথম লালনভূমি উত্তর ইংল্যান্ডে। নতুন উদ্ভাবিত ব্লাস্ট ফারনেস চুল্লিতে প্রথম লোহা ও ইস্পাত এখানে তৈরি হয়েছিল; এই লোহা দিয়ে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত আয়রন ব্রিজ সেতু। প্রথম স্টিম ইঞ্জিন সেখানে ব্যবহার হয়েছিলো খনির পানি তুলতে। রেখে দেয়া হয়েছে সেই পুরোনো ব্লাস্ট ফারনেস, খনিতে নামার লিফ্‌ট-চাকা, পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন ইত্যাদি। ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলেই একটি অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ভরে যায়—আজকের এই শিল্পোন্নত অবস্থাটি অনেক উদ্ভাবন এবং অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিলে তিলে সৃষ্টি হয়েছে, প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছে ঠিক এই জায়গায়।

মনে হলো আমাদের দেশের শিল্প ঐতিহ্যটিও পুনরাবিষ্কার করা দরকার—হোকনা তা কুটিরশিল্প, এক সময় এই কুটির শিল্পের পারদর্শিতাটাই নিজ প্রয়োজনে আধুনিকতর বড় শিল্পের সুযোগ করে দেয়; কিন্তু কতজন তা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন মনে করে? যদি আবদুস সালামের কথিত সেই কারিগরি সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনতে হয় তা হলে সব শিশু, সব তরুণ তরুণীকে এ নিয়ে ভাবতে হবে, এর আনন্দের ভাগ পেতে হবে। আমাদের বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে কী ভাবে শিগ্‌গীর এ সব ঢোকানো যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, বিশেষ করে দেশে এতগুলো অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাব শাখায় তো এ নিয়ে পদক্ষেপ দ্রুত নেয়াই যায়।

ইংল্যান্ডে এই স্বল্পকালীন ভ্রমণের সুযোগে সাউদাম্পটনে একবার ঢুঁ দিলাম পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখানকার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে দু'একজন ছাড়া সবাই তখনো রয়েছে—ব্রায়ান হপকিন্সের দলে আমার সমসাময়িক ছাত্রদের কেউ কেউ পিএইচডি শেষ করে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করছে। অন্যরা এখনো শেষ করেনি। আমার দীর্ঘদিনের ল্যাবোরেটরি সাথী

শাহের (গুণবন্ত রঙ্গলাল শাহ) সঙ্গে দেখা হলে তার স্ত্রী ক্রিষ্টিন ও ছেলে আবীরের সঙ্গে দারুণ সময় কাটলো। অন্যান্য সহকর্মী এবং ব্রায়ান খুব উৎসাহ ভরে বল্‌লেন আমি যাওয়ার পরে তাঁর গবেষণা দলে আর কী কী ঘটছে তার কথা। বাঙালি বন্ধু কয়েকজন রয়ে গেছেন। নজমুল হক সাহেব বোটানিতে শিক্ষক হবার পথে। পরে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর নজমুল হক দীর্ঘকাল এখানে অধ্যাপনা করে বাংলাদেশের বহু ছাত্রকে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছেন, আমাদের অপ্রচলিত শস্য ও ফলগুলোর উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলে তার মাধ্যমে কাজ করেছেন।

নতুন বাসা থেকে ঐতিহাসিক ঘটনা

তখনো আমরা থাকতাম শেখ সাহেব বাজারের সেই বাড়িতে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসা আমার প্রাপ্য হয়। শিক্ষকদের আবাসিক বিভিন্ন ভবনগুলোর কোন ফ্ল্যাট পেলামনা, তবে প্রায় শতবর্ষ পুরোনো একটি লাল ইটের দোতলা বাংলো বাড়ি যা এখন প্রায় পোড়োবাড়ির অবস্থা ধারণ করেছে মন্দের ভাল হিসেবে তার নিচের একাংশে ঠাই পেলাম। পি ডব্ল্যু ডি বাংলো নম্বর তিন নামে পরিচিত এই বাড়িটি ছিল ফুলার রোডে বৃটিশ কাউন্সিলের বিপরীতে পুরাতন উদয়ন স্কুলের পাশে। সেই পুরোনো কায়দার বাড়ি বলে এতে যত না দেয়াল তার চেয়ে বেশি ছিল বিশাল বিশাল দরজা, জানালা, আর বারান্দা। পঁচাত্তরের নভেম্বরের এক তারিখ এ বাড়িতে এসেছি। তার পরপরই আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঘটনা-দুর্ঘটনার মুখে পড়লাম এই জায়গাতে চারদিকে প্রায় উন্মুক্ত এই বাড়িতে।

পত্রিকায় ও গুজবে আসল খবরটি পাওয়া যাচ্ছিল না, তবে বোঝা যাচ্ছিল যে একটা কিছু ঘটছে যা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে তেমন কোন খবর পাওয়ার উপায় নেই। পত্রিকায় লিখলো এক অদ্ভুত সংবাদ—'৩ নভেম্বর ঢাকা জেলে যা ঘটেছে সরকার তার তদন্ত করছে, শিগ্‌গীর তার ফলাফল জানানো হবে'। কিন্তু কী ঘটনা সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। জেলে চার নেতাকে হত্যার বিষয় প্রকাশিত হতে এভাবে সময় লেগেছিলো। তারপরও কাজকর্ম সব স্বাভাবিক চলছিলো, কার্জন হলে ক্লাসও হচ্ছিলো। সেখানে আমার রুমে বসে একটি মিছিলের আওয়াজ পেলাম। আগস্ট পরবর্তী দিনগুলোতে মিছিল জিনিসটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম ছোট একটি মিছিল; অধিকাংশ তরুণ হলেও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষও কয়েকজন ছিলো। কিন্তু শ্লোগানগুলো আগেকার দিনের মত জয় বাংলার, খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই শ্লোগান আর শোনা যায়নি। মিছিলটি শহীদ মিনারের দিক থেকে এসে সচিবালয়ের দিকে চলে গেল। তখনই বুঝলাম ক্ষমতার গোড়ায় কিছু একটি ঘটছে, হয়তো মোশতাক সরকারের ও তাকে খাড়া করে রাখায় ব্যস্ত ওই তরুণ সেনা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে চিড় ধরেছে।

এর পরপর একদিন ভোরের দিকে মিগ ফাইটারের প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠলাম। একটু খানি পরে শোনলাম ফাইটার থেকে মেশিন গান ফায়ারিঙের আরো প্রচণ্ড শব্দ। এই প্রথম সিনেমাতে নয় সত্যিকার যুদ্ধ-বিমান থেকে মেশিন গানের শব্দ শোনলাম। মনে হচ্ছিলো সব কিছু ঘটছে আমাদের বাসার ওপরে বা তার খুব কাছে স্বল্প উচ্চতা থেকে। এরকম ফায়ারিঙের নিচে বা তার এলোমেলো গুলির বিরুদ্ধে আমাদের বাসার খুবই পুরু ছাদ বা দেয়াল বর্ম হিসেবে মন্দ ছিলনা। কিন্তু সমস্যা ছিলো বাসার বিশাল বিশাল কাচের দরজা ও জানালা। ঘরের কোন কামরাই এর থেকে মুক্ত ছিলনা। তাই জানালার নিচের পুরু দেয়াল ও বারান্দার পুরু রেলিংকে আড়াল হিসেবে পাব মনে করে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম এবং ওই দেয়াল ঘেঁষে তা করার জন্য খাটের তলাতেই চলে গেলাম শুয়ে ক্রলিং করে। কতক্ষণ যে ওই গগন-বিদারী আওয়াজ চলছিলো তা বলতে পারবোনা। পরে শোনেছি ওই বিমান আক্রমণ হয়েছিলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের উপর নয়, বরং একটু দূরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ওপর যেখানে একটি অস্থায়ী সেনা ছাউনি ছিল; বেশ কিছু দিন ধরে সেখানে ছিল বঙ্গ ভবনে অবস্থানকারী মোশতাক সরকারকে চালনাকারী ওই সেনা অফিসারদের বাহিনী।

পরদিন পত্রিকায় দেখলাম ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফাত জামিল মোশতাককে বাধ্য করেছেন জিয়াউর রহমানের বদলে খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করতে। এর আগে ১৫ই আগস্টের পর সেনা উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানকে প্রধানের পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। সব পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি দেখলাম নৌ বাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান দুজনে দুদিক থেকে খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সেদিনই আবার বাসায় এসে ভিন্ন রকমের কিছু খবর শোনলাম। আমাদের বাসার পুরো ওপরের তলায় থাকতেন ফার্মেসি বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর জব্বার সাহেব। তাঁদের দু'একজন সেনা অফিসার আত্মীয় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেসামরিক পোষাকে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন—কারণ ওখানে নাকি সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে এবং অফিসারদেরকে মেরে ফেলছে। মেডিক্যাল কোরের নারী সেনা অফিসার সহ বেশ কিছু অফিসার নিহত হয়েছেন, বাকি অনেকে যে যেদিকে পারে পালিয়ে নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। সে রাতে বিদ্রোহী সিপাহীদের সচক্ষে দেখলাম। বাসার সামনে থেকেই দেখলাম পর পর কয়েকটি ট্যাঙ্ক ধীর গতিতে পলাশীর দিক থেকে সলিমুল্লাহ হলের সামনের রাস্তা দিয়ে শহীদ মিনারের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ট্যাঙ্কের উপর অনেক ক'জন উর্দিপরা সিপাহী ভীড় করে বসে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে খুব উচ্চ স্বরে শ্লোগান দিয়ে চলেছিলো—'নারায়ে তকবির—আল্লাহু আকবর', 'সিপাহি-জনতা—ভাই ভাই'। দিনটি ছিল সাতই নভেম্বর, ১৯৭৫।

পরদিন কিছু কিছু বিষয় পরিস্কার হলো। খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি শহরের মধ্যেই কয়েকটি সেনা ছাউনিতে গিয়ে বাহিনীর আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন; বরং আরো কয়েকজন স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সেনা অফিসারসহ ওখানকার সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছেন। ওদিকে ক্যান্টনমেন্টে ঘটে চলেছিলো কাহিনীর আর এক অধ্যায়। জাসদের সৃষ্ট গণবাহিনী সেনাবাহিনীতে তাদের লোকদের মাধ্যমে সিপাহীদেরকে অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছিলো। এই মর্মে সেখানে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে যে এখন থেকে অফিসারদের কর্তৃত্ব থাকবেনা, তাদের ফাইফরমায়েশ খাটার জন্য ব্যাটম্যান প্রথা থাকবেনা, অফিসার-সিপাহী কোন ব্যবধানও থাকবেনা। গণবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার (মুক্তি যুদ্ধে পায়ে গুরুতর আহত) অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের। কিন্তু গণবাহিনী এই বিদ্রোহের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। বিদ্রোহী সিপাহীরা বরং ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় থাকা জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে এনে তাঁর হাতেই সেনা-কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলো। খালেদ মোশাররফ তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ প্রচেষ্টার শুরুতেই অনুগত সৈন্যদের দিয়ে জিয়াউর রহমানকে বন্দী করেছিলেন।

সাতই নভেম্বরের বেশ গভীর রাত পর্যন্ত রেডিয়োতে শোনলাম এবং টেলিভিশনেও দেখলাম জিয়াউর রহমান নিজে বা তাঁর বরাত দিয়ে অন্যরা বার বার ঘোষণা দিচ্ছেন বিদ্রোহী সিপাহীদের উদ্দেশ্যে। ওরা তখন শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছিল ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসে অস্ত্র জমা দিয়ে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। এজন্য জিয়াউর রহমান সেনা সদস্যদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করেছিলেন। এমন কি মোশতাক সমর্থক সিপাহীদেরকেও মানাবার জন্য মাঝে মাঝে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল যে মোশতাক সাহেব ভাল আছেন, তিনি শিগ্‌গীর এসে পৌছবেন, টেলিভিশনে বক্তব্য দেবেন ইত্যাদি। তখন জিয়াউর রহমান তাঁর এই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় ফিরে গিয়েছিলো, পালিয়ে যাওয়া অফিসাররাও দ্রুত ক্যান্টনমেন্টে ফিরে তাঁদের দায়িত্ব পুনঃগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। নইলে যে কী ঘটতো তা কল্পনা করা যায় না। এর কয়েকদিন পর সিপাহী বিপ্লবের ও অফিসার হত্যার পেছনে প্রধান ইন্ধনদাতা হবার অভিযোগ এনে কর্নেল তাহেরের বিচার হতে পারে। হয়তো তাঁকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা হিসেবে কয়েকজন যুবক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসার সামনে রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে হত্যার অথবা জিম্মি করার চেষ্টা করলে তিনি আহত হন। সেখানে প্রহরারত পুলিশের গুলিতে ওই যুবকদের চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় যার মধ্যে একজন ছিল তাহেরের এক ভাই বাহার। পরিস্থিতিতে আবার অসম্ভব অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাহেরের ফাঁসি হয়েছিলো।

জিয়াউর রহমান মোস্তাকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি, প্রধান বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হতে রাজি করিয়েছিলেন (মতান্তরে খালেদ মোশাররফই সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে রেখেছিলেন), নিজে সেনাপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছিলেন এবং সায়েমকে সরিয়ে নিজেকেই রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ওই সময় উপদেষ্টাদের নিয়ে যে ক্যাবিনেট গঠন করেছিলেন তাতে বেশ কিছু গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন রাজনীতির বাইরে থেকে। আমার শ্রদ্ধাভাজন পরিচিত ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে তাতে ছিলেন সাহিত্যিক আবুল ফজল, চাচা আজিজুল হক, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (স্বল্প কালের জন্য)। এর বেশ কিছুদিন পরে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাতে বামপন্থী থেকে ডান পন্থী বহু নেতা কর্মীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন—প্রথমে জাগ (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক) দল, তারপর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন, যে ফ্রন্টে আরো কয়েকটি দল যোগ দিয়েছিল—যেমন ক্যাপ্টেন হালিম ও এপসুতে আমার নেতা কাজী জাফর আহমদের সম্প্রতি সৃষ্ট ইউনাইটেড পিপল্‌স পার্টি (ইউ পি পি), যাতে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন মণির ভাই আকবর ভাইও। জিয়া আরো পরে এই ফ্রন্টকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) পরিণত করেন। বাকশালের সময় থেকে রাজনৈতিক দলের উপর যে নিষেধাজ্ঞা তাও এখন তুলে নিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থা আবার চালু হলো।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা। সাতই নভেম্বর ১৯৭৫ দিনটি এবং এর আগের কয়েকটি দিন কিন্তু আমার মনের মধ্যে ভীষণ ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিলো—আবার এতগুলো অতি মূল্যবান প্রাণ ঝরে গেলো বলে। মুজিব নগর সরকারের দিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসের দিনগুলোতে আমরা যেভাবে তাকিয়েছেলাম, বিশেষ করে তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্ব তখন এবং পরে বাংলাদেশে ফেরার পর যে রকম শ্রদ্ধা জাগিয়েছিলো—জেল হত্যার মত নির্মম ঘটনায় তাঁদের হারিয়ে হতবাক হয়েছি। তারপর খালেদ মোশাররফ, এবং তাঁর সঙ্গে কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দারের মত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এমন মৃত্যুও এনে দিয়েছিলো অসম্ভব বিষণ্নতা। খালেদ মোশাররফের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা গড়ে ওঠেছিলো মুক্তিযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে টেলিভিশনে দেখা একটি ছোট প্রতিবেদনে খুব সম্ভব ইন্ডেপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের রিপোর্টাররা সীমান্ত অঞ্চল থেকে এটি ধারণ করেছিলো—এর নাম 'ওয়ার অফ মেজর খালেদ'। পঁচাত্তরের আগস্টের কিছুদিন আগে তাঁকে সামনা-সামনি দেখেছিলাম ক্যান্টনমেন্টে সেনা ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে—সেনা প্রধান শফিউল্লাহ এবং উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে; তখন তিনি সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ। তিন জনেই সামনের সারিতে পাশাপাশি বসেছেন। কয়েকদিন আগে তাঁরা তিনজনই ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। এই উপলক্ষে

নানা জন এসে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আমি ও মণি গিয়েছিলাম আকবর ভাইয়ের (তখন তিনি সেনাবাহিনীতে লে. কর্নেল) আমন্ত্রণে। তিনি আমাকে ওই তিনজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান আমাদেরকে চিনতে পারলেন। এর আগেও কোন এক উৎসবের ছুটির দিন একবার আকবর ভাইয়ের বাসায় গেলে তিনি আমাকে ও মণিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর উপ-প্রধানের বাসায়। সেবারো ওই লন্ডনে দেখা হবার মতো নানা বিষয়ে উৎসাহ ভরে গল্প করেছিলেন—বিজ্ঞান সাময়িকী, বিজ্ঞান ক্লাবের কথাও বাদ যায়নি। তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়া বেশ ঘরোয়া ভঙ্গিতে চা আনিয়ে খাইয়েছিলেন। আর সেদিন সেনা ক্লাবে ওই তিন জনের কাছাকাছি বসে হাউজি খেলা দেখছিলাম। এর পরেপরেই কত কিছু ঘটে গেলো।

প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ

পঁচাত্তরের শেষের দিকে ও ছিয়াত্তরের শুরুতে আমি মাস তিনেকের জন্য ইতালির ত্রিয়েস্তে বিজ্ঞানী আবদুস সালামের উদ্যোগে স্থাপিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রে (আই সি টি পি) একটি উইন্টার কলেজে আমন্ত্রিত হই, আলী আসগর সাহেবও একই সঙ্গে যান। আমরা যাওয়ার পথে দিল্লি হয়ে যাই, আর আসার পথে কলকাতা ও শান্তিনিকেতন হয়ে আসি। সাতই নভেম্বর এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে আক্রমণের ঘটনার পরেপরেই আমরা ভারতে রওয়ানা হয়েছিলাম। ওই দিনগুলো ছিল দারুণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। ভারতীয় হস্ত ক্ষেপের সম্ভাবনা নিয়ে নানা গুজব শোনে গিয়েছিলাম। ভারতের ট্রেনে বাসেও এ সম্পর্কে জনতার নানা উত্তেজিত মন্তব্য তাদের নিজেদের মধ্যে করতে শোনছিলাম; তখন নিজেরা জাতীয় পরিচয় প্রকাশ না করাই শ্রেয় মনে করেছি। অন্যত্র ভারতীয় বন্ধুদের কাছে অবশ্য সরাসরি নানা কথা শুনতে হয়েছে। ওই আমার প্রথম ভারত যাওয়া। আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী ও আবদুল কাদের ভূঁইয়া (সলিমুল্লাহ হলে আমার ভিপিগিরির সময় হল এপসুর যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক) তখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানে পি এইচ ডি করছে। তাদের সঙ্গে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকলাম, দিল্লির নানা ঐতিহাসিক স্থানে ফুর্তি করে ঘুরে বেড়ালাম, 'গুজরাটি সমাজ' বলে একটি দলের সঙ্গে বাসে মথুরা, বৃন্দাবন, ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা গেলাম। বিজ্ঞান সাময়িকীর কল্যাণে কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে আমরা ভাল আতিথিয়তা পেলাম—সাময়িকীর লেখক সমরজিৎ কর, দীপক দাঁ ও তার গোবরাতলা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা, এবং শান্তি নিকেতনের দেবী চট্টোপধ্যায় আমাদের নিয়ে রীতিমত একটি বিজ্ঞান উৎসব করে ফেল্‌লেন।

ত্রিয়েস্তে এবার আমার জন্য বড় ঘটনা ছিলো আবদুস সালামের অনেক বেশি সান্নিধ্যে আসা। ওখানে থাকা কালে তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন বিভিন্ন

বিষয়ে—প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিশেষ করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বল এবং নিউক্লিয়ার উইক বলকে একীভূত করে ইলেকট্রো-উইক থিওরির আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতনামা; যদিও এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আরো তিন বছর পর, এর পরীক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাওয়ার পর। তাঁর সঙ্গে ত্রিয়েস্তের সেন্টারে নানা জায়গায় এমনিতে দেখা হয়—বিশেষ করে দুপুরে কাফেটেরিয়াতে তিনি আমাদের সবার সঙ্গেই খান। তখন আমরা চারজন বাংলাদেশী ওখানে ছিলাম—আসগর সাহেব ও আমি ছাড়াও প্রফেসর হারুণ অর রশীদ ও ড. মেজবাহউদ্দিন (পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর অনেক কৌতূহল, অনেক উৎসাহ; তাঁর প্রিয় ছাত্রদের অনেকে বাংলাদেশে—হারুণ স্যার তার মধ্যে একজন। আমাদের রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা হলো, অর্থনীতি নিয়েও। এগুলো নিয়ে সালাম অনেক ভাবেন। ইসলামী বিজ্ঞান ঐতিহ্য, বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন নিয়েও তাঁর অনেক কাজ রয়েছে। পাকিস্তানে কিছুদিন আগে কাদিয়ানিদেরকে (তিনি নিজেও কাদিয়ানি) অমুসলিম ঘোষণাতে তাঁকে মর্মাহত মনে হলো, অথচ পাকিস্তানের বিজ্ঞানোন্নয়নে তাঁর অবদানই সব চেয়ে বেশি।

বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য আবদুস সালামের একটি সাক্ষাৎকার নিলাম। তাঁর আবিষ্কারগুলো নিয়ে কথা হলো। বিজ্ঞান দর্শন সম্পর্কে তাঁর মতামত চাইলাম। আরো আলাপ হলো বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টার ব্যাপারে। সালাম নিজে এই ব্যাপারে সারা জীবন আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি বল্‌লেন যতদিন আমাদের দেশগুলোতে বিজ্ঞান সংস্কৃতি সৃষ্টি না করতে পারছি ততদিন আমাদের পরিত্রাণ নেই। এই সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্যই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণের কাজটি খুব জরুরি—এটি বিজ্ঞানীদেরকেই প্রধানত করতে হবে, বৈজ্ঞানিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সেগুলো সমাজের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের চেষ্টাগুলো তিনি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করে এসেছেন। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রকাশের যে চেষ্টা চলছে, বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন কীভাবে চলছে তার কিছুটা পরিচয় দিলাম। তিনি এ সম্পর্কে কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন।

ত্রিয়েস্ত থেকে ফিরে আসার পর আমাদের সব চেয়ে বড় অনুষ্ঠানটি হলো দেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ। বিজ্ঞান সাময়িকী ও অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাব এটি আয়োজন করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জনে হলে। এর জন্য দেশের সকল জায়গার বিজ্ঞান ক্লাব ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিল এই প্রথম বার এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সবাই মুখোমুখী আন্দোলনটি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে, তাদের কাজের কিছু নমুনা উপস্থাপন করতে পারবে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তা খুঁজে পাবে—যার ফলে দেশে একটি বৃহত্তর বিজ্ঞান সমাজ তৈরি হওয়ার সুযোগ বাড়বে। এতদিন ওরা পরস্পরকে চিনতো বিজ্ঞান সাময়িকীর মাধ্যমে, এবার চাক্ষুষভাবে চিনবে। দেশের

সকল প্রান্ত থেকে অনুসন্ধানী শাখাগুলো এসেছিলো—ওদের অনেকের নিজেদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা ছিলো, বাকিরা ঢাকার অনুসন্ধানী সদস্যদের সঙ্গে থেকেছে। বাইরে থেকে আসা অনেককে কার্জন হলেই রাখার ব্যবস্থা হয়েছিলো—এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ছিল অসাধারণ। ক্লাবের বৈচিত্রগুলো তাদের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল—খুলনার বেতাগী বিজ্ঞান ক্লাব, চট্টগ্রামের রাউজান বিজ্ঞান ক্লাব, কলকণ্ঠ, ঢাকা জুভেনাইল সায়েন্স পাইওনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন, কচি কাঁচার মেলা বিজ্ঞান প্রকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব ইত্যাদি বহু ক্লাব। সমাবেশে বিভিন্ন রকম আলোচনার আয়োজন ছিল। সবাই মিলে বড় মাপের সভা যেমন হয়েছে তেমনি আলাদা আলাদা ভাবে ছোট ছোট সভাও বেশ ক'টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি যে যেকোন সমাবেশ নয় বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ তা বোঝা যাচ্ছিল এর চারদিকের সাজসজ্জা থেকে—কতগুলো প্রিজমকে একত্র করে বানানো হয়েছিলো গেইট। সমাবেশের মূল শ্লোগান ছিল 'গ্রামেগঞ্জে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলো'।

বিজ্ঞান ক্লাবের নানা কাজ ফুটিয়ে তুলে আঁকা হয়েছে অনেক রঙিন পোস্টার। সমাবেশের প্রদর্শনীটির উদ্বোধনটিও হলো খুব ব্যতিক্রমী এক প্রক্রিয়ায়। কার্জন হলের সামনে রাখা হয়েছিল সুন্দর মিসাইল আকৃতির একটি রকেট। এর ফিউজে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ দিয়ে যা দূর থেকে সুইচ টিপে শুরু করে দিলেন আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন। রকেটটি সোজা হাউই বাজির মত ওপরের দিকে কিছুটা উঠে পড়ে গেল।

সমাবেশের মূল আলোচনায় এলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের কৃষি বিষয়ক সদস্য আজিজুল হক (চাচা), রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞান উপদেষ্টা প্রফেসর ইন্নাস আলী, ছিলেন রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডীন প্রফেসর রফিক উল্লাহ। সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বল্লেন বিজ্ঞান ক্লাব কী করতে পারে। মূল প্রবন্ধটি পড়লেন আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন; 'বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মনস্কতা, বিজ্ঞান আন্দোলন'—তাঁর এই প্রবন্ধটি বলতে গেলে এই আন্দোলনের জন্য একটি মূল্যবান দিগদর্শিকা হলো। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সমাবেশের এবং শুরু থেকে এই পর্যন্ত বিজ্ঞান সাময়িকী কীভাবে আন্দোলনের চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছে তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণী দিতে পারলাম।

মূল সম্মেলনের সেশনটি শেষ হয়ে গেলে কার্জন হল জুড়ে শুরু হয় সমাবেশের প্রদর্শনীটি। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে এটি পরবর্তী কালের বহুল অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলাগুলোর জন্য একটি পূর্বসুরির কাজ করেছিলো। কিছু ছিল সত্যি সত্যি পরিমাপে কাজে লাগবে এমনি কিছু পরিমাপযন্ত্র—যেমন পানির স্রোতের বেগ নির্ণয়ের, লবণাক্ততা নির্ণয়ের, দূরের কোন কিছুর উচ্চতা নির্ণয়ের, গাছের বৃদ্ধির গতি নির্ণয়ের, পাতলা জিনিসের পুরুত্ব

নির্ণয়ের ইত্যাদি। ছিল নানা রকম প্রাকৃতিক জিনিসের সংগ্রহ—দেশের এক এক অঞ্চলের প্রজাপতি, পাতা, ঝিনুক, শস্য ইত্যাদি। শিক্ষা উপকরণের একটি বিভাগ ছিল যাতে বিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা উপকরণ সহজ জিনিস দিয়ে নতুন ভাবনায় তৈরি করা হয়েছে। কোন কোন ক্লাব তাদের দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলাফল নমুনা সহ উপস্থাপন করেছিলো এতে, যেমন আমের পোকার সম্পর্কে গবেষণা, ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা এবং খুলনার বেতাগা অঞ্চলের সুপারি গাছের বিষয়ে গবেষণা।

আমাদের এই প্রথম দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশের সাফল্য থেকেই এরকম প্রদর্শনীতে একটি প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে আসা এবং তার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করার আইডিয়াটি আমাদের মাথায় আসে। সব দিক বিবেচনা করে এজন্য বিজ্ঞান যাদুঘরকেই সব চেয়ে ভাল মাধ্যম বলে মনে হলো। সে সময় খুব ছোট অবয়বে বিজ্ঞান যাদুঘরটি গড়ে উঠছিলো। মণি সহকারী কিউরেটর হিসেবে ওখানে চাকরি করছিলো বেশ কিছু দিন হলো। সাউদাম্পটন থেকে ফেরার পর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পদার্থবিদ্যার মাস্টার্স শেষ করে এবং তারপর এখানকার শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিউট (আই ই আর) থেকে এম এড ডিগ্রি নেয়। এরপর বিজ্ঞান যাদুঘরে যোগ দিয়েছিলো—যে কাজে ইংল্যান্ডে টটন কলেজে টেকনিশিয়ানের অভিজ্ঞতাটি তাকে খুব সহায়তা দিয়েছিলো।

বিজ্ঞান সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয়ের সুফল আমরা হাতে হাতেই দেখতে পারছিলাম। বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করার একটি উৎসাহ তখন জেলায় জেলায় দেখা দিয়েছিলো—স্কুল ও কলেজকে আশ্রয় করে তো বটেই, নানা উদ্যোগী মানুষের চেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও বেশ কিছু ক্লাব গড়ে উঠছিলো। কাজেই বিজ্ঞান সাময়িকীর এই দিকটি ক্রমেই সমৃদ্ধ হতে থাকে; আর সব ক্লাবের উৎসাহী সদস্যদের নিয়ে দেশব্যাপী আমাদের বেশ জমজমাট একটি বিজ্ঞান সমাজ গড়ে উঠলো। ছিয়াত্তর সালেই ব্যাপারটি সরকারেরও নজরে আনতে পারলাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান যাদুঘরকে দায়িত্ব দেয়া হলো সবগুলো ক্লাবের একটি তালিকা করতে, এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং জাতীয় ভাবে বিজ্ঞান মেলা করার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ আয়োজন করতে। কিন্তু বিজ্ঞান যাদুঘর তো তখন পর্যন্ত নেহাত ছোট সনাতন যাদুঘরই ছিলো—বিভিন্ন ভাবে যোগাড় করা বিজ্ঞানের নানা টুকিটাকি, নানা মাছ, পতঙ্গ ইত্যাদির সংগ্রহ, ইতিহাসের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছবি এমনি সব জিনিস দিয়ে সাজানো : তখন এটি ছিলো ধানমণ্ডির একটি ভাড়া করা বাড়িতে। ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণের সময় আমি আর মণি যখন যেখানে পেরেছি—বিজ্ঞান যাদুঘর ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান দেখতে বাদ দিইনি। লন্ডনের এক্সিবিশন রোডের বিখ্যাত 'সায়েন্স মিউজিয়াম' ও 'নেচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে' তো অনেকবার গিয়েছি। তা ছাড়া অন্যান্য শহরে অপেক্ষাকৃত ছোট এরকম মিউজিয়াম দেখেছি যেগুলোর নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

জেনেভায় একটি ছোট মিউজিয়াম দেখেছি যাতে অতীতের বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত বিশ্বের ম্যাপ ও বড় বড় গ্লোব রয়েছে। শত শত বছর আগে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর সম্পর্কে ভূগোলবিদদের যে রকম ধারণা ছিল তা এতে বোঝা যায়, অভিযাত্রী মানচিত্রবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় কী ভাবে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়েছে তাও বেশ বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা স্টেটের হান্টসভিল শহরে যে স্পেস মিউজিয়াম দেখেছি তার কথা আগেই বলেছি। রাইট ব্রাদার্সের প্রথম বিমান থেকে শুরু করে, প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেয়া স্পিরিট অব সেন্ট লুই সহ বিমান ইতিহাসের নানা মাইল ফলকগুলো দেখেছিলাম ওয়াশিংটন ডিসিতে স্মিথসোনিয়ানে। স্পিরিট অব সেন্ট লুই সম্পর্কে বই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাকে কী ভাবে আন্দোলিত করেছিলো সে কথা কখনো ভুলিনি।

তবে আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিলো একটি একেবারেই ছোট্ট বিজ্ঞান যাদুঘর—শুধু একজন বিজ্ঞানীর কাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেটি। ইতালির ফ্লোরেন্সে গিয়ে এই যাদুঘরটির কথা জানতে পেরেছিলাম—'গ্যালিলিও মিউজিয়াম'। জীবনের একটি বড় সময় গ্যালিলিও ফ্লোরেন্সে কাটিয়েছেন এখানকার শাসক মেডিচির চাকরি গ্রহণ করে। সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেটিকেই এখন মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। প্রাচীন ফ্লোরেন্সের অনেক অলিগলির মধ্যে বহু খুঁজে বাড়িটি বের করলাম। বাইরে 'গ্যালিলিও মিউজিয়াম' সাইনবোর্ড দেয়া রয়েছে বটে কিন্তু ওখানে কোন খোলা দরজা, টিকেট ঘর, বা দর্শকের সারি কিছুই দেখলামনা—যা অন্যান্য সব মিউজিয়ামে দেখেছি। বেশ খানিক্ষণ ঘণ্টা বাজাবার পর একজন তরুণী এসে ভেতরে নিয়ে গেলো। জানলাম এটি দেখতে খুব বেশি মানুষ আসেনা, আজ আমরাই এলাম। ওই তরুণী ও তার মা এর দেখাশোনা করে, দর্শক এলে ঘুরিয়ে দেখায়, ওরা এখানেই থাকে। প্রাচীন এই বাড়িতে বিভিন্ন কক্ষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে—গ্যালিলিওর করা বিভিন্ন পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি। বিশেষ করে গতির নিয়ম, পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ ইত্যাদি আবিষ্কারে তিনি ঢালু তলের উপর দিয়ে বল গড়িয়ে যে পরীক্ষা করেছেন সেগুলোর। তাঁর সময়ের যে ভূগোলক (গ্লোব) এবং খগোলক (মহাকাশের গ্লোব) তিনি ব্যবহার করতেন সেগুলো, আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য নিজের হাতে যে টেলিস্কোপগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন তা এবং সেই প্রথম আমলের তাপমান যন্ত্র থার্মোমিটার ইত্যাদি। বিজ্ঞান ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস এখানে ধরা পড়েছে। অবশ্য মিউজিয়ামের বৃহত্তর অংশে গ্যালিলিওর নিজের যন্ত্রপাতির বাইরেও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সব যন্ত্রপাতিও রয়েছে এখানে।

অধিকাংশ মিউজিয়াম দর্শকের জন্য শুধু দেখার ব্যাপারটি থাকলেও সেখানে নানা বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়, সক্রিয় বিজ্ঞানীরাও তাই ওখানে কাজ করেন। এদিক থেকে লন্ডন সায়েন্স মিউজিয়াম ও ন্যাচারাল সায়েন্স মিউজিয়ামের কোন

তুলনা হয়না। বিজ্ঞান ইতিহাসের নানা বিষয় নিয়ে, নানা সংগ্রহ নিয়ে, নানা অতীত যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা নিয়ে সেখানে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। তাছাড়া দর্শকদেরকেও শুধু দেখে সন্তুষ্ট হতে হচ্ছেনা, সেখানে তারা নিজের হাতে পরীক্ষাগুলো সহজে করে দেখতে পারছে, বক্তৃতা শুনতে পারছে, নানা ভাবে অংশ নিতে পারছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আমার খুবই আগ্রহ গড়ে উঠেছিলো সে সময়। আসলে সাউদাম্পটনে থাকতেই ওটি খুব প্রবল হয়েছিলো এ সম্পর্কে নানা বই পড়ে এবং মিউজিয়ামগুলো দেখে। তারো আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে থাকা কালে বিজ্ঞান বহির্ভূত ছাত্রদের বাধ্যতামূলক বিজ্ঞান ইতিহাস পড়ার নিয়ম থাকা কালে যে বইটি এর জন্য ব্যবহার করা হতো সেটিই আমাকে ওই দিকে উৎসাহিত করেছিলো। ছাত্র আন্দোলনের ফলে ওই নিয়মটি বাতিল হয়েছিল এবং আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্সের ছাত্ররা বিজ্ঞান ইতিহাসের এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো বটে কিন্তু এর পর থেকে নিজে পদার্থবিদ্যা পড়ার সময় এবং পরে পড়ানোর সময় এর ঐতিহাসিক পটভূমিটিকে গুরুত্ব দিতে ভুলিনি। সাউদাম্পটনেই প্রথম বিখ্যাত পদার্থবিদ জে ডি বার্নলের চার খণ্ডে লেখা 'সায়েন্স ইন হিষ্ট্রি' বইটি পড়ে, বিশেষ করে এ ইতিহাসের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলোর বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বহুকাল পরে এখন আমি পূর্ণাঙ্গ ভাবে এই বিষয়টির চর্চা করার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সুযোগ পেয়েছি (২০১৫)।

ঐ ছিয়াত্তর সন থেকেই জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়ে যাবতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সহ জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘরটি বিজ্ঞানোৎসাহী সর্ব সাধারণের পরিচিতিতে চলে এসেছিলো। এই কাজে স্বাভাবিক ভাবে আমিও অনেকখানি জড়িয়ে গিয়েছিলাম। আলী আসগর সাহেব বিজ্ঞান খেলাঘর পরিচালনা করেন বলে এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী এ আর খান সাহেব অনিসন্ধিৎসু চক্র নামে আর একটি ক্লাব পরিচালক হিসেবে একই ভাবে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ আয়োজনে জড়িয়ে যান।

জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে জেলায় জেলায় যে বিজ্ঞান মেলা হতো সেখানে অনুসন্ধানীর ছেলেমেয়েরা পুরস্কার পেলে অথবা আমাদের সমন্বয়ের কারণে পরিচিত বিজ্ঞান ক্লাবগুলো পুরস্কার পেলে খুব ভাল লাগতো। অবশ্য সম্পদ ও সুযোগের দিক থেকে বড় বড় স্কুল কলেজের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোই এগিয়ে থাকতো এতে। বয়স্ক নানা উদ্ভাবনকারীও মাঝে মাঝে চমক লাগিয়ে দিতেন। পরে এসব উদ্ভাবনকারীকে কাজগুলো এগিয়ে নিতে সহায়তাও দিয়েছে বিজ্ঞান যাদুঘর। অনুসন্ধানী পরিচালনার কাজে ও বিজ্ঞান সাময়িকীর ক্লাব সমন্বয় কার্যক্রমে এই অভিজ্ঞতাগুলো আমার খুব কাজে আসতো। ওদেরকে নিয়মিত নানা বিজ্ঞান-কর্মের আইডিয়া দিতে সাময়িকীর বিজ্ঞান ক্লাব ফিচারটি বেশ কাজে এসেছিলো। পরে বাংলাদেশে বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির অনুরোধে আমি 'বিজ্ঞান

ক্লাব' এই নামে একটি প্রামাণ্য বই রচনা ও প্রকাশ করি ওই সমিতির প্রকাশনা হিসেবে। এতে আমাদের দেশে তখনকার বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের ইতিহাস, এতে অংশগ্রহণকারী ক্লাবদের পরিচয়, ক্লাবদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ইত্যাদি দিয়ে চেষ্টা করেছি এই বইটিকে একটি চলমান আন্দোলনের আলেখ্য হিসেবে পড়ে তুলতে।

কিন্তু যতই দিন গিয়েছে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে কতগুলো দুর্বলতা চোখে পড়েছে। হয়তো গতানুগতিক ভাবে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ অনুষ্ঠান এবং তার আগে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান মেলায় প্রতিযোগিতাগুলোই এর জন্য দায়ী। বিজ্ঞান ক্লাবের আইডিয়াটি হলো সার্বক্ষণিকভাবে নিজের আনন্দে নিজে বিজ্ঞানের কাজে বিভোর থাকা এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে ক্রমাগত আত্মস্ত করা, ও একই সঙ্গে ওতে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেয়া। পুরো বিষয়টি হলো বিজ্ঞানমনস্ক তারুণ্যের একটি নিত্য চর্চার বিষয়। কিন্তু ক্রমে এটি হয়ে পড়ছিলো বছরের মাথায় বিজ্ঞান মেলা হবার সময় তড়িঘড়ি করে একটি তথাকথিত 'প্রজেক্ট' দাঁড় করানোর বিষয়। বিশেষ করে ছোটদের স্কুলে যখন এটি হয় তখন ছাত্ররা শুধু নয়, তাদের বাবা মা'রা পর্যন্ত শিক্ষক বা শিক্ষক স্থানীয়দের কাছে ধরনা দিতে থাকেন একটি প্রজেক্ট ঠিক করে দিতে। বড় ছাত্রদের ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের ভূমিকাটি বড় হয়ে দেখা দেয়। ধরনা দেয়া এই 'প্রজেক্ট' তৈরিটি যতটা না প্রতিযোগিতার জন্য ততটা আত্মীকৃত বা নিজের আনন্দ-উপলব্ধির জন্য নয়। অনেক সময় মনে হয় এমনি 'প্রজেক্ট' করার সঙ্গে জানার ও বিজ্ঞান জগতের খবর রাখার চর্চার যোগ তেমন একটি থাকেনা। মূল উদ্দেশ্যটি যা ছিল—বিজ্ঞানের পড়াশোনাটি এর মাধ্যমে অন্য রকম হবে—তা কিন্তু হয়ে ওঠছিলো না।

আর একটি জিনিস যা লক্ষণীয় তা হলো বিজ্ঞান ক্লাবের ব্যাপারটি অনেকাংশেই শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, গ্রামেগঞ্জে বিস্তৃত হচ্ছে না। প্রজেক্টগুলোর পেছনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করাটিও এর একটি ধরন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের নামকরা স্কুলগুলোতে এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর যদিও বা একটু প্রভাব পড়ে অন্যত্র কিন্তু তা হচ্ছিলনা। আমরা চাইছিলাম বিজ্ঞান শিক্ষার পুরো ব্যাপারটিই পরিবর্তিত হোক, এবং সেই সুবাদে শিক্ষার পুরো ব্যাপারটিতে মুখস্থবিদ্যা চলে গিয়ে আসুক আত্মীকৃতবিদ্যা। এমনকি স্কুলের বাইরে অনানুষ্ঠানিক (অনেকে বলেন উপানুষ্ঠানিক) যে শিক্ষা তারও ভিত্তি হবার কথা বিজ্ঞান ক্লাবধর্মী কাজ। যারা স্কুলে আসছেনা তাদেরকে স্কুলে আনারও এটিই হতে পারে একটি পথ। আসলে আমরা চাইছিলাম নতুন ধরনের শিক্ষা, আর তার জন্য প্রয়োজন অনুভব করছিলাম নতুন ধরনের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের।

'সিএমইএস'-এর শুরুর কথা

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র

উনিশ শ' আটাত্তর সনে আমার জীবনে আর একটি মোড় ঘুরে যায়, যেমন এর আগে উনিশ শ' ষাট সনে ঘুরেছিলো বিজ্ঞান সাময়িকী বের করার মাধ্যমে। এই দুটি মোড় ঘোরা আমার নিজের দৈনন্দিন জীবনের স্টাইলেও বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এবারকার মোড়টি এলো একেবারে বাস্তব জ্বলজ্যান্ত সক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে। ওই সনে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র, যা পরে বেশি পরিচিত হয়েছে সিএমইএস (সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স) নামে। সেই যে শুরু করলাম এর পর থেকে আজ অবধি সেটি আমার জীবনকে নানা ভাবে দখল করে রেখেছে। পরিবর্তনটি প্রথমে ধীর লয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু শিগ্‌গীর সিএমইএস-এর জন্য বড় লক্ষ্য নিয়ে তার কাজকে যখন অনেক বিস্তৃত করে ফেললাম এর নানা ধরনের কাজের জন্য ছাত্রের মতো আমাকে অনেক কিছু শিখতে হলো, সেসবের প্রয়োগ করতে হলো। সেসব কথায় পরে আসছি। এর পটভূমিটি বেশ দীর্ঘ, আগে সেই পটভূমিটি দেখা যাক।

যেই ষাট সালে বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশনা শুরু করার মাধ্যমে যে নেশা ও জেদটি মনের মধ্যে জেঁকে বসেছিলো, তা কিন্তু এর মধ্যে কখনো প্রশমিত হয়নি; বরং সাময়িকীকে আশ্রয় করে এর স্বপ্ন ক্রমে ডালপালা বিস্তার করছিলো। মূলত চিন্তাটি ছিলো সর্বজনীন বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে। বিজ্ঞানের যে মজাটি আমরা ভাগ্যবানরা পাচ্ছিলাম, তা দেশের অল্প ছেলেমেয়েরাই পাচ্ছিল। স্কুলে যারা যায় তারা কিছুদিন একভাবে বিজ্ঞানের কথা শোনে বটে, কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ শিগ্‌গীর অন্য ধারায় চলে গিয়ে এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। 'পাঠ্য' না থাকলে জীবনে বিজ্ঞান থাকবেনা এমনটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া পাঠ্য থাকলেও স্কুলে এর চর্চা যেভাবে হয় তাতে বিজ্ঞানের আসল মজা, আসল মর্মটাই

মাঠে মারা যায়। এ নিয়ে আমার স্বপ্নটি ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হলো একটি অন্য রকম স্কুলের ধারণায়, যেখানে বিজ্ঞান হবে সকল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা পরিসরে। আর সেই বিজ্ঞান হবে মুখস্থ করার নয়, হবে নিজে করার ও নিজে মজা পাওয়ার; নিজের জীবনে অঙ্গীভূত করার। আমার জন্য এটি কখনোই শুধু নেহাত ধারণা হয়েই থাকেনি। তখনই সত্যিকারের স্কুলের অবয়ব না পেলেও এর যাবতীয় চিন্তা-চেতনাকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম বিজ্ঞান সাময়িকীর পাতায়, বিশেষ করে 'আপন স্কুল' নামের বিশেষ ফিচারে।

'আপন স্কুল' ফিচারে যেটি বলার চেষ্টা করছিলাম তা হলো 'এখানে জোর করে কেউ কিছু তোমাকে পড়াবেনা। তোমাকে তুমিই পড়াবে; যখন খুশি, যেখানে খুশি নিজের জন্য ক্লাস বসাবে আর শিখবে সব কিছু থেকে। ভারি মজা হবে সে স্কুলে। কখন যে কী শিখবে তারও ঠিক নেই। ভাল লাগলে উৎসাহের চোটে না হয় একটু উপরের ক্লাসের জিনিসই শিখে ফেললে, অথবা আগের ক্লাসে যা পড়েছিলে তাও না হয় আবার নতুন করে দেখলে। কেউ কিছু বলবেনা, কারণ এতো তোমার 'আপন স্কুল"। (তখনকার বিজ্ঞান সাময়িকী থেকে এই উদ্বৃত অংশ থেকে বোঝা যায় আমরা কী চাচ্ছিলাম)।

বিজ্ঞান সাময়িকীর পাতার বাইরে এ ধারণার বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিলাম বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর কাজের মধ্যে। প্রথম দিকে অনেক দিন দেশের নানা জায়গায় গড়ে ওঠা বিজ্ঞান ক্লাবে এই 'আপন স্কুলের' ছায়াটি দেখতে পেরেছিলাম—যেখানে খুশি নিজের জন্য ক্লাস বসাবার আনন্দটি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করে। কিন্তু পরে আপন আনন্দে বিভোর হবার ভাগটি কমে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মেলায় প্রদর্শন করে পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার একটি প্রবণতা বিজ্ঞান ক্লাবের মধ্যে চলে এসেছিলো। আবার অন্য দিকে যেন আপন স্কুলের বাস্তবায়নের জন্যই আর একটি সুযোগ আমাকে তখন কিছুটা করে দিয়েছিলো বাংলাদেশ টেলিভিশন। ওখানে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান করতে আমার ডাক পড়েছিলো টেলিভিশনের একেবারে গোড়া থেকেই। কিছু কিছু নিয়মিত অনুষ্ঠান করারও সুযোগ পেলাম পরপর—বিচিত্র বিজ্ঞান,' 'অণু-পরমাণু' এমনি নামে এই সব অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পেয়ে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। দেখলাম টেলিভিশন অনুষ্ঠান আন্তরিকতার সঙ্গে করলে এবং তাতে কথার সঙ্গে হাতেকলমে কিছু কাজ দেখাতে পারলে তা সব রকমের মানুষকে দারুণ ভাবে নাড়া দিতে পারে—তরুণদেরকে তো বটেই। এসব বেশির ভাগ অনুষ্ঠানে আমি অন্য ভাবে আপন স্কুলের ধারণাটাই সবার মনের মধ্যে গেঁথে দেবার চেষ্টা করছিলাম। টেলিভিশনে একটি অসুবিধা অবশ্য ছিলো—সে সময় শুধু সীমিত কিছু জায়গায় টেলিভিশন দেখা সম্ভব হতো। রেডিয়োতে এই সমস্যা ছিলনা। ওখানেও আমার ডাক পড়তো বিজ্ঞান বিষয়ে কথা বলতে। এটিকেও আমি যথাসাধ্য ব্যবহার করতাম।

কিন্তু মূল স্বপ্নটি রয়ে গেলো—কখন সত্যিকার আপন স্কুলের সত্যিকার অবয়ব অন্তত একটি নমুনা হিসেবে সবার কাছে মেলে ধরতে পারবো। স্বাধীনতার

পরপর এক রকম 'গণ বিদ্যালয়ের' প্রয়োজনীয়তার কথা। তাতে বিজ্ঞান প্রধান উপজীব্য হলেও সবার জন্য সেটি সম্ভব করে তোলা যাবে যদি সর্বজনীন সাক্ষরতা আমরা অর্জন করতে পারি। দেশে সাক্ষরতার হারের তখন করুণ অবস্থা। দেশের অধিকাংশ মানুষ পড়তে লিখতে পারেনা। শিশুদের ক্ষেত্রেও শিক্ষার যা অগ্রগতি তাতে ভবিষ্যতেও এ অবস্থার বেশি পরিবর্তন হবেনা। এর অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দক্ষতা সবই দুরাশা। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুটি কাজ তখন আমার খুব পছন্দ হয়েছিলো। একটি হলো তাঁর 'খাল কাটা আন্দোলন', অন্যটি হলো 'সাক্ষরতা আন্দোলন'। খাল কাটা আন্দোলন ছিল অনেকটা আমাদের দেশের পুরোনো স্বদেশী ও স্বনির্ভর হবার আন্দোলনের মত। জিয়াউর রহমানের সেই 'হাতে কোদাল কাটো খাল' শ্লোগানে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জল প্রবাহগুলো সচল করার মধ্যে প্রত্যেকে নিজকে জড়িত করে যেন দেশের প্রাণশক্তির প্রবাহকে সচল করার প্রচেষ্টা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ওই সময় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে কয়েকদিন ব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পুনর্খননে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাসেবী চাইলে অন্য অনেকের সঙ্গে একদিন গিয়ে মাটি কেটেছিলাম। আমার কোদালের দুর্বল ঘায়ে ব্রহ্মপুত্র নদী কতখানি নাব্যতা লাভ করেছিলো তা বলতে না পারলেও আমি তাতে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলাম—বিশেষ করে ওখানে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী-শিক্ষক-বিজ্ঞানী এবং আরো অনেককে ঝাঁক বেঁধে একই কাজ করতে দেখেছি বলে। আমার মনে হয়েছিলো দেশের উন্নয়নের জন্য একটি লক্ষ্যবস্তুর চেতনা সৃষ্টি করতে সেটি দারুণ কাজ করেছিলো। একই রকম চেতনা সৃষ্টি করেছিলো জিয়াউর রহমানের সাক্ষরতা আন্দোলন। প্রত্যেকে অন্তত আর একজনকে সাক্ষর করবে এমন জোয়ার তুলে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু খাল কাটা আন্দোলন যেমন পরে গণমানুষের চেতনার চেয়ে জেলা প্রশাসকদের সরকারী হুকুমে যতখানি করা যায় ততখানিতে পর্যবেশিত হয়েছিলো, সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। প্রত্যেক জেলায় একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (এ ডি সি) নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সাক্ষরতার সব কিছু তাঁর অধীনে কাগুজে কাজের মধ্যে চলে গিয়েছিলো। তা ছাড়া এস এস সি পরীক্ষায় অন্য পাঁচজনকে সাক্ষর করার প্রমাণ দাখিলকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারটি কিছুটা ছেলেখেলা এবং হাস্যকর পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। এসব কারণে তরুণদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগানো সত্ত্বেও উভয় আন্দোলন শিগ্‌গীর থিতিয়ে পড়েছিলো।

আমাদের 'আপন স্কুলেও' সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তাটি খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম, এজন্য বিজ্ঞান সাময়িকী, বিজ্ঞান ক্লাব, এবং টেলিভিশনের সুযোগ সব কিছু পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করেছি সাক্ষরতার জন্যেও; সে সব কথায় একটু পরে আসছি। কিন্তু এত ধরনের কাজ নিয়ে এগোতে নিজেদের একটি সক্রিয় সংগঠনের

অভাব বেশ কিছু দিন ধরে অনুভব করছিলাম। এই অভাববোধটিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো ওইসময় বেশ এগিয়ে যাওয়া কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ অর্থাৎ ব্র্যাকের কথা আগেই বলেছি। বাংলাদেশ সরকারের নাম করা সচিব ড. আবদুস সাত্তারের গুণী স্ত্রী অ্যালেন সাত্তার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিউটে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আর একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'বেইসের' (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি এডুকেশন) সঙ্গে এ সময় পরিচয় ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রামাঞ্চলে গণশিক্ষার আয়োজনে কিছু প্রকল্প নিয়েছিলো, তাঁদের আমন্ত্রণে তার কিছু কিছু দেখে এরকম প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা নিয়ে আমি উৎসাহ বোধ করি। সমিতিবদ্ধ হবার জন্য বেইসের উদ্যোগগুলো দেখে মনে হয়েছে বিজ্ঞান গণশিক্ষা নিয়ে আমরা যা করছি তার জন্যও এরকম একটি সাংগঠনিক ভিত্তি থাকলে ভাল হবে। শুরুতে যে তাতে আমাদের কাজকর্মে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন আসবে বা উন্নতি হবে সেটি ভাবিনি, কারণ আমাদের নিজস্ব কাজ করার ক্ষমতা এবং এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সাময়িকীর ও আমার পরিচিতিটুকু ছাড়া বড় আকারে সক্রিয় হবার মতো কোন সম্পদ আমাদের সেদিন ছিলনা। কিন্তু শুরুতে সেটিও বা কম কী?

১৮৬১ সালের ওই সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্টটি পড়ে দেখলাম ন্যূনতম পাঁচজন ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ কল্যাণ, ধর্ম ইত্যাদি যে কোন কিছুর উন্নয়নকল্পে একত্র হয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিলেই একটি সমিতি গঠিত হতে পারে, এবং সেটিতে তাঁরা কী করবেন, কী উদ্দেশ্যে করবেন, কেমন করে করবেন তা নিজেরাই একটি স্মারক দলিলে লিপিবদ্ধ করে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের দফতরে রেজিষ্ট্রি করে নিতে পারেন। মনে হলো ঠিক আমাদের মতো উৎসাহী মানুষদের জন্যই খুবই সরল ও সহজ করে একশ' বছরেরও বেশি সময় আগে বৃটিশ আমলে এই আইনটি রচিত হয়েছিলো। কাজেই একটি সমিতি গঠন ও রেজিষ্ট্রি করেই আমাদের পদক্ষেপগুলো নিতে মনস্থ করলাম। এ নিয়ে নানা খোঁজ খবর করলাম, এবং আমাদের সেই স্মারক দলিল ও সমিতির নিয়ম কানুনগুলো তৈরির কাজে হাত দিলাম। এ সময় মনে পড়ে গিয়েছিলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে বড় ভাইরা আর চাচাদের উদ্যোগে স্থাপিত 'মহফিলে নও'-এর কথা; যার সিল মোহর দেখে আমি রাবার কেটে নিজের সিল মোহর বানাবার চেষ্টা করেছি, যার দলিলে সবাইকে স্বাক্ষর করতে দেখে নিজের একটি স্বাক্ষর ঠিক করার কথা ভেবেছি। সমিতি যায়, সমিতি আসে, কিন্তু একই সমিতি আইন থেকে যায়।

ওই ১৯৭৭ সালেই জন্ম হতে পারতো আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের, কিন্তু তা হয়নি। সব কিছু ঠিক করে আনলেও সে সময় আমি এক বছরের সাব্যাটিকাল ছুটিতে সুইডেনে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে থাকতেই আমদের সংগঠনটি সম্পর্কে

নানা পরিকল্পনা ভীড় করে মনে এসেছে। দেশে ফিরলেই একে দাঁড় করিয়ে ফেল্‌বো এটিই ছিল ইচ্ছে। এজন্য অন্য সবকিছুর সঙ্গে সুইডেনের শিশুদের, বড়দের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি। তাদের কোন কোন স্কুলে গিয়ে দেখারও চেষ্টা করেছে কীভাবে তারা সব শিক্ষাকে এত আনন্দময় করে তোলে। এর মধ্যে হাইস্কুলের একটি ক্লাস আমাকে বিশেষ ভাবে অবাক করেছিলো। এটি ছিলো ছেলেদের একটি প্র্যাকটিকাল ক্লাস আর বিষয় ছিলো নবজাতকদের প্রতিপালন। বিশ-ত্রিশ জন ছেলের প্রত্যেককে দেখলাম একটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নবজাতককে গোসল করানো, তাকে কাপড় দিয়ে নিঁখুত ভাবে মুড়িয়ে শুইয়ে দেয়া ইত্যাদি প্র্যাকটিস করছে—সবই পুতুলের উপর। বলা বাহুল্য এটি করা হচ্ছে পরীক্ষা পাশের জন্য নয়, সত্যিকার কাজে লাগবে বলে। সুইডেনে যেহেতু পিতৃত্বকে মাতৃত্বের মতই গুরুত্ব দেয়া হয়, এবং পিতাদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে ছয় মাস পিতৃত্ব ছুটি নিয়ে সন্তান লালন পালন করতে হয় তাই জীবনের প্রয়োজনেই এই শিক্ষাটি স্কুলে এসেছে।

সুইডেন থেকে ফেরার আগে আগে আর একটি কাজ করলাম। ডিসেম্বর মাসে আমাদেরকে ষ্টকহোলমে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। এ অনুষ্ঠানের পর আমরা ওই বছরের নোবেল বিজয়ীদের সঙ্গে একটি চা চক্রে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। সব কিছু দেখে এবং এখানকার নোবেল পুরস্কার এক্সিবিশন দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই মনে মনে ইচ্ছে হলো আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে দেখানোর জন্য এ রকম একটি অস্থায়ী প্রদর্শনী ঢাকায় করি। এর উদ্যোক্তা কে হবে? কেন আমাদের শিগ্‌গীর জন্ম লাভ করতে যাওয়া বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র। এটিই তাহলে হোক আমাদের সংগঠনের প্রথম জনসমক্ষে কাজ। নোবেল কমিটি ও বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র যৌথ ভাবে আয়োজন করবে এমনটি প্রস্তাব করে নোবেল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি পাঠালাম একটি বহনযোগ্য প্রদর্শনীর সব উপাদান আমাদেরকে দান করার জন্য। এতে কী লাভ হবে, আমাদের সংগঠনেরই বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, তা সবিস্তারে তাদের জানালাম। শিগ্‌গীর খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক উত্তর এলো। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে যে নোবেল পুরস্কারগুলো দেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটির পুরস্কার প্রাপক ও তাঁদের কাজের সংক্ষিপ্ত সহজ সচিত্র বর্ণনা সহ একটি পোস্টারগুচ্ছ তারা নোবেল কমিটির খরচেই জাহাজে ঢাকায় পাঠাবে। প্রত্যেকটি রঙিন পোস্টার বিশাল আকারের—মোটা কার্ডবোর্ডের উপর করা সহজে প্রদর্শনীতে স্থাপন করার উপযুক্ত করে। সেই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে পুস্তিকার অনেক কপি, নোবেল মেডালের প্রতিকৃতি ইত্যাদিও আসবে। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপের ব্যবস্থা সুইডেনে বসেই হয়ে গেলো।

১৯৭৮ সনে দেশে ফেরার পর পরই আমাদের সংগঠনটি রেজিষ্ট্রি করার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করলাম। যদিও প্রথম দিকে আমরা 'বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র'

এই নামটিই সর্বত্র বেশি ব্যবহার করেছি রেজিস্ট্রেশনে এর ইংরেজি নামটিই গেল—'সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স'—সংক্ষেপে 'সিএমইএস'। পরবর্তী কালে এটি যখন বড় ও ব্যাপক আকার নিয়েছে তখন এই সিএমইএস নামেই এটি দেশে বিদেশে সবার কাছে পরিচিত হয়েছে। ওই যে প্রতিষ্ঠার সময় যারা সমিতির প্রস্তাবনাটি রাখলাম আমরা সে ক'জনই হলাম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য—যার মধ্যে বিজ্ঞান সাময়িকীর গোড়ার মানুষরাই সবাই ছিলো—ইউনূস ভাই, ইকবাল, শামসুল হোসেন (বাহাদুর) ওরা অবশ্যই রইলো। আমি চেয়ারম্যান হয়ে প্রধান নির্বাহীও হলাম। যদিও তখন সমিতির চালচুলো বলতে কিছু ছিলনা তবুও সব ব্যবস্থাই হতে হলো অনেকটা কাজ চালিয়ে দেবার মত করে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এটি বিরাট কর্মযজ্ঞ ও বিরাট কার্যালয়ে রূপ নিয়েছিলো তখন তারো প্রধান নির্বাহীর কাজ করে যেতে হয়েছে আমাকে—দশকের পর দশক ধরে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম দেবার স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে লাল ইটের পোড়ো বাড়ি সদৃশ্য বিচ্ছিন্ন পুরোনো দালানে আমরা থাকতাম সেই পি ডব্ল্যু ডি বাংলো-৩ এতদিন বিজ্ঞান সাময়িকীর অফিস ছিল, তখন পাঁচ-ছয় বছরের জন্য এটি সিএমইএসেরও রেজিষ্টার্ড অফিস থাকলো। ইকবালের ছোট ভাই ভূঁইয়া ইমরান লিংকন (যে ছোট বেলায় বায়না ধরে আমাকে দিয়ে শিয়ালকোটের ক্রিকেট ব্যাট আনিয়েছিল) তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স অনুষদে ম্যানেজমেন্টের ছাত্র, বিজ্ঞান সাময়িকীতে সামান্য মাসোহারায় কাজ করে। তাকেই আমরা সিএমইএসের প্রথম কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করলাম—খণ্ডকালীন এবং প্রায় বিনা বেতনে। আমি সাউদাম্পটন থেকে ফেরার আগে ওখানে সস্তা অফারে পাওয়া একটি পোর্টেবল টাইপ রাইটার কিনেছিলাম—'অলিভেটি লেটেরা—৮০' মডেল নামে এই হালকা পাতলা সুন্দর টাইপ রাইটারটি তখন বেশ জনপ্রিয় ছিলো। মনে পড়ে লন্ডনের পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখে আমি টিউব ট্রেনে অনেক্ষণ ভ্রমণ করে এবং তারপর হেঁটে লন্ডনের বাইরে এক প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে এটি বেশ সাশ্রয়ী মূল্যে কিনেছিলাম। খুবই সুন্দর একেবারে ছিমছাম, চামড়ার সুন্দর কেইসের মধ্যে চমৎকার ভাবে বহনযোগ্য এই টাইপ রাইটার। ঢাকার বাসাতে কালেভদ্রে এটি ব্যবহার করতাম (এখনো এটি চমৎকার কাজ করে তবে এই কম্পিউটার যুগে আর ব্যবহৃত হয়না)। এইবার এটিকে পূর্ণমাত্রায় সিএমইএসের কাজে লাগালাম। লিংকন প্রত্যেক দিন বাসায় এসে অফিস করতো; তখন সে এই অলিভেটি লেটেরা টাইপ রাইটারে সিএমইএসের কাগজপত্র টাইপ করতো। কিছু কিছু আমিও করতাম। তবে আমার ইংরেজি-বাংলা সব লেখার কাজ আমি করেছি কলমে লিখে—তখনো করেছি, এখনো তাই করছি। খাতা-কলম থেকে আমার উত্তরণ সত্যিকার অর্থে কখনোই ঘটেনি—না টাইপ রাইটার আমলে, না কম্পিউটার আমলে।

সিএমইএসের প্রথম আয়োজন 'নোবেল পুরস্কার প্রদর্শনী' আয়োজিত হলো ঢাকায় নতুন পাবলিক লইব্রেরির হলঘর ও বারান্দা জুড়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে এটি উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রফেসর শামস-উল হক (যিনি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে অসময়ে আমার চাকরির ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন ও চাকরি দিয়েছিলেন)। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সুইডেনের তখনকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত একজন মহিলা কূটনীতিবিদ। পত্রিকায় ফলাও করে খবর ও ছবি প্রকাশিত হবার পর প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম ভালই হলো। এভাবে সিএমইএসের হাতেখড়ি হলো; ভাবতে লাগলাম এর পর সিএমইএস তার মূল কাজে কীভাবে এগোবে, এর আর্থিক সংস্থান কী ভাবে হবে।

আমাদের মূল লক্ষ্য ছিলো একেবারে তৃণমূলে ফলপ্রসু শিক্ষার জন্য কাজ করা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। তাই সিএমইএসের জন্য একটি মনোগ্রাম বানাবার প্রশ্ন যখন উঠলো তখন আমি নিজেই একটি সহজ সরল অথচ অর্থপূর্ণ ডিজাইন করার চেষ্টা করলাম। এর জমিন হিসেবে বেছে নিলাম লেখার একটি শ্লেটকে। শ্লেট যে সে সময় লেখা শিখতে খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছিলো তা নয়, তবে এ জিনিসটি সবাই চেনে, এবং তৃণমূল থেকে সর্বত্র এক সময় প্রায় সব শিশুই যে এটি ব্যবহার করতো তাও সবাই জানে। সর্ব সাধারণের শিক্ষার প্রতীক হিসেবে তাই একে চট্ করে চেনা যায়। তাছাড়া চারদিকে হলুদ কাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ ঘননীল রঙের শ্লেটটি বেশ ছিমছাম দৃষ্টি নন্দনও বটে। শ্লেটের ওপর আঁকা থাকলো সাদা একটি মই। এই মই সিড়ির মত ব্যবহৃত হয় ওপরে ওঠার জন্য, আবার কৃষি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় জমিকে ডেলা ভেঙ্গে সমান করার জন্য। শ্লেট, মই এই সবকে খুবই সরল লাগসই প্রযুক্তি বলা যায়। সিএমইএস সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত এমনিতরো বিষয়ে কাজ করার জন্য—সাধারণ মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল করে তুলতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তারা যেন নিজের হাতে নিয়ে ফলপ্রসু করে তুলতে পারে। এদিক থেকে মনোগ্রামটির পরিকল্পনায় একেবারে সনাতন প্রযুক্তিগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যেন সহজ সরল বিষয়গুলোকে আমরা তুচ্ছ না করি, বরং যা আছে তার ভিত্তিতে এগিয়ে যাই, উন্নততর পর্যায়ে আরোহণ করি। মজার ব্যাপার হলো সেই সময়ের তিন দশকের কিছু বেশি সময় পর ওই একই মনোগ্রামকে এখন আজকের অনেক ছেলে মেয়েরা শ্লেট হিসেবে না দেখে ট্যাবলেট কম্পিউটার হিসেবে দেখছে। ফ্রেম আর স্ক্রীন মিলে এটি ট্যাবলেট কম্পিউটারের মতো দেখতে তো বটেই যার স্ক্রীনে একটি মই আঁকা রয়েছে, শ্লেটের ফ্রেমে যে একটি ছোট ছিদ্রের মতো রাখা হয়েছে মনোগ্রামে (এরকম ছিদ্র পেন্সিল গুঁজে রাখার জন্য শ্লেটে থাকতো) তাকেও মনে হয় ট্যাবলেটের এ জায়গায় সচারচর থাকা 'কী' এর মতো। কাজেই বলা যায় সিএমইএস যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, একই অবয়বে থেকেও এর মনোগ্রামের ব্যাখ্যাটিও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার প্রচেষ্টা আমাদের সব কাজে গোড়া থেকেই ছিল—বিজ্ঞান সাময়িকীতে, বিজ্ঞান ক্লাবে ছিল, এখন সিএমইএসেও আছে। এই পর্যায়ে সিএমইএস বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের আইডিয়াগুলোকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলো। যদিও এখনো তার নিজস্ব কোন

স্কুল ছিলোনা, সিএমইএস চাইছিলো নানা স্কুলে এগুলো অনুকৃত হোক, এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও শিশু শিক্ষায় ব্যবহৃত হোক।

শুরুতেই বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত এরকম একটি আইডিয়ার ক্ষেত্রে এটি বেশ সফলও হয়েছিলো। একে বলা হয়েছিলো 'ম্যাচ বক্স সাক্ষরতা'। ওই সময় গণ সাক্ষরতার বিষয়টি একটি জাতীয় আন্দোলন রূপে চলছিলো। অক্ষর ও শব্দ যত ভাল ভাবে চিনবে এগুলো নিয়ে চর্চা যত বেশি হয়ে ততই সাক্ষরতা দ্রুততরও ব্যাপকতর ভাবে অর্জিত হবে। আর বই-খাতার বাইরে সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মাধ্যমে তা করতে পারলে চমৎকার হয়। ম্যাচ বক্স সাক্ষরতায় ম্যাচ বাক্সের উপর নানা অক্ষর ও সিলেবল ছাপানোর প্রস্তাব ছিল। ম্যাচ কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন একদিকে ছাপানো হলে অন্য দিকটিতে যে কোন একটি অক্ষর অথবা সিলেবল (স্বরচিহ্ন যুক্ত অক্ষর) ছাপানো যায়—এক একটি বাক্সে এক এক রকম। সর্বত্র বাসায় বাসায় ম্যাচ কাঠি ফুরিয়ে গেলে এর বাক্সগুলো ফেলে দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে এসব সংগ্রহ করে তা শিক্ষা উপকরণের কাজে লাগানো যায়। ম্যাচ বক্সের উপরের খোলসের এই লেখাগুলোকে তার ভেতরের আসা যাওয়া করা স্লাইডের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে গেঁথে গেঁথে নানা শব্দ এমন কি নানা বাক্য তৈরি করে ফেলা যায় অনায়াসে। সেগুলোকে আবার খুলে ফেলে এবং অন্যভাবে সাজিয়ে ভিন্ন শব্দ তৈরি করা যায় অথবা বেশ কিছু সময় সাজিয়েও রেখে দেয়া যায় বার বার পড়ার জন্য। আমরা বিভিন্ন ম্যাচ কোম্পানির সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করলে একটি কোম্পানি তার প্রজাপতি মার্কা ম্যাচের মার্কাটি শুধু এক পাশে ছাপিয়ে অন্য পাশটিতে ইতস্তত নানা অক্ষর ও সিলেবল ছাপিয়ে ম্যাচ বক্স সাক্ষরতার ব্যবস্থা করতে রাজি হলো। সদ্য প্রতিষ্ঠিত সিএমইএসের জন্য এটি ছিল বাইরের সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিরাট সাফল্য। প্রজাপতি মার্কা ম্যাচ বক্স যে অঞ্চলে বেশি ব্যবহৃত হতো সেখানে বাড়ি বাড়ি থেকে এর খালি বাক্স সংগ্রহের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়েছি যাতে সেগুলো সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহারের জন্য দেয়া যায়। তাছাড়া ওই বাড়িগুলোতেও বাক্সগুলো জমিয়ে জমিয়ে ওখানে অথবা প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের যাদের প্রয়োজন তারা এটি ব্যবহার করতে পারতো। আমরা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমেও এর প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে এই ম্যাচবক্স সাক্ষরতা ব্যবহৃত হয়। এরকম বাক্স ছাপাতে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয় বলে এই কোম্পানি একাজ কিছু সময় পর বন্ধ করে দিয়েছিলো।

সে সময় বিজ্ঞান সাময়িকীর শিক্ষা উপকরণ ফিচারে এরকম অনেক অভিনব উপকরণের আইডিয়া দেয়া থাকতো—শুধু সাক্ষরতার জন্য নয়, অংক, ভাষা, বিজ্ঞান, ভূগোল সব রকমের লেখাপড়ার জন্য। আমাদের অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবের একটি কাজই ছিল এগুলো বাস্তবায়ন করা। সহজ সরল, শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে তার ব্যবহারের জন্য পরে সিএমইএস 'লেখাপড়া খেলা' নামের একটি বইও ছাপিয়েছিলো।

অক্ষর চক্কর

প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই সিএমইএসের জন্য কিছু অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা হয়েছিলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুদিন ধরে একটি অনুষ্ঠান করে যাওয়ার দায়িত্ব নেবার মাধ্যমে। আসলে দায়িত্বটি আমার ওপরেই ছিলো—এটিও সাক্ষরতা বিস্তারেরই একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। শুরুতে অনুষ্ঠানটির প্রযোজক ছিলেন বেলাল বেগ (শৈশব থেকে পরিচিত বেলাল ভাই বাংলাদেশ টেলিভিশনে একজন ব্যতিক্রমী সৃষ্টিশীল প্রযোজক ছিলেন); আর অনুষ্ঠানটি ছিল 'শিক্ষা বিচিত্রা' নামের একটি দীর্ঘতর অনুষ্ঠানের অংশ। পরে অবশ্য অক্ষর চক্করই এতে মূল অংশে পরিণত হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো পরিচিত সুরে গানের নতুন কথায়, অথবা ছড়া কেটে, অথবা কিছুটা অঙ্গভঙ্গি করে ছোট ছোট ভূমিকাভিনয়ে, বিভিন্ন শব্দ ও অক্ষরকে পরিচিত করে তোলা, আর এভাবে সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা দেয়া। এর জন্য আমাকে এমন এমন সব কাজে নামতে হয়েছিলো যাতে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়ছিলাম—কারণ এগুলো করার অভ্যাস আমার আগে কখনো ছিলোনা। উদাহরণ স্বরূপ পরিচিত গানের কলির প্যারোডি রচনা করার কাজ শুরু করলাম। আমরা এক একটি অনুষ্ঠানকে এক একটি অক্ষরের প্রতি নিবেদন করতাম। ওই প্যারোডি গানগুলো তৈরি করতাম ওই অক্ষরকে কেন্দ্র করে। অনুষ্ঠানটি শুরু হতো কয়েকজন ছোট্ট শিশুর ওই অক্ষরগুলো সেজে মাথা নুইয়ে সবাইকে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে। কোন কোন সময় জনপ্রিয় গানের হুবহু একটি কলিই ব্যবহার করেছি ওই অনুষ্ঠানের মূল ধুয়া হিসেবে—যেমন 'ক' এর যে অনুষ্ঠান তাতে ধুয়াটি ছিলো বিখ্যাত লোকগীতির চরণে—

'কলে টিপ দিলে, উইড়া চলে
কোম্পানির জাহাজ
কলে টিপ দিলে।'

তারপর হয়তো দেখা গেলো দুই সঙ পরস্পরের কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করছে আর ঘোষণা হচ্ছে, লেখা ফুটে উঠছে—'কানে কানে কথা' 'কান', 'কানে', 'কথা' ইত্যাদি শব্দ।

পুরো অনুষ্ঠানটির ঘোষণাই করা হতো ফিরোজ শাইয়ের বিখ্যাত গানের অনুকরণে—

'ইশকুল খুইলাছে রে টিভি
ইশকুল খুইলাছে।
নাইচা গাইয়া অক্ষর চক্কর
ইশকুল খুইলাছে।'

যে কোন অক্ষরের অনুষ্ঠানে যুৎসই প্যারোডি করতে পারতাম—জনপ্রিয় লোক সংগীত, পপ সংগীত, কিংবা সিনেমার গান থেকে কোন অংশ খুঁজে নিয়ে।

যেমন 'ল' এর অনুষ্ঠানে করলাম 'দুই পাহাড়ের মাঝে মাওলা মসজিদ বানাইছে' —এই গানের সুরে

'বাপদাদারা বুদ্ধি কইরা অক্ষর দিয়াছে
দুইটি পেঁচের লতার লাহান 'ল' খান বানাইছে।'

সব সময় গানের উপর নির্ভর করতামনা, কখনো বা প্যারোডি করতাম জনপ্রিয় থিয়েটারকে। যেমন সে সময় সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটি দারুণ বিখ্যাত হয়েছিলো। এতে একটি দৃশ্য ছিল দলে দলে নানা রকম মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে আসার—নেপথ্যে গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসতো 'মানুষ আসিতেছে, মানুষ আসিতেছে'। এর অনুকরণে 'গ' এর অনুষ্ঠানে করেছিলাম একই রকম দৃশ্য যেখানে ছোট বড় নানা আকার আকৃতির 'গ' অক্ষরের পোষাক গায়ে নানা বয়সের শিশু ও বয়স্করা ক্যামেরার সামনে আসছিলো আর বলা হচ্ছিল—

'গ'য়েরা আসিতেছে, গ'য়েরা আসিতেছে, গেরাম গেরাম থাইকা আসিতেছে, গান গাইতে গাইতে আসিতেছে' ইত্যাদি।

কখনো কখনো এর জন্য রীতিমত সিনেমার এক একটি দৃশ্যেরই আয়োজন করে ফেলা হতো নাচে গানে ভরপূর করে। চাটগেঁয়ে ভাষার 'মালেকা বানুর বার মাস' আখ্যানকে যেভাবে সিনেমা করা হয়েছে ম'শেখাবার জন্য সেখান থেকে নেয়া হয়েছে মেয়েলি গান—

'মাল্‌কা বানুর সাত ভাই
অভাগ্যা মনু মিয়ার কেহ নাই..
মাল্‌কার বিয়া হইব—
মনু মিয়ার সাথে রে...

এর পর মালেকা আর মনু মিয়াকে 'ম' সমৃদ্ধ লেখার মাধ্যমে পরিচয়ও করিয়ে দেয়া হয়।

এভাবে আমি সারাক্ষণ চেষ্টায় থাকতাম কী করে কোন গানের সুরে পরের অনুষ্ঠানগুলোকে বাঁধবো। প্রতি সপ্তায় কয়েকবার করে প্রচারিত 'অক্ষর চক্কর' দারুণ জমিয়ে ফেলেছিলো। আমরা সবাই আশা করছিলাম যে এই অনুষ্ঠান এমন অনেকে দেখছিলো যাদের মধ্যে সাক্ষরতার অভাব আছে, অথবা সাক্ষরতা এখনো টেকসই হয়নি। মজা পাওয়ার জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখলে হয়তো তারা সাক্ষরতার কেন্দ্রেও এগিয়ে যাবে—সে রকম চেষ্টাই ছিল অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায়। বহুদিন ধরে 'সিসামি স্ট্রিট' ও 'ইলেকট্রিক কোম্পানি' নামের দুটি শিশু সাক্ষরতা সহায়ক অনুষ্ঠান দুনিয়ার সর্বত্র খুব জনপ্রিয় ও ফলপ্রসু হয়েছিলো। উভয়টির বেশ কিছু পর্ব দেশে বিদেশে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিলো। 'ইলেকট্রিক কোম্পানি' এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনেও দেখানো হতো। এ অনুষ্ঠানগুলোতে অবশ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে খুব উচ্চাঙ্গের অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়েছে প্রচুর। তা ছাড়া অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের 'পাপেট', 'মাপেট' ইত্যাদি (ছোট পুতুল এবং মানুষ বা

পশুপাখির সমান আকারের বড় পুতুল) ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো নিজেরাই এক একটি চরিত্র হিসেবে দারুণ পরিচিত হয়ে পড়েছিলো স্বনামেই। এতখানি সুযোগ আমাদের ছিলনা। তবুও আমরা এই বিখ্যাত অনুষ্ঠানগুলোর মূল কৌশলটিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম অক্ষর চক্করে—আমাদের মত করে। পাপেট, মাপেট বা অ্যানিমেশনে যা পারছিলামনা সত্যিকার মানুষকে সাজিয়ে তা করিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে অক্ষর চক্করের কুশীলব হিসেবে পেয়েছিলাম—ওদের কেউ কেউ গ্রুপ থিয়েটারেও ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করতো। সপ্তায় কয়েক দিন সন্ধ্যায় ওরা আমার বাসায় একত্র হতো এ পর্যন্ত যা স্ক্রীপ্ট লিখেছি তার ওপর মহড়া দিতে। এভাবে শুধু গীতিকার-নাট্যকার (অবশ্য প্যারোডির) ও স্ক্রীপ্ট রাইটারের ভূমিকায় নয়, কিছুটা পরিচালকের ভূমিকায়ও আমাকে নেমে পড়তে হলো অক্ষর চক্করের সুবাদে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই অনুষ্ঠানের একটি দর্শক-জরিপের ব্যবস্থাও আমরা করেছিলাম—সিএমইএসের উদ্যোগে। আসলে আমি সব কিছু করলেও অনুষ্ঠানে নাম থাকতো সিএমইএসের এবং এর পরিকল্পনা, রচনা, ও পরিচালনার জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিকটি পেতো সিএমইএস। বহুদিন ধরে চলেছিলো বলে তার মোট অর্থের পরিমাণ নেহাত কম ছিলনা—সিএমইএসের সে সময়ের নিম্নমাত্রার ব্যয় মেটাতে তা কাজে লাগতো। দর্শকের মতামত নেবার চেষ্টায় আমরা একটি প্রশ্নপত্র (কোয়েচশনীয়ের) তৈরি করেছিলাম যা হাজার হাজার কপি ছাপানো হয়েছিলো। কিছু স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে জরিপ পরিচালিত করে দেখার চেষ্টা করছিলাম অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়েছে কিনা, কাদের মধ্যে হয়েছে, সাক্ষরতার কাজে লাগছে কিনা। জরিপটি খুব ব্যাপক ভাবে করা সম্ভব না হলেও, অনুষ্ঠানটি যে দর্শকদের ভাল লেগেছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছিলো। সে সময় সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখার একটি প্রবল আগ্রহ থাকতো—সেভাবে আমরা সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে এমন অনেক মানুষের কাছে পৌছে যেতে পেরেছিলাম। অবশ্য আজ টেলিভিশন দেশের সব অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে যতটা পৌছতে পারে, সেদিন এতটা পারতোনা।

পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ

আশির দশকের প্রথমার্ধে সিএমইএসের হয়ে আর একটি বড় সৃজনশীল কাজ করেছিলাম তা হলো ইউনিসেফের পক্ষ থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নয়টি বইয়ের 'পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ প্রকাশ। প্রস্তাবটি ইউনিসেফকে আমিই দিয়েছিলাম। সেই সময় আমার রাশিয়ায় প্রকাশিত নানা বই কেনার একটা অভ্যাস ছিল। এ জন্য ঢাকা স্টেডিয়ামের উপরের তলায় স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের বইয়ের দোকানে প্রায়ই যেতাম। ওরা রাশিয়ায় প্রকাশিত বই নিয়মিত আনতো।

প্রথম দিকে দুই ধরনের বই ইংরেজি অথবা বাংলা অনুবাদে কিনতাম—এ দুয়ের একটি হলো চিরায়ত রুশ সাহিত্য এবং কম্যুনিস্ট রাজনীতির বই—'কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো', 'দাস ক্যাপিটাল' সহ মার্কস, এঙ্গেল্‌স, লেনিনের নানা বই। কিছু কিছু বেশ বড় আকারের গ্রন্থও কিনেছিলাম—যেমন রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস। এগুলো সব দীর্ঘ রচনা—সব যে পড়তে পেরেছি তা বলবোনা; তবে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে কিনেছি এবং আগ্রহ ভরে অন্তত কিছুটা পড়েছি। চিরায়ত রুশ সাহিত্য অবশ্য যা কিনেছি সবই শেষ না করার উপায় ছিলনা—গোর্কি, দস্তভয়স্কি, টলস্টয়, গোগোল, সুলখভ প্রমুখের বই। কেনা কঠিন ছিলনা, কারণ এ সব বইয়ের দাম থাকতো খুবই কম। ইংরেজি অনুবাদে অন্য রকম বইগুলো কিনতাম পদার্থবিদ্যার ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বই—কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক, অন্যগুলো সাধারণপাঠ্য বই। ছাত্র জীবনে ও শিক্ষকতা জীবনেও পদার্থবিদ্যার কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তকের জন্য আমি রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের বইয়ের উপর নির্ভর করেছি, আরো কিছু রাশিয়ান বই ব্যবহার করেছি মূল পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক হিসেবে। রাশিয়ান লেখকদের স্টাইলটিই ছিল যথেষ্ট ভিন্ন—অনেক ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল করতে সহায়ক হতো, তবে সব ক্ষেত্রে হতোনা।

'পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের' প্রেরণাটিও আমি পেয়েছিলাম এই রাশিয়ান বই থেকেই, তবে সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় আমার খাতিরে ততটি নয় যতটি আমার ছেলে কুশলের খাতিরে। কুশল তার চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই বড় বড় হরফে লেখা ছবির বই পড়তে ও উপভোগ করতে শিখেছিলো। আমি তাকে একই সঙ্গে গল্পের বই (যেমন রূপকথার গল্প অথবা শিশু কাহিনী) এবং বিজ্ঞান, প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞানের বই পড়তে উৎসাহিত করতাম। এই উভয় ক্ষেত্রে শিশুতোষ রাশিয়ান বইগুলোর কোন তুলনা হতোনা। সোভিয়েত প্রগতি প্রকাশনীর সৌজন্যে এর সবই সুন্দর ঝরঝরে শিশু-বান্ধব বাংলা অনুবাদে পাওয়া যেতো। এসব বইয়ের দৈর্ঘপ্রস্থ হতো বেশ ঢাউস কিন্তু পাতার সংখ্যা স্বল্প। বড় বড় হরফে লেখা বই ছবিতে থাকতো ভর্তি। ছবিগুলোর শিল্পগুণ হতো অত্যন্ত উঁচু; সবমিলে আঙ্গিক ও প্রকাশনা সৌকর্য হতো অনবদ্য; অথচ দাম খুবই কম। কুশল খুব ছোটবেলা থেকে এসব বইয়ের পোকা হয়ে পড়েছিলো; এবং কিছুটা আমিও। এখনো এত বছর পর যদি কুশলকে টলস্টয়ের শিশু-কাহিনী থেকে বলি 'পেয়েছিস, পেলি?' অথবা শিশুদের সেই খেলা—কার মুঠোর মধ্যে হারানো বীজটি রয়েছে তা খুঁজতে রাশিয়ান অর্থহীন ছড়া কেটে কেটে একে একে নানা জনের মুঠো করা হাত স্পর্শ করা—'আনা বানা রস, কুন্তর কান্তার যস'; অথবা ফসলের মাঠে এক সঙ্গে গম কাটার, ঝাড়াই মাড়াই করার, খড়ের বান্ডিল করার কম্বাইন হার্ভেষ্টারের বর্ণনা—সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে তার শৈশব স্মৃতি মনে করে। এর থেকেই ভাবছিলাম আমরা কেন সহজ বিজ্ঞানের বই এমন উপভোগ্য ভাবে লিখে শিশুদেরকে আকৃষ্ট করতে পারিনা—যে বইয়ে আমাদের পরিচিত প্রকৃতির কথা

থাকবে আমাদের শিশুদের আকৃষ্ট করার মত করে। এরকম বই প্রকাশ ব্যয়বহুল হবে বটে কিন্তু ইউনিসেফের ক্ষমতা আছে অনেক অনেক সংখ্যায় এগুলো ছাপিয়ে বিশাল সংখ্যক শিশুদের কাছে সুলভে পৌছাতে—সেক্ষেত্রে ব্যয়টি সার্থক হবে। সিএমইএসের তরফ থেকে এ জন্য ইউনিসেফের কাছে একটি প্রস্তাব দিলাম খুব উচ্চ মানের এরকম একটি সিরিজের বই প্রকাশের জন্য—যা হবে আমাদের দেশের পরিবেশের সে সব বিষয় নিয়ে যেগুলো পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা সহ আমাদের দৈনন্দিন সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়নে কাজে লাগবে। ইউনিসেফের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে আমার ইতোমধ্যেই বেশ পরিচয় ছিল। ওরা বিজ্ঞান সাময়িকীকে কিছু অর্থ অনুদান দিতো এবং সেই সুবাদে লেখালেখি ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতার উপর বেশ আস্থাবান ছিলো। তাছাড়া সরকারের জনশিক্ষা দফতরের সঙ্গে মিলে ইউনিসেফও চাচ্ছিলো যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু আকর্ষণীয় বই সরবরাহ করতে। আমাদের প্রস্তাবটি তাই তাদের বেশ পছন্দ হলো।

ইউনিসেফের সঙ্গে সিএমইএসের চুক্তি হলো এরকম নয়টি বইয়ের একটি সিরিজ প্রকাশের জন্য পরিকল্পনা, রচনা, অংকন, মুদ্রণ, এবং প্রকাশনা সৌষ্ঠবের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে। প্রত্যেকটি বইয়ের এই সবগুলো দিক যেন অনন্য হয় সে জন্য আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত গোড়া থেকেই গ্রহণ করলাম। শিশুতোষ বই হলেও এর কথাগুলো শিশু-ভোলানো কথা হবেনা, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে এটি কার্পণ্য করবেনা। এসব এমন ভাবে পরিবেশন করা হবে যে শিশুরাও আকৃষ্ট হবে, কিন্তু বড়দেরও কাজে আসবে। এই তথ্যগুলোর জন্য লেখক বিদেশী বইয়ের চেয়েও দেশের নিজস্ব পরিস্থিতির উপর যে গবেষণা ও কাজ হয়েছে তার উপর বেশি নির্ভর করবেন, যাতে 'পরিবেশ'টি সব অর্থে আমাদের পরিবেশ হয়ে ওঠে। এ জন্য বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক গবেষণা, জরিপ ইত্যাদি নিয়ে সম্ভাব্য সব রকমের অনুসন্ধান, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, তাদের প্রকাশনা ও প্রকাশিত ডকুমেন্টেশন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করা হবে। অর্থাৎ কিনা স্বল্প অবয়বের শিশুতোষ বই হলেও এর বক্তব্য বিষয়গুলো নির্ধারিত হবে রীতিমত পুস্তক রচনা-পূর্ব গবেষণার মাধ্যমে। ছবিগুলো বিদেশী অন্য কোন বই থেকে নেয়া হবেনা, বরং নিজেদের দেশের উপর অনুসন্ধানে যে প্রামাণ্য চিত্র, ফটো, বিমান থেকে নেয়া ফটো, ম্যাপ ইত্যাদি রয়েছে তার ভিত্তিতে আঁকা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছবিগুলোর মান হবে গুণী শিল্পীর আঁকা উচ্চ মানের বড় তেলচিত্র, জলচিত্র ইত্যাদির মত—নেহাত স্কেচ বা ডায়াগ্রাম নয়। সব কিছু মিলে আমরা এই পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের জন্য একটি উচ্চ মানের লক্ষ্যরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং মনে মনে সংকল্প করেছিলাম ইউনিসেফকে রাজি করাতে পারলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করবো। একদিকে বিজ্ঞানে বিশেষ করে পরিবেশ বিজ্ঞানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে, এবং অন্যদিকে

চিত্রশিল্পী ও মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতের সঙ্গে, আমার ভাল পরিচিতি থাকায় এবং এসব বিষয়ে নিজেরও কিছু পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতা থাকায় এদিক থেকে বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস ছিল।

ইউনিসেফ আমাদের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলো, এবং সে ভাবেই এর অর্থায়নে সম্মত হয়েছিলো। বইয়ের পুরো পরিকল্পনাটি আমার, বইগুলোর অধিকাংশ লিখবোও আমি, এর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব সিরিজ সম্পাদক হিসেবে আমি পালন করবো—তাই ঠিক করেছিলাম এ সবের জন্য প্রাপ্য সকল টাকা সিএমইএস'কে সরাসরি দান করতে পারবো। ওই সময় সিএমইএসের এই টাকার খুব প্রয়োজন ছিলো। বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলাম যানবাহন, মাটি, পানি, আবহাওয়া, উদ্ভিদ, ধান, বন, ফুল ও মাছ। তবে প্রত্যেকটির নামকরণ করা হলো একটু ছন্দোময় ও আকর্ষণীয় করে—কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিখ্যাত কবিতা বা গানের অংশ থেকে। এভাবে বইগুলোর নাম হলো 'ডাঙায় জলে হাওয়ায় চলে' (যানবাহন), 'ও আমার দেশের মাটি' (মাটি), 'পানি যাকে জীবন বলে জানি' (পানি), 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' (আবহাওয়া), 'সবুজের সাথে মিতালি' (উদ্ভিদ), 'ধন-ধান্য' (ধান), 'বনে জঙ্গলে' (বন), 'ফুলের জন্য ভালবাসা' (ফুল) এবং 'মাছের মেলা' (মাছ)। এর প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু-গবেষণাগুলো আমি করলাম প্রাসঙ্গিক নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে। যানবাহন, পানি, ধান, বন ও মাছের বইগুলো আমি নিজেই লিখলাম, অন্যগুলো আবদুল্লাহ আল-মুতী, আলী আসগর এবং ফরিদা আসগরকে দিয়ে লেখালাম। তবে পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের প্রত্যেকটি বইয়ের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো এর পটভূমি-গবেষণা এবং সেই অনুযায়ী লেখা, চিত্র অংকন ও সব কিছু সংযোজন; এই গবেষণা ও নানা ডকুমেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে। মাত্র পৃষ্ঠা তিরিশেকের বইয়ের জন্য এত রকম পটভূমি গবেষণা আমরা করলাম তা ভাবলে এখন অবাক হতে হয়। যানবাহনের বইটির জন্য অনেকখানি নির্ভর করেছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত এ সম্পর্কে গবেষণার—বিশেষ করে রিক্সা ও নৌকার উপর। এখানে সব চেয়ে বেশি কাজে এসেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেভাল আর্কিটেকচার (নৌ-স্থাপত্য) বিভাগে করা দেশীয় নানা নৌকার উপর কয়েকটি থিসিস। এগুলোর কারণেই আমরা খেয়া নৌকা, রপ্তানি নৌকা, গয়না, বাল্লাম নৌকা, ঘাসি নৌকা, সাম্পান ইত্যাদি নিজস্ব বৈশিষ্টকে শিল্পীর আঁকা ছবিসহ শিশুতোষ ভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। ট্রেন বা মোটর সাইকেল বা মোটর গাড়ির ইঞ্জিন কীভাবে তাকে শক্তি দেয় সেটি বোঝাবার চেষ্টা আছে, তেমনি নৌকার গুণ টানায় নৌকা পাড়ে চলে না এসে সামনে যাওয়ার (জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত ছবি ব্যবহার করা হয়েছে), কিংবা পালকে তেরচা করে বায়ু স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার রহস্য ভেদে বিভিন্ন বলের (ফোর্স) যোগ-বিয়োগগুলো সরল ভাবে বোঝাবার চেষ্টা আছে। শিশুদের জন্য

নিজে করার অনেক উপাদান ছিল প্রত্যেক বইয়ে। যেমন যানবাহন নিয়ে এই বইয়ে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে তার পালের কৌণিকতা বদলিয়ে ও তাতে ফু দিয়ে, কিংবা কাগজের বিমান বানিয়ে তার নানা অংশ বাঁকিয়ে যথাক্রমে নৌকার ও বিমানের গতি পথকে নিয়ন্ত্রণ করা।

পুরো সিরিজে চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রধানত কাজ করেছেন ফরিদা জামান (তখন আর্ট কলেজে উদীয়মান শিল্পী ও শিক্ষক, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী হিসেবে উচ্চ খ্যাতিতে অভিষিক্ত), এবং শওকাতুজ্জামান (তখন শিশু একাডেমির চিত্রশিল্পী, অকাল প্রয়াত); দু' একটি বইয়ে খ্যাতিমান শিল্পী রফিকুন্নবী (আর্ট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক) এবং সৈয়দ ইকবালও (লেখক, শিশু একাডেমির চিত্রশিল্পী, পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী)। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁরা সবাই, বিশেষ করে ফরিদা জামান যে কাজটি অত্যন্ত পরিদর্শিতার সঙ্গে করেছেন তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফটো হিসেবে পাওয়া মূল ইমেজকে একটি অত্যন্ত উঁচু মানের শিল্পকর্ম হিসেবে উপস্থাপিত করা। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যেমন স্পষ্ট তেমনি আবার তা শিশুর মনে অজানা জগতের হাতছানির হিল্লোল জাগিয়ে তুলতেও সক্ষম। বিশেষ করে প্রত্যেকটি বইয়ের প্রচ্ছদটিকে রীতিমত একটি শিল্পকর্ম করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম—অধিকাংশই যেন সামনে ও পেছনের প্রচ্ছদ মিলে একটি বড় শিল্পকর্ম। যেমন যানবাহনের বইটির প্রচ্ছদ হয়েছিলো নানা রকম যানবাহনের একটি আলো-ছায়ায় মিলে বড় কোলাজ ছবিতে।

শুধু মাটিকে নিয়ে যে শিশুতোষ বই হতে পারে সুন্দর সব ছবি হতে পারে সেটি আমরা দেখিয়ে দিয়েছি 'ও আমার দেশের মাটি' বইটিতে। এটি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিলের গবেষণাগারে চমৎকার মাইক্রোগ্রাফ নেবার সুবিধা থেকে—যেখানে মাইক্রোস্কোপ থেকে অনেক বড় করা ইমেজের সুন্দর ছবি নিয়ে নেয়া যায়। এতে মাটির প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের মাটির কণার আকৃতি; এদের মধ্যে ফাঁক; ভেতরে উদ্ভিদ মূলের রোঁয়াগুলো কী ভাবে রস শুষে নেয়; কেঁচো, পিপড়া ইত্যাদি কীভাবে মাটির ফাঁকে ফাঁকে থাকে; এসব সুন্দর ভাবে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। পানি সম্পর্কে বইটির জন্য আমি সহায়তা নিয়েছিলাম দু'জন পানি বিশেষজ্ঞ এইচ আর খান এবং মোহাম্মদ রফিক হোসেনের। বাংলাদেশের হাওড়, বাওড়, বিল, ঝিল, খাল, নদী এর মধ্যে কোনটি যে ঠিক কী এবং প্রত্যেকটির কী যে বৈশিষ্ট তা বৈজ্ঞানিক ভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে ছবি ও লেখায়। নলকূপের নল নিচে যখন নামে তখন এটি ওখানে পানিকে পায় কোথায়, কী হিসেবে, এরকম সাধারণ বিষয় অনেকেরই অজানা থেকে যায়। নদী শাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের মত জটিল জিনিসও বোঝানো যায় অতি সাধারণ কাজ নিজে করতে দিয়ে; তেমনি কাপ্তাইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও। দেশে জলধারা সমূহের সচ্ছন্দ চলাচলের গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃখননের মাধ্যমে আমাদের

খাল-নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে দেখানো হয়েছে। উলশি-যদুনাথপুর নামে বিখ্যাত খাল কাটার সুফল বোঝাতে যশোরের ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে আনা হয়েছিলো এই প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন নথিপত্র ও মানচিত্র—যাতে সঠিক ভাবে এটি উপস্থাপিত করা যায় প্রধানত ছবির মাধ্যমে।

পানির সম্পর্কে বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর প্রচ্ছদ। এজন্য শিল্পী ফরিদা জামানকে দেয়া হয়েছিল একটি উচ্চাকাঙ্খী কাজ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' বইটির প্রধান চরিত্র রিদয় নামক ছেলেটি বুড়ো আঙুলের আকার প্রাপ্ত হয়ে বালি হাঁসের পিঠে চড়ে তাদের ঝাঁকের সঙ্গে হিমালয়ে মানস সরোবরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ নদী নালা ভরা খেত খামারের উপর দিয়ে যেতে যেতে হাঁসেরা পরস্পরকে বলছে : 'কোন মাঠ' 'তির পুরনীর মাঠ—জলে থৈ থৈ'। 'কোন ঘাট?' 'সাকের ঘাট'—'গুগলি ভরা'...'কেমন বিল?' চলন বিল—জল নেই। 'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা' 'কোন দিঘি 'রায় দিঘি—পানায় ঢাকা'। রিদয় এগুলো নিচের ভূমিতে দেখছিলো, আর দেখছিলো দাবা খেলার ছকের মত টুকরা টুকরা চাষের খেত এদের মধ্যে। 'বুড়ো আংলায়' একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম-চিত্রে বর্ণিত এই আকাশ থেকে দেখা বাংলাদেশের নদী-নালা-খেতের এই দৃশ্যকে ফরিদা জামান প্রকাশ করবেন তাঁর তুলির মাধ্যমে 'পানি যাকে জীবন বলে জানি' বইটির প্রচ্ছদে। তিনি তা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে করেছিলেন।

'সবুজের সাথে মিতালি' বইটিতে আগাগোড়া চেষ্টা করা হয়েছে উদ্ভিদের প্রতি শিশুদের ভালবাসা জন্মাতে। এ কাজে সব চেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সুন্দর সুন্দর ছবিকে। এক্কেবারে তার আসল রঙে বিভিন্ন উদ্ভিদকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে এসব ছবিতে—যেমন বীজ থেকে শিমের অঙ্কুরোদগমের ছবি, কিংবা একটি শালগমের পাতা-কাণ্ড সহ ভূমিতে থাকা অবস্থার ছবি, মূল ইত্যাদি দেখিয়ে। খুব ছোট বেলায় টবের মধ্যে এরকম দৃশ্যগুলো দেখে, উদ্ভিদকে কখনো তরতাজা হতে দেখে, আবার কখনো ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়তে দেখে, এদের প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম, যা পরেও বজায় ছিলো। এই বই তৈরি করতেও আশা ছিলো যে ছবি ও লেখায় আকৃষ্ট হয়ে বইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী শিশুরা আসল পর্যবেক্ষণগুলো করতেও আকৃষ্ট হবে। 'ধন-ধান্য' বইটির বিষয়বস্তু কিন্তু আরো সীমিত—শুধু ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধানের কথা তখন শিশুরাও খুব শুনে থাকতো অহরহ। কিন্তু ইরি-৮, বাদশাভোগ, নাইজার শাইল, হাসি কলমি ইত্যাদি এক একটি জাতের ধান যে এক একটি বৈশিষ্ট মণ্ডিত জাত তা সে ধানের বড় করে দেখা বিস্তারিত ছবি ইত্যাদি থেকেই মনে দাগ কাটবে, এমন আশা করেছি। ধানের যে ফুল রয়েছে, তারও যে পরাগ সংযোগ হয় যার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন জাতের ধান সৃষ্টি হয়েছে—অদ্ভুত সুন্দর রঙিন ছবির মাধ্যমে তা শিশু মনেও দোলা দিতে

পারে। এই বইটির প্রত্যেকটি পর্যায়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের, বিশেষ করে এখানকার বিজ্ঞানী ড. নীলুফার হাইয়ের পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

'ফুলের জন্য ভালবাসা' বইটি লিখতে আবদুল্লা আল-মুতী রাজি হয়েছিলেন এবং এই বইয়ে ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ড. নওয়াজেশ আহমদের অনবদ্য সব ফটোগ্রাফকে। কৃষি বিজ্ঞানী নওয়াজেশ আহমদ তাঁর প্রকৃতি-ফটোগ্রাফির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই বইয়ের কথাটি পাড়লে তিনি জানালেন যে তাঁর তোলা ফুলের ছবির বিরাট সংগ্রহ রয়েছে তাঁর কাছে। ফটো বাছাইয়ের জন্য তাঁর বাসায় গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম; দেখলাম যেন ফটো-সংগ্রহ রাখার জন্যই পুরো বাসাটা, তিনি নেহাত বাড়তি উপসর্গ হিসেবে সেখানে কোন রকমে থাকেন মাত্র। আল-মুতী সাহেব আর নওয়াজেশ সাহেবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে এই অতি মনোগ্রাহী বইটি। ছবির দিক থেকে 'বন জঙ্গলে' বইটিরও সুযোগ ছিল অনেক। ফরিদা জামান আর শওকাতুজ্জামান সেই সুযোগকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করেছেন বড় বড় সব বনের দৃশ্য এঁকে। এর মধ্যে বনবিভাগ থেকে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফকে ভিত্তি করে আঁকা বনের ছবি, তার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ছবি যেমন আছে তেমনি কল্পনার রূপকথার বনও রয়েছে। আবার বনের উদ্ভিদের একেবারেই ছোট অংশ যেমন ফুল, বীজ, বীজ ছড়ানো ইত্যাদির উপরও দৃষ্টি দিয়েছে কোন কোন ছবি। গর্জন, কড়ই, সেগুন, শাল এ সব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি বনজ গাছের পৃথক ব্যক্তিত্ব যেন ঘোষণা করছে এখানকার এক একটি ছবি। তেমনি আবার বিশাল গাছের গুড়ির কর্তিত অংশে শত বর্ষের প্রতিটি বছরে গড়ে ওঠা প্রত্যেকটি রিং সুন্দর ভাবে দেখা দিচ্ছে তেমন ছবিও রয়েছে। বনজ সম্পদ তো শুধু কাঠ নয় তাই কাগজের মণ্ডে গাছের আঁশ কী ভাবে থাকে তার মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবিটিও দারুণ কৌতূহল উদ্রেক করে, যেমন করে কাঠ থেকে চেঁছে নেয়া পাতলা ভিনিয়ার, অথবা গাছকে ক্ষত করে সংগ্রহ করা রাবার। পুরো বইয়ে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিয়েছে আমার চাচাতো ভাই ফরিদ (বন বিশেষজ্ঞ ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ, পরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের বিজ্ঞানী এবং বিদেশী সংস্থার প্রধান)।

'মাছের মেলা' বইটিতে সব কিছু যেন দেখা যাচ্ছে পানির ভেতর দিয়ে অল্প আলোতে; কিন্তু সেখানেও যে এক একটি মাছ এত সুন্দর হতে পারে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন ফরিদা জামান তাঁর বড় বড় চিত্রগুলোতে। মাছের জীবন-বৈচিত্রও কম নয়—বিশেষ করে ইলিশের পুরো জীবনীতিহাস। একেবারে বাংলাদেশের মানচিত্র ধরেই এটি প্রাঞ্জল করা সম্ভব হয়েছে এই সব ছবির গুণে—প্রজননের মৌসুমে সমুদ্র থেকে কীভাবে নদীমুখে ঢুকে উজান বেয়ে এগিয়ে যায় পদ্মায় গোয়ালন্দের দিকে, পরে আবার ফিরে যায় সমুদ্রে। লেখক, শিল্পী সবাই মৎস্য বিশেষজ্ঞ ড. মাহমুদুল করিমের বৈজ্ঞানিক শাসনের মধ্যে থেকেই কাজ করেছেন।

এতো সব রথী-মহারথীদের অবদানে ও গবেষণায় এসব বই সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য মোটেই এই ছিলনা যে একে ভারিক্কি করে তোলা, বা একটি জবরদস্ত প্রামাণ্য কিছু করছি সেটি প্রমাণ করা। বরং এর উদ্দেশ্য বরাবর একটিই ছিলো, তা হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে নিখাদ আনন্দ দিয়ে তাদেরকে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের প্রতি উদ্দীপ্ত করে তোলা। এটি করতে গিয়ে আমরা তাদেরকে খুব সাম্প্রতিক ও নিখুঁত তথ্য দিতে চেয়েছিলাম—যা আমাদের দেশের নিজস্ব তথ্য, বিদেশী বইকে নকল বা অনুবাদ করে নয়। তাছাড়া বরাবর লক্ষ্য করেছি আসল প্রকৃতির চেয়ে সুন্দর অন্য কিছু নেই। আমরা ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে, বা কল্পনা থেকে এঁকে কখনোই ওই সৌন্দর্যের সমকক্ষ কিছু পাবোনা। তাই পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ করতে গিয়ে সরাসরি ফটো বা মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে তোলা ফটো, কিংবা আকাশ থেকে নেয়া ফটো ইত্যাদির ভিত্তিতেই শিল্প কর্মের অনেকটাই করা হয়েছে।

সবার সব অবদান একত্র করে আমাকে যে কঠিন কাজটি করতে হয়েছে সম্পাদক হিসেবে তা হলো সব কিছু সমন্বিত করে বইয়ে রূপ দেয়া। এজন্য দিনের পর দিন চারদিকে সব কিছু ছড়িয়ে বাসার মেঝেতে বসে কাজ করেছি। এ কাজে আমার সহায়ক হয়েছিলো একজন কিশোর—মাহমুদ (আহমদ মাহমুদুল হক, পরে মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্ত্বাধিকারী)। প্রকাশক পরিবারে বেড়ে ওঠা মাহমুদের বইয়ের গেট আপ, প্যাষ্টিং ইত্যাদি কাজে চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল, এবং সূক্ষ্ম শিল্প রুচিও ছিল। তাকে আমরা কিছুদিনের জন্য সিএমইএসের এই কাজের ভেতর নিয়ে নিয়েছিলাম। মাহমুদ আর আমি বইয়ের এই পর্যায়েও যেমন দিনরাত পরিশ্রম করেছি, তেমনি খুবই সৃজনশীল আনন্দও পেয়েছি। প্রেসের দিকটিও কম বড় চ্যালেঞ্জ ছিলোনা। রাশিয়ান প্রগতি প্রকাশনী বা অনুরূপ বিদেশী প্রকাশনাগুলোর সমান মান বজায় রাখার যে আকাঙ্খা আমরা পোষণ করছিলাম সেই মানের প্রেস দেশে বেশি ছিল না। ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেস ছিলো সেগুলোর অন্যতম। পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক মোহাইমান সাহেবের ছেলে মোমেন সাহেবই (পরে চেম্বার অফ কমার্সে ব্যবসায়ী নেতা) তখন প্রেসের বিস্তারিত দেখেন। তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞান সাময়িকী ছাপানোর সুবাদে আগে থেকেই ভাল পরিচয় ছিলো। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন আমাদের প্রচেষ্টাকে। বরাবরের মতো আমিও ছাপার সময় প্রেসে পড়ে রইলাম—যাতে মোমেন সাহেবের সঙ্গে মিলে সূক্ষ্ম সব বিষয়ে গুণগত মান রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারি। এ চেষ্টার ফল মিল্‌লো—মুদ্রণ অনবদ্য হলো। পরের দিকের বইগুলো ছাপাতে হয়েছিলো পুরোনো পল্টনে বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেসে। এখানেও ছাপার মান রক্ষাতে ব্যক্তিগত মনোযোগ পেলাম—কারণ প্রেসের মালিক ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজ সংসদের ক্যাবিনেটে থাকা কালে আমার নেতা সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম তারা মিয়া (পরে জাতীয় সংসদে হুইপ)।

সিএমইএসের পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজ ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে একটি অনন্য কাজ। ইউনিসেফের কল্যাণে এটি বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। তবে সেখানে এটি কতখানি ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিলো সে বিষয়ে খুব ভাল রিপোর্ট পাইনি। আমরা সিএমইএসের পক্ষ থেকে ঢাকার ও বিভিন্ন জেলার কিছু কিছু স্কুলে খোঁজ করে খুব সন্তোষজনক ফলাফল পাইনি। এমন পরিশ্রম করে করা প্রচেষ্টা এভাবে কিছুটা অপচয় হতে দেখে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। এর আংশিক ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছিলাম পরবর্তী সময়ে সিএমইএসের নিজস্ব স্কুল ব্যবস্থার জন্য আমরাই এটি একাধিক বার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে। একবার মাওলা ব্রাদার্সকে দিয়ে এটি করিয়েছিলাম—এর স্বত্বাধিকারী মাহমুদ তার কৈশোর বয়সে যে কর্মী হিসেবে এতে কাজ করেছিলো সে কথা সে ভোলেনি। যদিও অর্থাভাবে প্রথম বারের মত অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী প্রকাশনা এরপর আর সম্ভব হয়নি, তবুও আমরা আমাদের নিজস্ব স্কুলগুলোতে (মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা) এগুলোর চমৎকার ব্যবহার করেছিলাম। বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমরা যেই নতুন আঙ্গিকে নিতে সেখানে চেষ্টা করছিলাম এই সিরিজের বইগুলোর আবেদন তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে গিয়েছিলো।

এ ভাবে আমরা শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সিএমইএস-কে নিজস্ব পথেই শিক্ষার আয়োজন করতে হবে—কারণ সেখানকার খোল-নলচে পরিবর্তনের জন্যই এর জন্ম। বর্তমান স্কুলগুলোর জন্য এটি সেটি যোগান দিয়ে নয়, বরং এদের আমূল পরিবর্তন করার জন্য নিজস্ব মডেল সৃষ্টি করার মাধ্যমেই সিএমইএস সার্থক হতে পারবে।

মৌলিক বিদ্যালয়ের উন্মেষ

মৌলিক বিদ্যালয়ের ধারণাটি নিয়ে বিজ্ঞান সাময়িকীতে অনেক দিন ধরে লেখালেখি করছিলাম—এটি আমাদের সেই আপন স্কুল। এটি শুধু স্কুল হবেনা—হবে আনন্দ খেলাঘর, বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরি, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব কিছু। এটি আমরা দেশের সব শিশুর জন্যই চিন্তা করছিলাম—বর্তমান স্কুলের ধরন বদলে দিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের মনে হলো এত বড় লক্ষ্য গোড়া থেকে নিলে সাফল্য শিগ্‌গীর আসবেনা। কাজেই আমরা শুরু করতে চাইলাম যারা স্কুলে যায়নি বা এখন যাচ্ছেনা তাদের জন্য বিকল্প স্কুল হিসেবে এটি চালু করার মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে সিএমইএসের সকল চিন্তা ভাবনা এই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়েছিলো এবং আমরা এটি বাস্তবায়নের পথ খুঁজছিলাম। যখন যাকে যেখানে পেতাম, সরকারী বেসরকারী সব মানুষকে এর কথাই বলতাম। এ সময় দু'একটি এনজিও'র প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ হতো। ইউনূস ভাই চট্টগ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করে আরো বড় আকারে গ্রামীণ ব্যাংকের আয়োজন করেছেন টাঙ্গাইলে। ঢাকায় এলে আমার বাসাতেই থাকতেন—সেই পি ডব্ল্যু ডি বাংলো

তিন এর অপরিসর জায়গার ড্রইং রুমে। স্বেচ্ছাসেবী জগতের নানা মানুষ এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁদের মাধ্যমেও আমাদের মনস্কামনার কথাটি এমন সব দিকেও ছড়াতে পেরেছিলাম যেখানে আমার সাধারণ যাতায়ত ছিলনা। তাছাড়া প্রায়ই তাঁর সঙ্গে টাঙ্গাইলে যেতাম এবং ওখানে থাকতাম। বিভিন্ন এনজিও'র পরিচালক ও কর্মীদের সঙ্গে সেখানেও দেখা হতো।

বেইস (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কম্যুনিটি এডুকেশন) ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ মিলে শাহরাস্তিতে একটি বড় এনজিও সম্মেলন ডেকেছিলো। আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম সিএমইএস থেকে আরো কয়েকজন সহ। সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রেরও এমনি সম্মেলনে উপস্থিত থাকি। এসব জায়গায় যাওয়ার একটি সুফল হয়েছিলো যে সে সময়কার নানা এনজিও'র কর্মীদের সঙ্গে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিও প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছে যেসব সম্পর্ক পরেও রীতিমত বজায় রাখতে পেরেছি। তখনকার পুরো এনজিও আন্দোলনটির সঙ্গে এবং এর রীতিনীতির সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা এভাবে ঘটেছে। সিএমইএস এর মানুষ জন বলতে তখন দু'একজন ছাত্র যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এতে কাজ করতো—ব্যবস্থাপক হিসেবে ভূঁইয়া ইমরান (লিংকন) তো ছিলই, পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার একজন ছাত্র তারেক মনজুর ও ছাত্রী নাদিরা মজুমদার (পরে বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নাগরিক)। আর একজন ছাত্র বিষ্ণু দাশ ছিল প্রাণিবিদ্যার ছাত্র। সে তার এম এস সি থিসিসের জন্য মাছ ধরার ট্রলারে জেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সামুদ্রিক মাছের শ্রেণী বিভাজনের (ট্যাক্সোনোমি) কাজ করছিলো। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে এই অভিজ্ঞতার কথা বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লিখতে বল্‌লাম। 'বঙ্গোপসাগরের ট্রলারে' শিরোনামে তার এই ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক ভ্রমণকাহিনী বিজ্ঞান সাময়িকীর অনেকগুলো সংখ্যায় বেরিয়ে বেশ নাম করেছিলো। বিষ্ণু পরে ব্র্যাক, ক্যারিতাস ইত্যাদি বড় বড় এন জিও সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রধানত মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও এনজিও কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছে—গ্রামেগঞ্জে কর্মস্থলে থেকে শুরু করে এদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে; মৎস্য বিষয়ক লেখক হিসেবেও তার খ্যাতি রয়েছে। সিএমইএসের সঙ্গে আগাগোড়া সংশ্লিষ্ট থেকে বিষ্ণু শেষে এর পরিচালনা পরিষদের সদস্যও হয়েছে। আর একজন ভাল বিজ্ঞান লেখক ও বিজ্ঞান কর্মীর হাতেখড়ি তখন হয়েছিলো বিজ্ঞান সাময়িকী ও সিএমইএসে—স্বপন কুমার গায়েন (পরে অনেক বইয়ের লেখক ও আমেরিকায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক)। সবাই পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের জন্য কোন না কোন ভাবে কাজ করেছে। সিএমইএসের এর মূল লক্ষ্য বিকল্প স্কুলের ধারণায়ও তাদের নিজ নিজ চিন্তাগুলো কাজে এসেছে।

ওই সময় গ্রামবাংলার তৃণমূলে থাকা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আশা আকাঙ্খাগুলো কিছুটা কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিলো গ্রামীণ ব্যাংকের কল্যাণে। চট্টগ্রামের জোবরাতে, মীরসরাইতে এবং টাঙ্গাইলের জামুর্কি, ঘারিন্দা,

হাঁটুভাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ দেখতে গিয়েছি ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে। ওখানে কেন্দ্র-মিটিঙে দেখেছি দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা কী ভাবে নিজেদের মৌলিক সমস্যাগুলোর কথা আলোচনা করছে—যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বাসস্থান, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এর প্রত্যেকটি সমস্যার মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিল। সিএমইএসের শিক্ষা চিন্তাটিকেও ক্রমে ক্রমে আমরা এই তৃণমূলের দিকেই ধাবিত করছিলাম। গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক দরিদ্র সদস্যদের পরিবারে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছিলোনা। দরিদ্র পারিবারকে সাহায্য করার প্রয়োজন ছাড়াও অনেক জায়গায় কাছে কোন স্কুল ছিলনা। এমন অবস্থায় অনেকে কষ্টেসৃষ্টে স্কুলে ভর্তি হয়েও কিছুদিন থেকে শিগ্‌গীর ওখান থেকে ঝরে পড়ছিলো। তাদের একটি বড় সমস্যা দেখলাম স্কুলে গিয়ে সেখানে নিজেদের কোন উপকার বা ভবিষ্যৎ দেখতে না পাওয়া। অত্যন্ত ভীড় করে থাকা ক্লাসে বেশি কিছু মনোযোগ পেতে ব্যর্থ হয়ে বা সেখানে লেখাপড়াতে এগোতে না পেরে নিরানন্দ, নিরাশ অবস্থাতেই তারা স্কুলে থাকার ইচ্ছেটা বাদ দিতো। বলতে গেলে এ ভাবেই অশিক্ষার একটি দুষ্টচক্র দেশের এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে ঘিরে ধরেছিলো।

মনে হলো 'আপন স্কুলের' কথা যে রকম ভাবছিলাম তার প্রারম্ভ এখান থেকেই করতে হবে। কীভাবে সেটি করা যায়, এটিই ছিলো প্রশ্ন। এমন অবস্থায় জাঁ-মারী অ্যাট্টন নামের এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ হলো। তিনি ঢাকায় টেরে ডেস হোম্‌স (মানুষের ভূমি) নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের উদ্যোগে আলাদা আলাদা দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হতো। জাঁ-মারীর প্রতিষ্ঠানটি ছিল টেরে ডেস হোম্‌স-ফ্রান্স। যমুনা পারে দেওয়ানগঞ্জে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে তাঁরা কিছু কাজ করছিলেন। সিএমইএস কী করতে চায় সেটি জেনে তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন দেওয়ানগঞ্জে গিয়ে তাঁদের কাজগুলো দেখতে, এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে। বিদেশী মানুষও যে এখানকার তৃণমূলের মানুষদের সমস্যার সঙ্গে কী ভাবে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন জাঁ-মারী এবং তাঁর সহকর্মীদের না দেখলে তা আমি বুঝতে পারতামনা।

টেরে ডেস হোম্‌স-ফ্রান্সের এক তরুণ বেলজিয়ান কর্মকর্তা অঁরি লেফেব্রের সঙ্গে রাতের ট্রেনে দেওয়ানগঞ্জ গেলাম। ট্রেনে স্লিপিং কম্পার্টমেন্টে কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম আমার দীর্ঘদেহী বেলজিয়ান সঙ্গীটি একটি লুঙ্গি পরে ফেল্‌লেন আর পা তুলে বেশ জমিয়ে বসে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জে তাঁদের কাজ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত ধারণা দিলেন। ময়মনসিংহ, জামালপুর হয়ে ভোরের দিকে ট্রেন দেওয়ানগঞ্জে গিয়ে পৌঁছলো। এটি বাহাদুরাবাদ ঘাটের ট্রেন, এরপর

অন্যান্য যাত্রীরা স্টিমারে যমুনা পাড়ি দিয়ে অন্য পারে গিয়ে আবার ট্রেন নেবে। স্টেশন থেকে একটি রিক্সায় আমরা দু'জন পাঁচ ছয় মাইল দূরে তাঁদের প্রকল্প এলাকায় গেলাম। গ্রামের মাটির রাস্তায় প্রচুর ঝাকুনির মধ্য দিয়ে রিক্সা কোন রকমে এগোচ্ছিল। দেখলাম গ্রামের অনেক মানুষ অঁরিকে চেনে, তিনি পথে পথে নেমে বেশ আলাপও করছিলেন; কয়েক জায়গায় চায়ের দোকানে ঢুকে সেখানকার কারো কারো সঙ্গেও কুশল বিনিময় করছিলেন। প্রকল্প এলাকায় গিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো। স্থানীয় ভাবে এর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে আছেন ইরা রহমান—অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। এর বেশ কয়েক বছর পর ফরাসীরা যখন একে দেশীয় এনজিওতে পরিণত করে চলে গিয়েছিলো তখন ওই এনজিও'র দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। দেওয়ানগঞ্জের ওই অঞ্চলটি যমুনার ভাঙ্গনে ছন্নছাড়া একটি জায়গা। রাতারাতি অনেকে বাস্তুহারা হয়ে দুঃস্থ মানুষে পরিণত হয়। এই প্রকল্প ওখানে এরকম দরিদ্র মহিলাদেরকে গ্রুপভুক্ত করে তাদের স্বকর্ম সংস্থানের জন্য এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছিল। এই সব ব্যাপারে তাদের কর্ম কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অঁরি খুব বিনয়ের সঙ্গে আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি নিজের মত করে যা ভেবেছি তাই বলেছি, চিন্তাভাবনা কিছু থাকলেও তৃণমূলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার খুবই অল্প ছিল।

গ্রামে ঘোরার সময় এক জায়গায় আর একজন ফরাসী তরুণকে দেখলাম যিনি চমৎকার বাংলা বলতে পারেন, যদিও তা কিছুটা জামালপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক টানে আকীর্ণ। তাঁর নাম জাঁ-পল। শুধু ভাষাই আয়ত্ব করেননি বেশভূষায়ও ওখানকার স্থানীয় এনজিও কর্মীদের মতই সাদাসিধে পোষাক তাঁর, অন্যদের থেকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। ওখানে জমিজমা সংক্রান্ত একটি বিরোধ নিয়ে কথা বলছিলেন তাঁরা। জাঁ-পল স্পষ্ট বাংলায় বললেন 'আমিন ডেকে পাঠিয়েছি, আমিন আসলেই মাপ-জোখ করে আসল রহস্য বের করে ফেলবে'। জমিজমা, আমিন সংক্রান্ত কথাবার্তা ছোট বেলায় আব্বা ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের কাছে শোনতাম। বহুদিন পর একজন ফরাসীর মুখে এই সব দেশীয় কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এই জাঁ-পলের সঙ্গে পরে আমার ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। তিনি ওই অঞ্চলের একজন আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে। একবার সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁদের বাসায় গেলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। সেদিন জাঁ-পল খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাঁর মেয়ের সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে বলে—ঠিক যেভাবে আমরা মধ্যবিত্ত বাবা মা'রা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। আরো বেশ কয়েক বছর পরে এনজিওটির দেশীয়করণ করা হলে জাঁ-পল স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলেন।

ফেরার সময় রিক্সা করে দেওয়ানগঞ্জ স্টেশনে আসার পথে একটি স্যান্ডেল তৈরির কুটির শিল্প দেখলাম। গ্রামের বেশ কিছু তরুণ চামড়ার সহজ-সরল কিছু স্যাণ্ডেল তৈরি করছে—মামুলি সব হাতের যন্ত্রপাতি দিয়ে। এটি ওই প্রকল্পের

স্বকর্ম সংস্থানের একটি ব্যবস্থা। প্রতিদিন সবাই মিলে যে স্যান্ডেল তৈরি করে তা ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঢাকার বাজারে পাঠানো হয়। টেরে ডেস হোম্‌সের সঙ্গে এরপর আরো যোগাযোগ হয়েছে; তাদের কাজে সহযোগিতা দিতে গিয়ে আমার অনেক জানা হলো। এমনই একটি সহযোগিতা ছিল ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য উচ্চ পদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেবার জন্য মৌখিক পরীক্ষা ইত্যাদিতে থাকা। এনজিও জগত সম্বন্ধে দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে এসব আমাকে সাহায্য করেছিলো। আরো ভাল যা হয়েছিলো যে জাঁ-মারী ও তাঁর সহকর্মীরা ক্রমেই সিএমইএসের সক্ষমতা ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আস্থাশীল হয়ে পড়েছিলেন। জাঁ-মারী প্যারিসে অবস্থিত টেরে ডেস হোম্‌স-ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় দফতরে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। ওখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি ওদেরকেও রাজি করালেন আমাদের প্রথম পরীক্ষামূলক নতুন ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে অর্থ সহায়তা দিতে। সিএমইএসের সামনে এভাবে সত্যিকারের কাজে নামার দরজা খুলে গেল। প্রকল্প প্রস্তাব ইত্যাদি কীভাবে লিখতে হয়, কেমন করে আমাদের যুক্তিগুলোকে বাস্তব সম্মত বলে প্রমাণ করা যায়, তার একটি ভাল প্রশিক্ষণও হয়ে গেল আমার এই প্রথম দফাতেই। পরে এ কাজ অনেকবার অনেক পরিস্থিতিতে করতে হয়েছে।

মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা

সুরুজের অভিনব স্কুল

সিএমইএসের ইতিহাসে সেটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। দীর্ঘ এতগুলো বছর ধরে আমরা শুধু আমাদের আপন স্কুলের স্বপ্ন দেখেছি; এবার সেটি বাস্তব হতে চলেছে। ঠিক করেছিলাম পরীক্ষামূলক এই কাজ করতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের একটি জায়গা বেছে নেবো, যেখানে আমাদের প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনতে পারবে, স্থানীয় মানুষরাও একে গুরুত্ব দেবে। এই গুরুত্ব দেবার ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে ঠিক করেছিলাম আমরা এর জমি বাবদ কোন টাকা ব্যয় করবোনা—স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকেই জমি দান চাইবো। টাঙ্গাইলে গ্রামীণ ব্যাংকে ইউনূস ভাইয়ের সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে টাঙ্গাইল শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কিন্তু বেশ অগম্য স্থানে এমনই মানুষ পেয়ে গেলাম। গ্রামটির নাম সুরুজ বাজার, এটি সদর থানায় ঘারিন্দা ইউনিয়নে পড়েছে। সেখানে ইউনিয়ন কাউন্সিলের একজন সদস্য পনি মিয়া তাঁর ২৫ ডেসিমাল জমি একেবারে লিখে পড়ে দলিল করে সিএমইএসকে দান করলেন। তাঁর একমাত্র স্বার্থ এলাকার গরীব মানুষ এতে উপকৃত হবে। ওখানেই গড়ে উঠলো সিএমইএসের প্রথম নিজস্ব বিদ্যালয়, নিজের ভাবনা-চিন্তায় গড়া—'গ্রামীণ প্রযুক্তি ও মৌলিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, সুরুজ'।

সে সময় আমি সিএমইএসের হয়ে একটি পুস্তিকা লিখে ছাপিয়েছিলাম যার শিরোনাম ছিল 'বিদ্যালয় যখন বাড়ি আসে'। এর থেকেই আমাদের বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা যেতো। একে প্রযুক্তি কেন্দ্র বলার কারণ হলো এ বিদ্যালয় গ্রামের মানুষের উপকারার্থে প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে। এখানকার ছেলেমেয়েরা সাধারণ স্কুলে যাওয়া ছাত্রদের মত নয়; এরা দরিদ্র—হয় স্কুলে যেতে পারেনি, অথবা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। তারা তাই একই সঙ্গে লেখাপড়া করবে, প্রযুক্তি শিখে দক্ষ হয়ে জীবন ধারণের ব্যবস্থাও করবে। এই স্কুল শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যই নয়, এটি তাদের ও পরিবারের নানা

সমস্যা সমাধানে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্ষমতায়িত করারই স্কুল। দিনের অর্ধেকটা সময় তাদের সাধারণ লেখাপড়ার সময়, অন্য অর্ধেকটি প্রযুক্তি চর্চা করা ও তার মাধ্যমে আয় করার সময়। স্কুলটিকে তাই বিদ্যালয়, কুটির শিল্প কেন্দ্র, খামার, দোকান ইত্যাদি নানা ভাবে দেখা যায়। শিক্ষকদেরকেও তাই সেভাবেই নির্বাচন করলাম, প্রশিক্ষিত করলাম—এই সব দিক লক্ষ্য রেখেই। সেভাবেই স্কুলের 'বাড়ি আসা'। প্রথম প্রথম এই অদ্ভুত স্কুল দেখে অনেকে অবাক হয়ে গেলো, পরে কিন্তু সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেয়েদের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হলো, এর সব কাজ যেন মেয়ে-বান্ধব হয়, অর্ধেকেরও বেশি ছাত্র যেন মেয়ে হয়। এখানে মেয়েদের নেতৃত্ব দেখেও সবাই অবাক হলো। সব দিক থেকে স্কুলটি এমন অভিনব হলো এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো এত বড়ো হলো যে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে স্কুলের কাজে জড়িয়ে পড়তে হলো। সেই থেকে ওখানে যাওয়া আমার জন্য নিয়মিত ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো। বাসে টাঙ্গাইল গিয়ে তারপর রিক্সা নিতাম। কিন্তু পথ খুব খারাপ হওয়াতে এবং অনেক জায়গায় পথ বলে কিছু না থাকাতে, রিক্সায় থাকার চেয়ে নেমে হাঁটাটাই সহজতর হতো। তা ছাড়া ওসময় ওই অঞ্চলের আইনশৃঙখলা পরিস্থিতিও তেমন ভাল ছিল না। তাই সবাই পরামর্শ দিতো সন্ধ্যা হবার আগেই যেন সুরুজ ত্যাগ করে টাঙ্গাইল চলে আসি। পরে অবশ্য এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিলো।

তখনো সিএমইএসের মূল অফিস বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বাসাটাই। কিন্তু এর প্রায় সব কর্মীই কাজ করছে মাঠ পর্যায়ে টাঙ্গাইলের সুরুজে—এ ভাবেই চালাতে হচ্ছিল সব কাজ। অফিস মানে শুধু লিংকন, আর আমার সেই পোর্টেবল টাইপ রাইটার। একটি ফোনও নেই, ফোন করতে হলে গুলিস্তানে টি এণ্ড টি অফিসে যেতাম। চিঠিপত্রই তখন ছিল ভরসা। সুরুজে আমাদের যে স্কুলের কথা বলছি তাও একটি বেড়ার-টিনের ঘর; দেখতে একেবারেই সাধারণ—ওই ছাত্রদের বাড়ির মতই। কিন্তু যে ভাবে তাতে বহুমাত্রিক কাজের ব্যবস্থা হয়েছিলো সবাই তাই দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল। এরকম দর্শকদের মধ্যে ছিল ফ্রান্স থেকে আসা টেরে ডেস হোম্‌সের নানা প্রতিনিধিরাও। যখন তারা আসতো তাদেরকেও ওই ভাবে বাসে করে ও রিক্সা করে নিয়ে যেতাম। সে সব ওরা পরোয়া করতো না, বরং খুশিই হতো। শুধু সমস্যা হতো রাস্তাঘাটের দুরবস্থা এবং সড়ক দুর্ঘটনার আধিক্যের কারণে। টাঙ্গাইল পর্যন্ত যেতে গড়পড়তা দু'-তিনটি বড় সড় দুর্ঘটনার শিকার গাড়িগুলো রাস্তায় দেখতে হতো; তার মধ্যে আবার যেই বাসে যাচ্ছি তারই মত অন্য নানা বাসকে দুর্ঘটনায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখতাম।

ঢাকায় জাঁ-মারী এবং টেরে ডেস হোম্‌সের অফিসের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া এমন ছিল যে সুরুজে গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্রে যথেষ্ট সৃজনশীলতা দেখানো ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ আমাদের ছিল। নিজেদের পরিবারে ছাত্র

ছাত্রীদের নানা দায়িত্ব ছিল, আয় করার জন্য চাপও থাকতো তাদের উপর বেশ খানিকটা। তাই কত সময় স্কুলে থাকবে, সেই সময়টি কী হবে, পড়াশুনার ধরন কী রকম হবে, প্রযুক্তি শিক্ষা কিছুটা পাওয়ার পর তা বাজারে ব্যবহার করে আয়ের চেষ্টা করবে কিনা—ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। ওই ভাবেই ধীরে ধীরে বহু বছর ধরে আমরা সর্বোত্তম ব্যবস্থাটিকে খুঁজে পেয়েছিলাম—যা অবশেষে গ্রহণযোগ্য 'মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায়' পরিণত হয়েছিলো। তবুও সেই প্রথম দিনগুলোতে সুরুজের এই প্রথম উদ্যোগের উৎসাহ ও উত্তেজনার কোন তুলনা হয়না—মনে হয়েছে বহু কাল ধরে স্বপ্ন দেখার পর হাতের মুঠোয় চাঁদ পেয়েছি।

সুরুজের ঐ প্রথম দিনগুলোতে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে ওখানে চলে যেতাম। শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই ক্লাস নেবার চেষ্টা করতাম যতটা পারি, এজন্য আগে থেকে প্রস্তুতিও নিয়ে আসতাম। দেখতাম ছাত্ররা আমার প্রচেষ্টাকে কীভাবে গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে এই নতুন ব্যবস্থার জন্য কেমন ধারার শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাগবে, কীরকম শিক্ষা-উপকরণ লাগবে তাও বোঝার চেষ্টা করতাম। আমাদের স্কুল শুধু নিজের অঙ্গনের মধ্যেই কাজ করতোনা—তার ক্লাসরুমগুলো ছিল তার 'অন্তরঙ্গন' মাত্র। এর বাইরে ছাত্রদের ও প্রতিবেশীদের বাড়িঘর, খেতখামার, হাটবাজার সব সহ ছিল স্কুলের 'বহিরঙ্গন'—সেখানেও স্কুলের কিছু কাজ থাকতো। মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার 'বাড়ি বাড়ি কাজের' ধারণাটি তখন থেকেই গড়ে ওঠে। আর গড়ে ওঠে কেমন করে তারা তাদের শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে পারবে সেই ধারণাটিও। এজন্য ছাত্রদের বাবা মা, পরিবার, কাছের ব্যবসায়ী, সবার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিলাম। সিএমইএসের তখন এসব নিয়ে আমাকে সাহায্য করার বেশি কেউ ছিলনা। ওই সময় দেশের অন্যান্য অংশের মত টাঙ্গাইলেও বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর ধানের আবাদ খুব হচ্ছিলো। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আগে সরকারী বড় বড় গভীর নলকূপের উপর যেমন নির্ভর করা হতো সে নির্ভরশীলতা বেশ কমে এসেছিলো। এর পরিবর্তে জাপানি ও চীনা ছোট ছোট শ্যালো নলকূপের পাম্প বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো—কারণ এর দাম অনেক কৃষকেরই হাতের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিলো। সমস্যাটি হতো গ্রামে এই পাম্পগুলো মেরামতের কারিগর পাওয়া যেতোনা। শহর থেকে কারিগর না আসা পর্যন্ত সেচ বন্ধ থাকতো, ফসলের ক্ষতি হতো। আর কারিগরের পেছনে খরচও হতো অনেক। আমরা এমন একজন শিক্ষককে সুরুজের স্কুলে প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য পেলাম যিনি ওই পাম্প সারাতে পারেন। ভাবলাম বহিরঙ্গনে কিছু ছাত্র এই কাজ করলে তো হয়—তারা কৃষকদের পাম্প মেরামত করবে ঐ খেতে গিয়েই, বিনিময়ে কিছু উপার্জন করবে। তাদেরকে কীভাবে দ্রুত মেরামতের প্রযুক্তি শেখানো যায় এবং অভিজ্ঞ করে তোলা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চল্‌লো। এরকম দু-এক মৌসুমের পর আমরা এমন অবস্থায়

চলে এসেছিলাম যে সুরুজ গ্রামের আশেপাশের অনেকগুলো শ্যালো পাম্পের পুরো মৌসুমের মেরামতের কাজ সুরুজ স্কুল নিয়ে নিয়েছিলো। এর বিনিময়ে স্কুলকে কৃষকরা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিতো যা বিক্রি করে ছাত্ররা উপার্জন করতো। এই ব্যবস্থা অনেক দিন চলেছিলো। ছাত্র থাকা কালেই এলাকার প্রযুক্তি উন্নয়নে ও নিজের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করার এটি ছিল একটি সুন্দর উদাহরণ।

মনে পড়ে সুরুজ স্কুলটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর প্রথম যখন এ ভাবে প্রায়ই আসা যাওয়া করছি তখন দেখলাম সুরুজ বাজারের দোকানগুলোর সামনে ছোট বড় কাগজের ও কাপড়ের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকছিলো। আমাদের স্কুল নিয়ে এত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যেও অনেক মানুষের মতই মনটি ছিল খুব বিষণ্ন—কারণ সে সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হয়ে চল্লিশ দিনের শোক চলছিলো। তাঁর রাজনীতির সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে একমত হতে না পারলেও ব্যক্তিগত ভাবে জিয়াউর রহমান আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর সরল সততা ও যৌবন-দীপ্ত বলিষ্ঠ কিছু কাজের জন্য এবং বিশেষ করে তরুণদেরকে তিনি যেভাবে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তার জন্য। তাঁর খাল কাটা, সাক্ষরতা অভিযান, গ্রাম সরকার এসবকে কেউ কেউ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক চালাকির উদ্যোগ মনে করলেও আমি কিন্তু এগুলোকে তরুণ সমাজ ও গ্রামের মানুষের উপর তাঁর প্রবল আস্থা হিসেবে দেখেছি। তাঁকে লন্ডনে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি মারা যাওয়ার কয়েকদিন মাত্র আগে এক রাতে বঙ্গোপসাগরে 'হিযবুল বহর' জাহাজের পাটাতনে অনেক তরুণের মাঝখানে শেষবার যখন দেখেছি তখনও তিনি আমার মনে একই একনিষ্ঠ উৎসাহের সুরটি বাজাতে পেরেছেন। আমরা জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ ইত্যাদিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতাম বলে বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. আর এ গণি আমাকে ও ড. আলী আসগরকে হিযবুল বহরের ঐ তরুণ মেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই সুবাদে সাগরে রাতের আকাশের নিচে জিয়াকে বলতে শুনেছিলাম আর এক বাংলাদেশের কথা—যার সাগর সম্পদ আর মানব সম্পদ হবে আমাদের গর্ব। আমার নিজের চিন্তাকে এর সঙ্গে অনুরণিত করতে পেরেছিলাম। এর মাত্র কয়েকদিন পরেই বেদনাহত বিস্ময়ে দেখেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে এই অনুরণন অনেকের মধ্যেই ছিলো। জিয়াউর রহমানের মৃতদেহ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এনে পুরানো বিমান বন্দরের কাছে তখনকার জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে রাখা হয়েছে এই খবর শুনে রাতে সেদিকে হেঁটে রওয়ানা হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড থেকে। এই যথেষ্ট দীর্ঘ পথ আগাগোড়া হাঁটতে হয়েছে মানুষে ঠাসা রাস্তায় দারুণ ভীড় ঠেলে ঠেলে। প্রথম দিকে ব্যাপারটি লক্ষ্য করিনি—কিন্তু যখন লক্ষ্য করলাম দেখলাম এই ভীড় তো তরুণ-তরুণীদের ভীড়—মনে হলো অধিকাংশ মানুষের বয়স তিরিশের কম। অনেক চেনা মুখ নজরে পড়লো তাদের মধ্যে। ওরা নীরবে শুধু হাঁটছে হাঁটছে—মনে হলো এক রকম ঘোরের মধ্য দিয়ে।

সুরুজে নঈমুদ্দিন অঙ্গনে (জমিদাতা পনি মিয়ার প্রয়াত বাবার নামে ঠিকানাটি ওভাবে নির্ধারিত হয়েছিলো) 'গ্রামীণ প্রযুক্তি ও মৌলিক বিদ্যালয় কেন্দ্র গড়ে তুললাম। এর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো এখানেই চলবে, আমাদের পরিকল্পিত সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা এখানেই থাকবে। তবে জানতাম শুধু এতে চলবেনা কারণ যাদের জন্য এটি গড়া তাদের অনেকের কাছ থেকে এও বেজায় দূর, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। তাই একে কেন্দ্র করে আশেপাশের গ্রামগুলোতে কিছুদিন পর গড়ে তুলেছিলাম অনেকগুলো 'মৌলিক বিদ্যালয়'—প্রায় প্রতি পাড়াতেই একটি করে, ওই ছেলেমেয়েদের বাড়ির একেবারে কাছের স্কুল। যাদের প্রয়োজন তাদের অধিকাংশই পাড়ার মৌলিক বিদ্যালয়ে শুরু করতে পারে আমাদের সিষ্টেমে লেখাপড়া, তারপর যেতে পারে সুরুজে ঐ প্রযুক্তি কেন্দ্রে। এবার সত্যি সত্যি স্কুল তাদের বাড়িতে এলো।

পাড়ায় পাড়ায় মৌলিক বিদ্যালয়

আমরা পাড়ার বাসিন্দাদের দেউড়ি ঘরেই এক এক করে মোট বিশটি মৌলিক বিদ্যালয় শুরু করি—ঘারিন্দা ইউনিয়নের নানা গ্রামে ও পাড়ায়। এখানে প্রাধান্য দিলাম দ্রুত ও কার্যকর ভাবে সাক্ষরতা অর্জনের উপর, আর সেই সঙ্গে খুব সহজ সরল এবং অপেক্ষাকৃত ছোটদের জন্য নিরাপদ প্রযুক্তি যা নিজেদের কাজে লাগে, বিক্রিও হয়। কাজগুলো এমন যে এতে হাতেকলমে যথেষ্ট বিজ্ঞানও শেখা হয়। প্রথম দিকে এর মধ্যে ছিল মোমবাতি তৈরি, কাপড় ধোঁয়ার সাবান তৈরি, এবং লেখার চক তৈরি। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীরা এগুলো এমন সুন্দর বানাতে পারতো যে সবই আমাদের দেয়া বিশেষ নামে বাজারে বিক্রি হতো—'দীর্ঘস্থায়ী শোভন মোমবাতি', 'শোভা সাবান' এবং 'অংকুর চক'। এই পর্যায়ের শুরুর শ্রেণীটিকে আমরা বললাম 'অংকুর', এবং পরবর্তী শ্রেণীটিকে বললাম 'বিকাশ'। এ দুটি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তুল্য। পরের শ্রেণীগুলো অগ্রসর-১, অগ্রসর-২ ও অগ্রসর-৩ ছিলো প্রযুক্তি কেন্দ্রে। সেখানে লেখাপড়ার পর্যায়গুলো হলো দ্রুত লয়ে প্রতি ছয় মাসে এক এক করে সাধারণ বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয়। আর প্রযুক্তির বিষয়গুলোও এখানে আরো অগ্রসর—সবগুলো শ্রেণী শেষ হতে হতে রীতিমত একজন পোষাক শিল্পী, কিংবা কাঠের অথবা লোহার কারিগর, বিদ্যুৎ কর্মী অথবা কুশলী নার্সারিবিদ। পরে এমন সব প্রযুক্তিও এগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছিলো যেগুলোর কোন কোনটিকে দেশে আনার ও জনপ্রিয় করার পেছনেও সিএমইএস অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সে কথায় পরে আসা যাবে।

মৌলিক বিদ্যালয়ে অংকুর ও বিকাশ শ্রেণীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আগে থেকেই দ্রুত কাজে লাগার মত সাক্ষরতা গড়ে তুলতে যে চেষ্টা তার সঙ্গে আমি খুব একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। এর অন্যতম কারণ কয়েক বছর আগে আমার

জীবনে আর একটি বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো তা হলো আমাদের প্রথম সন্তান কুশলের জন্ম। তার জন্মের পর প্রথম দিন থেকেই আমি নিজকে শিশু পালনে যথেষ্ট ব্যস্ত করে ফেলেছিলাম—সেটি সদ্যজাত শিশুর নানা যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে শিশু মনস্তত্ত্বেরও কার্যত একজন ছাত্র হয়ে ওঠা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো। প্রথম মুখে হাসি দেখা দেয়া থেকে শুরু করে, বিভিন্ন জিনিসে তার অনুসন্ধিৎসা, ছন্দ ও সুরে সাড়া দেয়া, উচ্চারণের আগে থেকে এক রকম ইশারায় আলাপী হয়ে ওঠা ও পারস্পরিক খেলায় যোগ দেয়া—এসব আমাকে অভিভূত করে রেখেছিলো। বছর তিনেক বয়স হওয়া পর্যন্ত তার যে সব শিক্ষা ঘটছিলো প্রকৃতির ও পরিবেশের পাঠশালায়, তাতে আমিও যোগ দিচ্ছিলাম। তারপরেই শুরু হলো শিক্ষার আরো একটি মাত্রা—আঁকি-বুকি, গান গাওয়া, ছড়া কাটা, আর লেখাপড়া। কুশলকে খুব ছোট বেলা থেকে পড়তে ও লিখতে অভ্যস্ত করার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। বলতে গেলে শিশু শিক্ষার ওপর সব রকমের বই পড়ে আমার ধারণা হয়েছিলো এটি খুবই সম্ভব। কুশলের লালন পালনে আমি সে সময়ের পৃথিবী বিখ্যাত বেঞ্জামিন স্পকের বই থেকে শুরু করে নানা বই ও তত্ত্বের সহায়তা নিয়েছি ও তার কিছু কিছু প্রয়োগ করেছি। তার সঙ্গে নেচে, গান গেয়ে, ছড়া কেটে, আধো-খেলা আধো-শেখা এরকম অনেক রকম অভিনব কাজ করে, আমার প্রচুর সময় কেটেছে। এই সবকিছু আবার প্রায় সমান ভাবে করেছি কখনো বাংলায় কখনো ইংরেজিতে। বার্ট্রান্ড রাসেলের 'এডুকেশন' এবং এরকম আরো কয়েকটি বই পড়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে খুব ছোট বেলা থেকে শিশুকে দুই ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন মানুষের সঙ্গে দুটি (এমনকি তারো চেয়ে বেশি) ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত করালে খুব সহজে প্রাকৃতিক ভাবেই সে উভয় ভাষা শিখে ফেলবে। তা ছাড়া সরাসরি সিলেবল, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি লিখে বার বার দেখালে সে সেগুলো পড়তে পারবে, পরে ওরকম অন্য লেখাও পড়তে পারবে, এবং ক্রমে লিখতেও পারবে। কুশলের শৈশবে আমাদের বাসার নানা জায়গা থেকে সুতা দিয়ে কার্ডে লেখা অনেক শব্দ ঝোলানো থাকতো, যেগুলো মাঝে মাঝে বদলে দিতাম। কুশল এগুলো মজা করে পড়তো। এভাবে শব্দ থেকে সিলেবল ও তার থেকে বর্ণ পরিচয় হবার এই আধুনিক পদ্ধতিটি দেখলাম শিশুর সহজাত প্রকৃতির সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী কুশলের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় ও ইংরেজিতে কথা বলতাম। যেমন সে গল্প শুনতে খুব পছন্দ করতো বলে ওর সঙ্গে আমার চুক্তিই ছিলো যে একটি গল্প বাংলায় বললে পরেরটি ইংরেজিতে বলতাম। বেশির ভাগ গল্প আমি উভয় সাহিত্য থেকে নিয়ে নিজের মত করে বলতাম; কখনো ইতিহাস থেকেও নিতাম—যেমন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী। এর সবই আমি প্রায়শ বেশ মজার অভিনয় করে দেখিয়ে বলতাম, তাকেও অভিনয় করতে দিতাম। অনেক সময় কিছু কিছু অভিনয়ের অংশ আমাদের রুটিন কাজে পরিণত হতো। যেমন সকালে কাজে বের হতে দেরি হয়ে গেলে আমি তাকে এলিস ইন

ওয়ান্ডার ল্যান্ডের অনুকরণে অভিনয় করে তৈরি হতে হতে দৌড়তে দৌড়তে বলতাম 'মিষ্টার র‍্যাবিট মিষ্টার র‍্যাবিট, আই অ্যাম লেইট, আই অ্যাম লেইট...'। সেও দৌড়তে দৌড়তে তার অংশগুলো তখন বলতো। এভাবে কুশল খুব সহজে বলতে গেলে পরিশ্রম ছাড়াই বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষা বলতে, পড়তে ও কিছুটা লিখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। এসব ক্ষেত্রে আমার পঠিত তত্ত্বগুলো সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। পরে কুশলের জন্মের প্রায় সাত বছর পর তার ছোট ভাই উজলের জন্ম হয়। উজলের ক্ষেত্রেও আমি একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। তবে দু'জনের ব্যক্তিত্বের ও প্রবণতার মধ্যে যথেষ্ট তফাত ছিলো বলে আমাকে সে অনুযায়ী পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছিলো। যেমন কুশলের আনন্দ ও ক্ষমতা বেশি ছিলো কল্পনায়, নানা দৃশ্যকল্পে নিজেকে নিয়ে যেতে। একটি পেন্সিলকে বিমান কল্পনা করে সে ঘন্টার পর ঘন্টা মুখে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে এটি ওড়াতে পারতো, তেমনি যে কোন ভূমিকায় রোল-প্লে করতে পারতো। উজলের বেশি প্রতিভা ছিলো আঁকায়, সব কিছুকে সুন্দর চিত্ররূপ দিতে, চিত্ররূপ থেকে এবং নক্সা থেকে সব কিছু শিখতে। শুধু কাগজের উপর দ্বিমাত্রিক চিত্রে বা লেখায় নয়, ত্রিমাত্রিক সব মডেল তৈরিতেও সে শিশু বয়স থেকে পারদর্শী। খুব ছোট বেলাতেও সে আমাদের বাসার সামনে থেকে এই প্রাচীন বাসাটির চমৎকার রঙিন ছবি আঁকতে পারতো বা স্থপতির মডেলের মত কার্ডবোর্ডের ভবন ইত্যাদি বানাতে পারতো। তাকে সে ভাবেই পড়া ও লেখার মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। তাই কুশল যেমন খুব ছোট বেলায় বোম্বাইয়ের চান্দ পাবলিশার্সের সুদর্শন ইংরেজি ক্লাসিক বইগুলো শিশু সংস্করণে এবং সেবা প্রকাশনীর নিউজপ্রিন্টে ছাপা বাংলায় দেশ-বিদেশের ক্লাসিক বইগুলোর শিশু সংস্করণ খুব মজা করে পড়ছিলো, উজল তার সময়ে তা করেছিলো ইংরেজি যাবতীয় ক্লাসিকের কমিক সংস্করণে এবং স্পাইডার ম্যান, টিন টিন ইত্যাদি আধুনিক কমিক বইয়ে; ছবির ভাষার সঙ্গে না মিশলে পড়ার পুরো আনন্দ তার আসতোনা।

উজল হলো বাঁহাতি। একেবারে কোলের শিশু অবস্থায় এটি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে তাকে তার প্রবণতা অনুযায়ী জিনিসপত্র দেয়া নেয়া, সালাম দেয়া, হাত মেলানো থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা বাম হাতেই করতে দিয়েছি—অন্য রকম করাবার কোন চেষ্টা না করে। এজন্য গুরুজনদের অনেক সমালোচনা শুনতে হতো বটে, কিন্তু বাঁহাতি হবার মানে আমার জানা ছিল বলে সমালোচনায় কোন কান দিইনি। যখন প্রথম লেখা শেখাচ্ছিলাম দেখলাম উজল অনায়াসে আয়না-লেখাও লিখতে পারে অর্থাৎ আয়নায় দেখলে একটি অক্ষর বা শব্দকে যে রকম দেখায় সে খুব স্বচ্ছন্দে ওই ভাবে লিখতে পারে, আবার স্বাভাবিক ভাবেও লিখতে পারে। মনে হলো বাংলা বা ইংরেজি লিখন পদ্ধতি ডানহাতির জন্য তৈরি হওয়াতেই বাঁহাতি উজলের জন্য আয়না-লেখাটিই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। উজলের প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করে এবং এ সম্পর্কে পড়াশুনা করে আমি ওই সময় বিজ্ঞান সাময়িকীতে 'বাঁহাতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

সাক্ষরতার কাজে আমার বড় ল্যাবোরেটরি অবশ্য ছিল সুরুজের মৌলিক বিদ্যালয়গুলো। গ্রামের যে সব ছেলেমেয়েরা ঠিক মত লিখতে পড়তে না শিখেই কিছুটা বড় হয়ে গেলো, স্কুলের দিকে পা মাড়াবার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেললো, তাদের নিয়ে কী করবো? ওদের সবার জন্য এমন কী কৌশল অবলম্বন করা যায় যাতে তারা উৎসাহ খুঁজে পায়, দ্রুত সাক্ষর হয়ে ওঠে, এবং নিজেদের জীবন বদলাতে তা ব্যবহার করতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই আগে শব্দ ও সিলেবল পড়া আর তার মাধ্যমে বর্ণ পরিচয় করা—এই নীতিই অনুসরণ করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের (আই ই আর) শিক্ষক ছিলেন ড.হাফিজুদ্দীন শেখ। তিনি ১,২,৩,৪ এই সংখ্যাগুলো লিখতে শেখার ভিত্তিতে বাংলা অক্ষর লেখা শেখানোর একটি পদ্ধতি নিয়ে বই লিখেছিলেন। পদ্ধতিটি বেশ যুৎসই মনে হওয়াতে এটি নিয়েও বেশ খানিকটা পরীক্ষা করেছিলাম। এরকম দেশী বিদেশী সকল পরামর্শগুলো বিবেচনা করে নানা চেষ্টাই করছিলাম কত সহজে, কত স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শুরু করতে পারে, সেই সঙ্গে প্রযুক্তিও শিখতে পারে।

মৌলিক বিদ্যালয়ে আনন্দের কোন কমতি ছিলোনা। স্কুল শুরু করার অ্যাসেম্বলিটি সব স্কুলের মতই সমবেত গান ও শরীর চর্চা দিয়ে শুরু হতো। জাতীয় সঙ্গীত ভাল ভাবে গাইতে পারার জন্য ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এর সঙ্গে গাইবার জন্য একটি মৌলিক বিদ্যালয় সংগীতও রচনা করলাম—যাতে সুর আরোপ করে সবাইকে শেখানো হলো। এই গান পরে হাজার হাজার ছেলে মেয়ের মুখে নিত্য শোনেছি—

আমাদের মৌলিক বিদ্যালয়
আমাদের কাজের বিদ্যালয়
আমাদের খুশির বিদ্যালয়
বি-দ্যা-ল-য়
সে যে আমাদের জীবন
সে যে আমাদের আপন
সে যে আমাদের স্বপন
বি - দ্যা - ল - য়।

মৌলিক বিদ্যালয়ের মানুষরা

সুরুজে কয়েক বছরে মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাটি সফলভাবে চালু হয়ে যাবার পরে আমরা এই সিষ্টেমকে আরো অন্য কিছু জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। গাজীপুরে বর্মি বাজারের কাছে কায়েতপাড়ায়, চট্টগ্রামে চন্দনাইশে সাতবাড়িয়ায়, রংপুরে পীরগাছার দেউতিতে, এবং দিনাজপুরে চিরির বন্দরের রাণীর বন্দরে প্রযুক্তি কেন্দ্র করে আরো চারটি ইউনিটে শুরু হলো সিএমইএসের মৌলিক

বিদ্যালয় ব্যবস্থা। এই সব কটি জায়গায় স্থানীয় দাতার জমি পেলাম—সুরুজে যতখানি জমি পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি জমি নিঃশর্তভাবে দান করলেন তাঁরা। সাতবাড়িয়ার বিষয়টি আমার জন্য একটু বেশি আনন্দের হলো। ছোট বেলায় যখন বক্সীর হাটে থাকতাম সেখানে আমাদের দোকানের তরুণ কর্মচারী ছিলেন ফয়েজুর রহমান। সেই ফয়েজ যাঁকে কথায় কথায় 'বাঁ বোঁ করবেনা' বলার মুদ্রাদোষের জন্য আমার পঞ্চম শ্রেণীতে লেখা আমার বিশেষ রচনা '২০ বক্সীর হাট রোডে' উল্লেখ করেছিলাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ফয়েজুর রহমান এর মধ্যে নিজে ব্যবসা করে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন, সম্প্রতি সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এখন তিনিই দান করেছেন এই ইউনিটের জমি। স্কুলঘর ইত্যাদি তৈরি শেষ হলে প্রথম ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে ঘটা করে এর উদ্বোধন করলাম ফয়েজকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর তরুণ বয়সের ছোট্ট বালকটিকে এখন তাঁরই এলাকায় তাঁরই জমিতে বড় একটি কাজে সাহায্য করতে পেরে তাঁর আনন্দ যেন ধরে না। অনুষ্ঠানের পর তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মনে পড়ে গেলো এই সাতবাড়িয়ায় তাঁদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম যখন তখন আমি স্কুলেও ভর্তি হইনি—চৌধুরী খালুর বিয়েতে এসেছিলাম এখানে। এই চারটি ভিন্ন জায়গায় চারটি নতুন ইউনিটে আমরা বিস্তৃত হতে পারলাম ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থ সহায়তার ফলে। এর মাধ্যমে সিএমইএস পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর থেকে উন্নীত হয়ে একই সঙ্গে নানা জায়গায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুল ব্যবস্থা চালাবার পর্যায়ে চলে গেল। প্রত্যেক ইউনিটে ২০টি করে মৌলিক বিদ্যালয় হওয়াতে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেলো; সেই সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেলো অনেক খানি।

এতদিন বাস্তব কাজগুলোর প্রায় সবটাই হতো সুরুজ গ্রামীণ প্রযুক্তি ও মৌলিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। আমার বাসায় সিএমইএসের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে শুধু চিঠিপত্র আদান প্রদান হতো, পরিষদের সভা বসতো, সহযোগীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হতো। এখন ঢাকায় আমাদের একটি সত্যিকার কার্যালয়ের ও ইউনিটগুলোকে দেখাশুনা করার জন্য জনবলের প্রয়োজন হলো। মোহাম্মদপুরে আসাদ এভেন্যুতে তাই একটি অফিস নেয়া হলো। দীর্ঘদিন এটিই সিএমইএসের ঠিকানা ও এর বহু রকমের কাজের কেন্দ্র ছিল। লিংকন ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে। সে পূর্ণ কালীন ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিলো। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার নিয়ে এই অফিসে আরো কয়েকজন সংগঠককে নিয়োগ দেয়া হলো—ওয়াহাব, কুন্তল কান্তি, মনসুর এবং আরো দু'একজন। আমি বিকেলের দিকে বাসে বা রিক্সায় ওখানে চলে যেতাম। প্রথমে অফিসে জায়গা কম ছিলো—আমরা গোল হয়ে একটি ঘরে বসে কাজ করতাম। একটি ফোনের ব্যবস্থা হয়েছিলো—কিন্তু দেশের নানা স্থানে যে পাঁচটি ইউনিটে আমাদের কাজ তাদের সঙ্গে ফোন যোগাযোগ রাখা গেলোনা। কারণ

ওরকম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ফোন থাকে না। কোন জরুরি যোগাযোগ থাকলে কয়েক মাইল দূরে গ্রামীণ ব্যাংক অথবা ওরকম বন্ধু স্থানীয় কোন অফিসের ফোন ব্যবহার করে বার্তা দিতে হতো। এরকম বহুদিন চলেছিলো। মোহাম্মদপুর অফিসের লোকেরা কিন্তু অধিকাংশ সময়েই কোন না কোন ইউনিটে গিয়ে কাজ করতো। তাদের আসা যাওয়ার মাধ্যমে ইউনিটগুলোর সঙ্গে আমাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকতো। বাসে করে ট্রেনে করে আমিও প্রায়ই যেতাম নানা ইউনিটে, সপ্তাহান্তের ছুটিতে এবং অন্য প্রায় সব ছুটি ছাটাতে। দীর্ঘ ছুটিতে অনেক দিন থেকে কাজ করতে পারতাম ওখানে। আমরা এসব ইউনিটের যখন যেটি শুরু করেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও জায়গার আশপাশে কোথাও বিদ্যুৎ ছিলনা। আমরা যাওয়ার পর আমাদের চেষ্টায় বিদ্যুৎ এসেছে—গ্রামীণ কারিগরি বিদ্যালয় বলে কথা। মজার ব্যাপার হলো আমরা আমাদের স্কুলগুলোকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে নামেই ডাকি না কেন, স্থানীয় মানুষের কাছে এদের পরিচয় ছিল কারিগরি স্কুল হিসেবে। বাস থেকে নেমে রিক্সাওয়ালাকে কারিগরি স্কুল বললে তারা সোজা ওখানেই নিয়ে যেতো। প্রথম সুরুজে বিদ্যুৎ নেবার কথা মনে পড়ে। এজন্য আমার স্কুলের সহপাঠী মঞ্জুর (দেশের নাম করা অর্থোপেডিক সার্জন ডা. মঞ্জুরুল ইসলাম) ভাই তৌহিদকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেও আমাদের স্কুলেই দু'এক ক্লাস নিচে পড়তো। তৌহিদ তখন পল্লী বিদ্যুতের প্রকৌশলী। তার জিপে করে ঢাকা থেকে সুরুজে গিয়ে ওখানেই ম্যাপ ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যুৎ আনার কৌশল ঠিক হয়েছিল। এই সুবাদে সুরুজের মানুষরাও বিদ্যুৎ পেয়ে গিয়েছিলো।

এ ভাবেই একযোগে কাজ করতে পেরেছি বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মীদের সঙ্গে—ইউনিট প্রধান, সিনিয়র শিক্ষক, কারিগরি শিক্ষক, মৌলিক বিদ্যালয় শিক্ষক, সাধারণ কর্মী—সবার সঙ্গে। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে কাজ করার ফলে অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে পড়েছিলো ওরা অনেকে—বিশেষ করে প্রথম দিকে সংগ্রামের দিনগুলোতে। রংপুরের ছেলে আবদুস শহীদকে ইউনিট প্রধান করেই শুরু হয়েছিলো আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা টাঙ্গাইলের সুরুজ ইউনিট। শহীদ তখন একজন সদ্য পাশ করা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। আমরা ঠিক করেছিলাম যে সিএমইএসের ইউনিটে মূল শিক্ষক-পরিচালকরা হবে ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ার—যারা একাধারে পড়াশোনায় ভাল আবার বিভিন্ন প্রযুক্তিতে দক্ষ। তাদের সঙ্গে সহকারী কারিগরি শিক্ষক হিসেবে থাকবে দক্ষ কারিগররা। পাড়ায় পাড়ায় মৌলিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিল স্থানীয় মহিলারা যারা স্কুল পাশ করে আর কিছু করছিলো না। শহীদ সুরুজে শুধু চাকরিই করেনি, ওখানকার মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। পরে ঐ গ্রামেই সে বিয়ে করেছিলো, ওখানেই অনেকটা কাল কাটিয়েছে। সুরুজে সে সময় থেকে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করে আসছিলো রহিমা খাতুন। রহিমা সুরুজ বিদ্যালয়কে তার একান্ত আপন মনে করতো—যাবতীয় আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে সব সময় নিজেকে এগিয়ে

দিতো। আজও সে সুরুজ ইউনিটে কাজ করে। মাঝখানে একই সঙ্গে মোবাইল ফোন কল করার একটি দোকান দিয়েছিলো বাজারে—মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন চলে যাবার পর ওটি আর ভাল চলেনি। এখনো ঈদের দিন অথবা অন্য কোন উপলক্ষে ভোরে অদ্ভুত সময়ে ফোন আসলে বুঝি যে ওটি রহিমা করেছে—শুধু শুভেচ্ছা জানাতে, খবর নিতে বা তাদের খবর দিতে সে ফোন করে।

কায়েতপাড়া ইউনিট হওয়ার পর পর সেখানকার দায়িত্ব নেয় আর একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার সাহাজ উদ্দিন, তার বাড়ি কাপাসিয়ায়। পরে অবশ্য সে সাতবাড়িয়াতে চলে যায় ইউনিট প্রধান হিসেবে। কায়েতপাড়ার স্থানীয় মহিলা পাপিয়া সাধারণ গৃহবধু ছিল। ইউনিট হওয়ার পর ওখানে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি শেখে। পরে বিশেষ করে টাই ডাই, বাটিক ও ব্লক প্রিন্টে করার ও শেখাবার কাজে সে খুবই দক্ষ হয়ে পড়েছিলো। মনির হোসেন আর একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বিভিন্ন ইউনিটের দায়িত্বে ছিল বিভিন্ন সময়। যখন যে কাজ পড়তো তা সম্পন্ন করার জন্য সে সম্ভাব্য সব কিছু করতো। এক সময় সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলো। তারপর বেশ কয়েক বছর পর বেশ বিধ্বস্ত চেহারায় আবার সিএমইএসে যোগ দিতে এসেছিলো। তার কাহিনীটি ছিল খুব করুণ। চাকরি ছেড়েছিলো মানব পাচারকারীদের পাল্লায় পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপ সাইপানে। সাইপান দ্বীপটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে আমেরিকানরা জাপানিদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো—জাপানিরা ওখানে তাদের ত্রিশ হাজার সৈন্যের প্রায় শেষ জন না মারা যাওয়া পর্যন্ত এর দখল ছাড়েনি। এই যুদ্ধের প্রসঙ্গেই দ্বীপটির কথা শুনেছিলাম, এর সম্পর্কে তৈরি সিনেমা দেখেছি। তারপর এই দ্বীপের কী দশা হয়েছে তা জানা ছিলনা। এখন মনিরের কাছে শুনলাম এটি নামে মাত্র মার্কিন সৈন্যদের দখলে আছে। আসলে কতগুলো ফড়িয়া কোম্পানি চীন, বার্মা, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ থেকে শ্রমজীবীদেরকে পাচার করে তাদের শ্রমে এখানে বড় বড় কিছু গার্মেন্টস ফ্যাকটরি চালায়। এই পোষাকগুলোই 'মেইড ইন ইউএসএ' লিখে আমেরিকার বড় বড় ব্র্যাণ্ড কোম্পানিগুলো আমেরিকাতে বিক্রয় করে। মনিরের কাছ থেকে সেখানে তাকে প্রায় শ্রমদাসের মত ব্যবহার করে কী ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—ভেবে অবাক হলাম যে অন্তত নামে হলেও 'আমেরিকান টেরিটরি' বলে পরিচিত একটি জায়গাতেই এ যুগের এই 'দাস প্রথা' চলছে। কয়েক বছর এভাবে ব্যবহৃত ও অত্যাচারিত হয়ে কেমন করে সুকৌশলে সে সাইপান থেকে পালিয়ে এসেছে সে কাহিনীও চমকপ্রদ। এক সময় সুঠামদেহী এই যুবকের শরীরের ভগ্ন দশা দেখে তার কাহিনী অবিশ্বাস করার কোন উপায় ছিলনা। মনির এর পর আরো বহুদিন সিএমইএসের নানা ইউনিটে নেতৃত্ব দিয়েছে।

মিনারা নামে এক তরুণী দীর্ঘদিন পটুয়াখালীতে আমাদের নানা ইউনিটে কাজ করেছে। একবার ওখানে একটি মৌলিক বিদ্যালয় দেখতে গিয়ে দেখলাম মিনারা এসেছে তার চার বছরের ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে। ছেলেটি কোলে বসে চুপ করে আমাদেরকে আলাপ করতে দেখছিলো। হঠাৎ মিনারা তাকে বললো মৌলিক বিদ্যালয়ের গান গাইতে। এমনি ছেলেটি কোলে থেকেই সজোরে ভরা গলায় একেবারে সঠিক সুরে ও উচ্চারণে গাইতে থাকলো 'আমাদের মৌলিক বিদ্যালয়...'। পুরো গানটি প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে এসে ছাত্রদের গাইতে শুনে শুনে সে শিখে ফেলেছে।

এমনি ভাবে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সিএমইএসের কাজ করতে গিয়ে আমার যোগাযোগ ঘটেছে। এরা সবাই খুবই সাধারণ মানুষ, পড়াশোনা বা কাজে কর্মে আহামরি গোছের কেউই ছিলনা—বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাদের সংগ্রামী জীবন। সিএমইএসের প্রশিক্ষণ আর কাজের আবহ এদেরকে ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে, নানা প্রযুক্তিতে ও কাজে দক্ষ করেছে; অনেকের ক্ষেত্রে জীবনে একটি নেশার মতো উদ্দেশ্য এনে দিয়েছে—ছাত্র ছাত্রীদেরকে ও গ্রামবাসীদেরকে ভালবাসার, তাদের নেতৃত্ব দেবার। তাদের প্রশিক্ষণে আমি ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত থাকতাম, বলতে গেলে মূল ভূমিকা পালন করতাম—এর উপায়-উপকরণ এবং বিষয়গুলোও আমি নিজের মত করে উদ্ভাবন করেছি। ওদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণটি এখানেই—ওভাবেই নানা দিক থেকে এসে ওরা সবাই সিএমইএসের মানুষ হয়ে ওঠেছে; বলা যায় সিএমইএসের সব কিছু ওদের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সিএমইএসের ছাত্র ছাত্রীদের অনেকের সঙ্গে ওরা স্কুলে থাকা কালে ও স্কুল ছেড়ে যাবার পরও আমার একই ভাবে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। অনেকে সিএমইএসের সঙ্গেই কাজ করেছে তাদের ছাত্রত্ব শেষ হবার বহু পরেও। উন্নত ও আত্মসম্মানশীল কাজ করে তারা জীবনে স্বনির্ভর হতে পারলো কিনা সেটি দেখাও আমাদের কাজ। তাই পরে তাদের শিক্ষানবিশীর বা চাকরির ব্যবস্থা করা, অথবা নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করা সহ নানা রকমের গ্রাজুয়েট কর্মসূচি সিএমইএসকে হাতে নিতে হয়েছে। আমাদের এমনি একটি প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত নাম হলো 'সে ও সে'। ইংরেজি আদ্যক্ষরে গড়া এই নাম বিস্তৃত করলে যা হয় তার অর্থ দাঁড়ায় 'আত্মকর্ম সংস্থানকারী তরুণ ও মহিলাদের সামাজিক উদ্যোগ'।

সিএমইএসের এখন সাতাশটি ইউনিট—দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে এগুলো রয়েছে। এসবে আড়াই হাজার শিক্ষক, কারিগরি প্রশিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীরা কাজ করছে। প্রতি বছর অন্তত হাজার খানেক ছাত্র-ছাত্রী 'গ্রাজুয়েট' হয়ে বেরোচ্ছে এগুলো থেকে। তাই আগের দিনগুলোর মতো সবার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা এখন সম্ভব হয়না। তবুও চেষ্টা করি ওদের সঙ্গে যখনই সম্ভব কথা বলতে, ওদেরকে জানতে, প্রশিক্ষণে অংশ নিতে, সমস্যাগুলোতে মনোযোগ দিতে।

শিক্ষা ও প্রযুক্তির ল্যাবোরেটরি

সিএমইএস গোড়া থেকেই মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও এর প্রকৃতি কখনো এক জায়গায় থেমে থাকেনি। আসলে আমাদের প্রযুক্তি কেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলো তার নিত্য কাজের সঙ্গে শিক্ষার পদ্ধতিকে আরো লক্ষ্যনিষ্ঠ আরো দক্ষ করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছে। একই সঙ্গে নতুন নতুন প্রযুক্তিকে প্রশিক্ষণ ও লাভজনক ব্যবহারে আনার জন্যও চলেছে অনুসন্ধানী গবেষণা। এর প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমাকেই অগ্রণী হতে হয়েছে, তবে ক্রমে যেহেতু সিএমইএসে সহকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে এক একটি বিষয়ে অনুসন্ধান ও করে দেখার কাজগুলো আমার জন্য সহজতর হয়েছে—কারণ নতুন জিনিস করে দেখতে সিএমইএসের মানুষদের অনেকেরই খুব উৎসাহ থাকতো। দেশ-বিদেশের অন্যের থেকে কিছু ইশারা নিয়ে আমাদের পরিস্থিতির উপযুক্ত করে তোলার কাজটিই আমরা করেছি সব চেয়ে বেশি। ভাল লেগেছে এক পর্যায়ে এসবের ফলাফলগুলো উপযুক্ত মনে হবার পর তা সব সময়ের জন্য সিএমইএসের শিক্ষার ও কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলো; পরে আমরা নিজেরাই আর মনে রাখিনি যে এগুলো এক সময় আমাদের ছিলনা আমরা গবেষণার মাধ্যমে যোগ করেছি। সিএমইএসের নতুন সব কিছুর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম উদ্ভাবনে আমি ছিলাম সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া ভাল নাম বেছে নেবার জন্য সহকর্মীদের মতামত নিতাম—কিন্তু একবার দেয়ার পর এগুলো সিএমইএসের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; আমরা এ নামে ডাকছি, ছাত্র ছাত্রীরা ডাকছে, তাদের বাবা মা'রা ডাকছে, স্থানীয় মানুষ ডাকছে, যাদের সঙ্গে আমাদের নানা কাজ কারবার তারা ডাকছে। এভাবেই আমাদের স্কুলে শ্রেণীগুলোর নাম হয়েছে 'অংকুর', 'বিকাশ', 'অগ্রসর' ইত্যাদি; এভাবেই আমাদের দিনের বিভিন্ন কাজ ভাগ হয়েছে 'অন্তরঙ্গনে' আর 'বহিরঙ্গনে'; এ ভাবেই আমাদের মোমবাতির নাম হয়েছে 'শোভন' মোমবাতি ইত্যাদি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গিয়েছি কী ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে খুবই আনন্দদায়ক ভাবে ছাত্ররা শিক্ষাকে আত্মীকৃত করতে পারে, এবং তাদের জীবনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। এটি বাংলা, ইংরেজি, অংক বিজ্ঞান—সব কিছুর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে করার চেষ্টা করেছি। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করেছি। তা ছাড়া আমাদের পদ্ধতিগুলোর উপর ভিত্তি করে নানা রকম বই লিখলাম—বেশির ভাগ আমিই লিখলাম, যদিও তার মধ্যে সংগৃহীত কিছু কিছু জিনিসও ছিল। এভাবে প্রকাশ করেছি ছাত্রদের জন্য 'অংকুর বাংলা' এবং 'লেখাপড়া খেলা' নামের দুটি বই খেলার মত করে সাক্ষরতা ও অংক শেখা। আরেকটি বই হলো 'পাঁচ মিনিটের কাজ'। এতে ক্লাসে করার জন্য মজার মজার অনেক সৃষ্টিশীল কাজ ছিল—কিন্তু কোনটাই পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেয়না। এরকম আরো বেশ ক'টি বই

শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্য তৈরি করেছিলাম। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি বই হলো 'আমার বই'। বড় সাইজের এই বইতে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একটি লেখা ও তার উপর আঁকা সহজ এমন একটি ছবি ছিল যা ছাত্রের লেখা ও আঁকা জিনিস হিসেবেই দেয়া হয়েছে—'আমার কাজ', 'আমার মা' 'আমার দিন', 'আমার খেলা'—ইত্যাদি। উদ্দেশ্য ছিল এই নমুনা অনুসরণ করে প্রত্যেক ছাত্র নিজেই 'আমার বই নামে একটি বই লিখবে, ছবি ও আঁকবে। সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি বিজ্ঞানের উপর—যার মধ্যে ভূগোল ও পরিবেশের বিষয়গুলোও রয়েছে। আমাদের পদ্ধতিতে আনন্দের মধ্যে নিজে করতে করতে বিজ্ঞান শেখার ব্যাপারটি মনে রেখে মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞানের নতুন ধরনের পাঠ্য বই 'দেশ, পরিবেশ, বিজ্ঞান' তিন খণ্ডে লিখলাম। আগে ইউনিসেফের সঙ্গে আমাদের ওই মহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের নয়টি বইতো রয়েছেই।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সব চেয়ে মজার যে জিনিসটি আমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে করেছি তার নাম 'আমার ল্যাব'। এটি ক্লাসে সব ছাত্ররা ব্যবহারের জন্য একটি বহনযোগ্য ল্যাবোরেটরি—সব কিছু রাখা ছোট একটি টিনের সুটকেসে যার মধ্যে খোপ খোপ করে চুম্বক, কম্পাস, ব্যাটারি, তার, বাতি, থার্মোমিটার, কৌটা, টিউব ইত্যাদি নানা রকমের টুকি টাকি যন্ত্র রাখা হয়েছে; আর হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, করাত সহ ছোট ছোট কিছু হাতিয়ার। এই ল্যাবোরেটরি ডিজাইন করতে আমার নিজের ছোটবেলার নেশা ও অভিজ্ঞতাটুকু খুব কাজে লেগে গেলো—ওই যে তখন ল্যাবোরেটরি-আলমারির আয়োজন করেছিলাম নানা রকম যন্ত্রপাতি বানানোর জন্য। 'আমার ল্যাব' নামের একটি বইও এর জন্য লিখলাম যাতে ঐ টিনের স্যুটকেসের ভেতরকার জিনিসপত্র দিয়ে পঞ্চাশটি আলাদা এক্সপেরিমেন্ট করার উপায় বাতলানো হয়েছিল—এসব এক্সপেরিমেন্টের ফটো সহ। এক্সপেরিমেন্ট কথাটি হয়তো খুব গাল ভরা হয়ে গেল—বরং বলা যায় মজার মজার কাজ। ঐ পঞ্চাশটির বাইরেও অনেক কাজের পরামর্শ দিলাম যার থেকে নতুন নতুন মজার কাজ তারাই ভেবে বের করতে পারবে। যেমন যে থার্মোমিটারটি আছে তা দিয়ে নিজের দেহের তাপ যেমন মাপতে পারবে, ছাগলের বাচ্চারও মাপতে পারবে। কনডেন্সড মিল্কের যে টিনটি মুখ খোলা হিসেবে দেয়া হয়েছে তাকে বৃষ্টি মাপক যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায় অনায়াসে। এর মধ্যে কোন কাজই তেমন কঠিন কিছু নয়—কিন্তু প্রত্যেকটির সঙ্গে যথেষ্ট বিজ্ঞান শেখার ব্যাপার রয়েছে।

শিক্ষার ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ কখনোই আমাদের শেষ হয়নি, সব সময় কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছিল এর। তবে সব মিলে সিএমইএসে শিক্ষার দুটি মূলমন্ত্র দাঁড়িয়ে গেলো—'আপন ভুবন' এবং 'মুক্ত লেখাপড়া'। আপন ভুবন মানে হলো যা কিছু ছাত্রেরা শিখবে তা এমন ভাবে শেখানো হবে যাতে তারা একে

তাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে যথাসম্ভব একীভূত করতে পারে, কিছু কিছু এখনই ব্যবহারও করতে পারে। এ জন্য পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে শিক্ষক সহায়িকায় পরামর্শ থাকে কোন জিনিসটিকে আপন ভুবনে কেমন করে নিয়ে আসা যাবে। ধরা যাক বাংলার বইতে একটি ভ্রমণ কাহিনী পড়ানো হলো। এর পর ছাত্রদের প্রত্যেকে যার যার অভিজ্ঞতায় নিজের একটি ভ্রমণের কথা বলবে, লিখবে। দেশের ও বিদেশের ভূগোল পড়ার সময় তার সঙ্গে মিল রেখে নিজের গ্রামের ভূগোলের দিকে তাকাবে, এটি পর্যবেক্ষণ করবে, বর্ণনা করবে। 'মুক্ত লেখাপড়া' হলো শুধু সুনির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ের উপর নির্ভর না করে বহুরকমের পাঠ্য বস্তু, ছবি, দৃশ্য, ঘটনা ইত্যাদিকেও শিক্ষণীয় হিসেবে ব্যবহার করা, সেগুলোর ভিত্তিতেও মুক্ত ভাবে সাক্ষরতার চর্চা করা। এদের ভিত্তিতে ছাত্ররা নিজেরাও পাঠ্য বস্তু তৈরি করতে পারে, শিক্ষকরাও পারে। এ ভাবে পোস্টার, বিলবোর্ড, সাইন বোর্ড, পত্রিকা, অন্যান্য লিখিত বা অঙ্কিত বস্তু সবই পাঠ্য ও শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সিএমইএসে বাড়ি বাড়ি কাজ, প্রযুক্তির কাজ, বাজারের কাজ, ব্যবসা, সামাজিক কাজ ইত্যাদি নানা কর্মসূচিতে ওরা জড়িত বলে মুক্ত লেখাপড়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছে—এ সুযোগকে ব্যবহার করাটাই উদ্দেশ্য। এই মুক্ত লেখাপড়ার বিকাশ ঘটাবার জন্যই আমরা প্রকাশ করে আসছি প্রতি মাসে সহজ ভাষায় একটি পত্রিকা—'অংকুর বিকাশ'। এর অনেক লেখা ছাত্রদের নিজের লেখা—কিছুটা সম্পাদিত রূপে প্রকাশিত , অনেক ছবিও তাদের আঁকা; আর এতে তাদের জন্যই রয়েছে নানা জগতের বিষয়ে সহজ লেখা, ফটো, ছবি ইত্যাদি—মজার কথা, হাসির কথা এসবও। 'অংকুর বিকাশ' যেন তাদের জন্য হয়ে ওঠে মুক্ত লেখাপড়ার একটি বড় আকর।

সিএমইএসে প্রযুক্তির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব গুরুত্ব পেয়েছে কারণ আমরা সেই সব প্রযুক্তির দিকে যেতে চাচ্ছি যেগুলো আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা শিখে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে—যেগুলোর বাজার রয়েছে, এবং আরো উন্নত বাজার সৃষ্টি হতে পারে। একেবারে সনাতন সাধারণ প্রযুক্তিগুলোর জন্যও আমাদেরকে নতুন ভাবে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। যেমন বড় কারখানায় মোমবাতি বা সাবান এক ভাবে তৈরি হয়। তাকে যদি আমাদের মৌলিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পর্যায়ে এনে দিতে হয় তা হলে তাদের কুটির শিল্পে এর উৎপাদন যন্ত্রকে ছোট করতে হবে, তাদের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে এবং একই সঙ্গে তাদের জন্য লাভজনকও রাখতে হবে। এভাবে মোমবাতি ও সাবান তৈরির যে সব ছাঁচ এবং পদ্ধতি আমরা উদ্ভাবন করেছিলাম এবং তা আমাদের ছেলেমেয়েরা যে ভাবে ব্যবহার করেছে সেটি অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ নিয়ে পরীক্ষার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছি, পরে 'মোমবাতি তৈরি', 'সাবান তৈরি', 'টাই ডাই' ইত্যাদি বিষয়েও বই লিখেছি সুদৃশ্য ছবি, ডিজাইন ইত্যাদি সহ। মজার ব্যাপার হলো একুশে বইমেলা সহ বিভিন্ন সুযোগে বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ে অনেক ভারী ভারী

কথা নিয়ে আমার অন্যান্য বই যত বিক্রি হয়েছে এ সব বিক্রি হয়েছে তার চেয়ে বেশি—হাতের কাজে অনেকের উৎসাহ থাকার ফলেই সেটি সম্ভব হয়েছে।

তবে সনাতন প্রযুক্তির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজের চেয়ে ঢের বেশি কঠিন কাজ ছিল আমাদের দেশের জন্য অনেকটা নতুন উদীয়মান কিছু প্রযুক্তিকে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসার কাজটি। এগুলোর এক একটি এক এক সময় শুরু করেছি; ছাত্রদের জন্য এতে ব্যবসায়িক ভাবে সাফল্য আসতে সময়ও লেগেছে অনেক দিন। কোন কোনটিতে সাফল্য মোটেও আসেনি। তবে এর গবেষণার মজাটাই আলাদা। এগুলো অনেকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতই যদিও স্থান-কাল-পাত্র সম্পূর্ণ অন্য রকম, ল্যাবোরেটরিটাও নানা জায়গায় বিস্তৃত। আর এ সম্পর্কে দেশে বিদেশে অন্যদের কাজগুলো অনুসন্ধান করা যে তখন কতটা কঠিন ছিলো তা আজকের ইন্টারনেটের দিনে বোঝানো যাবেনা। গবেষণায় চমকপ্রদ ভাবে সফল অথচ ব্যবসায়িক প্রয়োগে ব্যর্থ এরকম দু'একটি নতুন প্রযুক্তির কথা দিয়েই শুরু করি। প্রথমটি হলো 'জ্বালানিবিহীন উম চুলা' (আমার দেয়া নাম)। এর আইডিয়াটি ছোটবেলায় পেয়েছিলাম স্কাউট ক্যাম্পিং সম্পর্কে একটি বইয়ে। সেখানে 'হে বক্স' নামের রান্নার জ্বালানি সাশ্রয়কারী একটি ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যা আমি সেই স্কাউটিঙের সময় করে দেখেছি। এতে ভাত বা তরকারি যাই রান্না করা হোক তা সাধারণ চুলায় পানি ফোটার অবস্থা পর্যন্ত গরম করে তারপর খাবার সহ গরম ডেগচিটি একটি কাঠ বা কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে হয়, যে বাক্সের তলায়, পাশে, ডেগচির ঢাকনির ওপর সব দিকে ভাল করে শুকনো খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় (সেজন্যই হে' বক্স নাম)। ওভাবে চার পাঁচ ঘন্টা বা তারো বেশি সময় রাখলে ভেতরটা পুরো সময় যথেষ্ট গরম থাকে এবং ঐ আঁচে খাবারটি পুরোপুরি রান্না হয়ে যায়। কাজেই রান্নার সিংহ ভাগের জন্য কোন জ্বালানিই খরচ হয়না। ভাত, মাছ, তরকারি, বিভিন্ন মাংস সবই এই পদ্ধতিতে রান্নার পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা সিএমইএসে প্রচুর করেছি। শক্ত মাংস হলে ফুটিয়ে নেয়াটি একটু বেশিক্ষণ করতে হয়, এই যা; অন্য সব কিছুর জন্য শুধু ফোটার অবস্থায় পৌছলেই হলো। বাক্সের বদলে মাটির নিচে গর্তে খড় দিয়ে রেখে একে আরো সহজ করেছি। শেষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য যেটি ভাল প্রমাণিত হয়েছে তা হলো একটি কিউব আকৃতির নিরেট ষ্টিরিয়োফোমের মধ্যে ডেগচি ঢোকাবার একটি গভীর গর্ত করে উত্তপ্ত ডেগচি তার ভেতর ঢুকিয়ে ওপরে ফোমের ঢাকনি দিয়ে দেয়া। টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি প্যাক করার জন্য এই ষ্টিরিয়োফোম প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এতে কোন খড় দিতে হয় না, ফোম নিজেই তাপের ভালো অন্তরক। ডেগচি থেকে বিকিরণকে প্রতিফলিত করে আরো ভাল গরম রাখার জন্য ভেতরে চকচকে ধাতব রাংতা কাগজ লাগিয়ে দিলাম। বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার তার লাগিয়ে এর ভেতরে কী হারে গরম ডেগচির উত্তাপ কমে পরীক্ষা করে করে সব চেয়ে ভাল ডিজাইন করলাম। এরই নাম দিলাম জ্বালানিবিহীন উম

চুলা—লেপের উমের কথা মনে রেখে। বাইরে যাওয়ার সময় এভাবে রান্না করতে রেখে দিয়ে গিয়ে কয়েক ঘন্টা পর এসে রান্না হয়ে থাকা গরম খাবার পাওয়া যাবে, রাতের খাবারের সময় নতুন রান্না এতে ঢুকিয়ে রোজার সেহরি খাওয়া যাবে, ইত্যাদি নানা সম্ভাবনা তুলে ধরা সত্ত্বেও এই উম চুলার প্রতি ক্রেতা আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়নি। ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় করা গেলে প্রচুর জ্বালানি সাশ্রয় হতো এতে।

ঐ ষ্টিরিয়োফোমের উম চুলার আর একটি রূপ আমরা উদ্ভাবন করেছিলোম সৌর চুলা হিসেবে। এতে খাবার ফুটিয়ে নেবার প্রয়োজন হতো না, তাই ওইটুকু জ্বালানিও লাগতোনা। ফোমের গর্তে খাবারসহ ডেগচিটি ঢুকিয়ে গর্তের মুখ পরস্পর সামান্য ব্যবধানে রাখা দুই স্তর কাচের ঢাকনিতে ঢেকে সিল করে দিতে হয়, এবং পুরো জিনিসটি খোলা রোদের তলায় মেলে রাখতে হয়। ডেগচিটি কালো রঙে রং করা থাকে। ডাবল কাচের মধ্য দিয়ে যে সূর্য তাপ ঢুকে তা আটকে গিয়ে ডেগচিকে প্রায় পানি ফোটাবার তাপে উত্তপ্ত করে তোলে। রাংতা কাগজ সাঁটা বোর্ড দিয়ে আয়নার মত সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করে কাচের উপর ফেললে অধিকতর সূর্য কিরণ ভেতরে গিয়ে ডেগচির উত্তাপ আরো বাড়ায়। এক্ষেত্রে দু-তিন ঘন্টায় ভাত এবং চার পাঁচ ঘন্টায় বাকি সব জিনিস সূর্য তাপে রান্না হয়ে যায়। এই 'সৌর চুলা' বাজারজাত করার আগে প্রচারের জন্য আমরা একটি সেমিনার করেছিলাম মোহাম্মদপুর সিএমইএস অফিসে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সহকর্মীরা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন, সাংবাদিকরাও ছিলেন। সকাল থেকেই অফিসের সামনে কিছুটা রোদ পড়ে এমন জায়গায় ত্রিশটির মতো এরকম ফোমের 'সৌর চুলা' খাবার দাবার সহ মেলে দেয়া হয়েছিলো যাতে সেমিনারের দুপুরের খাবারটি রান্না হয়ে যায়। সেদিন মেঘের কারণে আলো ছায়া হতে থাকলেও চমৎকার রান্না হয়েছিলো, সবাই খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন; কিন্তু এই সৌর চুলাও ব্যবসায়িক ভাবে সফল হয়নি। তাই মৌলিক বিদ্যালয়ে বেশি দিন এটি তৈরি শেখানো হয়নি।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের থেকে আনা কিছু বইয়ে নানা রকম বাজার উপযোগী শিল্প-কর্মের পরিচিতি দেখেছিলাম; এর মধ্যে একটির নাম 'দেক্যুপাজ'। ফরাসি ভাষার এই শব্দটি এসেছে দেক্যুপ থেকে যার অর্থ কাটা টুকরো। বিভিন্ন মুদ্রিত শিল্পকর্ম, ছবি, বা ডিজাইনের কাগজকে নানা ভাবে কেটে সেই টুকরোগুলো সেঁটে করা হয় বলে এই নাম। আমরা এটি করতে চাচ্ছিলাম সিএমইএস ছাত্রদের তৈরি কাঠের শো-পিস, পোড়া মাটির নানা পটারি দ্রব্য, টিনের পাত্র, স্যুটকেস ইত্যাদির উপর এসব মুদ্রিত শিল্প কর্ম সেঁটে তাকে সুদর্শন ও দামী করে তুলতে। নিয়ম হচ্ছে কাঠ, পটারি, টিন যার তলের ওপরে টুকরোগুলো লাগানো হবে তাতে স্বচ্ছ আঠা দিয়ে টুকরাগুলো ভাল করে আগে সেঁটে নিতে হবে। তারপর স্বচ্ছ বার্নিশ দিয়ে টুকরো এবং ঐ তলের পুরোটা বার বার একাকার করে ঢেকে দিতে হবে যাতে ডিজাইন আঁকা কাগজের টুকরোগুলো স্বচ্ছ বার্নিশের ভেতরে বিলীন হয়ে

যায় কিন্তু এর সুন্দর চিত্র দেখা যায়। প্রত্যেকবার বার্নিশের পরে অবশ্য সূক্ষ্ম শিরিষ কাগজ দিয়ে বার্নিশকে ঘষে ছোটখাট ত্রুটি সমান করে নিতে হবে। সব শেষে মনে হবে যেন টুকরোর ঐ ডিজাইনগুলো ঐ তলেরই অংশ—তাতে তলের সৌন্দর্য বেড়ে যায় অনেকখানি। এই দেক্যুপাজ মৌলিক বিদ্যালয়ে আমরা প্রচুর শিখিয়েছি, প্রচুর চর্চা করেছি। কিন্তু যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ব্যয় হয় সে পরিমাণ দাম পাওয়া যেতোনা বলে ব্যবসায়িক ভাবে একে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।

অন্য দিকে কিছু কিছু উদীয়মান প্রযুক্তিতে আমাদের সাফল্যই শুধু চমৎকার ছিলনা এ সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বড় ধরনের বিকাশে আমরা পথিকৃতের কাজ করেছি বলা যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো টিশ্যু কালচারের মাধ্যমে একেবারে স্পন (আদি অংশ) থেকে শুরু করে অয়েষ্টার মাশরুমের (ঝিনুক আকৃতির কারণে এই নাম) উৎপাদন। যদিও সাভারে উচ্চ ব্যয়ে স্থাপিত সরকারী মাশরুম কেন্দ্র থেকে মাশরুমের স্পন দেয়া চাষের প্যাকেট মাশরুম উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কাছে বিক্রয় করা হতো, তাতে সঠিক জায়গায় প্যাকেট রেখে তার যত্ন নেয়া ছাড়া চাষীর কোন কাজ থাকতোনা, আয়ও তাই কম হতো। স্পন তৈরির কাজ ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরাই সাভার কেন্দ্রে তৈরি করেন। আমাদের আকাঙ্খা ছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই এই স্পন তৈরি করবে। কাজটি সহজ নয়—এগুলো উন্নত বায়োটেকনোলজির ব্যাপার, এতে মাশরুমের গা থেকে ছোট একটি টুকরা কেটে নিয়ে বোতলে উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে তার টিশ্যু কালচার করতে হয়। এর থেকে অতি সরু সাদা সূতার আকারে মাইসেলিয়ামের রূপে ফাঙ্গাসের ছাতা গজিয়ে পুরো বোতল সাদা হয়ে গেলে এটিই স্পনের মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। এর এক বোতল থেকে সাধারণ খড়, গমের ভূষি ইত্যাদি ভর্তি অনেকগুলো প্যাকেটে প্রথমে 'মাদার স্পন' এবং পরে এরও প্রত্যেকটি থেকে আবার অনেকগুলো 'কমার্শিয়াল স্পন' প্যাকেট তৈরি সম্ভব হয় তখন। কিন্তু মুশকিল হলো এভাবে প্রতিটি পর্যায়ের কাজগুলো করতে হবে অত্যন্ত জীবাণুমুক্ত ভাবে—এই ছাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং প্যাকেটের ওই জিনিসগুলোর মধ্যে থাকছে অনেক রকম অবাঞ্ছিত দূষণ ছাতা। একবার ঢুকতে পারলে এগুলো পুরো স্পন প্যাকেটগুলোকে বা তারো আগে মাইসেলিয়ামের বোতলকে দূষিত করে তুলবে—সব ফেলে দিতে হবে। স্বল্প ব্যয়ে আমাদের গ্রামীণ ল্যাবোরেটরিতে এসব করতে পারার কোন সহজ উপায় দেখছিলামনা; এমন সময় উপায়ের একটি সূত্র পাওয়া গেলো ভারতে, বেশ কাকতালীয় ভাবে।

বাংলাদেশ পদার্থবিদ্যা সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে ঢাকায় পদার্থবিদ্যার একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের মূল দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। দিল্লি আই আই টি'র প্রফেসর গার্গের সুপারিশে তাঁর সদ্য পিএইচডি করা দুই ছাত্রী সুমনা চক্রবর্তী দত্ত আর গৌরী দত্তকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। দু'জনেই স্থায়ী

ভাবে দিল্লিবাসী বাঙালি। সেই উপলক্ষে ওদের সঙ্গে খুব ভাল আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো। পরে সুমনা বিহারের (তখনো ঝাড়খণ্ড হয়নি) রাঁচিতে সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (এস আর আই) নামের একটি এনজিওতে চাকরি নিয়ে ওখানে চলে এসেছিলো, তার স্বামী রমেন ওখানে একটি ইস্পাত কারখানার বিজ্ঞানী ছিল বলে। সিএমইএসের কাজকর্ম দেখে গিয়েছিলো বলে সুমনার খুব ইচ্ছে ছিলো আমরা এসআরআইয়ের সঙ্গে একত্রে কাজ করি। প্রতিষ্ঠানটি রাঁচির আশেপাশের অর্থাৎ ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের জীবনমানের উন্নয়নেই প্রধানত বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করছিলো। সুমনার কাছে শোনলাম ঐ আদিবাসীদের মধ্যে মাশরুম খাওয়া বেশ জনপ্রিয়, এসআরআই তাই চেষ্টা করছিলো আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে তাদের মধ্যে মাশরুমের উন্নয়ন ঘটাতে। সুমনাদের আমন্ত্রণে রাঁচি গিয়ে এস আর আই এর অন্যান্য বিজ্ঞানী বিশেষ করে সুমনার শিক্ষকস্থানীয় প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ দে-র সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করে ফেল্‌লাম (তিনি স্থায়ী ভাবে রাঁচিবাসী বাঙালি)। এর পর আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার যাওয়া আসা হয়েছে। এস আর আইয়ের কাজের ধরন দেখে মুগ্ধ হলাম। অতি সাধারণ ব্যবস্থাদির মধ্যে সবাই কাজ করছে; কিন্তু লক্ষ্যটি অনেক উঁচু—প্রযুক্তিকে আদিবাসীদের কাছে এনে দেয়া; সিএমইএসের সঙ্গে অনেক মিল খুঁজে পেলাম।

ওরা ছোট নাগপুরের আদিবাসী গ্রামে মাশরুম স্পনের যে ব্যবস্থা করে সুফল পেয়েছে, আমরা সে পথেই এগোলাম। ছোট কাচের বাক্সের ভেতরটা আলট্রা ভায়োলেট আলোর টিউব লাইট জ্বালিয়ে জীবাণুমুক্ত করে তার ভেতর রাবারের দস্তানায় ঢাকা হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট উত্তপ্ত ছুরি দিয়ে টিশ্যু কাটা, তারপর জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বাকি কাজ। খড় কিংবা গমের ভূষির চাষ-মাধ্যমকে বড় প্রেশারকুকার অটোক্লেভে উচ্চ চাপ ও তাপে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া হয়। এভাবে খুব অল্প খরচে আমরা আমাদের নানা ইউনিটে গ্রামীণ মাশরুম ল্যাবোরেটরি গড়ে তুলতে পারলাম। সেখান থেকে আজ সারা দেশে আমাদের ছেলে মেয়েদের মাশরুম বিক্রি হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো যে কাজ এক সময় সিএমইএস একা করতো এখন সারা দেশে এমনকি গ্রামেগঞ্জেও মাশরুম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে ভরে গেছে—সবই করছে তরুণ-তরুণী উদ্যোক্তারা।

দেশের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সিএমইএসের পথিকৃতের ভূমিকা পালনে আর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো ভার্মিকম্পোস্ট। এটি খুব অগ্রসর ধরনের একটি জৈব সার যা কেঁচোর পরিপাক যন্ত্রের কাজের উপর নির্ভর করে—গোবর, পচা পাতা, শাকসবজি ইত্যাদি কেঁচো খায় এবং তাকে নিজের পরিপাক যন্ত্রে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করে মলরূপে। এরকমের সার সে সময় দেশে কেউ করেনি, হয়তো কেউ দেখেওনি। তখন কাকতালীয়ভাবে এটি আমেরিকাতে আমার নজরে পড়েছিলো। আমি তখন এশিয়া ফাউণ্ডেশনের আমন্ত্রণে পরিবেশ ও নবায়নযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত একটি কার্যক্রমে আমেরিকার

কলরাডোতে কাজ করছিলাম। কলরাডোর একটি ছোট্ট প্রত্যন্ত গ্রাম কার্বনডেলে এ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কর্মশালা চলছিলো। ওখানে যেহেতু কোন হোটেল ছিলনা অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরা ওখানকার পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং করে থাকছিলেন।

আমার ব্যবস্থা হয়েছিলো বারবারা (সংক্ষেপে বারব) নামের একজন মাঝ বয়সী মহিলার বাসায় পেয়িং গেষ্ট হিসেবে। তিনি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মানুষদের মনোচিকিৎসায় কাউন্সেলিং করতেন। তাঁর বাড়িতে বেশ ক'দিন ধরে থাকার সুবাদে আমি তাঁর কাজ এবং ঘরকন্নার নানা জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁর রান্নাঘর থেকে যে সব ফেলনা বের হতো তার কোন কোনটি ফেলার নিয়ম ছিল একটি বড়সড় প্লাস্টিকের পাত্রে যেটি বিশেষ কায়দায় তৈরি। লক্ষ্য করে দেখলাম তাতে ছোট বড় বেশ কিছু কেঁচো কিলবিল করছে। বারব বোঝালেন ঐ ফেলনাগুলো ওখানে কম্পোষ্ট হচ্ছে—কেঁচো এসব খেয়ে মলত্যাগের ফলে মাস খানেকের মধ্যে এগুলো কালো মিহি চা পাতার মত দানা দানা সারে পরিণত হয় যা খুব উচ্চ মানের জৈব সার। বাড়ির পেছনে একটি সুন্দর বাগান ছিল বারবের, যা এই সারে বেড়ে উঠছিলো। বাগানে কিছু কিছু সবজি ছিল। আর ছিল বহু রকমের ছোট ছোট লতাগুল্ম। তিনি ওখান থেকে ভেষজ কিছু কিছু গুল্ম খুঁজে নিতেন। একাজে তাঁর সহায়ক হিসেবে মাঝে মাঝে আসতেন জ্যামাইকান এক ভদ্রলোক- যিনি খুব তাজিম করে অনেকটা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বিভিন্ন অসুখের জন্য প্রযোজ্য নানা গুল্ম বাছাই করতেন। আমার উৎসাহটি বেশি ছিল কেঁচোর তৈরি ঐ ভার্মিকম্পোস্টে—এর প্রতিটি পর্যায় খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম। আমার উৎসাহ দেখে বারব একদিন তাঁদের ভার্মি কম্পোষ্ট সমিতির সভায় আমাকে নিয়ে গেলেন—ঐ গ্রামেই। এতে উৎসাহী আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো, তাঁরা আমাকে কিছু পুস্তিকা দিলেন, তাতে খুব সংক্ষেপে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির উপায় বলা ছিল ছবির মাধ্যমে, কী ধরনের কেঁচো লাগবে, কতটি লাগবে, কী ধরনের ফেলনা জিনিস লাগবে, কিসের পর কী হবে ইত্যাদি। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে দেশে ফিরে এ সার তৈরির চেষ্টা চালাবো।

ঢাকার মোহাম্মদপুরে সিএমইএস অফিসের আশপাশে যেখানে ময়লা বা গোবরের গাদার সন্ধান পাওয়া গেছে তার তলায় ঐ বিশেষ কেঁচোগুলোর সন্ধান করেছি। কারণ সাধারণত কৃষি জমিতে যে কেঁচো থাকে সেগুলো মাটি খোঁড়ার কাজের জন্য ভাল কিন্তু ফেলনা জিনিস খাওয়ার জন্য নয়। আমাদের দরকার খননকারী কেঁচো নয়, বরং খাদক কেঁচো। এগুলো লালচে রঙের বিশেষ ধরনের কেঁচো যার কিছু কিছু আমরা নানা জায়গায় সন্ধান করে পেয়ে গেলাম। বড় গামলার মধ্যে রাখা পচা গোবরের মধ্যে এগুলো ছেড়ে দিয়ে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির কাজ শুরু করলাম। শুরুতে অফিসের পেছনে একটি জায়গায় এটি করতে গিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কিছু খিটিমিটি হলো বটে কিন্তু কাজ বন্ধ

হলোনা—প্রাথমিক পরীক্ষায় আমরা সফল হলাম। যখন সুরুজের প্রযুক্তি কেন্দ্রে এটি করতে গেলাম সঠিক কেঁচোর অভাব হলো। আমাদের এই কেঁচোতে ভার্মিকম্পোষ্ট দক্ষ ভাবে হতে চাচ্ছিলনা—এরা খুব ভাল খাদক নয়। তাছাড়া কাঁচামাল হিসেবে গোবর অত সহজলভ্য নয়—এর অন্য নানা ব্যবহার রয়েছে, পুরো গোবরের উপর নির্ভর করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে। এক্ষেত্রেও রাঁচির সেই এসআরআই আমাদের সহায়ক হলো। ওরাও এক পর্যায়ে ভার্মিকম্পোস্ট প্রচলন করেছিলো। তা ছাড়া ওরা উপযুক্ত জাতের বিশেষ কেঁচোর সন্ধান দিলো। পরে সেই কেঁচো থেকে লালন পালন ও প্রজনন করে আমরা এই কেঁচো অনেক সংখ্যায় পেতে পারলাম আমাদের নানা ইউনিটে। শুকনো পাতার মেশাল দিয়ে খুব সফল না হলেও শুকনা কচুরিপানা, পচা সবজি, ব্যবহৃত চা পাতা এগুলো চমৎকার কাজ করলো। হাটবাজারের ব্যাপারিদের সঙ্গে ও চায়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসব অন্তত প্রথম দিকে আমাদের প্রয়োজন মত পেয়েছি। পরে অন্যান্য নানা ব্যবস্থা করতে হয়েছে এই কেঁচো সারের কাঁচামাল যোগাড় করতে। পিঁপড়া ইত্যাদি থেকে কেঁচোকে রক্ষা করা একটি বড় সমস্যা ছিল। তা ছাড়া পচা জিনিসের আকর্ষণে অনেক রকম অনিষ্টকারী এসে জমা হয়—কীট পতঙ্গ থেকে কুকুর পর্যন্ত। গোবর, কচুরিপানা ইত্যাদির সঙ্গে কতখানি পানি থাকবে সেটিও খুব সাবধানে নির্ধারণ করতে হলো—বেশি ভেজা হলে কেঁচো ঐ পানিতে দমবন্ধ হয়ে মরবে, কম ভেজা হলে কেঁচোর পরিবেশ সঠিক হবেনা। মাটিতে গোবর ইত্যাদির বিছানা করে বা চারির মধ্যে—এই দুই ভাবে কেঁচো সার তৈরির চেষ্টা করলাম। এর পরীক্ষা নিরীক্ষা যেন শেষ হতেই চাচ্ছিলনা। এই চমৎকার সার বিক্রি করার সময় সারের সঙ্গে মূল্যবান কেঁচোর কোকুন এবং ক্ষুদ্র বাচ্চা কেঁচো চলে গেলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আগে সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে ওসব চেলে নিতে হয়, সার সঠিক পরিমাণে শুকিয়েও নিতে হয়। পরে আমাদের এই গবেষণা এমন স্তরে পৌঁছলো যে উচ্চতর সার হিসেবে সরকারী অনুমোদন পেতে এতে যাবতীয় পুষ্টি উপাদনের অনুপাত একেবারে সঠিক হতে হবে। তাই সুরুজে রীতিমত একটি রাসায়নিক টেস্টিং ল্যাবোরেটরি আমাদেরকে স্থাপন করতে হয়েছে।

আমাদের 'সৌর চুলা' প্রযুক্তি ব্যবসায়িক ভাবে সফল না হলেও 'সৌর বিদ্যুৎ' প্রকল্প খুবই সফল হয়েছে, এবং সেটি সারা দেশে অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের জন্যও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিড স্টেট ফিজিক্সে আমার গবেষণা ক্রমেই সোলার সেলের পদার্থবিদ্যার দিকে সরে এসেছিলো। ইতালির ত্রিয়েস্তে আইসিটিপিতে যে নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ক গ্রুপ ছিলো সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকেই আমি তার সদস্য ছিলাম এবং সেখানে নিয়মিত গিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রমে অংশ নেয়ার ফলে সৌর বিদ্যুতের তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণ অগ্রগতিগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এ সময় প্রফেসর মুহতাশাম হোসেন ও প্রফেসর শামসুল হকের চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা সেখানে

একটি এনার্জি পার্ক করে বিদ্যুৎহীন জায়গায় দ্রুত সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সমস্যাগুলো নিয়ে দেশের জন্য বাস্তবানুগ কিছু কিছু গবেষণাও শুরু করি। পরে আমি নিজেও বহু বছর এই কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। এ রকম অবস্থায় সিএমইএস পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য দেশের প্রথম কিছু পরীক্ষামূলক বাস্তব প্রকল্পে বিদ্যুৎ কর্মীদের ও গ্রাহকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বিশেষ করে মেঘনার চরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রচেষ্টার সঙ্গে শরিক হয়। আরো পরে সিএমইএস নিজেই গ্রামের কিছু কিছু বাড়িতে কিস্তিতে শোধ করার ভিত্তিতে এবং বাজারগুলোতে দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে। এই পথিকৃতের কাজ ও প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলো সিএমইএসের জন্য এবং দেশের সৌর বিদ্যুতায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরে 'গ্রামীণ শক্তির' মতো প্রতিষ্ঠান বিশাল আকারে গ্রহণ করেছে। সিএমইএসের দিকে বড় ব্যাপার ছিলো তার ছাত্রদেরকে সৌরবিদ্যুতের কারিগর হিসেবে গড়ে তোলা এবং বিশেষ করে এর যে ইলেকট্রনিক অংশগুলো রয়েছে, সেগুলো নিজেরা তৈরি করে সৌর বিদ্যুৎ সিষ্টেমকে ব্যয়-সাশ্রয়ী করা।

কৃষি সংক্রান্ত কিছু অভিনব বিষয়গুলো যেমন মাশরুম, ভার্মি কম্পোষ্ট, এবং কিছু পরে বাক্সে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন করা এগুলো সিএমইএস নানা দিক থেকে তথ্য ও পরামর্শ সংগ্রহ করে শুধু নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলো বলে সব সময় একটু সন্দেহ ছিল প্রত্যেক বিষয়ে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করছি কিনা, এটিই দক্ষ ও নিরাপদ পদ্ধতি কিনা ইত্যাদি। এই সন্দেহের চমৎকার নিরসন হয়েছিলো যখন পরে আমেরিকার উইনরক ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে আমরা 'ফার্মার টু ফার্মার' বলে একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম তখন। এই কার্যক্রমে আমেরিকা থেকে (কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশ থেকে) এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবীরা অল্প কিছু দিনের জন্য এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন। উদ্দেশ্য হলো আমরা যা করছি তা দেখে পর্যালোচনা করা এবং এর উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেয়া। মাশরুম, ভার্মিকম্পোস্ট, মৌমাছি পালন, মুরগি পালন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ এভাবে এসেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে মতামত দিয়েছেন আমরা যে পর্যায়ে বিষয়গুলোর উপর কাজ করছি তাতে আমাদের পদ্ধতিতে কোন খুঁত নেই। তবে একে আরো উন্নত করার ও ব্যাপক করার জন্য কিছু কিছু নতুন ধরনের মাশরুম উৎপাদনের চেষ্টা করেছি, এর চাষ মাধ্যমে পরিবর্তন এনেছি; এমনি করে বাকিগুলোতেও।

কিশোরী শক্তি, বিজ্ঞানমুখী তারুণ্য

কুড়িতে বুড়ি নয়

একেবারে গোড়া থেকে সিএমইএস মেয়েদের নিয়ে বেশি কাজ করবে বলে ঠিক করেছিলো, কারণ সুবিধাবঞ্চিতদের নিয়েই যেখানে এর কাজ সেখানে মেয়েরা দুই ভাবে সুবিধাবঞ্চিত—গরীব হিসেবেও, মেয়ে হিসেবেও। মৌলিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে, সেখানে কাজকর্মের ধরনের ব্যাপারে, মেয়েদের নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে সব সময় ওদের একটি প্রাধান্য রাখা হয়েছিলো। তারপরও দেখা গেলো এখান থেকে মেয়েরাই হারিয়ে যাচ্ছে আগে। যেই ওরা কিশোরী হলো তখন নেমে এলো অনেক বিধিনিষেধ—তারপর বাল্য বিয়ে এসে তাদের বাকি সম্ভাবনাও শেষ করে দিচ্ছে। এজন্য ঠিক করলাম শুধু মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়াশোনা ও প্রযুক্তি শেখার ভাল ব্যবস্থা করে দিলে আপনা আপনিই তাদের বঞ্চনাগুলো দূর হয়ে যাবেনা; ওদের জন্য আলাদা কর্মসূচি নিতে হবে। সেই চিন্তা থেকেই এলো সিএমইএসের 'কিশোরী কর্মসূচি'। সে সময় দেশে নারী প্রগতির জন্য অনেক কাজ হচ্ছিলো, কিন্তু শুধু কিশোরীদের সমস্যাগুলোকে আলাদা করে কেউ দেখছিলোনা। মৌলিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার কারণে আমাদের কাছে মনে হলো সেটি ঠিক হচ্ছে না, নারীর কথা বলে কিশোরীকে বোঝানো যাবেনা—এদের সমস্যা ভিন্ন, গ্রামের কিশোরীদের বঞ্চনার কোন শেষ নেই। বলতে গেলে তাদের প্রায় পুরো কৈশোরই চুরি হয়ে যায় বিধিনিষেধ আর বাল্য বিয়ের কবলে পড়ে, তারপর বহুমুখী নির্যাতন তো রয়েছেই।

সেই যে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত কিশোরীদেরকে তাদের নিজস্ব সমিতি ভুক্ত করে ক্ষমতায়নের পথে নিয়ে যাওয়া—সেটিই হয়ে পড়লো সিএমইএসের একটি মুখ্য পরিচয়। সব চেয়ে বড় কাজ ছিলো কিশোরীদের নিজেদের ধ্যান ধারণা বদলে দেয়া—তাদের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে সমতার চিন্তা ও উচ্চাকাঙ্খার চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া: বিয়ের আকাঙ্খা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেই বড় মানুষ হয়ে

ওঠার আকাঙ্খা। এটি অসাধ্য সাধন করলো। এর আকর্ষণে সপ্তাহে একটি দিন তারা শত বাধা অতিক্রম করে অন্য কিশোরীদের সঙ্গে 'জেন্ডার সেশনে' একত্র হয়েছে, নিজেদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে, অন্যদের নিয়ে সামাজিক কাজের পরিকল্পনা নিয়েছে, নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় ঠিক করেছে। ওখানেই ওরা সন্ধান পেয়েছে কিশোরী শক্তির। এ শক্তি তাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিলো, কিশোরী কর্মসূচি তাকে উন্মুক্ত করেছে। তাই তারা সাহস করে পুরো গ্রামে গলা ফাটিয়ে বলতে পেরেছে 'কুড়িতে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়'। বঞ্চনার প্রত্যেকটি বিষয়, প্রত্যেকটি ঘটনা আলাদা করে নিয়ে তাদের সকল সাধ্য দিয়ে তাকে দূর করার চেষ্টা করেছে। আর্থিক ক্ষমতা লাভের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি শিখেছে, সেটি ব্যবহার করেছে উপার্জন সৃষ্টির জন্য। এই সবকিছুতে সিএমইএস সহায়ক হয়েছে, তাদের জন্য সমাজের সহায়ক শক্তিগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করেছে। কর্মসূচি যেন শুধু কথার মধ্যে বা শ্লোগানের মধ্যে থেকে না যায়, এমনকি শুধু সচেতনতার মধ্যেও থেকে না যায়, বরং কাজে ও ফলাফলে পরিণত হয়—সেটিই ছিল চেষ্টা।

এই কিশোরীরা কারা? আমাদের মৌলিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা তো আছেই, তাদের বোনেরা আছে, সরকারী স্কুলে পড়ে এমন অনেক গরীব ঘরের কিশোরীরা আছে, যারা কোথাও পড়েনা তারাও আছে। তারা তাদের 'বন্ধু নেতাদের' দ্বারা সংগঠিত হয়, আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। এই প্রথম আমার একটি সুযোগ হলো সত্যিকার অর্থে এ কিশোরীদেরকে চেনার। প্রথম দিকের সমিতিগুলোতে যারা ছিলো তাদের চিন্তাভাবনা আশা-আকাঙ্খা জানার সুযোগ বেশি হতো। তাদের মনোভঙ্গি আমরা যে কত দ্রুত বদলে দিতে পেরেছিলাম তা দেখে নিজেও অবাক হয়েছি। এই নতুন মনোভঙ্গি নিয়ে তারা বঞ্চনার কতগুলো দেয়াল যে একে একে ভেঙ্গে ফেলছিলো সে খবর তাদের কাছে থেকেই সব সময় পচ্ছিলাম। একবার যখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে—তাদের শরীর, তাদের মন, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা জেন্ডার সেশনে জেনেছে, তারপর তারাই সেই জ্ঞান সেই কাজ ছড়িয়ে দিয়েছে বাদবাকি সব কিশোরীদের জন্য। কুসংস্কারের এবং আরোপিত অপবিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের ওপর যে সব হাস্যকর বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের উচ্ছল স্বাভাবিক কৈশোর উন্নয়ন বন্ধ করা হয়েছে, যে ক্ষতি তারা নিজেরাও নিজেদের করে এসেছে, এবার তারা তা উৎপাটন করবেই। সম্পূর্ণ সমান অধিকারের চেতনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়েছে এক্ষেত্রে তাদের মূলমন্ত্র।

কিশোরী কর্মসূচিকে কীভাবে আরো দক্ষও আরো কার্যকর করে তোলা যায় এ নিয়ে আমাদের চিন্তার সীমা ছিলনা। কর্মসূচির কিশোরীরা, বিশেষ করে যারা নিজের চেষ্টায় ক্ষমতায়নের পথে অধিকতর অগ্রসর হয়েছিলো, সিএমইএসের একটি বিরাট আন্দোলনে শামিল হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি

দেশের তারুণ্যের একটি বিরাট সুপ্ত শক্তির যেন উন্মোচন ঘটাতে পারছিলো—যখনই এই কিশোরীদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের জীবনের দিকে তাকিয়েছি, তখনই এই কথাটি মনে হয়েছে। গ্রামের সবাই হয়তো এ কিশোরীদের মনোভঙ্গি ও জীবন পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত সব কথা সব সময় জানতোনা—তাই পুরো অঞ্চলের মানুষ যেন ঐ কিশোরী শক্তির উন্মেষ অনুভব করতে পারে সে জন্যও ওরা সচেষ্ট ছিল। ওদের নিজস্ব ফুটবল টিম বা ক্রিকেট টিম নানা মাঠে গিয়ে স্ত্রী-পুরুষ দর্শকের সামনে খেলছিল, এবং তাদের 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' সাইকেল চালনার প্রতিযোগিতা গ্রামের রাস্তা থেকে স্থানীয় সড়ক হয়ে দূরের অন্যান্য গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, পথে পথে অভ্যর্থনা কেন্দ্রের থেকে পানি, শরবত ইত্যাদি খেতে খেতে দুই পাশে দর্শক সারিকে অতিক্রম করে। তবে এই কিশোরীদেরকে স্থানীয় মানুষ আরো নানা ভাবে অধিকাংশ সময় দেখেছে—তাদের সামাজিক কাজে দেখেছে নির্যাতিতা কিশোরী বা মহিলাকে বাঁচাতে, অন্যদের বাল্য বিয়ে রোধ করতে, গর্ভবতীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে, পরিবেশ রক্ষায় নেতৃত্ব দিতে; প্রযুক্তির শিখে তা কাজে লাগাতে, তার ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করে আর্থিক স্বনির্ভরতার পথে এগোতে, এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে।

এসব কাজে তাদেরকে উৎসাহিত করতে তাদের জন্য একটি ম্যাগাজিন বের করতে শুরু করলাম—নাম দিলাম *কিশোরী*। দ্বিমাসিক ভিত্তিতে তাদের ক্ষমতায়ন চিন্তার অনেক খবর দিয়ে সিএমইএসের পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে *কিশোরী*। এই পত্রিকা নিজেই নিজের একটি জগত রচনা করতে পেরেছে—কিশোরীদের নিজেদের লেখা ছাপিয়ে, সেই সঙ্গে দেশে ও বাইরে কিশোরী ও নারী অগ্রসরমানতায় নতুন কী ঘটছে, অতীতে এই মর্মে কী সংগ্রাম হয়েছে, কারা তার মধ্য থেকে উঠে এসেছে, এ সবই এর উপজীব্য এসব খবর দিয়ে আইন-আদালত থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিস্থিতি এ সব বিষয়ে তাদের আরো কী জানা প্রয়োজন তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই পত্রিকায়, এখনো হচ্ছে। প্রতি সংখ্যায় এর একটি সম্পাদকীয় লেখার যখন প্রয়োজন পড়ে তখন আবার একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি আরো কী ভাবে মেয়েদের এই কৈশোর ও তারুণ্যকে পরিবারের ও দেশের জন্য মহা শক্তিতে পরিণত করা যায়।

নাম কিশোরী কর্মসূচি, অংশ নিচ্ছে যারা তারা অধিকাংশ কিশোরী, কিন্তু কর্মসূচিটি শেষ পর্যন্ত শুধু কিশোরীদের জন্য রইলোনা, সেটি উচিত হতোনা। কিশোরী শক্তির বিকাশে কিশোরীদের জন্য অন্যদের সমর্থন দরকার—শুধু মেয়েরা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনা সবার মধ্যে এ সম্পর্কে বুঝ-ব্যবস্থাও সৃষ্টি করতে পারবেনা। তাই অনেক ছেলে এ আন্দোলনে এগিয়ে এলো, তারাও কর্মসূচিতে শামিল হয়ে গেলো। তাদের কাজও একই—কিশোরী শক্তির উন্মোচন করা, সেই সঙ্গে ছেলেদের নিজেদের

সচেতনতা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদিকে ঐ ভিত্তিতে নিয়ে নিজেদের কৈশোর যাত্রাকেও অনেক বেশি সার্থক করা। এভাবে মেয়েরা ছেলেরা মিলে আমাদের এই কর্মসূচি হয়ে পড়লো কৈশোরকে সার্থক করার ক্ষেত্রে একটি অনন্য চেষ্টা যা এত সামগ্রিক দিক থেকে এদেশে আগে কখনো হয়নি।

কিশোরী কর্মসূচিতে কিশোরীদের ক্ষমতায়নের বড় চ্যালেঞ্জ এবং একই সঙ্গে বড় হাতিয়ার হলো নিজস্ব প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অগ্রসরতা। এর মধ্যে সত্যিকারের উপার্জন শুরু করার বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বনির্ভর হওয়া। এখান থেকেই তাদের শ্লোগান ছিল 'আমাদের এক পণ, বিয়ের আগে উপার্জন'। এই একটি সম্ভাবনা তাদেরকে অপরের বোঝা হবার ও প্রকারান্তে নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে অনেকখানি প্রতিরক্ষা দেয়। আমাদের কিশোরীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠেছিলো। পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, অথবা চাল ভেঙ্গে দিয়ে এক রকম উপার্জন করা যায় বটে, কিন্তু সেটি ক্ষমতায়ন নয়। তাদের উপার্জন হবে উন্নত কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, প্রযুক্তির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওরা জানে এটি তাদের জন্য শুরু মাত্র, কিন্তু আকাঙ্খাটি তাদের উচ্চে থাকবে। এমনই অবস্থাতে তাদের অনেককে দেখেছি—একদিকে যেমন নিজেদেরকে ক্ষমতায়িত করেছে, লেখাপড়া চালিয়ে গেছে, পাশাপাশি নিজের আকাঙ্খার ডানা মেলে দিয়েছে ক্রমাগত ওপরের দিকে। একেবারে শুরুর এরকম একজন অগ্রণী কিশোরী চায়না আখতারের কথা খুব মনে পড়ে। অসুস্থ বাবার পরিবারে একেবারেই দুস্থঃ অবস্থাতেই সুরুজের কিশোরী কর্মসূচিতে চায়নার আর্বিভাব হয়েছিলো। কর্মসূচি তাকে দক্ষ দর্জি হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিলো, তারপর দক্ষ ব্যবসায়ী। ঘুপচি ঘরের মত বাড়ির ভেতরে একটি সেলাই মেশিন সে কিনেছিলো কর্মসূচির ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে। সেই বাড়িটিই চার পাঁচ বছরের মধ্যে রীতিমত একটি কারখানায় পরিণত হয়েছিলো, এবং পরিবারের থাকার ঘরটিও গর্ব করার মতো। আর চায়নার ব্যবসাও শুধু দর্জিগিরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ছোট ভাইকে স্কুল পাশ করিয়ে মালয়েশিয়া পাঠাবার পর বিয়ে করার ফুরসত হয়েছিলো চায়নার। সে অনেকদিন আগের কথা। এর পর চায়নার মতো আরো অনেক সফল কিশোরীর ভীড়ে আমাদের উৎসাহ আরো তুঙ্গে ওঠেছিলো।

মেয়েদের প্রায় সবাই হয় সিএমইএস মৌলিক বিদ্যালয়ে অথবা অন্যান্য সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করে। সিএমইএসের ছাত্রীরা কোন না কোন প্রযুক্তির উপর দক্ষ হয়ে কাজ শিখছে, কেউ কেউ হয়তো ইতোমধ্যে দক্ষ হয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেছে বা অন্য কারো জন্য খণ্ডকালীন কাজ করছে। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রীদের নিজ স্কুলে সে সুযোগ নেই। তাদের জন্য তাই স্বল্পকালীন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের বিষয়-বৈচিত্র সৃষ্টি করা সহজ, কারণ প্রয়োজনে বাইরের প্রশিক্ষক এমনকি বাইরের প্রতিষ্ঠানেরও সহায়তা নেয়া গেছে অন্তত প্রথম দিকে। এর ফলে দেখা গেলো মেয়েরা বাজার চাহিদার

সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি শিখে তা উপার্জনের কাজে লাগালো। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ওরা পোষাক তৈরি, বিউটিশিয়ানের কাজ, মোবাইল ফোন মেরামত, পশু চিকিৎসক সহকারী, গ্রাম ডাক্তার, মাশরুম চাষ, ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ইত্যাদি বহু রকমের কাজে দক্ষ হয়ে গেলো। দেশে এই জাতীয় নানা প্রশিক্ষণের সঙ্গে এদের কাজের পার্থক্যটি ছিল ওখানে শুধু শেখার খাতিরে শেখা নয়, কিছু আয় হবে বলেও নয়, মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতায়ন ও ক্রমাগত নিজের উন্নয়ন—প্রযুক্তি ও ব্যবসার ওপর নিজের দখল এনেই এটি সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিউটি পার্লারের প্রচলন হবার পর দেখছি আমাদের মেয়েদের 'অপরাজিতা' নামের পার্লারগুলো দেশের সর্বত্র ছোট ছোট হাটে বাজারে গড়ে ওঠেছে। এরকম কিছু কিছু পার্লারে আমি একাধিকবার গিয়েছি—যেমন চট্টগ্রামে চন্দনাইশে গাছবাড়িয়া বাজারে, গাজিপুরে মাওনা চৌরাস্তায় এবং বর্মি বাজারে। অনেকদিন দেখেছি হয়তো এ সবের মালিক ও প্রধান বিউটিশিয়ান আমাদের কিশোরী স্কুলে বা কলেজে গিয়েছে। কিন্তু পার্লার বন্ধ নেই, তার নিযুক্ত অন্যরা চালিয়ে নিচ্ছে।

কিশোরী কর্মসূচিতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে সেই 'বন্ধু নেতাদের' অনেকে পরবর্তী সময়েও কোন না কোন ভাবে কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত থেকেছে। তা ছাড়া পরে কর্মসূচিতে কিশোরী ছাড়াও তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে সিএমইএস কর্মীরা এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থেকেছে। এই যে কর্মীরা তাদের নিজের জীবনের পরিবর্তন, তাদের ক্ষমতায়নটিও চোখে পড়ার মত। তাদের অধিকাংশই নিজেরাও সুবিধাবঞ্চিত তরুণী, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাদের লেখাপড়া হয়েছে, চাকরি হয়েছে। তারা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে কিশোরীদের রোল মডেলে—যারা অনেকের জীবন স্পর্শ করেছে, পরিবর্তন করতে অনুঘটকের কাজ করেছে। এদের অনেকের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও একযোগে কাজ করার সুযোগটি আমার জন্যও কম পাওয়ার বিষয় ছিলনা। দিনাজপুরে রাণীর বন্দরের স্বপ্না, রাজশাহীর দামকুড়ার নয়ন, চট্টগ্রামের চন্দনাইশে টুন্টা বড়ুয়া, ঝালকাঠির আমুয়ার মিনারা এবং এদের মত আরো অনেকে বহুকাল ধরে আমার সহযাত্রী ছিল, অনেকে এখনো আছে। এদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, ধীরে ধীরে তাদের সিএমইএসের মানুষ হয়ে ওঠা, তারপর অনেক সংখ্যক কিশোরীদের মধ্যমণি হয়ে ওঠা সবই ঘটেছে বলতে গেলে চোখের সামনে দিয়ে। সে সময় সিএমইএস গড়ে ওঠার কালে এসব কর্মীদের দেখেছি আমাদের সবার চোখে বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠতে।

স্বেচ্ছাসেবীর জীবন

নিবন্ধনের নিয়ম অনুযায়ী, এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমাদের সিএমইএস হলো একটি এনজিও। কিন্তু এর আরো ভাল পরিচয় যা আমি দিতে পছন্দ করি

তা হলো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। স্বেচ্ছাসেবা হলো মনের আনন্দের কাজ; নিজের জন্য তো বটেই সিএমইএসে আমার সকল সহকর্মীর জন্য আমি একে তাদের আপন আনন্দের কাজ হিসেবেই দেখতে চেয়েছি সব সময়—অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা দেখতে পেয়েছিও। তাদেরকে অবশ্য এ কাজের জন্য একটি বেতন নিতে হয়েছে, কিন্তু তাতে কাজটি নেহাত চাকরির জন্য চাকরিতে পর্যবেশিত হয়নি। সিএমইএসের বড় সবলতা এখানেই। এভাবে এনজিও আন্দোলনের মধ্যে এই স্বেচ্ছাসেবার আদর্শটি আমি অনেকের ক্ষেত্রে খুব লক্ষ্য করেছি, অনেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও। পরে এনজিওর ধারণার আরো বহু রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, দরিদ্রের নয় আপন উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি কিছু কিছু নেতিবাচক অর্থও করা হয়েছে, ওই সবকে প্রমাণ করার জন্য বাস্তবেও কিছু এনজিও'র অভাব হয়নি। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবার সৌন্দর্যকে ও বাস্তবতাকে এসব কোনদিন ম্লান করতে পারেনি বলেই আমার বিশ্বাস। সেই যে স্কুল থেকে কলেজে আসার পর পর বিজ্ঞান সাময়িকী বের করেছিলাম তখন থেকেই মূল কাজের মধ্য থেকে (তখন মূল কাজ ছিল লেখাপড়া) নানা ভাবে সময় মুচড়িয়ে বের করে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবায় নিজেকে সমর্পন করেছিলাম। তারপর থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আমার মজ্জাগত—তবে এই তাড়ানো বড়ই আনন্দের। সেই লেখা, সেই সম্পাদনা করা, সেই প্রুফ দেখা, কিছুই শেষ হয়ে যায়নি; কিন্তু নতুন নতুন বিচিত্র কাজ আরো যুক্ত হয়েছে। বড় আকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজও মাথা পেতে নিতে হয়েছে—বিজ্ঞান ক্লাব পরিচালনা, সব চেয়ে বড় দায়িত্ব সিএমইএস। যা ছিল নিজের বাসায় অফিস করে ছোট একটি প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে তা পরিণত হলো দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজিওতে; চালাবার কঠিন দায়িত্ব রয়ে গেলো ওই আনন্দমগ্ন স্বেচ্ছাসেবীর হাতে। ফলে ছুটিছাটা, সাপ্তাহিক ছুটি, সামাজিকতা, পারিবারিক বিনোদন, আড্ডা, পুরানো বন্ধুত্ব ঝালাই করার চেষ্টা—এসব সুযোগ খসে পড়তে লাগলো বটে কিন্তু নতুন প্রাপ্তির ঘরটিও শূন্য রইলোনা। এর মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করলাম নতুন আর এক জগত, অন্য এক বন্ধুগোষ্ঠি, অন্য সব স্বেচ্ছাসেবীর সান্নিধ্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাগলের মতো এক একটি সমস্যার পেছনে ছোটা মানুষ, আপন আনন্দে আপনি বিভোর। চোখের সামনে অনেকগুলো তরুণের জীবন বদলে যেতে দেখাটিও কম কথা নয়। তাছাড়া একই ধারায় বরাবরের মত ওই বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজের ফলে সিএমইএসের বাইরেও বিরাট তরুণ সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিতেও কিছু অবদান রাখতে পারছিলাম বলে মনে হয়েছে।

বহু বছর ধরে অন্য অনেক এনজিও ও সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এমন স্বেচ্ছাসেবী মানুষ আর প্রতিষ্ঠান প্রচুর দেখেছি। অনেক পরে এনজিও ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে বেশ কিছু বছর কাজ করার সুবাদে আরো বৃহত্তর পরিসরে এ সুযোগ পেয়েছি। যদিও তাদের দুনিয়াটি ক্রমেই কঠিন থেকে

কঠিনতর হয়ে পড়েছে, তবুও স্বেচ্ছাসেবীর স্বভাবটিই এমন যে শত বাধাতেও তাদের উৎসাহ কমেনা।

এরকম কাজ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয় সে কথা গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো কলেজে থাকতে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য মার্শাল ল'র অধীনে আমার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের মামলা ঠুকে দেবার ঘটনা থেকেই। এর পর পদে পদে তা আরো অনেক বুঝতে হয়েছে। সব প্রকারের সব বাধাকে আলাদা করে বলা কঠিন হবে, তবে সব কিছুকে এক কথায় বলা যায়—আমলাতন্ত্র। প্রথম বহু বছর সরকারী আমলাতন্ত্রকে আমাদের আনন্দের কাজে গোলাপের কাঁটা মনে করে খেলোয়াড় সুলভ মনোভঙ্গি নিয়ে এর সঙ্গে এর ভাষাতেই লড়েছি, নিজে আমলা না হওয়ার ফুর্তিটি মনে রেখে। হাজার হলেও আমার বন্ধুরাই তো তখন বেশ কেউকেটা আমলা, তাদের সহকর্মীরা ও রাজনৈতিক মনিবরা যতই কষ্ট দিক তারা কিন্তু আমাদেরকে সহায়তা দিতে ব্যগ্র ছিল, বলতে গেলে সেবার আনন্দের ভাগ তারাও পাওয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু পরে পরে যা ঘটলো সেটি রীতিমত মারমুখী আমলাতন্ত্র—যত না কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি কাগজ। তাও হয়তো এতটা কঠিন হতোনা যদি দাতা সংস্থাগুলোর তরফ থেকেও আর একটি আমলাতন্ত্র এর মধ্যে গজিয়ে না উঠতো। এখানে পরিবর্তনটি মনে হলো হঠাৎ করেই দেখা দিলো। আগে তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের মত সেবার কাজগুলোর ভালমন্দ বেশি গুরুত্ব পেতো। কিন্তু ক্রমে দেখা গেলো সেখানেও কাগজ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হলো যা ক্রমে অন্য সব সত্তাকে গ্রাস করার উপক্রম করলো। সরকারের বা দাতাদের সব আমলাতন্ত্রের উপলক্ষ ছিলো একটিই—তা হলো জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতা অবশ্যই কাম্য, কিন্তু যার জন্য জবাব দেয়া সেই কাজ করারই ফুরসত যদি জবাবদিহিতার কাগজ তৈরি করতে গিয়ে হারিয়ে যায়—তা হলে সেটিকে কী বলা যায়? কাগজের চাহিদা থাকলে তা তৈরি করার পারদর্শী মানুষ রয়েছে—কিন্তু তারা আবার আসল কাজের মানুষ নয়। কাজের মানুষ কমিয়ে কাগজের মানুষ বাড়াতে হলে, বা নিজে যে সময়টি সিএমইএসের মানুষদের নিয়ে ডুবে থাকার কথা সে সময়টি আমলাতান্ত্রিক কাগজে ডুবে থাকতে হলে, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে?

তবে এসবের মধ্যেও এই কঠিন কাজের পুরস্কার কম নয়। একটি পুরস্কার হলো শুধু সিএমইএসের দিক থেকে নয় দাতাদের দিক থেকেও একই রকম আপন ভোলা স্বেচ্ছাসেবী মনের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বাদ। একেবারে গোড়াতে যখন শুধু সুরুজ বিদ্যালয়টি শুরু করেছি তখন টেরে ডেস হোম্‌স-ফ্রান্স আমাদের সাহায্য করছিলো। সে সময় প্রায় প্রতি বছরই ইতালির ত্রিয়েস্তে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রে মাস দুয়েকের কাজের অবসরে ট্রেনে ফ্রান্স চলে যেতাম ঐ টেরে ডেস হোম্‌সের আমন্ত্রণে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সারা ফ্রান্স জুড়ে যে সব সাধারণ মানুষ সুরুজে আমাদের ছেলেমেয়েরা সহ এমনি সুবিধা-বঞ্চিতদের জন্য

টেরে ডেস হোম্‌সকে সাহায্য করছে তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা। এ কাজে সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতো জিল ডেনিল্‌স—বৃটিশ মহিলা, কিন্তু ফরাসিকে বিয়ে করে থেকে গেছেন ফ্রান্সে। কোথায় বাংলাদেশে ওই সব কিশোর-কিশোরী—এরাই জিলের মনটি জুড়ে ছিল। পরিস্কার দেখতে পেতাম চাকরির কর্তব্যে নয় ওদের টানে জিল দিনের পর দিন ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে গেছে ফ্রান্সের আনাচে কানাচে গ্রামেগঞ্জে। দুজনে টেরে ডেস হোম্‌স গ্রুপগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছি, কথা বলেছি, ওদের মেলায় উপস্থিত থেকেছি। ওর নিজের জীবন একটানা এরকম সব কাজে উচ্ছন্নে গিয়েছিলো—কিন্তু ওই কাজের মধ্যেই সে গড়ে নিয়েছিলো অন্য রকম আর এক জীবন।

জিলের মেয়ে জেনির সঙ্গে আমার প্রথম যখন পরিচয় হয় তখন সে দশ-এগার বছরে কিশোরী—ওদের বাড়িতে ফ্রান্সের উত্তরে সমুদ্র তীরের কাছে নর্মান্ডির অঁ-ফ্লো নামের ছোট্ট শহরে। ছবির মত সুন্দর এই শহরে ইউরোপের বহু চিত্রশিল্পী যায় সমুদ্রের ছবি আঁকতে—শত বছর ধরেই যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি বিখ্যাত ইম্‌প্রেশনিষ্ট চিত্রকরদের একটি বড় গন্তব্য ছিল। ওই দেখা হবার মাত্র কয়েক বছর পর জেনিকে জিল পাঠিয়েছিলো বাংলাদেশে গ্রামে গিয়ে সুরুজে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। জেনি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় সে সময় থেকেছে বেশ কিছুদিন। তার চেয়েও বয়সে বেশ ছোট আমার ছেলে কুশলের সঙ্গে সে বাসে-রিক্সায় সুরুজে চলে যেতো, কুশল তার দোভাষির কাজ করতো। অঁ-ফ্লোতে এমন বিলাসী বাগানবাড়ির মত বাড়ি ছেড়ে জিল নিজে থাকতো টেরে ডেস হোম্‌সের কারণে প্যারিসের পর্যটক-প্রিয় ঘনবসতির এলাকা মোমার্তের কাছে গিঞ্জি গলিতে একটি 'স্টুডিও' ঘরে (একটি মাত্র ছোট কামরা, টয়লেট অন্য তলায়)। এককালে ছাত্ররা থাকতো বলে এমন ঘরকে স্টুডিও বলা হয়। আমি প্যারিসে থাকলে জিল ঐ স্টুডিও আমাকে ছেড়ে বান্ধবীর বাসায় চলে যেতো। দীর্ঘ কাল জিলের এই স্বেচ্ছাসেবী জীবনের আমি সাক্ষী হতে পেরেছি। ফ্রান্সে কিংবা বাংলাদেশে এক সময় তার টেরে ডেস হোম্‌সের কাজের শেষ হয়—তার পছন্দসই ঠিক এমন কাজ সে আর পায়নি। পরে মাঝ বয়সে একটি ছোট ব্যবসা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে—'প্যারিস কনটাক্ট' নামের একটি টুরিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠান, সেই ছোট্ট বাসা থেকেই। তখনো কিন্তু তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। এদিকে সেদিনের কিশোরী জেনি আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা থেকে এমবিএ করে এখন ইংল্যান্ডে। মাঝখানে হংকং ও কুয়ালালামপুরে ছিল অনেক দিন, তখন বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসে দেখা করেছে।

আলোয়িজ মূলার নামের এক সুইস ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় না হলে সিএমইএস নিয়ে আমাদের কাজের আনন্দ কখনো এতখানি পরিপূর্ণ হতো না, আমার নিজের তো নয়ই। আলোয়িজের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবশ্য আমার

সঙ্গে পরিচয়েরও অনেক আগে থেকে। স্বাধীনতার পর পর তিনি কারিতাসের সঙ্গে কাজ করছিলেন—সে সময় সপরিবারে ঢাকার মিরপুরে থাকতেন, পরে এখানে মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ ট্রেনিং স্কুল বা সংক্ষেপে 'মট্স' নামক কারিগরি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে। সেই মট্স এখন বিখ্যাত বড় স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। আলোয়িজ একজন প্রকৌশলী, যদিও নিজেকে কারিগর অথবা কারিগরি শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে তিনি ভালবাসেন। মট্সের অনেক দক্ষ শিক্ষক তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে—তারাই এখন এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। সত্তর দশকের মাঝামাঝি মিরপুরে থাকতে এখানে আলোয়িজের দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়। তখনকার ঢাকায় মেয়ের জন্ম নিয়ে সেই বিরান মিরপুর থেকে ক্লিনিকে ছুটাছুটি করার কাহিনী তাঁর মুখে শোনেছি। ঐ বাংলাদেশে জন্ম নেয়া মেয়ে ব্রিজিট এখন একজন স্মার্ট তরুণী, ওদের বাড়ি সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্নে ওর সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। আলোয়িজ সিএমইএসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন একজন মূল্যায়নকারী পরামর্শ দাতা (কনসালটেন্ট) হিসেবে, সেই যে পরিচয়, তিনি মনে হয় একে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের মতই ভালবেসে ফেলেছিলেন। কারিগরি বিষয়গুলোর সত্যিকার বাস্ত বায়নে তাঁর জ্ঞান অতুলনীয়, তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, অবলোকন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোয়িজ হলেন অসংখ্য চমৎকার আইডিয়ার মানুষ। একই ভাবে আমাদের যে কোন আইডিয়াকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য বহু যোগসূত্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ইত্যাদির খোঁজ তাঁর কাছে পাওয়া যেতো।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে বাংলাদেশে আসলেই সিএমইএসের কথা ভুলতেননা। বলতে গেলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের মানুষ তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আলোয়িজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের। কোন চিন্তা মাথায় এলে প্রথমে তাঁর সঙ্গে এটি যাচাই করতাম, সামনাসামনি না পারলে চিঠিতে এবং পরবর্তী কালে ইমেইলে। সিএমইএসের সরাসরি সমস্যাগুলো তো বটেই, এর বাইরেও প্রায় সব বিষয়েই এটি করতাম। পরামর্শ দেয়া এক কথা কিন্তু সত্যিকার হাতেকলমে সহায়তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আলোয়িজ ঐ শেষের কাজটি করতে ওস্তাদ। তাই প্রত্যেকবার বাংলাদেশে আসার সময় সিএমইএসের এই কাজের জন্য এই যন্ত্রাংশটুকু, ওই কাজের জন্য কোন হাতিয়ার, যে সবের অভাবে আমরা বিকল হয়ে আছি তা আলোয়িজের স্যুটকেসে দিব্যি জায়গা করে নিতো। তাছাড়া তিনি জানতেন ইউরোপের কোথায় কিংবা আরো বেশি ভারতের কোথায় গেলে সমস্যার সমাধান মিলবে। আমার সঙ্গে আলোয়িজের অভ্যাসে অনেক মিল রয়েছে যেমন তার একটি হলো যে কোন আইডিয়া বোঝাতে গেলে সামনের কাগজে আঁকিবুকি করে ডায়াগ্রামের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা। দু'জনেই এসব নিয়ে নন্‌ষ্টপ কথা বলতে পারি; সিএমইএস অফিসে দুপুরের খাবার, বিকেলের নাশ্‌তা, রাতের

খাবার, রাতের আরো পরের চা সব কিছু চলছে আর আমাদের কথা ও কাজ এগিয়ে যাচ্ছে অনেক সুন্দর পরিকল্পনা রূপে—এমনটি প্রায়ই হতো। আলোয়িজের বৈশিষ্ট হলো তিনি যখন কথা বলতে থাকেন তখন অন্য জনকে খুবই ওত পেতে থাকতে হয় কখন এ কথার মধ্যে সামান্য গ্যাপ পাওয়া যাবে, নিজে কিছু বলতে পারবে। এটি অবশ্য ছিল তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহের বহিপ্রকাশ। যদিও পেশায় তখন কনসালটেন্ট—সময়ের মূল্য তাঁর অনেক, কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে তাঁরও কোন জুড়ি ছিলোনা। গাল ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আলোয়িজকে বাস্ত ববাদী কোন মানুষের চেয়ে বরং দর্শনের প্রফেসরই মনে হতো বেশি।

আলোয়িজ আমার সঙ্গে সিএমইএসের গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গায় গিয়েছেন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারিগরি দিকগুলো দেখাটাই ছিলো উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়তি অনেক কাজ হয়েছে। এমন মানুষের সান্নিধ্যে সময়টিও অদ্ভুত চমৎকার কেটেছে। একবার আমরা স্বল্পবিত্ত কৃষকের ছোট জমিতে পানি সেচ দেবার মতো আধুনিক সৌর বিদ্যুৎ চালিত কিছু ছোট পাম্প সরজমিনে পরীক্ষা করছিলাম। পাম্পগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে আলোয়িজের বন্ধু সুইজারল্যান্ডের বীল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের হাতে, তৈরি হয়েছে ভারতের একটি প্রতিষ্ঠানে। উত্তর বঙ্গের ভরা শীতে কুয়াশার মধ্যে আলোয়িজসহ আমরা দেখছি কখন পাম্পের কাজ শুরু করার মত রোদ এর সৌর প্যানেলে পড়ে, ইলেকট্রনিক্সগুলো ঠিক মত কাজ করছে কিনা। দেখা গেল পানির সঙ্গে অনেক বালি আসছে। যে ছাকনি আছে তা বদলাতে হবে, পাইপের মধ্যে কয়েকটি বাঁক আছে তা সোজা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে চলে গেলাম স্থানীয় ছোট বাজারে ওরকম পাইপ লাগাবার মত এঙ্গেল সেখানে পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

অন্যদিকে সুইস ডেভেলপমন্ট কোঅপারেশন (এসডিসি) এবং কারিটাস সুইজারল্যাণ্ড আমাদের দাতা সংস্থা হওয়াতে এবং জেনেভায় ওয়ার্ল্ড ইকোনামিক ফোরামের শোয়াব ফাউন্ডেশনের আমি একজন সামাজিক উদ্যোক্তা নির্বাচিত হওয়াতে এক সময় ঘন ঘন ওই দেশে যেতে হতো। ওখানকার কাজের ফাঁকে লুসার্নে আলোয়িজের গ্রামের বাড়িতে হানা দেয়াটি ছিল অবশ্য কর্তব্য। তখন সিএমইএসের কাজে আসতে পারে এরকম কত জায়গায় যে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই—বলতে গেলে সিএমইএসের জন্য অনেকগুলো বাতায়ন খুলে দিয়েছেন। আমার আর কিসে কিসে উৎসাহ তাও তাঁর বিচক্ষণ জানা। একবার তাই নিয়ে গেলেন জেনেভায় সার্নে অর্থাৎ নিউক্লিয়ার গবেষণার ইউরোপীয় সংস্থায়। এতবার এখানে এসেও সার্নে ঢোকার সুযোগ হয়নি—সেই সার্ন, ইউরোপীয় দেশগুলোর মিলিত পদার্থবিদ্যা ল্যাবোরেটরি যেখানে জেনেভার ও তার পাশে ফ্রান্সের বেশ কিছু জায়গা জুড়ে ভূগর্ভে রয়েছে দুনিয়ার সব চেয়ে শক্তিশালী কণিকা ত্বরক যন্ত্র লার্জ হেড্রোন কলাইডার (এলএইচসি)। আলোয়িজের ধর্মপুত্র ওখানে গবেষণা করছে, তার সুবাদে এর একেবারে ভেতরে

গিয়ে কণিকা ত্বরক যন্ত্রে এক্সপেরিমেন্ট করতে দেখলাম দুনিয়ার বহু দেশের বিজ্ঞানীদেরকে। অবশ্য সে সময় ওই যন্ত্রটি তখনো পুরাপুরি কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি।

ঢাকায় বা সিএমইএসের গ্রামের ইউনিটে বসে যেমনটি হয় লুসার্নে আলোয়িজের বাড়িতে ফিরেও ঠিক তাই হয়। তাঁর স্ত্রী ফ্রিডার আতিথ্যে আমাদের নন্ ষ্টপ আইডিয়া চর্চা। মাঝে মাঝে তাঁদের বড় মেয়ে জুডিথ আর ছোট মেয়ে বাংলাদেশে জন্ম নেয়া ব্রিজিটও এসে যোগ দেয়—ওরা কাছেই অন্য জায়গায় থাকে ও নিজেদের কাজ করে; তার সবার ছোট ছেলেটি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ—সেও আসে মাঝে মাঝে। কাছের একটি ছোট শহরে আলোয়িজের ছোট বোন পর্দার কাপড়, এবং ঘর সাজাবার অন্যান্য কাপড়ের বিশেষ ধরনের লোকজ ডিজাইন করে। পাশে একটি ছোট তাঁতে নিজেই সেটি সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে বুনে দেখে কেমন হয়। আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয় ছিল। বনের মোষ তাড়ানো, অতি ব্যস্ত, কিন্তু সব সময় আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকে এমন আলোয়িজের কোন খবর হঠাৎ করে পাচ্ছিলামনা—বহু দিন ধরে। পরে বুঝতে পারলাম রহস্যটি কী? আলোয়িজ আর ফ্রিডা দানিয়ুব নদীর পারে পারে হাঁটতে গিয়েছিলো—তা মাসাধিক কাল ধরে। হাঁটা মানে শুধুই হাঁটা নদীর পার ধরে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সব যোগাযোগ যথাসম্ভব পরিহার করে শুধু মনের আনন্দে হাঁটা। জার্মানি থেকে শুরু করে অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া এই বিখ্যাত নদীর পাশে নাকি হাঁটার চমৎকার পরিবেশ রয়েছে—রাতে ছোটখাট হোটেল, সরাইখানায় থেকে এ ভাবে শুধু পথ চলার ছুটি কাটানো। আলোয়িজ ও ফ্রিডার পক্ষেই সম্ভব এমন কাজ।

জিল বা আলোয়িজ যাদের কাজই হলো উন্নয়নের মাঠ পর্যায়ে দেখাশোনা, তারা আপন আনন্দে বিভোর হয়ে ছন্নছাড়া হয়ে সবার সঙ্গে মিশতে পারে, কাজ করতে পারে। কিন্তু ঢাকার সুইস দূতাবাসের সঙ্গে যে উন্নয়ন সহযোগী এস ডি সি রয়েছে তার প্রধান আনামারি মিভারের পক্ষে অতটা সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে যদি তা সম্ভব হতো আনামারি তাই করতেন। সিএমইএসের কাজের প্রত্যেকটি পর্যায়ে ছিল তাঁর অসম্ভব আগ্রহ। কোন বিষয়ে কোন কিছু মনে হলে, কোন কিছু আরো জানতে চাইলে সরাসরি ফোন করে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন। তরুণ তরুণীদের প্রযুক্তি অর্জনের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছিলেন আর বাংলাদেশে সিএমইএস যে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা মনে প্রাণে মানতেন; সে জন্য এর সাফল্যের কোন খুঁটিনাটি তাঁর দৃষ্টি এড়াতোনা। এ সময় সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য শহর ইন্টারলেকেনে নানা দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বড় সম্মেলন হচ্ছিলো মূলত এস ডি সি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে। এ সম্মেলনের বিষয়টি ছিল বড় চমৎকার—সিএমইএস বাংলাদেশের গরীব গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের জন্য যা করার

চেষ্টা করছিলো ঠিক তাই, শুধু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি সব দেশে দেশে সকল তরুণ তরুণীদের লক্ষ্য করে। সম্মেলনের এ বিষয়বস্তুটিকে বলা হয়েছে 'শিক্ষার জগতকে কাজের জগতের কাছে নিয়ে যাওয়া'। প্রধানত আনামারির চেষ্টায় সেই সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণই শুধু জানানো হলোনা, বরং এর প্রস্তুতির দিনগুলোতে এবং এটি শেষ হবার পর এর উপর রিপোর্ট তৈরির জন্য যে দলটি সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরে এসডিসি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কাজ করছিলো আমাকে তাতে শামিল করা হলো। সম্মেলনটি দারুণ হলো—শিক্ষার জগতকে কাজের জগতের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টির যে এত রকমের মাত্রা রয়েছে আগে তা জানা ছিলনা। সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ সম্পর্কে সচেতনতা বহুদিনের, যে কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি পর্যায় থেকে কর্মমুখী হবার জন্য সাধারণ শিক্ষার বদলে পছন্দ অনুযায়ী একাধিক স্রোতের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে—কোন কোনটি সরাসরি কারখানায় শিক্ষানবিশীর মাধ্যমে। তবে কর্ম সংস্থানের সমস্যা সেখানেও বহু রকমে দেখা দেয়, শিক্ষাকে কর্মের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজটি দেশে দেশে ভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। আমরা সিএমইএসে একেবারে তৃণমূলে সেটি সামাল দেয়ার একটি উপায় বের করেছি। অন্যান্য পর্যায়েও সমস্যা কিন্তু রয়েছে।

সম্মেলন পরবর্তী কাজ করতে গিয়ে বার্নে বেশ কিছু দিন থাকলাম। এসডিসি'র পক্ষ থেকে সম্মেলন আয়োজনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মাল্টে লিপশিনস্কি। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। তাঁর স্ত্রী ডোরা রেপোল্ড এসডিসি'র প্রধান কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মাল্টে আর ডোরার সঙ্গে বহুবার আলাপের সুযোগ হয়েছে তাদের নিমন্ত্রণে গিয়ে অথবা সভা সমিতিতে। চমৎকার এই দম্পতির সান্নিধ্য সিএমইএস কে তুলে ধরতে আর ঐ সম্মেলন পরবর্তী কাজ করতে খুব সহায়ক হয়েছিল। বহুদিন পর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখেছিলাম ডোরা রেপোল্ড বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে ঢাকায় এসেছেন। এত দিন পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে সুইস রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের দায়িত্বও পালন করতেন। ডোরা আসার পর মাল্টেও একটি আঞ্চলিক দায়িত্ব নিয়ে এসে ঢাকা থেকে কাজ করেন। ঢাকায় তখন নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে দেখা হতো। একজন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রদূতকে এরকম বন্ধু হিসেবে পেয়ে খুব ভাল লাগতো, কূটনীতির জগত কেমন করে চলে জানতেও পেরেছি অনেক ভাল ভাবে। আনামারি পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসডিসি'র দায়িত্ব নিয়ে জোহান্সবার্গে চলে যান। অবশ্য এর পরও তাঁর সঙ্গে দু'একবার দেখা হয়েছে। একবার লুসার্নে আমার একটি পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিলো। খুব খুশি হলাম যখন দর্শকদের মধ্যে আনামারিকে দেখতে পেলাম—ট্রেনে বার্ন থেকে এসেছেন শুধু এতে উপস্থিত থাকতে। ডোরা তিন বছর রাষ্ট্রদূত থাকার পর দেশে ফিরে যান। এর পর যে দু'তিনবার সুইজারল্যান্ডে গিয়েছি ডোরা আর মাল্টে

দম্পতির সঙ্গে দেখা করে এসেছি প্রত্যেকবার। সিএমইএস ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহে কোনদিন ভাটা পড়েনি।

আমাদের দেশেই এনজিওধর্মী কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী এমন বেশ কিছু মানুষকে কাছে থেকে দেখেছি অশোকা ফাউন্ডেশনের শুরু থেকে একজন সহযোগী সদস্য হবার সুবাদে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধান কার্যালয় করে এই অশোকা ফাউন্ডেশন দুনিয়ার সর্বত্র বিস্তৃত—বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে। এর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হলেন বিল ড্রেটন। ছোটখাট দেহের ভাবুক প্রকৃতির এই অতি অমায়িক মানুষটিকে চট করে দেখলে একজন আমেরিকান না মনে হয়ে বরং আমাদের দেশের একজন বিনয়ী স্কুল শিক্ষক মনে হবে। তাঁকে বলা যায় স্বেচ্ছাসেবীদের স্বেচ্ছাসেবী। প্রত্যেক দেশে গিয়ে নিজে পরিশ্রমী অনুসন্ধান করে ওখানকার এরকম সৃজনশীল কর্মীদেরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে, নিজের উদ্ভাবনশীলতাকে ব্যবহার করে কোন না কোন ভাবে পীড়িত মানুষের সমস্যার সমাধানে সাফল্য পেয়েছে, অথচ নিজের জীবন-জীবিকার তাগিদে এতে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছেনা। ওদেরকে অশোকার পক্ষ থেকে ফেলোশিপ ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে আরো ফলপ্রসু করে তোলার চেষ্টা করা হয়। অশোকা ফেলোদের নির্বাচনে ও তাদের সংগঠনে সে সময় বিল ড্রেটন বন্ধুভাবে আমাকে কিছুটা জড়িত করেছিলেন। এ ভাবেই বেশ কিছু অশোকা ফেলোর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। ফেলোদের ছিল বিচিত্র সৃজনশীলতা—কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাপড়া আরো আনন্দদায়ক করার জন্য নতুন পদ্ধতি বের করেছেন, কেউ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক মা'দের শিশু-যত্নের ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছেন, কেউ প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে বিশেষ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে ব্যবহার করছেন ইত্যাদি। তাদের অনেকের সৃজনশীলতা, তাদের আত্মনিবেদিত জীবন দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিলনা। যেমন ফিলিপ গায়েনের কথাই ধরা যাক। এই তরুণের সঙ্গে ভাল পরিচয় হয় কলকাতায় অশোকার এক সম্মেলনে গিয়ে বেশ কয়েক দিন হোটেলের একই কক্ষে অবস্থানের কারণে। একটানা আলাপে বুঝলাম আদিবাসীদের স্বার্থ নিয়ে ফিলিপের যে সংগ্রাম তা একদিকে একজন নিবেদিত গবেষকের, অন্যদিকে একজন লড়াকু সৈনিকের; অথচ সে নিজে আদিবাসী নয়। তার গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ময়মনসিংহের বনাঞ্চলে গারোরা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা আদিবাসীরাও এর থেকে বাদ যায়নি। বন এবং আদিবাসী এ যেন তার সত্তার সম্পূর্ণ অংশ হয়ে পড়েছিলো। পরে এই উভয় বিষয় সম্পর্কে তার লেখা অনেক বই পড়ে এ বিষয়ে ক্রমেই নিশ্চিত হয়েছি। শুধু তথ্য সংগ্রহ করে এ ধরনের বই লেখা সম্ভব নয়, যদি না মনে প্রাণে ঐ মানুষদের জীবনের ও সমস্যাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে না যাওয়া যায়।

অশোকার বাংলাদেশী ফেলোদের সঙ্গে যেমন তেমনি অন্যান্য দেশেরও কারো কারো সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হতে হয়েছে। এদিক থেকে ব্রাজিলের কিছু অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিওতে যে ধরিত্রী সম্মেলন হয় আমি তাতে এনজিওদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাংলাদেশের এনজিওদের পক্ষ থেকে এর জন্য 'এনজিও বক্তব্য' তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো সিএমইএসকে। দেশের সব প্রাসঙ্গিক এনজিও এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি সম্মেলন আহবান করে সিএমইএস এই বক্তব্য খাড়া করার ও প্রকাশ করার কাজটি সম্পন্ন করেছিলো—আমার জন্য সেটি ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। একটি সুন্দর বইয়ের আকারে ধরিত্রী সম্মেলনের এনজিও ফোরামে পেশ করার জন্য এই ডকুমেন্ট তৈরি করেছিলাম। বিশ্বসমাজ ধরিত্রী সম্মেলনে নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশে, বন রক্ষায়, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে এবং দারিদ্র দূরীকরণে কী সমঝোতায় আসবে এগুলোই ছিল প্রশ্ন। এক কথায় আমাদের একটি মাত্র এই বিশ্বকে বাঁচাতে এবং বাংলাদেশের মত দেশকে বাঁচাতে বিশ্ব কী পদক্ষেপ নেবে, কী নেয়া উচিত সে নিয়ে আমাদের বক্তব্যগুলো আমরা তুলে ধরেছিলাম।

ধরিত্রী সম্মেলন শুরুর আগে আগে আমি ইতালির ত্রিয়েস্তে ছিলাম। সেখান থেকে ব্রাজিলে যাওয়ার এমন একটি ব্যয়-সাশ্রয়ী টিকেট যোগাড় করলাম যা রোমের কোন এক অখ্যাত ছোট বিমান বন্দর থেকে ছোট এক বিমানে লন্ডনে এনে আমাকে ব্রাজিলের পথে রওয়ানা করিয়ে দেয়ার কথা। সেই বিমান বন্দর ও বিমানের এমন দুরবস্থা যে বহু ঘন্টা বিলম্বে লন্ডন পৌছতে হলো। বিলম্বের কারণ যা বলা হলো তা অদ্ভুত। লন্ডন যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ তেল নিতে হবে তা নিলে বিমানটি এত ভারী হয়ে পড়বে যে ওই বিমান বন্দরের চারিদিকের পাহাড়গুলো দ্রুত ওপরে ওঠে অতিক্রম করতে পারবেনা। তাই অল্প তেল নিয়ে আগে অন্য একটি বিমান বন্দরে গিয়ে পুরো তেল নিতে হবে। তারপরও লন্ডন থেকে রিও'র বিমান ধরতে পারলাম কারণ সেখানকার বিমানটিও আরো বেশি বিলম্ব করেছে বলে। রিও'র বিমান বন্দরে তখন অসংখ্য প্রতিনিধিদের আগমনে এলাহি অবস্থা। কোন হোটেল বা অন্য কোন থাকার জায়গায় তিল ধারনের উপায় ছিলনা। রিওতে অশোকার প্রতিনিধি সিন্ডিকে ফোন করে করে এক তরুণ ব্রাজিলিয়ান দম্পতির বাসায় পেয়িং গেষ্ট হিসেবে জায়গা পেলাম। সমুদ্র পারে বিশাল তাঁবুতে এনজিও ফোরাম বসেছিলো ধরিত্রী সম্মেলনের। সারা দুনিয়ায় এ নিয়ে যে তুলকালাম চলছিলো তার অনেক খন্ড খন্ড চিত্র ওখানে নানা সভায় উপস্থিত থেকে পেলাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জি ডব্ল্যু বুশ (বাবা বুশ, ক্লিনটনের আগে যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন) যখন সোজা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াকে তুচ্ছ করে এর নিয়ন্ত্রণের বিধি নিষেধে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করলেন, তখন তার প্রতিবাদ মিছিলেও শামিল হলাম। কিন্তু সেবার আমার সব চেয়ে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা

হলো আর এক নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষাত ধরিত্রী সম্মেলনের পরে—তা রিওতে নয় তার থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ব্রাজিলের উত্তর অংশে।

কিছু স্থানীয় অশোকা ফেলোদের সঙ্গে যুক্তি করে বিল ড্রেটন আমাকে ব্রাজিলের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পেরনামবুকো প্রদেশের রাজধানী রেসিফেতে পাঠাতে মনস্থ করলেন। ঠিক রেসিফেতেও নয় এর থেকে কিছু দূরে ওলিন্দা নামের একটি ছোট ঐতিহাসিক শহরে। উদ্দেশ্য হলো এখানে অশোকার কাহমান লুসিয়া বেন্ডিরা নামের এক মহিলার নেতৃত্বে নারী উন্নয়নে যে কাজ চলছে তার সঙ্গে আমাদের কিশোরী কর্মসূচির যোগাযোগ স্থাপন করা। ইতোমধ্যে রিওতে দেখেছি ব্রাজিলের মানুষরা খুবই শ্রেণী বিভাজনের শিকার। এর বিশাল জনসংখ্যার প্রধান উৎস হচ্ছে আদিবাসীরা (যাদেরকে এখানকার নানা 'ইন্ডিয়ান' গোত্রের মানুষ বলেই সবাই জানে), পর্তুগাল থেকে আসা দখলকাররা এবং আফ্রিকা থেকে এক সময় দাস হিসেবে আনা কালো মানুষরা। এখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব আধিপত্য এখনো ওই পর্তুগীজ বংশোদ্ভুতদের হাতে—গায়ের রঙ যত বিশুদ্ধ সাদা তাদের দবদবাও তত বেশি। অধিকাংশ মানুষ কিন্তু মিশ্র বংশের—সাদা-কালো, সাদা-আদিবাসী, কালো-আদিবাসী। মিশ্রণের প্রকার ও বৈচিত্র অসংখ্য রকমের। পেরনামবুকো অঞ্চলে মনে হলো আদিবাসী মিশ্রণটিই বেশি, কালো বা মিশ্র কালোর সংখ্যাও অনেক। মুখে যতই বলা হোক যে ব্রাজিলে বর্ণবাদের স্থান নেই, দেখলাম গরীব মানুষ এবং নানা ভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ মানেই ঐ আদিবাসী ও কালোদের নানা মিশ্রণের মানুষ। রিওতেও দেখেছি এখানকার অত্যন্ত অরাজক অবস্থা ও খুন-খারাবিতে ভর্তি কুখ্যাত 'ফাবেলা'গুলোর (বস্তি) বাসিন্দারাও এমনই সব গরীব মিশ্র বর্ণের মানুষরাই। আমি যে তরুণ সাদা দম্পতির সঙ্গে থাকতাম তাদের মুখেও শুনেছি নগরের গরীব মানুষ, বিশেষ করে পথ-শিশুদের করুণ অবস্থার কথা। পথশিশুদের নানা ছিঁচকে অপরাধের কারণে মার্কেটে খদ্দের কম আসে বলে মার্কেট সমিতি প্রায়ই বন্দুকওয়ালা লোক ভাড়া করে রাতে ঐ শিশুদের মেরে ফেলার জন্য—এমন কথাও শোনেছি।

ওলিন্দাতে কাহমান ও তার সহকর্মীরা ওখানকার আদিবাসী ও মিশ্র আদিবাসী মেয়েদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলো। পুরো অঞ্চলে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, অথচ অত্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত। একটি জিনিস বাড়তি ভাবে তাদেরকে খুব আঘাত করছে তা হলো কিছুটা বাধ্যতামূলক ভাবে পরিবার পারিকল্পনা। তারা বলছে স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে তাদেরকে নানা ভাবে বাধ্য করা হচ্ছে, এবং যে সব পদ্ধতি তার জন্য অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে তা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং অনেক যন্ত্রণা এজন্য তাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে। তাদের বহু ক্ষোভের মধ্যে এটিই সব চেয়ে প্রকাণ্ড হয়ে ওঠেছে বলে মনে হলো। আমাদের কিশোরী কর্মসূচির কথা শুনে তাদের মধ্যে দারুণ সাড়া

জাগলো। কাহমান নিজেও মিশ্র বর্ণের মেয়ে—যদিও সে মধ্যবিত্তের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমার ইংরেজিতে বলা কথা সে পর্তুগীজে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। ওর মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্ন আসলো ঐ ৪০/৫০ জন মহিলাদের নানা জন থেকে। আমাদের কার্যক্রমের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের আগ্রহের সীমা নেই। একটা জিনিস তাদের কাছে কেন জানি খুব বিস্ময়ের মনে হলো, আমি নিজে পুরুষ হয়ে মেয়েদের জন্য এত সব কিছু ভাবলাম কেন, করলাম কেন। মনে হলো তারা বলতে চাচ্ছে ওখানে সেটা কেউ করবেনা। কাহমানও দেখলাম ওদের সঙ্গে একমত। কাহমান ও ঐ মহিলারা মিলে রীতিমত একটি প্রস্তাব পাশ করলো—আমাকে সম্মান সূচক 'নারীত্ব' দিয়ে তাদের সমিতির সদস্যভুক্ত করে নিলো—এই নিয়ে তাদের সে কী উচ্ছাস! ওদের কারো কারো বাড়ি ঘর দেখাতে নিয়ে গেলো কাহমান- সংগ্রামী জীবনের ছাপ চারিদিকে। তাদের জীবনের সঙ্গে কাহমানকে যেভাবে একাত্ম মনে হলো তাতে মনে হলো এমন সমস্যাসংকুল জায়গাতেই বোধ হয় নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী জীবনগুলো গড়ে ওঠে—যার নিজের আনন্দও ঐ সমস্যার হদিশ পাবার আনন্দের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

পরে ব্রাজিলে আর একবার গিয়ে পরিচিত হয়েছিলাম ভিন্ন রকম একজন স্বেচ্ছাসেবী ফাবিয়ো রোজার সঙ্গে। সেবার গিয়েছিলাম শোয়াব ফাউন্ডেশন ও অশোকার একটি সম্মেলনে সাঁ পাওলোতে। কিন্তু ওখানে পৌছার আগে গেলাম ব্রাজিলের একেবারে দক্ষিণে পোর্তো আলেগ্রে নগরে—নামের অর্থই যার 'আনন্দময় বন্দর'। এই পোর্তো আলেগ্রে ব্রাজিলের সর্ব দক্ষিণের প্রদেশ রিও গ্রাণ্ডে ডে সুলের রাজধানী। এ অঞ্চলের সঙ্গে ব্রাজিলের অন্য অংশের চেয়ে বরং আর্জেন্টিনারই মিল বেশি; পর্তুগীজ, জার্মান, ইতালীয়ান বংশোদ্ভূত সাদা লোকরাই অতীতে এখানে অভিবাসী হয়েছে, নগরাঞ্চলে সত্তর ভাগ মানুষই সাদা। বিশেষ করে অতীত যোদ্ধা ও বর্তমান 'কাউবয়' হিসেবে গাউচো বলে কথিত বেপরোয়া মানুষেরাই এখানে চোখে পড়ার মত। ব্যাপক হারে গোচারণ ও গো-মাংস রফতানী করে সমৃদ্ধ এখানকার অভিজাতরা। ওদেরই একজন ফাবিয়ো রোজার কাজ দেখতেই এখানে আসা। যদিও দেখতে ও পারিবারিক পরিচয়ে ফাবিয়ো ঐ অভিজাতদের একজন কিন্তু তখন তিনি অশোকা ফেলো এবং স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে ঐ স্বেচ্ছাসেবীদের একজনে পরিণত হয়েছেন। পোর্তো আলেগ্রে থেকে কিছু দূরে এনক্রুজিলহাদা নামের একটি দুর্গম গ্রামীণ অঞ্চলকে তিনি তাঁর এখনকার কর্মক্ষেত্র করে নিয়েছেন। তাঁর সংগ্রাম মূলত দরিদ্র মানুষদের কাছে বিদ্যুৎ ও কৃষি উন্নয়নের উপায় পৌঁছে দেয়া। তাঁর মনে গেঁথে আছে এই দুটি জিনিস পেলে তারা বাঁচবে। প্রথমে বিশেষ উপায়ে সাধারণ বিদ্যুতের সরবরাহ তাদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় অসহযোগিতায় সেটি ভেস্তে গেছে। আবার নতুন করে যখন শুরু করলেন তখন সম্বল হলো সৌর বিদ্যুৎ। আমাকে নিয়ে গেলেন ঐ এনক্রুজিলহাদায়।

এ এক বনে ঢাকা পাহাড়ি এলাকা—তার মাঝে মাঝে এক ঘর থেকে অনেক দূরে আর এক ঘর এমনি করে দরিদ্র কালো মানুষদের বাস। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ওখানে যাওয়ার পথে বৃষ্টি দেখে ফাবিয়ো এক দোকানে থেমে কয়েকটি খুব বড় পলিথিনের ব্যাগ কিনে নিয়েছিলেন। দেখিয়ে দিলেন কী ভাবে মাঝখানে একটি বড় ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে নিতে হবে একটি বর্ষাতির মত পরার জন্য। আর একটি ছোট ব্যাগ টুপির মত করে পরে মাথা পানি থেকে বাঁচাতে হলো। অনেক পানি কাদা ভেঙ্গে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমরা এক এক বাড়িতে যাই আর ফাবিয়ো হাঁকডাক করে বাড়ির মানুষদের জড়ো করে। পাহাড়ের ঢালে বনের ভেতর সামান্য কিছু জায়গা কুপিয়ে জমি তৈরি করে তারা কোন মতে কিছু কৃষি কাজ করার চেষ্টা করে বাড়ির সংলগ্ন জায়গাতেই। ওর মধ্যেই ফাবিয়ো তাদের দেখিয়ে দেন কীভাবে ভাল জাতের শাক সবজি বা ফসল করা যায়, নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, মাটি যেন ধুয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা যায়। ওই দিন বৃষ্টির মধ্যেই জমিতে বসে তিনি দেখলেন পদ্ধতিগুলো কাজ করছে কিনা। তারপর বাড়ির ভেতরে যেখানটায় সৌর বিদ্যুতের ব্যাটারিটা রাখা আছে সেখানে গেলেন। ব্যাটারিটি ভেতরে হলেও ছোট সৌর প্যানেল মেলে দেয়া রয়েছে সামনে অথবা ছাদে। ব্যাটারিটি খুব যত্ন করে বিছানার পাশে সাধারণত রাখা আছে। ব্যতিক্রমী বিষয় দেখলাম ব্যাটারির ওপরে রাখার জন্য পুতুলের সাইজের মা মেরির একটি মূর্তিও সঙ্গে দিয়েছেন ফাবিয়ো। ওরা সবাই ধর্মপ্রাণ মানুষ—খুব তাজিমের সঙ্গে রেখেছে মেরির মূর্তিকে, সঙ্গে ব্যাটারিকেও। বাড়িতে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে, ভীষণ খুশি এ নিয়ে—কাজ করতে খুব সুবিধে হয়। এটি যখন ছিলনা নিজেদেরকেও আরো প্রত্যন্ত, আরো অসহায়, মনে হতো। এসব কথাই তারা বোঝালো। বহুদিন লেগেছে ফাবিয়োর এ কাজে সফল হতে। সৌর বিদ্যুতের যে সিষ্টেম তার দাম একবারে বুঝিয়ে দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। একটু একটু করে সে দাম তাদের কাছ থেকে নিতে হয়, তাও দাম অনেক কমিয়ে। ফাবিয়ো এটি করতে পারেন কারণ তিনি বড় লোকদের কাছে বিক্রয় করার জন্য আলাদা একটি সৌর বিদ্যুতের কোম্পানি করেছেন। তার লাভ থেকে দরিদ্রের সৌর বিদ্যুতে সাশ্রয় করা হয়। এখানকার মানুষের ভরসা ছিলনা এতরকম আবহাওয়ার মধ্যে সৌর বিদ্যুত সিষ্টেম থেকে সব সময় তারা বিদ্যুৎ পাবে। এটি নিজেরা চালাতে পারবে এমন আত্মবিশ্বাসও ছিলনা। এসব আস্থা আনতে অনেক সময় লেগেছে। কিন্তু একটি একটি করে এখানে অনেক দরিদ্র-ঘরে সৌর বিদ্যুৎ দিতে পেরেছিলেন ফাবিয়ো। তাঁর কথা—প্রথমে 'এনক্রুজিলহাদা, তারপর ব্রাজিল, তারপর দুনিয়া; তবে প্রথমে এনক্রুজিলহাদা'। কাদায় মাখা, বৃষ্টিতে জব জব, পলিথিনের ব্যাগ পরা ফাবিয়োকে দেখে কে ভাববে যে তিনি পোর্তো আলেগ্রের অভিজাতদের একজন।

বই আর রেডিয়ো-টিভির মাধ্যম

সিএমইএসের কাজের জন্য বহু রকমের বিষয়ে লেখালেখি করতে হয়েছে, ছাপাতেও হয়েছে, যা ছোটবেলা থেকে করে আসা লেখালেখির তুলনায় ভিন্ন। এর মধ্যে 'মোমবাতি তৈরি' থেকে শুরু করে কিশোরী ক্ষমতায়নের জন্য 'স্বপ্ন দেখার সাহস' পর্যন্ত বিচিত্র রকম বই লিখেছি; অনেক লেখা নিয়মিত লিখতে হতো সিএমইএসের পত্রিকাগুলোর জন্য—'কিশোরী' ও 'অংকুর বিকাশ'। মৌলিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই সহ এত রকম জিনিস ছাপানো হতো যে এক সময় একটি প্রেসই বসিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের অফিসের পাশে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এই পুরানো মিনি অফসেট মেশিনটি কিনেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুদ্রণের মান আরো ভাল করার প্রয়োজনে নিজেদের প্রেসে ছাপানোর চিন্তাটি বাদ দিয়েছিলাম।

সমস্ত কিছুর মধ্যে সাধারণ পাঠকের জন্য বিজ্ঞানের লেখালেখিও অব্যাহত রেখেছি, যদিও সিএমইএসের লেখা আমার সময়ের উপর যথেষ্ট ভাগ বসিয়ে রেখেছিলো। বিজ্ঞানের লেখা অব্যাহত রাখার একটি চাপও ছিল বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশের প্রয়োজনে। পদার্থবিদ্যা ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতিগুলো বোঝার চেষ্টা এবং তা নিয়ে বলা, লেখা, বা রেডিয়ো কিংবা টেলিভিশনে সম্ভবমত সম্প্রচার করা—এটি আমার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। সিএমইএস যেমন আমাকে গ্রামের কিশোর কিশোরী ও তরুণ সমাজের কাছাকাছি এনে দিয়েছিলো তেমনি বই প্রকাশের জগত আর রেডিয়ো-টিভি সম্প্রচার জগতের কারণে আরো ব্যাপকতর অর্থে দেশের নতুন তারুণ্যের কাছাকাছি আমি বরাবর থাকতে পেরেছি। বলতে গেলে এই সান্নিধ্যের অনুভূতিটি আমি নিজের প্রজন্মের মানুষ বা তারও আগের প্রজন্ম থেকে শুরু করে পরের প্রজন্মেও বিস্তৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এটিই আমি আমার জীবনের সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে করে এসেছি। লেখার সুযোগ বরাবরই ছিলো—সেই ছোটবেলা থেকেই ছিলো। বলার আর সম্প্রচারের সুযোগ এখন ক্রমে বাড়ছিলো। সত্তরের দশক থেকে এর সঙ্গে আরো একটি মাত্রা যুক্ত হলো তা হলো বই আকারে লেখা প্রকাশের। বাংলা একাডেমি নিজের উদ্যোগে আমাকে দিয়ে 'জাতি, সমাজ ও বংশগতি' নামের অনুবাদ বইটি লিখিয়ে প্রকাশ করেছিলো সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। সেটিই ছিল আমার প্রথম প্রকাশিত বই। স্বাধীনতার পর আরো বই প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম, কারণ এবার প্রকাশকদের মধ্যে আমার কাছ থেকে বিজ্ঞানের বই পাওয়ার চাহিদা আসছিলো, যদিও তখন এরকম প্রকাশকের সংখ্যা ছিলো হাতে গোণা।

অনেকদিন থেকে বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য এবং কিছু কিছু অন্য প্রকাশনার তাগিদে প্রচুর লেখা লিখেছি; মোটামুটি বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা, দর্শন—এসবের মধ্যেই লেখাগুলো সীমাবদ্ধ থাকলেও তাতেও বিষয়-বৈচিত্র কম ছিলনা। কিছু কিছু

লেখার উপলক্ষটি ছোটরা কিন্তু আসলে ওগুলো বড়দের পাতেও কম স্বাদের হবেনা। অন্যগুলো সরাসরি বড়দের জন্য, যারা ওসব বিষয়ে আমার মতই আনন্দ পায়। তাই বইয়ের জন্য নতুন করে না লিখে এই আলাদা আলাদা প্রকাশিত লেখাগুলোকেই বইয়ের রূপ দিতে লেগে গেলাম। একই ধরনের বিষয়ে অনেক লেখা থাকার সুবিধা হলো এর সবগুলোকে একটি সাধারণ থীমের একটি বইয়ের মধ্যে আনা যায়। এ পর্যায়ে প্রথম বইটি ছাপলো 'বর্ণ মিছিল' নামের প্রকাশনা। বর্ণ মিছিলের কর্ণধার তাজুল ইসলাম সাহেব ছিলেন বেশ বিদগ্ধ ব্যক্তি—তিনি খুব যত্ন নিয়ে আমার নানা লেখার এই সংগ্রহটি ছাপিয়েছিলেন; আসলে ও সময় সংস্কৃতিমনা প্রকাশকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তবে বই দেবার জন্য নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে এবং একের পর এক তা ছাপিয়ে গিয়ে সে সময় আমাকে অনেক বইয়ের লেখকে পরিণত করেছিলেন 'মুক্তধারার' চিত্তরঞ্জন সাহা। প্রকাশনার জগতে তখন তিনি গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি। মুক্তধারা নিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ স্বাধীনতার পর থেকে হলেও এ জগতে তাঁর বিচরণ অনেক আগে থেকে 'পুঁথিঘর' নিয়ে। নোয়াখালীর চৌমোহনীর ঠিকানার পুঁথিঘর সারা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল ছোট বড় সবার পাঠ্য বই, নোট বই ইত্যাদির জন্য।

পুঁথিঘর ছিল ব্যবসায়িক ভাবে অত্যন্ত সফল একটি প্রতিষ্ঠান। মুক্তধারার মাধ্যমে চিত্তবাবুর নতুন প্রকাশ ঘটেছিলো সৃজনশীল সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। সেই সাহিত্য শুধু সনাতন অর্থের মধ্যে সীমিত ছিলনা, তিনি চাইতেন জ্ঞানের সকল বিষয়ে তাঁর প্রকাশনা বিস্তৃত হোক। বিজ্ঞানের বইয়ের ব্যাপারে আমার উপর তাঁর খুব আস্থা ছিলো। এক পর্যায়ে শুধু আমার পাণ্ডুলিপি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, আমাকে বলতেন ভাল তরুণ লেখক খুঁজে পেলে এবং আমি যদি সুপারিশ করি তা হলে তিনি তার বই ছাপাতে এক পায়ে খাড়া। ওভাবে আমার সুপারিশে যাদের বেশ কিছু বই তিনি ছাপিয়েছিলেন তার মধ্যে পদার্থবিদ্যায় আমার ছাত্র সুলেখক স্বপন কুমার গায়েনের কথা বলতে পারি। সিএমইএসের প্রথম পর্যায়ে জড়িত থেকে স্বপন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিল। কৃতী পদার্থবিদ হয়ে সে বহুদিন ধরে নিউয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছে।

মুক্তধারা থেকে এক এক করে আমার বই যখন বেরুচ্ছে তখন এর দেখাশোনা করার জন্য আমাকে প্রায়ই বাংলা বাজারে মুক্তধারার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যেতে হতো। এই বাংলাবাজার একটি অনন্য জায়গা। এর সঙ্গে আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়েছিলো ভূঁইয়া ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছাত্র থাকাকালে। সে সময় বাংলাবাজার আমার বিচরণক্ষেত্র থেকে দূরে থাকলেও ইকবালের ওটিই ছিল স্বাভাবিক চারণ ভূমি। সে ওখানে নতুন বই এবং তারো চেয়ে বেশি পুরানো বইয়ের সন্ধানে থাকতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে। দেশের সব প্রধান প্রকাশনা সংস্থার কার্যালয় এই একটি জায়গায় বহু দিন আগে থেকেই। বইয়ের

কেন্দ্রীয় বাজারটিও এখানেই। এখান থেকে বই চলে যায় সারা দেশের নানা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব বইয়ের দোকানে তো বটেই, তাছাড়া আনাচে কানাচে গ্রামেগঞ্জের ছোটছোট সব বই বিক্রেতাদের কাছে—বাজার, হাটখোলা, ছোট বড় যাবতীয় রেলওয়ে স্টেশন সব খানে। এভাবে বই ছড়িয়ে দেয়ার একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। অনেক প্রকাশকের ওখানেই রয়েছে নিজেদের প্রেস—যেমন মুক্তধারার। ওখান থেকে বেরুচ্ছে ফর্মা ফর্মা বই, বাইন্ডিং হয়ে প্যাকেট হয়ে চলে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে। এসব কর্মযজ্ঞ দেখেও আনন্দ লাগে। বাংলাবাজারে যে একটি রমরমা পুরানো বইয়ের বাজার আছে, দুর্লভ বইয়ের বাজার আছে—তাও জেনেছিলাম ভূঁইয়া ইকবালের কাছেই।

তখন নিজের বই ছাপাবার তাগিদে নবাবপুর, বাহাদুর শাহ পার্ক হয়ে চলে যেতাম বাংলাবাজারের দিকে—এই একটি কাজ আমাকে এসময় ওইমুখী করতো। মুক্তধারার বড় অঙ্গনটিতে ঢুকে খবর দিলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়তো স্বয়ং চিত্তবাবুর দরবারে। চিত্তবাবু ব্যস্ত মানুষ—নিজের নেশা পেশা প্রকাশনার ব্যবসা ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁকে অনেককে সময় দিতে হয়; তাছাড়া প্রকাশক সমাজেরও তিনি তখন মধ্যমণি। তবুও বেশ সময় নিয়েই নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হতো—আমার প্রকাশিতব্য বইগুলোর খুঁটিনাটি নিয়েই আলাপ হতো সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে বড় একটি প্লেটে সাজানো অনেক মিষ্টি চলে আসতো। তাঁর দফতরেই আমার বলতে গেলে সব চেয়ে বেশি মিষ্টি খাওয়া হতো। তাঁর সঙ্গে আলাপ সেরে কোন কোন দিন চলে যেতাম বই তখন যে পর্যায়ে রয়েছে সেই বিভাগে—প্রুফ দেখা, ছবি সমন্বয় করা, মেশিন প্রুফ দেখা, প্রচ্ছদ দেখা—ইত্যাদি। এ ভাবে বেরুলো আমার 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নামের বইটি প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে। 'লঘু-গুরু বিজ্ঞান' বইটির কিছু কিছু অংশে অপেক্ষাকৃত হালকা মেজাজের কিছু লেখা আনার চেষ্টা করেছি। 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট' বইটি বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদেরকে যে সব বিজ্ঞানের কাজের পরামর্শ বিভিন্ন সময় দিয়েছি সেগুলোকে কেন্দ্র করেই। কোন কোন বই ছিল বেশ গুরু গম্ভীর প্রকৃতির—তবে সেগুলোর সংখ্যা বেশি নয়। আমার এমনি একটি বইয়ের নাম 'শিক্ষা বিজ্ঞান দর্শন'। প্রথম দিকের এসব বেশির ভাগ বই মুক্তধারার প্রকাশিত। এখন বইগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় তখন মুদ্রণের ও অঙ্গসজ্জার কেমন দৈন্য ছিল। এরপর মাত্র দু'এক দশকের মধ্যে সব দিক থেকে বইয়ের অঙ্গ সৌষ্ঠবে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তবে ভাল কথা হলো মুক্তধারায় আমার প্রথম প্রকাশিত সেই বইগুলোর অধিকাংশই আধুনিকতর কালে অন্য প্রকাশকরা উন্নত মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা ব্যবস্থায় পুনর্মুদ্রণ করেছে। অবশ্য বেশ আগে থেকেই অন্য কিছু প্রকাশক বইয়ের উন্নততর মুদ্রণের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছিলো, তাদের কোন কোনটি আমার নতুন বইয়েও। এরকম প্রকাশকদের মধ্যে মাওলা ব্রাদার্স এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। তখন এর স্বনামধন্য

কর্ণধার আতিকুল মাওলা ছিলেন শাকুর ভাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শাকুর ভাইয়ের কাছে শুনতাম তিনি কী বড় মাপের প্রকাশক ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরস্পর দুই ভাই—ছোট ভাই মাহমুদুল হকই পরে মূল মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী। এই মাহমুদই তার কৈশোরে সিএমইএসে আমাদের অনন্য প্রকাশনা 'পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজের' নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে কাজ করেছে—যে কথা আগে বলেছি। মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী হিসেবে মাহমুদ আমার অনেকগুলো বই প্রকাশ করেছে। এসব বইও বেশির ভাগ বিজ্ঞান সাময়িকীতে আমার নানা লেখার সমন্বয়ে তৈরি—নাম থেকে বুঝা যায় কীভাবে তাদের বাছাই করেছি। যেমন 'ছোট প্রাণ ছোট কথা'—নানা উদ্ভিদ, পোকামাকড়, অণুজীব এসব বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে। এটি ছাড়া আরো একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার শরণাপন্ন হয়েছি নানা বিষয়কে একই শিরোনামের অধীনে আনার চেষ্টায়—সেটি হয়েছে 'আকাশ, আলোক, তনু মন প্রাণ' নামের বইটিতে। 'স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ' বইটিতে অবশ্য সেটি সম্ভব হয়নি, তাতে ময়ূরীর কেন বাহারী ও লম্বা লেজের ময়ূরকে পছন্দ তার বিবর্তন তত্ত্বগত ব্যাখ্যা নিয়ে লেখা প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধ হওয়াতেই এই নাম; এই বইয়ের বাকি লেখাগুলোও অবশ্য প্রধানত এমনি সব জীবতাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়েই। এই সব বই এবং আরো অনেক ক'টি প্রকাশ করেছে মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স থেকে। আর মাহমুদের বড় ভাই বিদগ্ধ প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক তার আলাদা প্রকাশনী 'সুবর্ণ' থেকে প্রকাশ করেছে আমার আরো সাম্প্রতিক কালের অনেকগুলো বই; 'মহাবিশ্বে মানুষ' নামের পুরো একটি সিরিজ। তা অবশ্য অনেক পরের কথা। এই প্রধান প্রকাশকরা মুক্তধারা, মাওলা ব্রাদার্স, সুবর্ণ ছাড়া আরো কিছু প্রকাশক দু'একটি করে বই ছাপিয়েছে—যেমন *সময়* প্রকাশনা একটু ভিন্ন মেজাজের আমার দুটি বই প্রকাশ করেছে। একটি হলো 'রাতভর সূর্য'—যাকে বলা যায় কিছু বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ কাহিনীর একটি সমাহার। রাতভর সূর্য নামের প্রথম ভ্রমণটি সুইডেনে উত্তর মেরুর কাছের জায়গা কিরুনায় সব চেয়ে দীর্ঘ দিন মিড সামার ডে'র দিনে ভ্রমণ—যখন ওখানে বলতে গেলে চব্বিশ ঘন্টাই দিন। এটি বল্গা হরিণ আর হিমবাহের জায়গা, যার প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক চমকপ্রদতায় ভরপুর। তেমনি অন্য যে ভ্রমণকাহিনীগুলো এই বইয়ে এনেছি তাতেও বৈজ্ঞানিক রহস্য কম নয়। বাংলাদেশ বেতারে 'পরিবেশ ও নগরজীবন' বলে একটি অনুষ্ঠান আমি দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে গেছি। এতে প্রতি অনুষ্ঠানে আমাদের নগর জীবনে পরিবেশের এক একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছি—এ ভাবে মোট প্রায় বাষট্টিটি আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে। এত রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বের করার জন্য আমাকে নগর জীবনের অনেকগুলো দিকের পরিস্থিতি নিয়ে খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করতে হয়েছিলো। এই সব বিষয় নিয়ে পরে আমার একটি বই *সময়* প্রকাশনা প্রকাশ করেছে যার নামও 'পরিবেশ ও নগর জীবন'। লেখার ও বইয়ের শিরোনামের জন্য রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছি একথা একটু আগে বলেছি। কিন্তু

একবার পুরো বইয়ের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের উপর রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ দিতে পারাটি আমার কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। এটি করেছি বাংলা একাডেমির ভাষা শহীদ গ্রন্থমালার জন্য একটি বই 'বৃষ্টি ও বজ্রের' ক্ষেত্রে। এর জন্য রবীন্দ্র কাব্যের মধ্যে একটি অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান শেষে দেখলাম প্রতি অধ্যায়ে আমি যা বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথ দু'-তিন ছত্রের কবিতায় তার পটভূমিটি মনে হয় অনায়াসে বলে দিয়েছেন। যেমন 'মেঘ বৃষ্টি' অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি কী ভাবে ধূলোবালি আকাশে গিয়ে প্রত্যেকটি এক একটি জলকণা ধারণ করে মেঘ তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বেছে নিলাম:

ধূলোবালি দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে

'অথবা বিজলি রেখার রূপরেখা' অধ্যায়ে:

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে

ঢাকা রেডিয়োর সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক ছাত্র অবস্থা থেকেই ছিলো। সাধারণ ভাবে এখানে কাজটি ছিলো কথিকা লেখার ও তা নিজে পড়ার; তাছাড়া অন্যান্য সরাসরি (লাইভ) অনুষ্ঠানও থাকতো। আজকের টেলিভিশনের জয় জয়কারের যুগের তরুণরা হয়তো বুঝতেই পারবেনা যে সেদিন সারা দেশে রেডিয়োর গুরুত্ব কী ছিল—এমনকি টেলিভিশন আসার বহুদিন পরেও দেখতাম গ্রামেগঞ্জে শহরে বন্দরে চায়ের দোকানে ঘরে ঘরে রেডিয়ো সব সময় বাজছে। অনেকের রীতিমত নেশা ছিল সারাক্ষণ রেডিয়ো শোনা, কি কাজ করতে করতে, কি অবসরে। কথিকা কিন্তু হুবহু পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার মত ছিলনা—অন্তত আমি সেটিকে তা মনে করতামনা। কারণ স্কুল জীবনেই আমার নিজের ঐ ট্রানজিস্টার রেডিয়ো হবার পর থেকে আমি রেডিয়োর একজন নিয়মিত শ্রোতা ছিলাম, আর আমি জানতাম কেমন কথিকা শুনতে শ্রোতার ভাল লাগে। আলাপী ভঙ্গিতে যেন শুধু ঐ একজন শ্রোতাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে ওভাবে উপস্থাপিত না হলে কোন বিষয়ের আলোচনা রেডিয়োতে ভাল লাগেনা, খুব কট্টর কোন গুরু গম্ভীর বিষয় হলে তো নয়ই। কাজেই যে বিষয়ের কথিকাই হোক না কেন ব্যক্তিগত ভাবে শ্রোতাকে আকর্ষণের একটি চেস্টা থাকতেই হতো। প্রথম দিকে বহুদিন রেডিয়োতে আমার গন্তব্য ছিল শাহবাগের পুরানো রেডিয়ো স্টুডিয়োতে। তারও আগে ঢাকা রেডিয়ো পুরানো ঢাকার কিনারায় নাজিমউদ্দীন রোডে ছিল, সেটি আমি পাইনি। পরের দিকে আগারগাঁওয়ে বর্তমান আরো চমৎকার বেতার ভবনেও

অনুষ্ঠান করেছি। এসব জায়গায় নিয়মিত যাতায়তের ফলে প্রযোজক, প্রযোজকের সহকারীবৃন্দ, উপআঞ্চলিক পরিচালক এমন অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। তাই রেডিয়োতে যাওয়ার একটি আকর্ষণ ছিল সেখানে অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষমান থাকার সময় চা খেতে খেতে তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া। বেশ কিছু প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে রেডিয়ো অফিসে—তাঁদের কেউ কেউ আবার রেডিয়োর নয়, বরং আমার মতো অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন। নিজের জীবনে অত্যন্ত ব্যস্ত, অথচ রেডিয়োর মাধ্যমে বহু শ্রোতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এই রেডিয়ো অফিসে এসে সময় দিতে হয়, এমন আমার অতি ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে এখানেই দেখা হতো। আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন—আমাদের মুতী ভাইয়ের সঙ্গে এটি প্রায়শ হতো, দু'জনে একই ধরনের অনুষ্ঠানে থাকতাম বলে। রেডিয়োর কথা মনে হলে সব সময় একটি দুঃখের কথাও মনে হয় যে এভাবে রেডিয়ো স্টুডিয়োতেই সুস্থ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো। দুজনেই অপেক্ষা করছিলাম যার যার রেকর্ডিং করার জন্য স্টুডিয়োর বাইরের ঘরটিতে। রেকর্ডিং যন্ত্রের কিছু গোলযোগের কারণে সেদিন ওভাবে তাঁর সঙ্গে অনেক্ষণ আলাপ হয়েছিলো। সদ্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পার্সোনাল কম্পিউটারের কথাই বেশি হয়েছিলো। এক মুহূর্তের জন্যও তখন মনে হয়নি আর মাত্র মাসখানেকের মধ্যে হঠাৎ করে তাঁর দুরারোগ্য রোগের কথা শুনতে হবে।

টেলিভিশনে অনুষ্ঠানে আমার হাতেখড়ি হয়েছিলো দেশে টেলিভিশন চালু হবার বছর দুয়েকের মধ্যেই। তবে প্রায়শ অনুষ্ঠান করার ডাক পেতে শুরু করেছি সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর থেকে। বিশেষ বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান বাদ দিলে আমার করা সব অনুষ্ঠান ছিলো বিজ্ঞান সংক্রান্ত। সেই একবারে প্রথম দিকের অনুষ্ঠানগুলো করতে বেশ একটু সাহসের দরকার হতো বৈ কি। রেকর্ড করার ব্যবস্থা ছিলোনা—ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে 'অ্যাকশন' চিৎকারটি শুনলেই শুরু করে দিতে হতো, আর থামার উপায় ছিলোনা—যা করছি সোজা দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। নিজের বলার কায়দা কানুন ছাড়া আর বড়জোর ব্যবহার করতে পারতাম আঁকা ছবি বা বই থেকে দেখানো ছবি; অবশ্য চেষ্টা থাকতো সত্যিসত্যি কোন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবার। যেন এটি করতে গিয়ে কোন বিপত্তি না হয় সে জন্য সব কিছু আগে থেকে বহুবার করে ঠিক করে রাখতে হতো। নানা নামে বিজ্ঞানের বিষয়ে বহু রকমের অনুষ্ঠান করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে খানিকটা অংশ থাকতো। কিন্তু আমি বেশি মজা পেয়েছি শুধু নিখাদ বিজ্ঞানের যে সব অনুষ্ঠান করতাম সেগুলোতে, যার পরিকল্পনায় আমার বেশ স্বাধীনতা থাকতো। 'অণু-পরমাণু', 'বিচিত্র বিজ্ঞান' ছিলো এমনিতরো অনুষ্ঠান। 'বিচিত্র বিজ্ঞান' অনুষ্ঠানটির প্রত্যেকটি পর্ব আমি নির্বাচন ও আয়োজন করতাম হাতেকলমে দেখিয়ে বোঝাতে পারবো এমন এক একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

ডিআইটি বিল্ডিং থেকে (বর্তমান রাজউক ভবন) টেলিভিশন স্টেশন রামপুরায় নিজস্ব ভবনে চলে যাবার পর থেকে অনুষ্ঠান করার সুযোগসুবিধা নিত্য বেড়ে ওঠছিলো। সেখানে স্টুডিয়োতে 'বিচিত্র বিজ্ঞানের' জন্য আমি রীতিমত একটি ল্যাবোরোটরির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতাম।

সেদিনের 'বিচিত্র বিজ্ঞান' থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমি অতি শীতল উত্তাপ সম্পর্কে অনুষ্ঠানটি করতে চেয়েছিলাম কারণ দর্শকরা এমন শীতল উত্তাপে কী ঘটে তা কল্পনাও করতে পারবেন না। অথচ আমার হাতের কাছেই এটি দেখাবার মত ব্যবস্থা রয়েছে। তরল বাতাস তৈরির একটি যন্ত্র পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ছিল। তরল বাতাস এমন শীতল তরল যা দেখতে পানির মত মনে হলেও আসলে বরফের চেয়ে ১৯৬ ডিগ্রি বেশি ঠাণ্ডা! ওরকম আশ্চর্যরকম শীতল উত্তাপে রাখলে অনেক পদার্থের গুণাগুণে বিরাট সব পরিবর্তন আসে। যেমন একটি ফুল এর মধ্যে ডোবালে সেটি ইটের মত শক্ত ও ভঙ্গুর জিনিসে পরিণত হয়। উত্তাপ নিয়ে নানা কথা যেমন ওই টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এলো তেমনি এমন ঠাণ্ডা জিনিসের উত্তাপ মাপার কায়দাগুলোও দেখালাম। স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ যে থার্মোমিটার তা ওখানে কাজে লাগাবেনা, কারণ এ উত্তাপে নামার অনেক আগেই সাধারণ থার্মোমিটারের মধ্যে থাকা পারদ অথবা এলকোহল জমে কঠিন হয়ে যাবে। তা হলে এর উপযুক্ত থার্মোমিটার কী হতে পারে? বিভিন্ন ধাতুর বৈদ্যুতিক গুণের পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে ওই উত্তাপ মাপার বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার তৈরি করা হয় যার জন্য অবশ্য সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ মাপক যন্ত্র ইত্যাদি লাগে। একটি জবা ফুল তরল বাতাসে ডুবিয়ে সেখান থেকে তুলে এনে দেখালাম যে এটি ইটের মত শক্ত হয়েছে এবার হাতুড়ির একটি বাড়ি দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো ভেঙ্গে ফেললাম। ম্যাজিকের মত এ কাজ হলো কারণ তরল বাতাসের এ রকম প্রচণ্ড শীতল উত্তাপে পদার্থ একেবারেই বদলে যায়। তেমনি বদলে যায় শরীরের ক্ষুদ্র অংশ, এর স্নায়ুর সংবেদনশীলতা। একে ব্যবহার করেই সৃষ্টি হয়েছে নিম্ন উত্তাপের শৈল্য চিকিৎসা যাতে তরল বাতাস প্রয়োগে অতি শীতল করে নিয়ে তারপর শরীরের ছোট কোন অংশকে অনায়াসে কেটে বাদ দেয়া যায়। থার্মোফ্লাস্ক থেকে এই তরল অন্য পাত্রে ঢালা যায়—পানির মত পড়তে দেখলেও বাইরের সাধারণ উত্তাপেই নিমেষে ফুটন্ত হয়ে এটি উবে যায়। এর অনেক কিছুই টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে দেখিয়ে নিম্ন উত্তাপের বিজ্ঞানের মত একটি জটিল বিষয়কেও দর্শকদের জন্য মনোগ্রাহী করে তুলতে পেরেছিলাম। এ ভাবে সব সময় ভাবতে হয়েছে পরের অনুষ্ঠানে কোন বিষয়টিকে সামনে আনলে এমন মনোগ্রাহী করা যাবে।

তবে আমি চাচ্ছিলাম টেলিভিশনেও সরাসরি তরুণদের সঙ্গে কাজ করতে। এখানেও ওদের জন্য দেশব্যাপী একটি বিজ্ঞান সমাজ গড়ে তোলা যায় কিনা সেটিই আমার মাথায় ছিলো। মনে হলো উপযুক্ত কুইজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এটি সম্ভব, কারণ তা হলে সারা দেশে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা নিজেরা বিজ্ঞানের

প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে বিষয়টির সঙ্গে একাত্ম হবে। একই ভাবে বয়স্ক দর্শকরাও হবেন, মনে মনে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। কুইজকে আমি যেভাবে দেখছিলাম তা সচরাচর কুইজের থেকে বেশ আলাদা। ওসব ক্ষেত্রে কুইজ মাস্টার অর্থাৎ যিনি কুইজ পরিচালনা করেন তাঁকে শুধু হতে হয় এক ধরনের তারকা-ব্যক্তিত্ব—তাঁর পরিচিতির আকর্ষণের মধ্যে আর যা তাঁকে করতে হয় তা হলো শুধু তাঁর বাচনভঙ্গির মুনশিয়ানা রাখা এবং প্রায়শ প্রশ্নের বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা সুন্দর কথা ও হাসির কথা বলতে পারা। কুইজের উত্তর আগে থেকে অন্যরা তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন, সেটি তিনি মিলিয়ে নেন; জানা থাকলে হয়তোবা দু'একটি কথা এ নিয়েও বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়না। প্রতিযোগীরা কুইজে অংশ নেয় শুদ্ধ উত্তরটি দিতে পারার কৃতিত্ব লাভের জন্য, প্রতিযোগিতাটিই এখানে মুখ্য। অনুষ্ঠান থেকে তারা কিছু শিখবে সেটি বড় কথা নয়, তাদের কাছে উত্তর হয় জানা আছে (অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থ আছে) অথবা জানা নেই। আমি কুইজকে দেখছিলাম সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এমন সব প্রশ্ন করবো যা দু'এক শব্দে মুখস্থ রাখা তথ্য দিয়ে জবাব দেয়ার মত হবেনা, বরং তার পটভূমি জানা থাকলে যার উত্তর এখনই চিন্তা করে দেয়া সম্ভব। এমনকি উত্তর পুরোপুরি শুদ্ধ না হলেও শুদ্ধ হবার কাছাকাছি হতে পারে; অর্থাৎ কিনা বিষয়টি নিয়ে মাথা খেলাতে হবে। তারপর কুইজ মাস্টার হিসেবে আমি প্রয়োজনে শুদ্ধ উত্তরটি বিস্তারিত দিয়ে দেবো—সম্ভব হলে ছবি দেখিয়ে বা প্রত্যক্ষ দেখিয়ে তা করবো। এরকম কুইজের উদ্দেশ্য হলো কুইজের মাধ্যমেই কিছু শেখা এবং কিছু চর্চা হওয়া; ফলে অনেকে পরে এ নিয়ে আরো অনুসন্ধান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, যা শেষ পর্যন্ত ওই তরুণ বিজ্ঞান সমাজ গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

টেলিভিশনে আমার শুভানুধ্যায়ী প্রযোজকদের সহায়তায় এই নতুন ধরনের কুইজ শুরু করতে পেরেছিলাম। প্রথম দিকে বিভিন্ন নামে বেশ কয়েকটি কুইজ সিরিজ মোটামুটি এ রকম চলেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার একটি অংশমাত্র ছিলো। এর মধ্যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়ে বেশ সুপরিচিত হয়েছিলো 'জ্ঞান জিজ্ঞাসা'। তবে আমি যা করতে চাচ্ছিলাম সেটি সব চেয়ে ভাল ভাবে এবং বহু বছর ধরে প্রায় এক টানা নিয়মিত করতে পেরেছিলাম যে অনুষ্ঠানে তার নাম *দেশ ও বিজ্ঞান*। এর পরিচালনা শুধু আমারই উপর ন্যস্ত ছিলো, শুধু বিজ্ঞান নিয়ে। আরো বড় কথা হলো নামটি ওভাবে দিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানে আলোচিত বিজ্ঞানের কিছুটা সীমানা এঁকে দিয়েছিলাম প্রধানত দেশকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের জন্য তুলনামূলক ভাবে বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে এসে। এর মানে এই নয় যে বিজ্ঞানের সর্বশেষ ও চমকপ্রদ যে সব জিনিস একেবারে সরাসরি আমাদের দেশের বিষয় নয় তাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিচ্ছিলাম, বরং তার মধ্যেও দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম যেখানেই সম্ভব। উদ্দেশ্য ছিলো বিজ্ঞান যে আমাদেরও জীবনে

অঙ্গীভূত সেটিই বার বার করে মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা। দেশের ওপর জোর দেয়ায় দেখলাম আমার জন্য অনেক দুয়ার খুলে গেলো। যে সব জিনিসে ডুবে আছি, নিত্য জীবনের কথা বলতে যা অসংখ্যবার উচ্চারণ করছি, তার মধ্যেও যে সুন্দর আধুনিক বিজ্ঞান রয়ে গেছে সেটি বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দিতে পারলাম। এরকম এক একটি করতে পারলে আমি দারুণ আনন্দ পেতাম। যেমন হাওড়, বাওড়, বিল, ঝিল এক নিশ্বাসে এক সঙ্গে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করি, কিন্তু অনেকেই জানিনা এর একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটি তফাৎ কী, অথবা প্রায়শ রেডিয়োতে যে বলা হয় নদী-বন্দরগুলোকে তিন নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে হবে সেই বিপদ সংকেতটি দেখতে কেমন, এমনি ধরনের প্রশ্ন। *দেশ ও বিজ্ঞান* শুরু করার আগে পর্যন্ত আমার নিজেরও ধারণা ছিলনা দেশ ও বিজ্ঞানকে একত্র করে এত গুরুত্বপূর্ণ সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে। এই অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল মোট প্রতিযোগীদের যে অর্ধেকের প্রাপ্ত নম্বর অন্যদের চেয়ে বেশি তারা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার ফিরে আসতে পারবে, বাকি অর্ধেক নতুন প্রতিযোগী হবে। ফলে অনেক বার ফিরে আসা প্রতিযোগীরা ক্রমে দেশের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগের বিষয়গুলোতে পারদর্শী হতে থাকতো, এজন্য নিজেদের আগ্রহ গড়ে তুলে নানা বইপত্র, আলোচনা, পত্রিকা, ম্যাগাজিন থেকে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতো—এমন সব জিনিস যা সরাসরি তাদের পাঠ্য বইয়ের অংশ নয়, আপাতত কোন কুইজ বইয়েও পাওয়া যাবেনা। অন্যরা একইভাবে চেষ্টা করতো এই দলে ঢুকতে।

দেশ ও বিজ্ঞান বহু বছর ধরে সাপ্তাহিক ভাবে সম্প্রচারিত হয়েছে এবং এর জন্য আমি বেশ ক'জন প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করেছি। প্রথম দিকে প্রযোজক ও আমি উভয়ে বেশ উচ্চাকাঙ্খী ছিলাম। হয়তো এরকম একটি ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের প্রযোজনায় যথেষ্ট ব্যয় সহায়তা দেয়ার নীতি যে টেলিভিশন গ্রহণ করেছিলো আমরা তার পরিপূর্ণ সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য এর মধ্যে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ আগে থেকে রেকর্ডিঙের সুযোগ এসে গিয়েছিলো। আমরা রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি ও টেলিভিশনের গাড়ি নিয়ে এক এক দিকে চলে যেতাম। বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আগাম পরিকল্পনা করা থাকতো যাতে ঐ একটি জায়গা থেকে তুলে আনা অনেক কষ্টসাধ্য বাস্তব রেকর্ডিং ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে দেখানোর সুযোগ হয়। যেমন জয়দেবপুরে ধান গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে শুধু উচ্চ ফলনশীল ধানের নতুন জাত চালু করার নানা দিকই ধারণ করলামনা, বরং দেশের একটি প্রধান বীজ ব্যাংকের নানা দিকের দৃশ্যও ধারণ করলাম—এই বীজ ব্যাংকের ভেতর শীতলতা কেমন, নানা জাতের ধান কী ধরনের পাত্রে কোথায় সংরক্ষণ করা হয়েছে, বহু বছর পর পর এদের নবায়ন কেমন করে করা হয় তেমনি অনেক কিছু। কুইজের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার বা না পাওয়ার পর বিস্তারিত উত্তর দেবার সময় আমি এই দৃশ্যগুলো ব্যবহার করতাম। একই ভাবে

নারায়ণগঞ্জে গিয়ে সেখানকার নদী-বন্দরে বিপদ সংকেতগুলোর অবয়ব ধারণ করলাম—রাতের ও দিনের জন্য সংকেত; একই সঙ্গে ওখানে নদী পথে নিরাপদ ভাবে স্টিমার চালাবার আধুনিক প্রযুক্তিগুলো ধারণ করলাম; সেই নারায়ণগঞ্জেই আবার পাটকলে গিয়ে পাটের গাইট করার জন্য হাইড্রলিক প্রেসের কাজও ধারণ করলাম। আগে থেকে পরিকল্পনা করে নেয়াতে ও ওসব জায়গার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দ্রুত সময়ে এ ভাবে অনেক কিছুকে টেলিভিশনে নিয়ে আসতে পারতাম। এগুলো আমাদের দেশেই, আমাদের ধারে কাছেই রয়েছে—কিন্তু কেউ কখনো জানার বা জানাবার কৌতূহল প্রকাশ করেনি, তাই টেলিভিশনের মনোযোগ পায়নি। পরে পরে অবশ্য এভাবে সত্যিকার বিষয়গুলো দেখাবার সুযোগ কমে গিয়েছিলো, কারণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এত বেশি সময় ও সম্পদ দিতে পারতোনা। আমি সে অভাব মিটিয়ে নিতাম কথার মাধ্যমে বিষয়গুলো আরো জলজ্যান্ত করে তোলে, এবং ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে ছবি, ফটো ব্যবহার করে (হায়, ইন্টারনেট তখনো আসেনি!)। তবে ওই যে সত্যিকার জায়গাগুলোতে গিয়ে ব্যাখ্যাগুলো ধারণ করে আনার সেই উত্তেজনা ও আনন্দের কোন তুলনা হয়না।

এভাবে দেশীয় বিষয়ের বিজ্ঞান নিয়ে অনুষ্ঠান করার নগদ ফল আমি অসংখ্যবার পেয়েছি। অদ্ভুত জায়গায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রকমের অজানা মানুষ আমার কাছ থেকে এটি সেটি জানতে চেয়েছে, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে, অথবা মজার মন্তব্য করেছে। যেমন একবার নিউমার্কেটে মাছের বাজারে দরদাম করতে গিয়ে মাছটি তাজা কিনা সে ব্যাপারে আমার মন্তব্য মাছওয়ালার পছন্দ হয়নি। তিনি খুব হতাশ ভাবে বললেন 'আপনি টেলিভিশনে নানা রকম মাছ সম্পর্কে মানুষকে শেখান, আর আপনিই কিনা আমার তাজা মাছ চিনতে ভুল করলেন!'। আর একবার বিদেশ থেকে আসা কারো জন্য বিমান বন্দরের ভেতরে ঘেরাওয়ের বাইরে অপেক্ষা করছি। যেই পুলিশ ঘেরাওটি পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি আমাকে চিনতে পেরে বললেন যে তিনি রাঙ্গামাটিতে দীর্ঘ দিন ছিলেন। আমি সেখানকার পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের নিয়মগুলোর যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছি তা তাঁর নিজে দেখা। এই বলে তিনি খুব সম্মান করে আমাকে ঘেরাওয়ের ভেতরে যেতে দিলেন আগত বন্ধুকে স্বাগত জানাতে। এমনি ধরনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাকে চমকে দিয়েছে—সবই *দেশ ও বিজ্ঞানের* ফল। এতে আমার মনে একটি খুবই তৃপ্তিবোধ কাজ করেছে। স্কুল-কলেজের তরুণ প্রতিযোগীদের একটি বিশেষ রকমের বিজ্ঞান সমাজই শুধু এটি গড়ে তোলেনি, বরং একেবারেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তুলতেও আমার দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টাটি একটি ভাল ফল এনেছিলো বলে সব সময় মনে হয়েছে, যার কিছু রেশ এখনো দেখতে পাই।

প্রতীচী-২

প্রাচীন উপসালা আর সত্তর দশকের সুইডেন

দেশের বাইরে শুধু ইউরোপের কয়েকটি শহরকে আমি কিছুটা আপন করে চিনেছি বলে মনে হয়েছে। সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার সুযোগ হবার কারণে এটি সম্ভব হয়েছিলো। সব ক্ষেত্রে যে খুব বেশি দিন ছিলাম তাও অবশ্য নয়। আর চেনা বলতে আমি শহরের রাস্তাঘাট খুব ভাল চিনেছি তাও বোঝাচ্ছিনা; আমার স্বভাবটাই ছিল যেখানে কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়েছি তার চরিত্রটি ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা, আর তার মাধ্যমে দেশটার চরিত্রও। এই অর্থেই এদেরকে কিছুটা চিনেছি বলে দাবি করতে পারি। মজার ব্যাপার হলো শহরগুলোর কোনটিই ওসব দেশের প্রধান শহর নয়, বরং মফস্বল শহর বলতে যা বোঝায় অনেকটা ঠিক তাই। এগুলো হলো বৃটেনের সাউদাম্পটন, সুইডেনের উপসালা এবং ইতালির ত্রিয়েস্ত। সাউদাম্পটনে চার বছর কাটিয়েছি ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি'র জন্য গবেষণা করার সুবাদে, এর কথা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে বৃটেনের নানা অবিজ্ঞাতা নিয়েও। এখানে বাকি দুটি শহরের স্মৃতিগুলো আনবো। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি এবং এখনো সুইডেনের প্রধান বিদ্যাপীঠ। ওখানে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করার জন্য এক বছরের মতো থেকেছি। আর ইতালির ত্রিয়েস্তে রয়েছে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ আবদুস সালামের উদ্যোগে স্থাপিত আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (আইসিটিপি)। ওখানকার এসোসিয়েট সায়েন্টিষ্ট হিসেবে আমি পরপর বহু বছর প্রতিবার মাস দুয়েক করে ওখানে কাটিয়েছি—যার সম্মিলিত কালটি নেহাত কম হবেনা। কোন সময় ওখানে ছিলাম তাও গুরুত্বপূর্ণ—কারণ শহরগুলোর অবয়ব খুব পরিবর্তন না হলেও কয়েকটি দশকের আবর্তনে এসব শহর ও দেশের সামাজিক রাজনৈতিক আবহে অনেক পরিবর্তন এসেছে; আমি যখনকার কথা বলছি সে সময়ের অনেক ভাবসাব এখন হয়তো হারিয়ে গেছে।

১৯৭৭ সালের সেপ্টম্বর মাসে যখন সুইডেনের উপসালা শহরে গিয়ে পৌছলাম তখন চারিদিকে ৫০০ সংখ্যাটি লেখা দেখতে পাচ্ছিলাম—কারণটি চট্ করে বোঝিনি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় হলো এ ছোট শহরটির প্রাণ আর ঐ বছরটিতে উদযাপন করা হচ্ছিল উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শত জন্ম বার্ষিকী। সারা ইউরোপে এর থেকে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, প্যারিস (সরবোঁ) আর ইতালির বলোনিয়া ও পিসা ছাড়া আর কোনটি ছিলনা।

উপসালায় আমার বাস ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে 'রাখার বারিস গাতান' নামের ছাত্র হোষ্টেলে। আমরা থাকি হোষ্টেলের এক একটি 'করিডরে'—অর্থাৎ কিনা পাঁচ জনের একটি যৌথ অংশে যা একটি করিডর নামে পরিচিত। পাঁচ জনের পাঁচটি রুম, আর সবাই মিলে একটি রান্না ও খাওয়ার ঘর, একটি টয়লেট ও একটি গোসলখানা। তবে খুবই ব্যতিক্রমী ব্যাপার মনে হলো আমার করিডরে আমি ছাড়া বাকি চারজনের তিন জন ছিল ছেলে, একজন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে লারস সুইডিশ, নরেন ভারতীয়, মোহাম্মদ মিশরীয়। মেয়েটির নাম বিরগিত্তা—সে সুইডিশ। এদের মধ্যে দেখলাম মোহাম্মদই সব চেয়ে স্মার্ট, খুবই চালাক চতুর। বাকিরা মাটির মানুষ—নরেনকে দেখি খুব ভোরে তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায় স্থানীয় পত্রিকা অফিসে—বাড়ি বাড়ি পত্রিকা বিলি করার জন্য। পত্রিকাকে গুটিয়ে কেমন করে জানি ঢিলের মতো ছুঁড়ে মারে রাস্তায় সাইকেলের ওপর থেকেই, সোজা বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পড়ে। ফিরে এসে ক্লাসে যাবার জন্য তৈরি হয়। দীর্ঘদেহী সুইডিশ হলেও লারসের স্বভাব কিন্তু খুব নরম। বিরগিত্তাই বলতে গেলে করিডরের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। রান্না ও খাবার ঘর পরিস্কার করতে গড়িমসি করলে তার কাছেই জবাবদিহি করতে হয় কারণ বিরগিত্তাই প্রত্যেকের দায়িত্ব বন্টন করে সে তালিকা ফ্রিজের উপর সেঁটে রাখে। রাতে প্রায়ই কিছুক্ষণ খাবার ঘরে নিজেদের আড্ডা হয়—নরেন, লারস, বিরগিত্তা নিজেরা থাকলে চুটিয়ে সুইডিশ বলে, মোহাম্মদ ও আমার জন্য তাদেরকেও ইংরেজি বলতে হয়। অনেক কিছুর জন্যই আমাদের নিজেদের বোঝাপড়া দরকার হয়—যেমন মাঝের করিডরে যে টেলিফোনটি ঝোলানো রয়েছে তার ব্যবহার নিয়ে। ওখানে একটি কাগজ আমরা রেখে দিই; কেউ যদি শহরের বাইরে কোথাও ফোন করি তা হলে কোথায় করলাম, কতক্ষণ করলাম তা নিজেই লিখে রাখি। মাস শেষে এর হিসেব করে প্রত্যেককে পয়সা দিয়ে দিতে হতো সম্মিলিত ফোন-বিলটি দেবার জন্য। টেলিফোন এলে কেউ না কেউ সেটি ধরাটিও ছিল জরুরি; বিশেষ করে রাতের গভীরে ফোন এলে। কার কাছে টেলিফোন এসেছে জানা নেই, কেউ না কেউ রুম থেকে বের হয়ে এসে ফোন ধরে তারপর হাঁক দিয়ে আসল প্রাপককে ডেকে দিতাম। প্রায়শ দু'তিনজন এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম ঘুমের কাপড়ে। সেক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে অন্যদের পরনে দেখতাম অতি ক্ষীণবস্ত্র অথবা থাকতো মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারেই বস্ত্রহীন। বস্ত্রহীনতার

দিকে এমনিতেই তখন সুইডিশদের একটি ঝোঁক লক্ষ্য করেছি। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে গরম আবার শীতের দিকে হেলে গিয়েছিলো। যেদিন রোদ ওঠতো, বাইরে উত্তাপও ভাল থাকতো, হোস্টেলের ছেলে মেয়ে অনেক বাসিন্দাই নামে মাত্র বস্ত্রে বা সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হয়ে বাইরের ঘাসে শুয়ে রৌদ্র স্নান করতো।

ধৈর্য ধরে সুইডেন সম্পর্কে আমার সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার কাজটি কাঁধ পেতে নিয়ে নিয়েছিলো বিরগিত্তা এবং নরেনের গার্ল ফ্রেণ্ড কারিন (যাকে আমরা আমাদের করিডরের একজন অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে আপন করে নিয়েছিলাম)। কারিন নিজে কিন্তু ঠিক সুইডিশ নয়—ফিনিশ (ফিনল্যাণ্ডের মানুষ)। সে আমাকে বলেছে 'আমার চোয়ালের গঠন দেখেই তোমার বোঝা উচিত ছিল আমি ফিনিশ, এটি মোটেই সুইডিশদের মত নয়'। বিরগিত্তা লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে খুব একটি বড় ছিলনা। কাজেই তিন চার মাস পর চারিদিক যখন বরফে সাদা হয়ে এলো, কাছের বনের পথগুলোও যখন বরফের তলে হারিয়ে গেলো তখন সেখানে সে আমাকে ক্রস কান্ট্রি স্কীইং করা শুধু শেখালোই না এজন্য তার নিজের স্কীইং পোশাক, স্কী, সবই ধার দিয়েছিলো। কিছুটা অনুযোগের সুরেই সে বলছিলো যে একজন সুইডিশ পুরুষের সব চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হলো যখন এখানকার বিশালকায় সব হ্রদগুলোর পিঠ ঠাণ্ডায় জমে সম্পূর্ণ বরফ হয়ে যায় তখন ঐ হ্রদের মাঝখানে গিয়ে একাকী এক মনে স্কী করে যাওয়ার সময়টি। সুইডিশ পুরুষদের মধ্যে এই একাকীত্ব পছন্দ করার প্রবণতা আমিও লক্ষ্য করেছি, যা কিন্তু সেখানকার মেয়েদের মধ্যে নেই।

উপসালায় আমার দৈনন্দিন কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিজিকুমে' (পদার্থবিদ্যা ভবন) এবং টেকনিকুমে (প্রযুক্তি ভবন)। আসলে গবেষণার কাজটি টেকনিকুমে প্রফেসর তুভের তত্ত্বাবধানে—নতুন ধরনের সৌর কোষ তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা। ফিজিকুমে যেতে হতো কারণ সেখানে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের দফতর—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আমাদেরকে যেই সুইডিশ সরকারী প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠপোষকতা করছে, এবং আমাদের জন্য নানা রকম গবেষণা প্রকল্পের ব্যবস্থা করছে। আমার বাসস্থান রাখার বারিস গাতান থেকে মিনিট দশেক হাঁটলে ওখানে পৌছা যায়—পর পর টেকনিকুম, শ্যামিকুম (রসায়ন ভবন), ফিজিকুম। এসব পার হয়ে একটু উঁচু জায়গায় একদিকে ক্যারোলিনা রেডভিভা—উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত লাইব্রেরি, অন্য দিকে আরো উঁচুতে উপসালা দুর্গ—সুইডিশ নাম 'উপসালা স্লোট'। এটি আসলে দুর্গ ও প্রাসাদের একটি বিশাল সমন্বয়—এখানকার রাজকীয় দরবার হলে এক সময় সুইডেনের রাজাদের অভিষেক হতো; এখনো এখানে রয়েছে স্থানীয় গভর্নরের বাসস্থান, দফতর এবং চিত্রশালা। এর কাছেই রয়েছে বোটানিকাল গার্ডেন। অন্যান্য জায়গার বোটানিক্যাল গর্ডেনের সঙ্গে এখানকারটির বড় তফাত হলো এর সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে কার্ল লিনিয়াসের—সেই উদ্ভিদবিদ যিনি নানা উদ্ভিদ আর

প্রাণির শ্রেণী বিভাজনের ব্যবস্থা করেছেন ও প্রত্যেক প্রজাতিকে বৈজ্ঞানিক নাম দেবার রীতিটি প্রবর্তন করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছেন। এখানকার বাসিন্দা লিনিয়াস ১৭ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসব করেছিলেন। তাঁর আরো ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত একটি উদ্যান উপসালার কাছের গ্রাম লিনিয়াস হামেরবিতে রয়েছে—সেখানে গিয়ে সেটিও দেখে এসেছি।

উপসালা দুর্গ ছেড়ে নিচের দিকে নেমে এলে আমরা ক্রমে উপসালার নদী ফাইরিসেনের কাছাকাছি চলে আসি যার তীরের কাছে রয়েছে 'ডম শিরকে' নামের উপসালার ঐতিহাসিক গির্জা। যেই সেইন্ট এরিক এই গির্জার প্রাণপুরুষ তাঁর কবর, সুইডেনকে যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের একটি বড় পরাশক্তিতে পরিণত করেছিলেন সেই রাজা গুস্তাভ ভাসার কবর, আর বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াসের কবর এই গির্জাতেই রয়েছে। যখনই সুযোগ পাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই নিম্নগামী পথের ঢাল বেয়ে নদীর কাছে চলে আসার আমার একটি বড় আকর্ষণ ছিল—দাগ হেমারশোল্ড লাইব্রেরি। বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর ইংরেজি বই ছিলো সেখানে, ধার করে আনতে পারতাম। সুইডেনের একজন নামকরা আমলা দাগ হেমারশোল্ড জাতিসংঘের দ্বিতীয় সেক্রেটারি জেনারেল (১৯৫৩-১৯৬১)। আজকের জাতিসংঘের অনেক প্রতিষ্ঠান ও অনেক নিয়ম কানুনের জনক বলা যায় তাঁকে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো অপঘাতে, সেক্রেটারি জেনারেলের কাজ করতে গিয়েই। ১৯৬০-৬১ সনে আফ্রিকার কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধের সময় বিদ্রোহী সেনারা জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করলে তিনি সেখানে পরিদর্শনে যান। ওখানে অবতরণের সময় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যু কি দুর্ঘটনা না কি গৃহযুদ্ধের বেলজিয়াম-ঘেঁষা ডানপন্থীরা বিমানটিকে গুলি করে ভূপাতিত করেছিলো সে বিতর্ক এখনো রয়ে গেছে। হেমারশোল্ড ছাত্র জীবন উপসালায় কাটিয়েছেন ঐ দুর্গে, কারণ তাঁর বাবা ওখানে গভর্নর ছিলেন, আর যৌবনে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর ঐতিহাসিক অঙ্গনের ভেতর দিয়ে রাস্তার ঢালে গড়িয়ে আমার হাঁটা পথ ঐ নদীতে ডম শিরকের কাছে এসে শেষ হয়ে যেতো সাধারণত, তারপর চড়াই পথে ফেরত যেতাম। নদীর পশ্চিম পারে এই পুরো এলাকা হলো তথাকথিত 'গাউনের' এলাকা। গাউন কারা পরে? এককালে রাজন্যরা ও দরবারের লোকরা পরতো, শক্তিশালী যাজক শ্রেণী পরতো, আর পরতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র সমাজ। উপসালার নদীর থেকে এই পশ্চিমের এলাকাগুলোতে দুর্গ-প্রাসাদ, গির্জা, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা—ঐ গাউন পরিহিতদের এলাকা, যদিও আজ শুধু অধ্যাপক ও ছাত্ররাই দলে ভারী। নদীর পূর্ব পারে ছিলো 'টাউন' সেই পাঁচ শত বছর আগে থেকেই এখানে ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ এমনিতরো গাউনবিহীনরাই বাস করতো। আজও তারাই বাস করে। আমিও কখনো সওদাপাতি কিনতে হলে বা টাউন সেন্টারে যেতে হলে

তবেই শুধু গাউনের অঞ্চল ছেড়ে নদী পার হয়ে টাউনের অঞ্চলের দিকে যেতাম, অল্প পথ হলেও প্রায়শ বাসেই যেতাম। সেখানকার মজা অন্য রকম—মানুষের মেলা, দোকানদারি, নানা বিনোদন ইত্যাদি। সেই প্রাচীন কাল থেকেই নাকি টাউন আর গাউনের মধ্যে একরকম জেদাজেদি ছিলো। এখনো উভয় পক্ষে কিছু বৈরি ভাব রয়ে গেছে বৈকি, তবে সেটি কিছুটা প্রকাশ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিন ছাত্ররা দল বেঁধে টাউনে নেমে এসে টাউনের বাসিন্দাদেরকে মজা করে চ্যালেঞ্জ করার সময়। সেটি শুধু একবারই দেখেছি। সাতাত্তর- আটাত্তর সালের সুইডেন এক দিক থেকে যেমন তার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্টগুলো ধারণ করছিলো তেমনি তারই ধারাবাহিকতায় দারুণ সব সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিলো সেখানে। নারী-পুরুষ সমতার ও পারামিসিভ সোসাইটির বিষয়টি, এবং উভয়ের নগ্নতার স্বাভাবিকতা সুইডেনের অনেকটা ঐতিহ্যগত—কাজেই বৃটেনের মত বলা যাবেনা যে একেবারে ভিক্টোরিয়ান রক্ষণবাদিতার বিপরীতে পেন্ডুলাম সম্পূর্ণ অন্যদিকে পারমিসিভ হবার দিকে চলে গিয়েছে। যা বলা যায় তা হলো ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো নিয়েই নতুন ভাবে আধুনিক ভাবে সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিলো তখন। উদাহরণ স্বরূপ সেক্স এড্যুকেশন নিয়ে নানা পর্যায়ের শিক্ষায় যে মহাযজ্ঞ চলছিল তা দেখলে অবাক হতে হয়। অন্যদিকে দেখা যায় সন্তান পালনে বাবার ভূমিকাকে বড় করে তোলার জন্য বিরাট প্রচার কার্য চলছে। বাসে ওঠলেই দেখা যায় এক বিরাট পোষ্টার যেখানে তরুণ বাবা কোলে পিঠে সন্তান নিয়ে দারুণ ব্যস্ত রয়েছে। তাছাড়া এখানে যে অসংখ্য শুধু-বাবার বা শুধু-মায়ের বাচ্চাকাচ্চার সংসার রয়েছে সেখানে সন্তান প্রতিপালনকে আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ সহায়তা, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দেয়ার জন্য রয়েছে সরকার নিয়োজিত 'বাবা' ও 'মা' যারা নিত্য নিজ নিজ 'সন্তানের' খোঁজ খবর রেখে সহায়তা দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সরকারী কর্মচারী হিসেবেই তা করছেন।

সুইডেনে এই সব বিরাট বিরাট সামাজিক এক্সপেরিমেন্টগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমাদেরকে দেয়া বইপত্র থেকে, আর পত্রিকা ও টেলিভিশন থেকে। সরাসরি যেটুকু অভিজ্ঞতা ও কথাবার্তা হয়েছে তাও কম নয়। বইপত্র কিছু কিছু ইংরেজিতে থাকলেও পত্রিকা ও টেলিভিশন উভয়ে সুইডিশ ভাষায়। তবে ধীরে ধীরে সুইডিশ ভাষায় লেখা সহজ কথাগুলো কিছু কিছু বুঝতে শিখেছিলাম প্রয়োজনে এঙ্গলেস্কা-সোয়েন্সকা (ইংরেজি-সুইডিশ) অভিধান ব্যবহার করে। কথাও কিছুটা বুঝতাম বলে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মূল কথাগুলো বুঝতাম (একটি সাদাকালো পুরানো টেলিভিশন পুরানো জিনিসের দোকান থেকে কিনে এনে আমার রুমে রেখেছিলাম)। এখানকার টেলিভিশনে হলিউডের সিনেমা ও আমেরিকান কিছু সিরিয়ালও সুইডিশ সাবটাইটেল সহ দেখাতো। ওই সাবটাইটেল দেখে দেখেও সুইডিশ বোঝতে সুবিধা হয়েছিলো। সব চেয়ে বড় কথা হলো প্রত্যেকদিন বিকেলে আমাদের সেমিনারে সুইডিশ শেখার একটি ক্লাস

হতো—সেটি নিজেই ছিল একটি বিরাট অভিজ্ঞতা। অসা বাকলিন নামের একজন মহিলা আমাদেরকে সুইডিশ শেখাতেন- এ নিয়ে নানা বইপত্র, কাগজ ইত্যাদি দিয়েছিলেন। অসা প্রথম যেদিন এলেন সোজা এসে প্রত্যেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন 'ইয়ো হেতের অসা, ভ' হেতের দু?' (আমার নাম অসা, তোমার নাম কী?)। এভাবে ক্লাসের পরিবেশে আমাদের শুধু সুইডিশ বলারই নিয়ম ছিল। এর বাইরে অবশ্য অসার সঙ্গে অনেক আলাপ হতো। সুইডেনের সব অফিসের মতো আমাদের সেমিনারের সঙ্গেও একটি সুসজ্জিত রান্নাঘর ছিল। সেখানে চা ও অন্যান্য খাবার বানিয়ে খেতে খেতে আড্ডা দিতেও সাহায্য করতেন অসা। ওই সময় পঁচাত্তর পরবর্তী পট-পরিবর্তনের রেশ ধরে ধরপাকড়ের ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ থেকে অনেক তরুণ সুইডেনে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছিলো, একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অসা খুব সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দরখাস্তগুলো অনুবাদ করে দিতেন, এবং ওদের বক্তব্যগুলো বলে আমাদের মতামত চাইতেন। অসার কাছে যেটুকু সুইডিশ শিখেছিলাম তাতে কথা তেমন বলতে না পারলেও পত্রিকার খবরের মর্ম কিছুটা বুঝতে পারতাম। পত্রিকা বলতে বেশি হাতে পড়তো উপসালার স্থানীয় পত্রিকা 'উপসালা নিয়া টিডনিং' (উপসালা নব পত্রিকা), কারণ নরেন এটিই বিলি করতো। সেমিনারে গেলে অবশ্য সুইডেনের জাতীয় দুটি পত্রিকা 'দাগেন্স নিয়েটের' (দিনের খবর) অথবা 'সোয়েন্সকা দাগব্লাডেট' (সুইডিশ দৈনিক পত্র) পেতাম। এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক হালচাল কিছু এখান থেকে বুঝতে পারতাম।

সেবার ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের পোষ্ট ডক্টরাল প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে আরো ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ড. মসিহুজ্জামান, এবং পদার্থবিদ্যার ড. আবদুল মুইন খান। কাজেই আন্তর্জাতিক সেমিনার আবহাওয়ায় দেশীয় আড্ডাটিও কম হতোনা। তার ওপর সাপ্তাহিক ছুটিতে মাঝে মাঝেই আমি চলে যেতাম স্টকহোলমে আহমদউল্লাহদের কাছে। কলেজ জীবন থেকে আমার বন্ধু আহমদউল্লাহ তখন সুইডেনে পিএইচডি করছিলো, তার স্ত্রী জিনাতের (জিনু) সঙ্গে স্টকহোলমে থাকতো। ওরা দু'জনেই খুব চাইতো আমি শনি-রোববারগুলো যথাসম্ভব স্টকহোলমে ওদের সঙ্গে কাটাই। এজন্য জিনু আমাকে একটি শুট্টি কার্ডের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলো (শাব্দিক অর্থ সত্তর কার্ড)। সত্তর ক্রোনার দিয়ে কেনা এই কার্ড থাকলে যে কোন সময় উপসালা-স্টকহোলম ট্রেন ভ্রমণ করা যেতো, স্টকহোলমে যত্রতত্র বাসে-ট্রেনে যাতায়ত করা যেতো। এতে সপ্তাহান্তে আমার প্রচুর আড্ডা, ভুরিভোজন আর বেড়াবার ব্যবস্থা হয়ে যেতো।

আহমদউল্লাহরা আর তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে তখনকার সুইডেনের সামাজিক এক্সপেরিমেন্টগুলো প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছু জানতে পারছিলাম। সুইডেনের মানুষদের তখন সন্তান গ্রহণ করতে দারুণ অনাগ্রহ, বিয়ে করতেও। সন্তান জন্মদানকে উৎসাহিত করার জন্য যে কারো কোন সন্তান হলে

সরকার থেকে সন্তান পালনের জন্য প্রচুর ভর্তুকি পাওয়া যেতো যা হয়তো প্রয়োজনেরও অধিক ছিল। এই 'বার্ন বিদ্রোগ' বা সন্তান ভাতা নিয়ে ওখানকার বাংলাদেশীদেরকে খুব হাসিঠাট্টা করতে দেখতাম যে সুইডেনে স্বচ্ছল হবার একটি উপায় হলো বেশি সন্তান নেয়া। সুইডেনে সামাজিক সেবার বিষয়টি তখন সারা দুনিয়ার ঈর্ষার বিষয় ছিলো। শুধু বার্ন বিদ্রোগ নয় এরকম হাজারো রকমের বিদ্রোগ (ভাতা) পাওয়া যেতো অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য, দুর্ঘটনার জন্য, পড়াশোনার ব্যয়ের জন্য, বেকারত্বের জন্য ইত্যাদি কত কি। আহমদউল্লাহর একবার রাতে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা শুনলাম। এর জন্য টেলিফোনে শুধু একটি বিশেষ নম্বরে ফোন করতে হলো। তিন চার মিনিটের মধ্যেই নাকি ডাক্তারসহ একটি সুসজ্জিত এম্বুলেন্স এসে হাজির। এসব এম্বুলেন্স শহরের অলিতে গলিতে এমনিতেই টহল দিতে থাকে, যাতে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতে পরে। সামাজিক সেবাকে সুইডেন তখন এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো যে ওটা নিরবচ্ছিন্ন রাখা পরে সম্ভব হয়নি—এর অপব্যবহারের কারণে এবং যথেষ্ট সম্পদের অভাবে।

ইন্টারন্যশনাল সেমিনারের একটি মজা হলো বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে তাদের দেশ সম্পর্কে জানা। কিউবার তরুণী বিজ্ঞানী এলার কাছে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর কিউবায় গণশিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে আমার দারুণ আগ্রহ হতো। তিনি দেখলাম একেবারে কায়মনোবাক্যে একজন বিপ্লবী ও ফিডেল ভক্ত। সে সময় ইথিয়োপিয়ার বামপন্থী একনায়ক মেঙ্গিৎসু হাইলে মরিয়মের সমর্থনে কিউবা প্রচুর পরিমাণে সৈন্য পাঠিয়েছিলো। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা সেমিনারে এ নিয়ে এলাকে অভিযুক্ত করতেন। এলা কিন্তু এ সম্পর্কে ফিডেলের পক্ষে এবং তৃতীয় বিশ্ব সংহতি নিয়ে রীতিমত বক্তৃতা দিয়ে ফেলতেন এবং খুবই জোশ নিয়ে কথা বল্‌তেন। কিউবার বিখ্যাত দেশাত্ববোধক সঙ্গীত 'গুয়ানতেনা মেরা, গুয়াহিরা গুয়ানতেনা মেরা, গুয়ানতানা মে—রা .., গানটি এলা আমাকে শুদ্ধ ভাবে গাইতে শেখান (এটি ঢাকায় আমরা এপসুর ছেলেরা খুব গাইতাম)। এলার কাছেই প্রথম শুনলাম যে এটি আসলে একটি ভালবাসার কাহিনী ভিত্তিক লোক-সংগীত।

নব্বইয়ের দশকের বিশ্বজোড়া পরিবেশ সচেতনতার অনেক আগেই সুইডেনে সেই সাতাত্তর আটাত্তর সনে অসাধারণ পরিবেশ সচেতনতা লক্ষ্য করেছি। ওসময় যে সমাজতন্ত্রী সরকার এখানে ক্ষমতায় এসেছিলো তাদের একটি অঙ্গীকারই ছিলো সুইডেনের সব পরমাণু শক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া। সুইডেনের অবশ্য তখন প্রচুর বিকল্প শক্তি উৎস ছিল যা এখনো আছে—জল বিদ্যুৎ সম্পদ, বায়োম্যাস সম্পদ (উদ্ভিদ ভিত্তিক জ্বালানি, সারা দেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ বন থাকাতে) ইত্যাদি। সুইডেনের এক সময়ের তামা সম্পদ এবং আজকের লৌহ সম্পদ আমরা এর দূরবর্তী অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ

লৌহ খনি রয়েছে সুইডেনের একেবারে উত্তরে কিরুনায়—'লুইসা ভারা কিরুনা ভারা কোম্পানি' যেটি চালাচ্ছে। ও জায়গা এতই উত্তরে যে তা মেরু বৃত্তের একেবারে ভেতরে। ট্রেনে যাওয়ার সময় মেরু বৃত্তটি যখন পার হচ্ছিলাম তখন আমাদের সবাইকে একটি সার্টিফিকেট দেয়া হলো পৃথিবীর উত্তর মেরুর এত কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। সেটি ছিল ভরা গ্রীষ্মকাল জুন মাসের চতুর্থ সপ্তায়—অত উত্তরে প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই তখন দিন; এমনকি উপসালাতেও সে সময় গভীর রাত পর্যন্ত দিনের আলো থাকে। কিরুনায় যাওয়ার আকর্ষণ শুধু এগুলোই ছিলনা। আমাদের একটি লক্ষ্য ছিল হিমবাহ দেখা এবং এখান থেকে কিছুটা দূরে বরফঢাকা পর্বত বেষ্টিত টারফালা নামক জায়গায় হিমবাহ গবেষণা কেন্দ্র দেখা।

পর্বতারোহীদেরকে হেঁটেই পর্বত বেয়ে ওখানে যেতে দেখলাম। তবে আমরা গেলাম হেলিকপ্টারে। হিমবাহের মধ্যে গিয়ে এটি দেখা কিছুটা বিপজ্জনক হলেও আমরা তাই করলাম। এই হিমবাহ হলো জগদ্দল বরফের নদীর মতো, বছরে হয়তো দু'এক ইঞ্চি এগোয়। অতীতে এক কালে এই হিমবাহগুলোই সুইডেনের অনেক দক্ষিণে নেমে এসে একে আঁচড়িয়ে এর এবড়ো খেবড়ো ভূমি ও ছোট বড় অসংখ্য হ্রদ সৃষ্টি করেছিলো। কিরুনার পাহাড়ে ওঠে আমরা নিশীথ সূর্য দেখলাম ২৩ জুন রাতে; রাত মোটেই ছিলোনা ওটি, সূর্য একবার শুধু একটু হেলে পরের দিনের জন্য আবার উদিত হয়েছে। কিরুনা অঞ্চলে দেখলাম বেশ কিছু আদিবাসী সামি গোষ্ঠির মানুষ বাস করছে—সুইডেনের, নরওয়ের ও ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এরা বহু হাজার বছর ধরে বাস করছে যাদেরকে আগে ল্যাপ বা ল্যাপল্যান্ডার বলতো বিদেশীরা। সামিদের অনেকে এখনো বল্গা হরিণ চরিয়ে তাদের ওপরই নির্ভর করে; বল্গা হরিণের মাংস সুইডেনে নিত্য খাদ্য, সামিদের তো বটেই। তাছাড়া সমুদ্রে মাছ ধরে সেই মাছ ধোঁয়ায় দিতে দেখলাম সংরক্ষণ করার জন্য। হেলিকপ্টার করে টারফালায় যাওয়ার সময় উপর থেকে শত শত বল্গা হরিণকে পর্বতের একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে দেখলাম। সামিরাই হরিণগুলোকে চরিয়ে নিয়ে যায়।

উপসালা থেকে আমরা আন্তর্জাতিক সেমিনারের বিজ্ঞানীরা শুধু সুইডেনের নানা জায়গায় ভ্রমণ করিনি, বরং বৈজ্ঞানিক বড় কেন্দ্রগুলো দেখতে জার্মানিতে পূর্ব বার্লিন, পশ্চিম বার্লিন; সুইজারল্যান্ডে জুরিখ এবং হল্যান্ডের আমস্টার্ডাম ও লাইডেনেও গিয়েছি। সব জায়গায় অল্প সময়ে বর্তমান গবেষণা খুব বেশি দেখা হয়নি কিন্তু সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তীর্থের মতো জায়গা দেখতে পেয়েছি। জুরিখ পলিটেকনিকে আইনস্টাইন পড়তেন। এখানকার স্নাতক হবার পরপরই ১৯০৫ সালে একেবারে তরুণ আইনস্টাইন তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন—স্পেশিয়াল রিলেটিভিটি থিওরি, ফটো-ইলেকট্রিক থিওরি এবং ব্রাউনিয়ান মোশন থিওরি। আমস্টার্ডামের কাছে ছোট্ট লাইডেন শহরের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান খ্যাতি প্রধানত কেমারলিং ওনেসের জন্য যিনি

অতি নিম্ন উত্তাপের গবেষণায় যুগান্তকারী কাজ করেছেন—লাইডেনকে এর তীর্থে পরিণত করেছে। অতি নিম্ন উত্তাপে কোন কোন পদার্থের বিদ্যুৎ-রোধ শূন্য হওয়ার ঘটনা সুপার কন্ডাকটিভিটিও (অতি পরিবহন) তিনিই এখানে আবিষ্কার করেন। এসব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নতম উত্তাপ সৃষ্টির রেকর্ড তখন (১৯৭৮) পর্যন্ত এখানেই। সাধারণ হিসেবে সব চেয়ে নিম্নতম যে উত্তাপ সম্ভব তাকে বলা হয় পরম শূন্য উত্তাপ (অ্যাবসল্যুট জিরো)। কিন্তু পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব বলে ঠিক এই নিম্ন উত্তাপ সম্ভব নয়, তবে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাছের উত্তাপ সম্ভব। লাইডেনে এটিকে শূন্যের অতি অতি কাছে নেয়া সম্ভব হয়েছে। এমন সূক্ষ্ম ভাবে পরম শূন্যের কাছে যে অনেক দূরে একটি ট্রাক গেলে তার কাঁপুনিতেই উত্তাপ বেড়ে যায়। তবে আমার জন্য আর একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল সেদিনের পূর্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিনে কম্যুনিস্ট বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সীমান্ত অঞ্চলটি দেখা।

প্রথমে বিমানে গিয়েছি পূর্ব বার্লিনে। বিমান বন্দর থেকেই এর কড়াকড়ি নিরাপত্তা ও পুলিশী রাষ্ট্রের ভাবসাব খুব স্পষ্ট ছিলো; পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে আমাদের চেহারা মেলাতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গবেষণা করা হলো। রাস্তায় দেখলাম বিশাল বিশাল লাল ব্যানার—সম্প্রতি হয়ে যাওয়া বার্লিন যুব সম্মেলনের। মনে পড়লো এর বছর তিনেক আগে বাংলাদেশ যখন পূর্ব জার্মানির সঙ্গে দারুণ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে, তখন অনেক তরুণ ও রাজনীতিবিদরা এখানে দল বেঁধে এরকম সম্মেলনে এসেছিলো। এই অধুনালুপ্ত রাষ্ট্র পূর্বজার্মানির (জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক—জিডিআর) সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন দেশের মানুষরাই প্রধানত এখানে আসতে পারছিলো; দেখলাম তাদেরকে চমৎকৃত করার জন্য বেশ কিছু আয়োজন এখানে রয়েছে। বিশাল শপিং সেন্টার রয়েছে যেখানে অনেকটা পাশ্চাত্যের মতই ভাল ভাল ভোগ্য পণ্য রাখার ব্যবস্থা আছে—ডলারে কেনা যায়। বলতে গেলে এগুলো সোভিয়েত ব্লকের মধ্যে সেরা পণ্য। বার্লিন টাওয়ারের উপর ঘূর্ণায়মান রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এখানকার বিখ্যাত মিউজিয়ামে এক কালে গ্রিস থেকে আনা অমূল্য পারগামোন মার্বেল মূর্তিগুলো দেখলাম। এটি অবশ্য ভাগ্যক্রমে দেশ ভাগের সময় পূর্ব বার্লিনের অংশে পড়ে গিয়েছিলো। তবে যেটি খুবই বিসদৃশ তা হলো সব জায়গায় পুলিশী তৎপরতা, আর গোপনীয়তার ভাব। পাশ্চাত্যের সাধারণ দিলদরিয়া ভাবের খুব অভাব এখানে, যেটি এমনকি ল্যাবোরেটরির বৈজ্ঞানিক আলাপের মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। ঐ বৈঠকে মনে হলো কয়েক জন মানুষ সভাকক্ষে আছে শুধু নিজেদের বিজ্ঞানীরা কোন অতিরিক্ত বেফাঁস কথা বলে কিনা দেখার জন্য—অন্তত তাদের হাবভাবে তাই মনে হচ্ছিলো। ব্যতিক্রমী ভাবে পরে একটি মিনিবাসে জনৈক মহিলা যখন শহরটি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন বার্লিন দেয়ালের ওপারে পশ্চিম বার্লিনের দালানগুলো দেখিয়ে খুব উচ্ছসিত ভাবে তিনি বলছিলেন 'ওটিও আমাদের শহর, আমরা

আপাতত বিভক্ত হয়ে রয়েছি'। হয়তো গাড়ির মধ্যে আমরা সবাই বিদেশী হওয়াতেই তিনি ঐ উচ্ছাস প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছিলেন। সাধারণত পর্যটকরা বার্লিন দেয়ালের একটি গেইট 'চেক পয়েন্ট চার্লির' কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে আসা যাওয়া করে। আমরা কিন্তু বিমানেই পূর্ব বার্লিন থেকে উড়ে পশ্চিম বার্লিনে গেলাম—হয়তো জীবনের সংক্ষিপ্ততম বিমানযাত্রা করে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম অন্য জগতে চলে এসেছি। সেই রাত করফুরস ড্যামের ঝলমলে শপিং মলে সুসজ্জিত পাশ্চাত্যের নগর জীবনের সমারোহ দেখলাম যথারীতি, আর উন্টার ডেন লিন্ডেন (লিন্ডেন গাছের তলায়) নামক বিখ্যাত বৃক্ষ-সুশোভিত সড়কের প্রশান্ত হাসিখুশি আবহে হাঁটলাম। একটি দেয়াল কী করে একই জাতির দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাত্রাকে ভাগ করে রেখেছিলো তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পশ্চিম বার্লিনে সে রাতে ডিনারে খোশ গল্পের সময় এখানকার এক বিজ্ঞানী বলছিলেন 'দেখুন আমাদের কোন নিরাপত্তার সমস্যা নেই, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে কোন লাভও নেই। আমরা এমন ভাবে পূর্ব জার্মানির পেটের মধ্যে ওয়ারশ' জোটের (কম্যুনিস্ট সামরিক জোট) সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি যে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই আমরা তাদের দ্বারা দখল হয়ে যাবো'। এমন সরু সূতার উপর স্থিত ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভারসাম্য।

প্রফেসর তুভের সঙ্গে আমার যে গবেষণার কাজ তা শেষ করে একটি খসড়া প্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলাম। তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ; তাই এটি দেখে, আমাকে পরামর্শ দিয়ে, এর সঙ্গে নিজে কিছু যোগ করে একটি যৌথ প্রকাশনা যে করবেন সেই সময় তাঁর কম। তাই ঠিক হলো সাপ্তাহিক ছুটিতে আমাদেরকে নিয়ে তিনি স্টকহোলমের কাছের সমুদ্রে একটি অতি ছোট দ্বীপে তাঁর 'সমার স্টুগেতে' (গ্রীষ্মকালীন কুটির) চলে যাবেন এবং সেখানেই সবাই দু'তিন দিন কাটিয়ে এই কাজগুলো সম্পন্ন হবে। সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের অনেকেরই এরকম সমার স্টুগে থাকে। তুভের কুটিরটি যে দ্বীপে তাতে ওরকম আর মাত্র দশ বারোটা কুটির ছিল—এতই ক্ষুদ্র এই দ্বীপটি। বলতে গেলে তাঁরা ক'জন মিলে দ্বীপটির মালিক। এরকম অসংখ্য দ্বীপ সুইডেনের ওই উপকূলের কাছের সমুদ্রে ছিল। গাড়িতে করে ঘাটে পৌছে লাইফ জ্যাকেট পড়ে স্পিড বোটে আমরা ঐ দ্বীপে চলে গেলাম—প্রফেসর তুভে, সুইডিশ ছাত্র ওলে ও তার গার্লফ্রেণ্ড, সেমিনারের আর একজন পোষ্ট ডক্টরাল তানজানিয়ার কাশিনজে এবং আমি। দেখলাম সমার স্টুগেতে বসবাস মানে প্রকৃতির মধ্যে বাস। দ্বীপে প্রচুর বন-জঙ্গল আর প্রচুর পাখি। কিন্তু অন্য বাসিন্দারা এখনো ছুটি কাটাতে আসেনি বলে এটি জনমানব শূন্য। তুভের সমার স্টুগেতে কাঠের গুড়ির কিছু সাধারণ আসবাব ছাড়া বেশি কিছু নেই; তবে রান্নার ব্যবস্থা মন্দ নয়। একটি জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলো, যাতে ফ্রিজটি চালু হয়। ওলে আর তার বান্ধবী মাছ ধরার সরঞ্জাম

নিয়ে এসেছিলো—কয়েকটি ছিপ ইত্যাদি। সবাই মিলে কিছুক্ষণ মাছ ধরে বেশ কয়েকটি পাওয়া গেলো। রাতে এগুলো ভেজে খাওয়া হলো, আরো খাবার আনা হয়েছিলো।

ভোরের ঘুম ভাঙ্গলো অসংখ্য পাখির কলরবে। বাইরে এসে দেখলাম পাখিদের সমারোহে সে এক দৃশ্যই বটে। আগেই জেনেছিলাম যে কুটিরের সঙ্গে কোন টয়লেট নেই। বেশ দূরে এক জায়গায় একটু ঘেরা টয়লেটের মত আছে একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগের ওপর, যাতে জীবাণুনাশক ও কম্পোস্ট সহায়ক জিনিসপত্র দেয়া আছে—বর্জ্যগুলো সেখানে কম্পোস্ট হয়ে যায়। অবশ্য কুটিরের কাছে এক জায়গায় গোসলের পানির একটি শাওয়ার রয়েছে। সন্ধ্যার পর আবিষ্কার করলাম যে এখানে মশার সাংঘাতিক উপদ্রব। অবশ্য সারা গায়ে লোশন মাখা ছিল বলে বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া এগুলো আর কিছু করতে পারছিলোনা। একটি থিওরি প্রমাণ হয়ে গেলো। দেখলাম মশাগুলো তুভেকে আক্রমণ করছে কম, আমাকে তার চেয়ে বেশি, কাশিনজেকে সাংঘাতিক ভাবে। অর্থাৎ মশা কালো রঙে আকৃষ্ট হয়। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসের ফাঁকে ফাঁকে দিন রাত চল্‌লো প্রফেসরের সঙ্গে আমাদের এক একজনের বৈঠক। এরই ফলে আমাদের এখানে গবেষণার ফলাফলগুলো এক সময় জার্নালে প্রকাশ পেয়েছিলো।

রাশিয়া থেকে বাংলাদেশী সহ বিদেশী ছাত্ররা ছুটিতে সুইডেনে বেড়াতে আসতো। তাদের মুখে শুনেছি এখান থেকে কয়েকটি পাশ্চাত্যে বানানো ব্লু'জিন্স কিনে নিয়ে রাশিয়ায় বিক্রি করলেই নাকি রুবেলে অনেক টাকা পাওয়া যায়—এতই চাহিদা এসব জিনিসের। বুঝতে পারছিলাম যে বাইরে সোভিয়েত রাষ্ট্র যত শক্তিশালী ও গৌরবময় দেখায় ভেতরে ভেতরে সেখানকার মানুষের আকাঙ্খাগুলো পাশ্চাত্যের ভোগ্য পণ্যের দিকে মুখিয়ে আছে, নিজের দেশে যার খুব অভাব। সুইডেন থেকে ফেরার আগে সেখান থেকে রাশিয়া যাবার একটি চেষ্টা করেছিলাম। মস্কোতে এডুকেশন এটাচি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজে ইউনূস ভাইয়ের সহকর্মী এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ (একুশের অমর কবিতার কবি : 'ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক; একটি মিনার গড়েছি আমরা চার কোটি কারিগর।...)। তাঁকে লিখেছিলাম তাঁর অতিথি হিসেবে তাঁর সঙ্গে থাকবো এই বলে তাঁর স্পন্সরশিপে ভিসা পেতে পারি কিনা। তিনি জানালেন তা অসম্ভব, ভ্রমণকারী হিসেবে আসতে হলে রাশিয়ান ট্যুরিস্ট ব্যুরো ইনটুরিস্টের মাধ্যমে আসতে হবে, এবং তা বেশ ঝকমারি কাজ এবং ব্যয়বহুল। কাজেই সুইডেন থেকে রাশিয়া যাওয়া হয়নি, তবে অল্প সময়ের জন্য পোল্যান্ড যাওয়া হয়েছিলো দেশে ফেরার সময়। ড. মসিহুজ্জামান ও আমি ঠিক করেছিলাম বেশ কিছুটা ব্যয়সাশ্রয়ী পোলিশ এয়ার লাইন্‌স 'লট্‌সের' টিকেট করে দেশে ফিরবো, যাতে পথে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ'তে দু'একদিন থাকাও যাবে। সুইডেনে শুনে গিয়েছিলাম এক অদ্ভুত কথা। সরকারী রেইটে এক ডলারে পাওয়া

যায় মাত্র আট লটসি পোলিশ টাকা। কিন্তু ডলারের এত চাহিদা যে স্থানীয় মানুষরা অনেক বেশি বিনিময় হারে ডলার কিনবে। ওয়ারশ বিমান বন্দরে এক বাঙালি ছাত্র বললো বিমান বন্দরে নয় একেবারে শহরের মাঝখানে গিয়ে কোন ক্যাফেতে চা খেতে বসলেই অনেক উঁচু দরে স্থানীয়রা ডলার কিনে নিয়ে যাবে। সেখানে অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে। বললাম এসব পুলিশী রাষ্ট্রে সেটি করা ঠিক হবে কিনা। সে জানালো পুলিশও হয়তো আসতে পারে বেশি দামে ডলার কেনার জন্য। ছেলেটি শুধু বলেই ছাড়লোনা শহরে আসার জন্য দুজনকে দুটি বাস টিকেটও দিয়ে দিলো যাতে এখন টাকা ভাঙ্গাতে না হয়। সে যা বলেছিলো হুবহু তাই হয়েছিলো, ডলারে আট লটসির বদলে অনায়াসে আমরা আশি লটসি পেয়ে পোলিশ টাকায় পকেট ভারী করে ফেল্‌লাম। অবশ্য সে টাকায় খুব আকর্ষণীয় কিছু যে কেনার জন্য পেলাম তা নয়। পোল্যান্ডের প্রতি আমার অন্য গভীর আকর্ষণ ছিলো। সেই অষ্টম শ্রেণীতে ক্লাস লাইব্রেরিতে 'মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়' বইটিতে বাঙালি লেখকের পোলিশ স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে উদ্বাস্তু হবার কাহিনীর জন্য এবং মাদাম কুরীর কারণেই প্রধানত এটি সৃষ্টি হয়েছিলো।

সুইডেনে আসার সময়ের অভিজ্ঞতাগুলোও রীতিমত স্মরণীয়; প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ 'পানামের' (ঐ বিখ্যাত বিমান কোম্পনিটি পরে লুপ্ত হয়েছে) টিকেটের সুযোগ নিয়ে দিল্লি, তেহরান, ইস্তাম্বুল, এবং ভিয়েনা প্রত্যেক জায়গায় বেশ কয়েকদিন করে যাত্রা বিরতি করে তবে সুইডেনে এসেছিলাম। দিল্লিতে প্রয়োজনটি ছিলো অস্ট্রিয়ার ভিসা নেবার। তেহরানে গিয়ে রইলাম ঢাকার এটমিক এনার্জি কমিশনের আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অনুজ প্রতিম রশীদুজ্জামানের সঙ্গে। তাঁরা সেখানে ইরান সরকারের পরমাণু শক্তি কার্যক্রমে সহায়তা দিচ্ছিলেন। এখন (২০১৫) ইরানের পরমাণু শক্তি সক্ষমতা নিয়ে সারা দুনিয়ায় তোলপাড় হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে একদিন আমাদের বন্ধুরা ইরানকে এই ব্যাপারে হাতেখড়ি দিতে সাহায্য করেছিলো। ওই দিনগুলো ছিলো বলতে গেলে শাহের আমলের শেষ দিনগুলো—শাহের বিত্ত বৈভবের তেহরান যেটুকু দেখেছি আমার কাছে একটি ইউরোপীয় শহরের মতই মনে হয়েছে। সেখানে সব কিছুতে আধুনিকতার ছোঁয়া, মেয়েদের পোষাক অধিকাংশ পাশ্চাত্য স্কার্ট ইত্যাদি। অবাক লাগে এর মাত্র এক বছর পর সবকিছু বদলে গিয়েছিলো; ইমাম খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবে ইরান সম্পূর্ণ অন্য রকম দেশে পরিণত হয়েছিলো। এখন বুঝতে পারছি সাতাত্তর সনের সেপ্টম্বরে ইরানে যা দেখেছিলাম তার মধ্যে কোন গভীরতা ছিলনা। ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম 'ফাইভ ডলার এ ডে' নামক স্বল্প মূল্যে ভ্রমণের পরামর্শদাতা বইটির উপর ভরসা করে। ঐ পরামর্শ অনুযায়ী খুবই সস্তা একটি হোটেলের সন্ধান পেয়ে গেলাম ইস্তাম্বুলের একেবারে কেন্দ্রে। হোটেলের কাউন্টারের দায়িত্বে ছিল অল্প বয়সী এক তরুণ।

কথায় কথায় জানলাম সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার পরিচয় পেয়ে অনুরোধ করলো ফিজিক্সের কিছু বাড়ির কাজে তাকে সাহায্য করতে, আমি সানন্দে সেগুলো তাকে বোঝালাম। সেই থেকে সে আমার এমন অনুগত হলো যে সাশ্রয়ী ভাবে ইস্তাম্বুল দেখার সব পথ বাতলে দিলো। হাজার বছরের ক্যাথিড্রাল আয়া সোফিয়ার সামনে সর্বজনীন সাইট এ্যাণ্ড সাউন্ড শো কখন হবে, তোপকাপি প্যালেস মিউজিয়ামে কখন যেতে হবে, এসব বুদ্ধি তো দিলই, আমাকে সাধারণ তুর্কীদের লঞ্চে তুলে দিলো যাতে বসফরাসের এপার ওপার অর্থাৎ একবার এশিয়া, একবার ইউরোপ, আবার এশিয়া, এমনি ভাবে ঘাটে ঘাটে ভিড়ে সব দেখতে পারি সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে অতি অল্প পয়সায়। সে সময় আয়া সোফিয়ার কাছের চত্বরে ইস্তাম্বুলের দূরপাল্লার বাসগুলো সব থামতো। ওখানটায় অনেক্ষণ কাটিয়ে আমার অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিলো। নানা বাস দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে অদ্ভুত রোমান্টিক সব গন্তব্য—কোনটি যাবে আংকারা বা দামাস্কাস, কোনটি স্যালোনিকা, কোনটি বেলগ্রেড, ভিয়েনা, মনে হলো এ যেন ইউরোপ-এশিয়ার সব রাস্তার একটি মহামিলন কেন্দ্র, লাফ দিয়ে বাসে ওঠে বসলেই হলো।

অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে ছিলেন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সিতে (আই এ ই এ) ফাত্তাহ ভাই, ঢাকায় পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমার একটু সিনিয়র। তাঁর অতিথি হিসেবে ভিয়েনাও ভাল করে দেখা হলো, আর ঐ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিকেও। ফাত্তাহ ভাইয়ের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলো পরীক্ষা করা যাতে এর ইউরেনিয়াম জ্বালানির হিসেব নিকেষ থাকে, বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত না হয়। তাঁর জাপানি স্ত্রী হিরোকো সান এবং তাঁদের শিশুপুত্র ও কন্যার সঙ্গেও দেশে ভাল পরিচয় ছিলো—এখানেও তাঁদের সঙ্গে খুব মজা হলো। জাপানে পড়াশোনা করার সময় ফাত্তাহ ভাইয়ের বিয়ের কাহিনীটি এখানে শুনলাম। তাঁর রক্ষণশীল জাপানি শ্বাশুড়ি নিজের মেয়ের বিদেশী ছেলেকে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারতেননা। ফাত্তাহ ভাই আবার দেখতে ছিলেন অনেকটা জাপানি চেহারার, জাপানিও বলতেন একেবারে নিখুঁত উচ্চারণে। তাই বিয়ের পর শেষ পর্যন্ত হিরোকো যখন তাঁকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন শুধু বললেন, ফাত্তাহর বাড়ি পশ্চিমে—ভাবখানা এমন যে জাপানেরই পশ্চিমের কোন জেলায়। ওটা যে কত পশ্চিমে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বহুদিন পর, তত দিনে তিনি জামাইয়ের গুণে মুগ্ধ। সম্প্রতি প্রয়াত (২০১৫) ফাত্তাহ ভাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে।

ত্রিয়েস্তে বহু সংস্কৃতিতে অবগাহন

ছিয়াত্তর থেকে ছিয়ানব্বই—এর মাঝখানে অনেক বছরই ইতালির ত্রিয়েস্তে গিয়েছি, প্রত্যেকবার দুই আড়াই মাস করে থেকেছি; কখনো কখনো পর পর প্রায়

প্রতি বছরেই গিয়েছি। তাই ত্রিয়েস্ত শহরটিও এক রকম আমার শহরে পরিণত হয়েছিলো। পঞ্চাশের দশক থেকে স্থায়ী ভাবে ইতালির শহর হলেও ত্রিয়েস্তের সাম্প্রতিক ইতিহাস কিন্তু বড়ই বিচিত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ত্রিয়েস্ত ছিলো অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং অষ্ট্রিয়-জার্মান সংস্কৃতির একটি পীঠস্থল। ওই মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার জোটের বিরুদ্ধে ইতালি বিজয়ী হলে এটি ইতালির শাসনে চলে আসে। আগে থেকেই অবশ্য ত্রিয়েস্তে ইতালীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল, ইতালীয়ান ভাষীরাই ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ওই যুদ্ধের প্রচুর স্মৃতি, সৈন্যদের সমাধি ইত্যাদি ত্রিয়েস্তের আশেপাশে রয়েছে, আর আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের বহু লেখাতে তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে, কারণ তিনি অ্যাম্বুলেন্স দলের অংশ হিসেবে এই ফ্রন্টে ইতালীয় বাহিনীতে ছিলেন।

ত্রিয়েস্ত কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে একেবারেই লাগোয়া,বরাবর প্রচুর শ্লোভেন শ্লাভ মানুষের এখানে বাস ছিল; যুগোশ্লাভিয়ানরাও তাই একে তাদের দেশের অংশ মনে করতো। যতদিন এই অঞ্চলের অধিকাংশ শ্লাভরাই অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং ত্রিয়েস্তও তাই ছিল, ততদিন তেমন কোন সমস্যা হয়নি এ নিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হলে সমস্যার শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্শাল টিটোর কম্যুনিস্ট পার্টিজান বাহিনী এ অঞ্চলে ইতালীয় ও জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সারাক্ষণ গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং মিত্রবাহিনীর যুদ্ধজয়ের সময় ত্রিয়েস্তের দখলও নিয়ে নিয়েছিলো। ত্রিয়েস্তের পাহাড়ের ওপর অপিচিনাতে এই গেরিলাযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখেছি। কিন্তু মিত্র বাহিনী একে টিটোর নেতৃত্বাধীন যুগোশ্লাভিয়ার শাসনে দিতে চায়নি, তাই ১৯৫৪ পর্যন্ত বৃটিশ ও মার্কিন সেনারা এই বিতর্কিত অঞ্চলটি দখলে রেখেছিলো। এরপর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ত্রিয়েস্ত শহর ও আশেপাশের সামান্য কিছু অঞ্চল ইতালির এবং বাকি অংশ যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই যুগোশ্লাভ সীমান্ত ত্রিয়েস্ত শহরের খুব কাছেই রয়েছে। তখনো ত্রিয়েস্ত শহর ও আশপাশে প্রচুর শ্লাভিক মানুষ ছিল এবং তাদের ভাষা সার্বোক্রোয়াট সেখানে যথেষ্ট শোনা যেতো।

মজার ব্যাপার হলো ইতিহাসের এত রকমের হাত বদল হলেও ত্রিয়েস্তের কেন্দ্রস্থলের সকল বড় বড় স্থাপত্য কর্মগুলো সবই অস্ট্রিয়ান ঘরানার এবং শহরের রাস্তা, দুপাশের ভবন সবই প্রায় উনবিংশ শতাব্দী বা তারো আগের তৈরি একই ধাঁচের। শত শত বছর ধরে শহরের এই চেহারায় মনে হয় কোন পরিবর্তন আসেনি—আর তা খুবই সুন্দর চেহারা। এর প্রমাণ আমি হাতেনাতে পেলাম একদিন ত্রিয়েস্তের ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই হাতে নিয়ে শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে দেখে। ঐ বইয়ে ১৮৫৫ সালের দিকে তোলা এখানকার বেশ কিছু ছবি ছিলো। আমি সেই ছবির এক একটি ভবনের সঙ্গে এখনকার ওই একই ভবনের নানা খুঁটিনাটি মিলিয়ে দেখেছি, কোন পরিবর্তন নেই—প্রত্যেকটি অলঙ্করণ, জানালা, জানালার ভেনেশিয়ান কপাট সব কিছু হুবহু

এক; রাস্তা, ফুটপাত তাও একই; শুধু ঘোড়ার গাড়িগুলো নেই। দোকানপাটের, ক্যাফের পণ্য অবশ্য বদলেছে, কিন্তু তার ভবন বদলায়নি।

আমাদের কাজের জন্য ত্রিয়েস্তের যে এলাকা তা শহরের কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে মীরামারে নামক কৃত্রিম বন সৃষ্টি করা পার্কের মধ্যে ফিজিক্স কেন্দ্র আইসিটিপিতে। এই পার্কটি তৈরি করিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ান সম্রাট ফ্রানজ্ জোসেফের ছোট ভাই আর্ক ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ান। এখানে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের একেবারে পানি ছুয়ে আছে তাঁর ক্যাসেল, যে প্রাসাদে তিনি অষ্ট্রিয়ান নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে থাকতেন। আশপাশেই পার্কের বনের মধ্যে শাপলা, রাজহাঁস ইত্যাদি সুশোভিত কয়েকটি পুকুর, অনেক ভাস্কর্য ইত্যাদি। ১৮৬৪ সালে এই ক্যাসেল থেকে সমুদ্র যাত্রা করে তিনি মেক্সিকো যান ও সেখানকার বিদেশী হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের অবস্থায় ফরাসি সৈন্য ও দেশী-বিদেশী অন্যদের সমর্থনে নিজকে মেক্সিকোর সম্রাট ঘোষণা করেন। কিন্তু গণতন্ত্রীদের বিদ্রোহে ১৮৬৭ সালে ওখানে নিহত হন। আইসিটিপিতে কাজের ফাঁকে যখনই ঐ বিশাল পার্কের বনে হাঁটতে গিয়েছি, মাত্র চার পাঁচ মিনিটে সমুদ্র তীরে ঐ ক্যাসেলের প্রাঙ্গনে গিয়েছি হতভাগ্য ম্যাক্সিমিলিয়ানের কথা মনে হয়েছে। ক্যাসেলের সামনেই তাঁর আবক্ষ মূর্তি রয়েছে; আর ক্যাসেলে রয়েছে তাঁর সস্ত্রীক বসবাসের সব আসবাব ও চিত্র, এমনকি মেক্সিকোর দিকে তাঁর সেই শেষ যাত্রার ছবিও।

এমনই প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সৌন্দর্যের মধ্যেই রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি চমৎকার চর্চা স্থল আইসিটিপি, আবদুস সালাম সাহেব ছিলেন যার প্রাণপুরুষ। দুনিয়ার নানা দেশের বিজ্ঞানীদের কাজে মুখরিত জায়গাটি; এর করিডরে, ক্যাফেটেরিয়াতে, সেমিনার কক্ষে প্রায়শই দেখা হতো বিশ্ব খ্যাত সব পদার্থবিদদের; অনায়াসে আলাপ করা যেতো। ওখান থেকে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের বাঁধানো পার ধরে চওড়া হাঁটা পথ চলে গিয়েছে শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত—বাসে আসা যাওয়া করা যায়, এমনকি দীর্ঘ পথে হেঁটেও যাওয়া যায় সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে। এ পথে যতখানি পথই যাইনা কেন সারাক্ষণ দূরে দেখা যায় আড্রিয়াটিকের পানি ছুঁয়ে সেই মীরামারে ক্যাসেল—যেন ত্রিয়েস্তের প্রতীক। ওদিকে শহরের দোকানপাট, রোমান এমফিথিয়েটার ইত্যাদির এক দিকে পাহাড়, অন্য দিকে বন্দর ও সমুদ্র। পাহাড়ের গায়ে রয়েছে ত্রিয়েস্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আইসিটিপি যেখানে আছে তার কিছুটা ওপরে পাহাড়ে 'গ্যালিলিও বিল্ডিং' আমাদের থাকার জায়গা—এও সেই বন মীরামারে পার্কের প্রান্তে। রাতে গ্যালিলিও বিল্ডিং থেকে দেখা যায় ত্রিয়েস্ত শহরের, বন্দরের জাহাজের এবং আরো দূরে যুগোশ্লাভিয়ার শহরের বাতি।

সালাম সাহেব গ্যালিলিও বিল্ডিংটি তৈরি করিয়েছেন প্রত্যেক কামরাতে দু'জন করে থাকার জন্য—সব সময় দুই ভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী। এই নিয়মটি আমাকে বিভিন্ন সময়ের রুমমেটদের মাধ্যমে নানা দেশের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার

সুযোগ করে দিয়েছিলো। যেমন ইথিওপিয়ার তরুণ বিজ্ঞানী হাইলুর কথা ধরা যাক। প্রায় দু'মাস আমরা এক কক্ষে কাটিয়েছি, ইতালির দু'একটি জায়গায় এক সঙ্গে গিয়েছি ল্যাবোরেটরিতে কাজ করার জন্য। ওই সময়ে আমি ইথিওপিয়া সম্পর্কে যা জেনেছি, বাইরে থেকে আর কোন ভাবে তা জানা যেতোনা। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি ইথিওপিয়া এবং কাছাকাছি দেশ ইরিত্রিয়া (যা কখনো ইথিওপিয়ার সঙ্গে একত্রে কখনো ভিন্ন দেশ হিসেবে থেকেছে) ও সোমালিয়া ইত্যাদি আফ্রিকার হর্ন অঞ্চলের দেশ ক'টির সঙ্গে বাকি সাব-সাহারান আফ্রিকার অনেক পার্থক্য। ইথিওপিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, পোষাক ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের মিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তখন সেখানে মেঙ্গিৎসু হাইলে মরিয়মের কম্যুনিস্ট ঘেঁষা একনায়কত্ব চলছিলো। আমার বন্ধু হাইলু নিজেও রাশিয়ার বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করেছে, লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু না রাশিয়ার কম্যুনিজম না নিজ দেশে তার অক্ষম অনুকরণ—কোনটাই সে পছন্দ করেনা। ওর কাছে ইথিওপিয়ার কথা যত শোনেছি তার চেয়ে বেশি শোনেছি রাশিয়ায় তার দিনগুলোর কথা। রাশিয়ান ভাষা স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, আইসিটিপি-তে কোন রাশিয়ানকে দূর থেকে দেখেও সে বুঝতে পারে তাঁর দেশ কী, গিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ জুড়ে দেয়। ওর কাছে শিখে শিখে আমিও রাশিয়ান নারী পুরুষের চেহারা চট করে চিনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এক সঙ্গে ট্রেন ভ্রমণ করে আমরা বলোনিয়ায় গিয়েছিলাম সেখানকার বিখ্যাত বলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবোরেটরিতে। ত্রিয়েস্তে এবং ভ্রমণে ওর মাধ্যমে আরো বেশ ক'জন ইথিওপিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিলো।

আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো ত্রিয়েস্তে আমার পোলিশ রুমমেট তোমাসের সঙ্গে। ওর সঙ্গে কয়েকবার আমার আইসিটিপিতে সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু রুমমেট ছিলাম একবার বহুদিনের জন্য। দারুণ দিলখোলা মানুষ তোমাস। যতক্ষণ রুমে আছি, কথা আমাদের ফুরাতোনা। আর কিছু না হলে দু'জনেই যে একটু আধটু ইতালীয়ান শিখছি তার চর্চা করতাম। তোমাস পোল্যান্ড থেকে ট্রেনে এসেছে বলে ত্রিয়েস্তে অবস্থানের পুরো রসদই যেন সে দেশ থেকে নিয়ে এসেছে—প্রধানত নানা রকম টিনের খাবার। প্রায়শই সে আমাকেও তার সঙ্গে এসব খেতে বাধ্য করতো। এর সঙ্গে ত্রিয়েস্ত থেকে কেনা টাটকা পেঁয়াজ, টম্যাটো, প্যাপরিকা ইত্যাদি মিশিয়ে চমৎকার খাবার সে রুমেই তৈরি করে ফেলতো। আমাদের মজাটা হতো রাতের ঘুমাবার সময় আলাপে। একজন কথা বন্ধ করলে আরেকজন শুরু করতাম বলে কারো সহজে ঘুমানো হতো না; পরে দুজনে চুক্তি করে কথা বন্ধ করতাম। তোমাসের আলাপের অনেক মাত্রা—সে ভাল ফিজিসিস্ট, এর সম্পর্কে যে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করলে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো। তার বাড়ি ক্রাকাউয়ে যেখানে রয়েছে দুনিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি—সেই কপারনিকাসের ক্রাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়, তোমাস সেখানকার ছাত্র। ফিজিক্সের

থেকেও তার মুখে বেশি শুনতাম বাড়ি নির্মাণের কলাকৌশল। এক সহকর্মীর সঙ্গে মিলে সে ক্রাকাউয়ের শহরতলীতে নিজ হাতে একটি বাড়ি বানাচ্ছে। পড়াশোনা ও শিক্ষকতার পাশাপাশি ছুটির দিন গিয়ে একটু একটু করে সে বাড়িকে গড়ে তুলছে। এ জন্য বাড়ির নক্সা, ইটের দেয়াল গাঁথা, ঢালাই করা ইত্যাদি এক একবার কয়েকদিন করে করছে ওরা দুজন। দু'জন তরুণ শিক্ষক শুধু নিজেদের কায়িক শ্রমে ও কৌশলে একটি বাড়ি তুলে ফেলছে এমন কথা আমি আগে কখনো শুনিনি—তাই এর খুঁটিনাটি শুনতে আমার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য হতোনা। তোমাসেরও দেখলাম একটি নিত্য বিষয় হলো রাশিয়ার সমালোচনা। সে প্রায়ই বলতো 'আমাদের সমস্যাটি কী জান, রাশিয়া আমাদের বন্ধু নয়, আমাদের ভাই। বন্ধু হলে নিজে পছন্দ করতাম, ভাইয়ের ক্ষেত্রে সেটি হবার যো নেই, আমি চাই বা না চাই সে আমার ভাই হয়ে জেঁকে থাকবেই। শুধু সোভিয়েত রাশিয়াই যে ভাই তা নয়, এর আগে জারের রাশিয়াও ভাই হয়ে পোল্যান্ডকে নিয়ে অনেক খেলেছে, আর স্টালিনের রাশিয়াতো এমন ভাই ছিল যে হিটলারের সঙ্গে আমাদেরকে ভাগাভাগি করে নিতেও বাধেনি'। তোমাসের সঙ্গে আইসিটিপিতে আমার শেষ দেখা যখন হয় তখন লেস ভেলেসার নেতৃত্বে 'সলিডরনস' (সলিডারিটি) আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পোলান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি রীতিমত নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিলো। এ নিয়ে দেশের গণতান্ত্রয়নে তোমাসের দারুণ উৎসাহ আর আশা লক্ষ্য করেছিলাম। এর কয়েক বছর পরেই সে আশা পূর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু তোমাসের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

আসলে ঐ বছরগুলোতে কিছুদিন করে ত্রিয়েস্তে কাটানোটি দুনিয়ার হালচাল জানতে আমার জন্য একটি বাতায়নের কাজ করেছে- শুধু পত্র পত্রিকা পড়ে দেশ থেকে যা উপলব্ধি করতে পারতামনা। ১৯৮৪ সালেই প্রথম বার লক্ষ্য করি আইসিটিপিতে প্রচুর চীনা বিজ্ঞানীর আগমন ঘটেছে, সেই সঙ্গে আরো অনেক তরুণতর চীনা ছাত্র এসেছে আইসিটিপি'র সহযোগী সংগঠনে পদার্থবিদ্যায় ও গণিতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করার জন্য। এ রীতিমত ঝাঁক বেঁধে আসা। তরুণদের সবাই দ্রুত ইতালীয়ান শিখে ফেলছিলো—সর্বত্রই তাদের দেখা যেতো। তবে নানা বয়সী বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই আমাদের কথা হতো বেশি—পুরুষ যত, মহিলাও প্রায় তত জনই। তাঁরা আইসিটিপিতে বেশ প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কাছে শুনেছি চীনের নতুন নেতা দেং শিয়াও পিঙের চীনকে পুঁজিবাদী বিশ্বে উন্মুক্ত করার নতুন নীতির কারণেই এসব সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ির জন্য 'চার কুচক্রী' শাস্তি পেয়েছে, এখন 'বেড়াল সাদা কি কালো সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে ইঁদুর ধরাটাই কাজ'। শুধু আইসিটিপিতে নয় চীনা তরুণ তরুণীদেরকে তখন নাকি ইউরোপ আমেরিকার সকল বড় বড় বিদ্যাপীঠে দলে দলে পাঠানো হচ্ছিল। যে চীনা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো তাঁরা রাজনীতির কথা যে খুব বলতে চাইতেন তা নয়, তবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানা যেতো। চীনাদেরকে এত কাছে পেয়ে আমার আর একটি মজার কাজ ছিলো তাদের লিপিগুলোর মধ্যে কিসের ছবি শেষ পর্যন্ত কী রূপ লাভ করেছে, আর এখন কী অর্থ বুঝায় সেগুলো জানতে চাওয়া। এ এক মজার ব্যাপার। যেহেতু যে কোন নতুন শব্দ চীনা ভাষায় লিখে ফেলা যায়না (যেটি আমরা বাংলা ভাষায় পারি), কাজেই ইতোমধ্যে থাকা ছবি ভিত্তিক লিপির যেটির সঙ্গে এর উচ্চারণ সব চেয়ে ভাল মিলবে সেটিই ব্যবহার করতে হয়। যেমন *বাংলাদেশ* শব্দটি হয়তো আমরা স্বাধীন হবার আগে কখনো তাদের ব্যবহার করতে হয়নি, ফলে ঐতিহাসিক ভাবে এর জন্য কোন চীনা লিপি তাদের নেই। ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম বাংলাদেশকে তারা মেনজিয়ালাগুয়ো বলে কেন। উত্তর হলো তাদের লিপির যে সব সিলেবল-চিত্র রয়েছে তার মধ্যে মেন, জিয়া, লা, গুয়ো এই কয়টি একত্র করে লিখলে বাংলাদেশ কথাটির আওয়াজের সব চেয়ে কাছাকাছি একটি উচ্চারণ তারা পেয়েছে—তাই ওটাই তাদের কাছে বাংলাদেশ। এসব সিলেবল ও সিলেবল-সমাহারের কোন একটি অর্থ হয়তো আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই লিপির প্রশ্নে আইসিটিপিতে আমার আর এক জাপানি রুমমেট কাৎসুমির সঙ্গে আলাপটি ছিল মজার। আমরা জাপানিদের চীনা লিপি *কানজি* এবং একই সঙ্গে তাদের নিজেদের লিপি *কানা* ব্যবহারের বিষয়ে আলাপ করছিলাম। কাৎসুমি বলছিলো যে জাপানি শিশুকে এরকম বহু হাজার লিপি চিহ্ন সোজা মুখস্থ করে রাখতে হয়। আমি বললাম লিপি সংস্কারের ফলে এটি যদি না করতে হতো তা হলে শিশুরা বরং আরো জরুরী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাই বেশি মনে রাখতে পারতো; তাদের পরিশ্রমও কম হতো, লেখাপড়ায়ও বেশি এগিয়ে যেতে পারতো। কাৎসুমি সব মনোযোগ দিয়ে শুনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো—'তা হয়তো হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা জাপানি হতামনা'।

আশির দশকের শেষের দিকে ত্রিয়েস্তে ভিয়েতনামের বেশ কিছু তরুণ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের দেখে চমৎকৃত হয়েছি—দারুণ প্রতিভাবান, নিজেদের বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী, তাদেরও অর্ধেকের কাছাকাছি মহিলা। এ কোন নতুন ভিয়েতনামকে দেখছিলাম? অল্প কিছুদিন আগের ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের বীরত্ব নিয়ে আমার আলাপের অনেক উৎসাহ থাকলেও তাদের কিন্তু উৎসাহ বেশি ছিল এই নতুন ভিয়েতনামের কথা বলতে-যা প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর শিল্প-উন্নয়নের কথা। তাদেরকে দেখলাম দারুণ ভাবে ভবিষ্যতমুখী, অতীতমুখী নয়।

ত্রিয়েস্তে আমার এক রুমমেট করিমের কথাও খুব মনে পড়ে। আলজেরিয়ান এই তরুণ বিজ্ঞানী অত্যন্ত রসিক ছিলো—আর তার রসিকতার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিলেন তখনকার আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট শাদলি বেনজাদিদ। দেশে থাকতে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বেনজাদিদকে আমি কট্টর এক-নায়ক শাসক হিসেবেই জানতাম বিপ্লবোত্তর আলজেরিয়ার অন্য সব কর্ণধাররা যেমন ছিলেন—বেনবেল্লা,

বুমেদীন ওঁরা। কিন্তু করিমের কাছে তার অন্য চিত্র পেলাম। বুমেদীনের হঠাৎ মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন শক্তিশালী নেতা প্রেসিডেন্ট পদ আকাঙ্খী ছিলেন বলে তাঁদের কেউ না হয়ে ফাঁকতালে বেনজাদিদ প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন। করিম কথায় কথায় প্রেসিডেন্টের বোকামী ও অযৌক্তিক আচরণের কথা তুলে ধরে হাসতে হাসতে পেটের খিল ধরিয়ে দিতো—আর আফসোস করে বলতো 'শাদলি ওহ শাদলি'। ওর থেকে জানলাম ফরাসিরা আলজেরিয়া ছেড়ে গেলেও ফরাসি ভাষা ও কালচার অনেকখানি রেখে গেছে, সেদিক থেকে আলজেরিয়াবাসীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে গেছে—এক ভাগ ফরাসি কথায় বেশি স্বচ্ছন্দ, সুযোগ পেলে সব সময় ঐ ভাষাই ব্যবহার করে; অন্য ভাগ আরবি-ভাষী। করিম ঐ প্রথম দলে পড়ে, ওরা নাকি বাড়িতেও ফরাসি বলে, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে।

তুরস্কের বিজ্ঞানী নীলুফার এগরিচানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো তাঁর স্কুল পড়ুয়া ছেলে করকুদের মাধ্যমে, সে মায়ের সঙ্গে ত্রিয়েস্তে এসেছিলো, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিলো। নীলুফারের সঙ্গে পরে অনেকবার আইসিটিপিতে দেখা হয়েছে, গল্প হয়েছে। তিনি তুরস্কের তখনকার প্রধানমন্ত্রী তুরগুত ওজালের পারিবারিক বন্ধু। তাঁর কাছে ওজাল এবং তুরস্কের সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে প্রচুর আলাপ হতো। প্রত্যেকবার তিনি আমাকে তুরস্কের বিখ্যাত হালভা (হালুয়া) এবং 'টার্কিশ ডেলাইট' নামের বিখ্যাত মিষ্টান্নের প্যাকেট দিতেন—এগুলোর প্রতি আমার বিশেষ লোভ ছিল।

আর একজন তরুণী বিজ্ঞানী বুলগেরিয়ার মারিয়া কলারোভা কেমন করে জানি আমাদের দুতিন জনের একটি ছোট দলের গার্জেনগিরি নিয়ে নিয়েছিলো। ঐ দলে আমি ছাড়া ছিল তুরস্কের একজন তরুণ আহমেট আর সেদেশেরই তরুণী নশিদা, যে ত্রিয়েস্তে পিএইচডি করছিলো। বিজ্ঞানী হওয়া ছাড়াও মারিয়া ছিল শ্লাভ নৃগোষ্ঠির কালচারের একজন বিশেষজ্ঞ। ত্রিয়েস্তে ও তার আশেপাশের পাহাড়ে শ্লাভ ঐতিহ্য ধারণ করে যে পুরোনো মঠ ও অর্থোডক্স চার্চগুলো রয়েছে আমরা তার সঙ্গে সেগুলোতে যেতাম রীতিমত দীর্ঘ পায়ে হাঁটা, পাহাড় আরোহণ করা অভিযান চালিয়ে। বুলগেরিয়ানটি শ্লাভোনিক ভাষা হওয়াতে মারিয়ার সুবিধাই হতো ওখানে কথাবার্তা বলতে, লিপিগুলো পড়তে, আমাদেরকে বোঝাতে। এসব অভিযানে সাথে কী কী খাবার, পানীয় নিতে হবে, আপেল, রুটি ইত্যাদি কয় ভাগ করতে হবে এসব সে সযত্নে নিজের হাতে করতো। সিরিলিক লিপি (রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান ইত্যাদি ভাষা যাতে লেখা হয়) নাকি দুই বুলগেরিয়ান ভাই উদ্ভাবন করেছিলো—এ নিয়ে মারিয়ার গর্বের সীমা ছিলনা। মারিয়ার কারণে আমি পোপ জন পলকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পেরেছি। মারিয়া আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো ত্রিয়েস্তের উচ্চ ভূমিতে এক আধুনিক চার্চে যেখানে পোপ এসেছিলেন। সেদিন সারা ত্রিয়েস্ত ভেঙ্গে পড়েছিলো সেখানে। এর মধ্যেই মারিয়া আমাদেরকে পোপের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।

গ্যালিলিও বিল্ডিঙের এমন সব আকর্ষণ ছেড়ে ত্রিয়েস্তে আমাকে দু'একবার অন্যত্র অন্যভাবে থাকতে হয়েছে। এমনি একবার ছিলাম ত্রিয়েস্ত শহরের রাস্তাগুলো যেখানে পাহাড়ের ওপর ওঠে গিয়েছে সেই অঞ্চলে সিনোরা (মাদাম) নানুত নামে এক বৃদ্ধা বাড়িওয়ালির বাসায়। ত্রিয়েস্ত শহরটিই আসলে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চতার স্তরে রয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থলটি সমুদ্রের পাড়ে একেবারে সমুদ্র সমতলে—সমুদ্র থেকে কয়েকটি তৈরি করা খাল শহরের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এই অংশটি খুব সরু এক ফালি জায়গা। বাকি ত্রিয়েস্ত পাহাড়ের ঢালে। যথেষ্ট উঁচু পাহাড় প্রায় খাড়া ওঠে গেছে অনেকখানি ওপরে গিয়ে সেখানে মালভূমির মতো বিস্তৃত উচ্চ সমতল। বিভিন্ন বাস ঘোরানো-প্যাঁচানো রাস্তা দিয়ে ওই ওপরে যায়, তা ছাড়া আরো সরাসরি ওঠার জন্য কেবল ট্রেন রয়েছে। সিনোরা নানুতের বাসা এই দুইয়ের মাঝামাঝি এক জায়গায়। আশির কাছাকাছি বয়সের সিনোরা একা থাকেন, আমিই বাসায় অন্য একমাত্র প্রাণি। ওই বাসায় আমাকে অনর্গল ইতালীয়ান শুনতে হয়েছে সিনোরার মুখে। তিনি ইংরেজি জানেন না, ইতালীয়ান যে আমি খুব অল্প বুঝি তাও তিনি ইতোমধ্যে ধরে ফেলেছেন। তারপরও তাঁর কথার কোন বিরাম নেই। আমি সামান্য যেটুকু বোঝতাম সেখান থেকেই বাকিটা আন্দাজ করে নিতাম—দিন দিন আমার বোঝার ক্ষমতা বেড়েছে। একটা সুবিধা ছিল, সন্ধ্যার পর আমি যখন বাসায় আসতাম তার কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তিনি টিভি দেখতে বসতেন। তাঁর বেশির ভাগ কথা ঐ টিভিতে যেই সিনেমা বা সিরিয়াল দেখছেন সে সম্পর্কে; আমাকেও দেখতে হতো এবং যেহেতু ছবির কাহিনী বেশ কিছু আমি আন্দাজ করতে পারছি কাজেই তাঁর কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে এবং সায় দিয়ে দু'একটি কথা বলতে আমার সুবিধাই হতো। টিভিতে প্রায় ইতালির নানা যুদ্ধের (বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) ছবি থাকতো। শেষোক্ত যুদ্ধের বিষয় আসলে তিনি মুসোলিনিকে গালমন্দ করতেন—বলতেন 'স্টুপিডো ডুচে'। তাঁর শাসনামলে মুসোলিনিকে সবাই 'ইল ডুচে' (নেতা) বলতো; আর স্টুপিডো কি ইতালীয়ান শব্দ না আমাকে বোঝাবার জন্য ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করতেন জানিনা। তবে তিনি যে মুসোলিনিকে ঘৃণা করেন তা মনে হয়নি, বরং প্রিয় ডুচের কিছু কিছু ভুলের জন্য সস্নেহেই যেন গালমন্দ দিচ্ছেন। যুদ্ধে অবশ্য সিনোরা নানুত অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আহতও হয়েছেন; একদিন হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে তিনি দেখিয়েছেন এখনো থেকে যাওয়া দু-একটি ক্ষতের চিহ্ন। এ প্রসঙ্গ এনে তিনি প্রায়ই বলতেন 'ওহ ইব্রাহীম নো গয়রা, নো গয়রা, নো গয়রা' (যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ নয়)। সাধারণ সব ইতালীয়ানদের মতোই তিনি অঙ্গভঙ্গি করে, আবেগ দিয়ে এসব কথা যখন বলতেন মোটামুটি বুঝতে কষ্ট হতোনা।

কিন্তু শোনা এক জিনিস আর বলা অন্য জিনিস। বলাটি আমার জন্য বেশ দুঃসাধ্য হতো। তবুও আলাপ এক পাক্ষিক হয়না বলে চেষ্টা আমাকে করতেই

হতো। ইতালীয়ানে আমার শব্দ ভান্ডার ছিলো অতি সীমিত। তাই এর জন্য একটি ফর্মুলা বের করে নিয়েছিলাম। কোন জিনিস বোঝাতে ইংরেজিতে এর যত প্রতিশব্দ আছে তার মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে কটমটে আদি ল্যাটিনের মত মনে হয় (বাংলায় তৎসম শব্দের মতো) সেটিই ব্যবহার করে দেখতাম বোঝে কিনা। যেমন একবার সিনোরাকে বাংলাদেশের বন্যা বুঝাতে গিয়ে যখন কূল কিনারা পাচ্ছিলামনা, নানা সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করে ব্যর্থ হচ্ছিলাম, ইনানডেশন এই শব্দটিকেই একটু ইতালীয়ানের মতো করে বল্লাম 'ইনানডেৎসিয়োনে' সঙ্গে সঙ্গে সিনোরা লাফিয়ে ওঠে বল্লেন 'ওহ ইনানডেৎসিয়োনে এতক্ষণ তাই বলছোনা কেন?' বয়স আশির দিকে হলে কী হবে সিনোরা সব কাজ নিজের হাতে করেন। নিজেরও যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠা তিন জন মেয়ে আছে তাঁর, ওরা মাঝে মাঝে আসে; কিন্তু সিনোরা কাউকে কিছু করতে দেননা। আমি অদক্ষ হাতে মাঝে মাঝে রান্না করে খাই—একেবারেই সহজ ডিম ওমলেট, স্পেগেটি ইত্যাদি। কিন্তু তাতেও রন্ধন ব্যাকরণের এতো ভুল হতো যে সিনোরা সহ্য করতে পারতেন না, গজর গজর করতে করতে শিখিয়ে দিতেন, নইলে নিজেই করে দিতেন।

ত্রিয়েস্তকে বের হবার আর ঘরে ফেরার নীড় হিসেবে ব্যবহার করে আমি ওর মধ্যেই প্রচুর ভ্রমণ করেছি—যেগুলোকে মোটামুটি তিনটি এলাকায় ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো ইতালিতে, দ্বিতীয়টি অনেক সীমিত পরিসরে হলেও যুগোশ্লাভিয়ায়, আর তৃতীয়টি ফ্রান্সে। যুগোশ্লাভিয়ার কথা বাদ দিলে অন্য সবগুলোতে মূল ভ্রমণ হয়েছে ট্রেনে এবং এর সবগুলোরই প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হয়েছে ত্রিয়েস্ত-ভেনিস রেলপথ দিয়ে। এই সুন্দর পথ দিয়ে এতো অসংখ্য বার যাতায়ত করেছি যে এর স্টেশনগুলোর নাম আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে এর অনেক ক'টি হেমিংওয়ের উপন্যাসে উল্লেখিত দেখেছি এগুলোর প্রথম মহাযুদ্ধকালীন গুরুত্বের জন্য। প্রায়শ দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে ফেরার সময় সরাসরি ত্রিয়েস্ত পর্যন্ত না এসে ভেনিস সান্তা লুচিয়া স্টেশনে নেমে যেতাম—যেখান থেকে বের হলেই ভেনিসের বড় খালগুলো। স্টেশনের লেফট লাগেজে মালপত্র রেখে অনেকখানি সময় ভেনিসে কাটিয়ে, হয়তো তার গ্র্যান্ড ক্যানালের পাশে ঠায় বসেস থেকে গন্ডোলা, ওয়াটার বাসের আনাগোণা দেখে তারপর রাতের ট্রেনে ত্রিয়েস্তে ফিরতাম (ঘন্টা দুয়েকের পথ)।

ইতালির নানা জায়গা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি আইসিটিপি'র উদ্যোগে বিভিন্ন ল্যাবোরেটরির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। এভাবে পার্মা, বলোনিয়া, ফ্লোরেন্স, রোমে বহুবার গিয়েছি। ল্যাবোরেটরির কাজে গেলেও ইতালির যে সব প্রধান আকর্ষণ এর ইতিহাস, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এসবের কোনটির প্রতি অবহেলা করিনি কখনো। রোমে গেলেই একই ফোরাম, কলোসিয়াম, প্যানথিয়োন, ট্রেভি ফাউনটেন, ভ্যাটিকান ইত্যাদি বার বার দেখেছি প্রত্যেক বার 'রোমান হোলিডে' সিনেমাটির অড্রি হেপবার্ন ও গ্রেগোরি পেককে স্মরণ করেছি, ওসব স্থাপত্যের

অনেক গুলোর স্রষ্টা জুলিয়াস সীজারকে বা অগাস্টাস সীজারকে স্মরণ করা ছাড়াও। তবে ইতালিতে আমার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার মানুষগুলো। সব সময় হৈ চৈ, অট্টহাসি, হাতের মুদ্রা দেখিয়ে এমন ভাবে কথা বলা যেন ঝগড়া করছে, আসলে আলাপকে ভারী উপভোগ করে এরা। তবে এর মধ্যেও ইতালীয়ান মানুষের বর্ণনাটি সর্বত্র একই ভাবে দেয়া যাবেনা, কারণ আমি নিজেই স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে ইতালির মানুষের হালচাল কেমন করে বদলে যায়।

আমার বাস ছিলো মোটামুটি উত্তরের আবহে ত্রিয়েস্তে। এর কাছাকাছি বিখ্যাত জায়গাগুলো হলো ভেনিস, পাদুয়া; আর একটু দূরে ভোরানা—সেই সেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েটের কাহিনীর শহর। আমাকে প্রায়ই মিলান যেতে হতো ফ্রান্সের ট্রেন ধরতে অথবা ভিসা করতে, তাই পথের মধ্যে নেমে এসব শহর দেখা হয়ে গিয়েছিলো—পাদুয়াতে গ্যালিলিওর বিশ্ববিদ্যালয়, ভেরোনাতে রোমিও-জুলিয়েটের সেই ব্যালকনি ইত্যাদি সহ। মিলান নিজে হলো উত্তরের মহানগরী—শিল্পায়িত জায়গা, সব দিক থেকে এখানকার মানুষ অধিকতর স্বচ্ছল, পশ্চিম ইউরোপীয় চাল চলনে অভ্যস্ত—আদব কায়দায় কিছুটা শরীফ গোছের। তারপর যত দক্ষিণে গিয়েছি মানুষের ধরন বদলেছে, বিশেষ করে রোমে যখন পৌঁছে যাই। কিছুটা ইতালীয় চটুলতা ও নগরীর চরিত্রের কারণে এখানে মানুষ একটু বেপরোয়া, গাড়ি চালায় নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে, রাস্তায় কোন মেয়েকে দেখলে অপরিচিত যুবকরা অকারণ শিষ দেয়—এগুলো মনে হয় কেউ গায়ে মাখেনা। তা ছাড়া ছিচকে অপরাধও অনেক বেশি, এক সময় তো রোম ও আশপাশের কিছু শহর এজন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠেছিলো। আর নেপল্‌সে যখন গিয়েছি তখন মনে হলো অন্য এক দেশে এসে পড়েছি। মানুষের গায়ের রঙ অনেকেরই বেশ শ্যামলা—প্রায় বাঙালীদের মতই প্রায়। দারিদ্রের ভাব (অন্তত সেই সত্তর-আশির দশকে) খুব স্পষ্ট—মাথায় বহন করা পাত্রের মধ্যে অনেক পিৎসা নিয়ে চিৎকার করে ফেরিওয়ালা ফেরি করছে। একা পেলে বিদেশীকে ও মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করার ব্যাপারে বখাটে যুবকরা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আবার সেই ইতালি তো ইতালিই—সবাই সবকিছু কিছুটা হাসি মুখেই নেয় বলে মনে হলো। অথচ এই নেপলসই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর আর এখানেই দেখলাম আমার কাছে ইতালির সব চেয়ে চমকপ্রদ দর্শনীয় স্থান প্রাচীন পম্পেই শহর। এই শহরটি ৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট দিনটিতে কাছেরই ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির ছাই ও পাথর কণায় পুরাপুরি ঢেকে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রায় দু'হাজার বছর পর ওপরের মাটি সরিয়ে পুরা শহরটি আবার আবিষ্কৃত হয় ঠিক যে অবস্থায় ওই দিনটির ওই মুহূর্তটিতে শহরটি ছিলো। মানুষরা পালাতে গিয়ে মারা গিয়েছিলো, অনেকে নিজের বাড়িতেই মারা গিয়েছিলো সকালের নাস্তার টেবিলে বসা অবস্থাতেই, টেবিলের রুটি ও খাবার পুড়ে অঙ্গার হয়ে এখনো আছে, মৃতদেহগুলোও বিশেষ

উপায়ে মূর্তিমান করা হয়েছে। স্টেডিয়াম, থিয়েটার, ছোটবড় রাস্তা, রুটির বেকারি, পাবলিক গোসল খানা, জনসভার জায়গা, সেখানকার স্তম্ভ মূর্তি সবই আছে। ৭৯ সালের সেই দিনটিতে শহরটি যেমন ছিলো ঠিক তেমনি তাকে খুঁজে পেলাম, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কামরায় কামরায় দেখলাম সবই প্রাচীন বাস্ত ব, কিছুই কৃত্রিম নয়। এমনকি তখন ওখানে একটি নির্বাচন হবার কথা ছিল তার ভোট প্রার্থীদের প্রচারে দেয়ালের লিখনও। প্রাচীন পম্পেই থেকে বেরিয়ে নতুন পম্পেইতে এসে দেখলাম আধুনিক শহর, নেপলস অঞ্চলের মানুষের অসম্ভব হৈ চৈ, পিৎসাওয়ালার হাঁক ইত্যাদি। যদিও ইতালির কুখ্যাত মাফিয়াদের আসল আদি ঘাঁটি হলো কাছেই সিসিলি দ্বীপে, তবে শুনলাম মাফিয়ার কিছু দৌরাত্ম এই নেপলস অঞ্চলেও রয়েছে।

ত্রিয়েস্ত থেকে আরো কাছে, আরো সহজে কথায় কথায় চলে যাওয়া যেতো যুগোশ্লাভিয়ায়—আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে যুগোশ্লাভিয়ার অঙ্গরাজ্য শ্লোভেনিয়ার কিছু এলাকায়। আসলে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে রেল পথে পূর্বের বিশ্বে যেতে গেলে ত্রিয়েস্ত হচ্ছে মধ্যেকার স্টেশন, সাংস্কৃতিক অর্থেও তাই। এখান থেকে একদিকে গেলে ইতালি বা অষ্ট্রিয়ার নানা শহর অন্যদিকে গেলে জাগ্রেভ, বেলগ্রেড, ইস্তাম্বুল—সব তুর্কী প্রভাবিত। আগেকার দিনের বিলাসী ট্রেন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের সব গল্পে (এমনকি জেম্‌স বন্ডেও) ত্রিয়েস্তের এই উল্লেখ রয়েছে। ত্রিয়েস্ত নিজেই অবশ্য একসময় প্রচুর সংখ্যক শ্লাভ জনগোষ্ঠির আবাস ছিলো। ১৯৫৪ সনে ত্রিয়েস্ত শহর ইতালিতে অন্তর্ভুক্ত হলে ওদের অনেকে যুগোশ্লভিয়ায় চলে গেছে। তা সত্ত্বেও ত্রিয়েস্ত ও আশেপাশে সার্বোক্রোয়াট ভাষায় কথা বলা অনেক শ্লোভেন মানুষের বাস রয়েছে, তাদের বেশ কিছু দোকানপাটও শহরে আছে। যুগো-মার্কেট বলে একটি এলাকাই আছে তাদের ব্যবসার। শনি ও রোববার এটি বিরাট অস্থায়ী বাজারে পরিণত হয়। ঐ দুদিন যুগোশ্লাভিয়া থেকে প্রচুর ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা এখানে আসতো—তখন ওখানে ইতালীয়ান ভাষা যত শোনা যেতো, সার্বোক্রোয়াটও শোনা যেতো প্রায় সে রকমই। এ বাজারের কাছে শহরের মাঝখানেই অর্থোডক্স চার্চের দুটি সুন্দর গির্জা রয়েছে, যুগোশ্লাভিয়ার অনেক মানুষই অর্থোডক্স খৃষ্টান ধর্মাবম্বী। ইতালির ত্রিয়েস্তে যুগোশ্লাভ ক্রেতা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দেখে স্পষ্ট বুঝা যেতো দুই দেশের অর্থনৈতিক পার্থক্য। যুগোশ্লাভ সবার চেহারায় এবং পরিচ্ছদে দারিদ্রের একটি ভাব দেখা যেতো, অন্ত ত তুলনামূলক দারিদ্রের। ত্রিয়েস্ত শহরে যে অল্প কয়েকজন ভিক্ষুক দেখা যেতো তারাও দেখতে যুগোশ্লাভ, আরো দুঃখের বিষয় হলো দেখে মনে হতো তারা যুগোশ্লাভিয়ার মুসলিম অংশ থেকে এসেছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় আমাদের অধিকাংশ যাত্রা ছিল দিনে গিয়ে দিনে আসার ব্যাপার। ত্রিয়েস্তের বাস স্টেশন থেকে বাস পাওয়া যায় যা সীমান্ত পার হয়ে কাছের শ্লোভেনীয় শহর কপারে যায়, কিংবা আরো একটু দূরে শ্লোভেনিয়ার

রাজধানী লুবলিয়ানায় যায়। কপার আড্রিয়াটিকের পারের ছোট্ট শহর—ত্রিয়েস্তে আমাদের গ্যালিলিও বিল্ডিঙের পাহাড়ের ওপর থেকে এর বাতি রাতে দেখা যায়। তেমন কিছু নেই ওখানে, বন্দর হিসেবে দেখতে গেলে ত্রিয়েস্তের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু সেখানে আমাদের আকর্ষণ হলো সস্তায় খাবার দাবার কেনা—এমন কি টাটকা গরুর মাংস, সবজি ওসবও—পুঁজিবাদী ইতালির চেয়ে কম্যুনিস্ট যুগোশ্লাভিয়ায় এগুলো অনেক সস্তা। তাছাড়া কপারের রেস্টুরেন্টে ভরপেটে ভাল খাবার খেয়ে আসা যায় যেই দামে ইতালিতে তা অসম্ভব। লুবলিয়ানা অপেক্ষাকৃত বড় সুন্দর শহর—এখন এটি একটি স্বাধীন দেশ শ্লোভেনিয়ার রাজধানী। লুবলিয়ানা যাওয়ার পথে একবার গিয়েছি পস্তয়নাতে যেখানে রয়েছে দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ভূগর্ভস্থ গুহার একটি। মাটির নিচে মনে হয় প্রাকৃতিক গুহার এক আলাদা শহর। সেখানে পর্যটকদের জন্য তৈরি ছোট ট্রেনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া যায়। গুহার ভেতরে ষ্টেলেকটাইট নামে পাথরের অসংখ্য সূঁচালো সব দণ্ড ওপরে গুহার ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এগুলো আসলে ফাঁপা, এদের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি পড়ছে অবিরত, এতে আঘাত করলে বাদ্য যন্ত্রের মত সুন্দর বাজে। গুহার মধ্য দিয়ে চলে গেছে ভূগর্ভস্থ নদী। এখানে চির অন্ধকারের কারণে দেখলাম কোন কোন মাছের চোখ নেই। এমন প্রাকৃতিক রাজ্যও মানুষের যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। টিটোর পার্টিজান গেরিলারা এখানে একটি গোলাবারুদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। জার্মানরা সেটি জানতে পেরে একে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিলো—ফলে গুহার এক অংশ নিকষ কালো, ধ্বংসপ্রাপ্ত। এসব জায়গায় সেসময় যখন গিয়েছি যুগোশ্লাভিয়া তখন সুন্দর শান্তির জায়গা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর, ভ্রমণকারীদের স্বর্গ। অথচ নব্বই এর দশকে ত্রিয়েস্তে গিয়ে যখন ওই দিকে তাকিয়েছি মন খুব খারাপ হতো। প্রতিদিন শুনতাম যুগোশ্লাভিয়ার হানাহানির কথা, গৃহযুদ্ধের কথা, গণহত্যার কথা—সার্ব আর ক্রেয়াটদের মধ্যে, বসনিয়ান আর সার্বদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে; আরো কত জনের কতরকম প্রতিপক্ষ সেখানে হানাহানিতে মেতেছিলো।

ত্রিয়েস্তে যতবার গিয়েছি তার অধিকাংশ বার ওখান থেকে আমার অন্তত এক সপ্তাহের জন্য হলেও ফ্রান্স যাওয়া হয়েছে, কখনো আরো যথেষ্ট দীর্ঘতর সময়ের জন্য। সবই সিএমইএসের সহযোগী টেরে ডেস হোম্‌স-ফ্রান্সের আমন্ত্রণে। কাজেই ট্রেনে ত্রিয়েস্ত থেকে প্যারিস যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন আমার মুখস্থ ছিলো। ভেনিসে ফ্রান্সের একটি কনস্যুলেট ছিলো যা আমার জন্য খুব সুবিধাজনক হতো—দিনে গিয়ে দিনে ভিসা নিয়ে ফেরত আসতে পারতাম। প্যারিসের আসল আন্তর্জাতিক ট্রেনটি ধরতে হতো মিলানে গিয়ে। দিনে ট্রেনে মিলান যেতে চার পাঁচ ঘন্টা লাগতো; সেখানে প্যারিসগামী রাতের ট্রেনে স্লিপার কোচে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যেতে পারতাম। ঘুমাতে যাওয়ার আগেই ট্রেন কন্ডাক্টর পাসপোর্ট সংগ্রহ করে

নিয়ে যেতো; ভোরে সবাই ঘুম থেকে উঠলে কামরায় কামরায় গিয়ে সিল লাগানো পাসপোর্ট ফেরত দিতো। ট্রেনের মধ্যেই ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট-ভিসা পরীক্ষা ইত্যাদি সেরে রাখতো। কখন যে ইতালি পার হয়ে রাতের গভীরে ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছি টেরও পেতামনা। একবার এই ট্রেনে এক ফরাসি সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইতালীয়ানদের সঙ্গে ফরাসিদের পার্থক্য কী? তিনি বল্লেন 'ট্রেনের মধ্যেই মৃদুভাষী ফরাসিদের এবং হৈ হৈ মার্কা উচ্চ কণ্ঠ ইতালীয়ানদের দেখলে তুমি নিজেই ওটা টের পাবে'।

প্যারিসে সাধারণত আমার গন্তব্য ছিলো স্যাঁ দেনিতে টেরে ডেস হোম্‌স অফিস অথবা মোমার্তের কাছে জিল ডেনিলসের ষ্টুডিওতে। এভাবে বার বার যাওয়াতে প্যারিস শহর মোটামুটি পরিচিত হয়ে পড়েছিলো। বিশেষ করে প্রথম যেবার গেলাম তখন সাঁওতাল লুকুক নামের এক তরুণী ছিলো টেরে ডেস হোম্‌সের প্রতিনিধি, যে এর আগে ঢাকায় আমাদের প্রকল্প দেখে গেছে টাঙ্গাইলের সুরুজে। সাঁওতাল ছিল শুধু পাক্কা প্যারিসিয়ান নয় প্যারিসের নগরজীবন ও স্থাপত্যের একজন বিশ্লেষক ও এর নানা বিষয় নিয়ে রীতিমত একজন আন্দোলনকারী। যেমন ল্যুঁভ মিউজিয়ামের সামনে তখন সদ্য যে কাচের পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছিলো এর সে ঘোরতর বিরোধী ছিলো। আবার অন্য দিকে পাম্পেদু সেন্টারে যেভাবে বিশাল ভবনের পুরো মেরুদণ্ড কাঠামো সবই ভেতরে গোপন রাখার বদলে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে—চলন্ত সিড়ি, বাতাস চলাচলের চোঙা সব কিছু সমেত, এই সাহসী স্থাপত্য তার খুব পছন্দ। তার চক্ষুশূল অথবা প্রিয় স্থাপত্য নির্বিশেষে সে আমাকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে ছেড়েছে। তাছাড়া শব্দের শেষের দিকের যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণকে হিসেবের মধ্যে না নিয়ে অতি সংক্ষেপিত এবং অনুনাসিককৃত ফরাসি উচ্চারণের মৌলিক বিষয়গুলোও সে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো—যেমন ইংরেজিতে অভ্যস্তরা যেটি পড়বে সেন্ট ডেনিস সেটি হয়ে যায় স্যাঁ দেনি অথবা ন্যাশন হয়ে যায় ন্যাশোঁ ।

প্যারিসে টেরে ডেস হোম্‌স অফিসে সম্মেলন করা ছাড়া ফ্রান্সে আমার মূল কাজ ছিল মফস্বলে গিয়ে ঐ সংস্থার মৌলিক সদস্যদের মধ্যে প্রকল্প নিয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করা। এজন্য প্রতিদিন কয়েকবার করে আমাকে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিতে হতো, প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। এটি প্রধানত জিলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে করেছি। জিল দোভাষীর কাজ করতো। জিলের কাজের নিজের এলাকা ছিলো ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল—নর্মান্ডি ও তার আশেপাশের প্রদেশগুলোতে। এই অঞ্চলে ছবির মত সুন্দর ছোট ছোট অনেক শহরে এ ভাবে গিয়েছি, অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। দেখলাম টেরে ডেস হোম্‌সের মাধ্যমে সুদূর বাংলাদেশেও কাজে লাগার জন্য ওখানকার সাধারণ মানুষের কী আগ্রহ! সেই সঙ্গে যেখানেই গিয়েছি সেখানকার ইতিহাস, অর্থনীতি এসবও ভ্রমণে আলোচনায় বার বার ওঠে এসেছে। যেমন নর্মান্ডির সমুদ্র সৈকত এলাকা এক দিকে যেমন বহু যুগের চিত্রশিল্পীদের প্রিয়

জায়গা অন্য দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নর্মান্ডি বিচ ল্যান্ডিঙের সময় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেরও স্মৃতি এখানে এখনো দগদগে হয়ে আছে। পুরোনো 'লংগেস্ট ডে' অথবা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক 'সেইভিং প্রাইভেট রায়ান' সিনেমায় যার দৃশ্যগুলো আমরা দেখেছি। জীবন বাজি রেখে মিত্র বাহিনীর সেনারা সমুদ্রের কিনারায় তাদের অবতরণযান থেকে নামছিলো আর জার্মান মেশিন গানের শিকার হচ্ছিলো। তারপরও সেই বাধা অতিক্রম করে যারা এগিয়েছিলো তাদের সঙ্গে ওখানকার গ্রাম ও শহরবাসীদের সাক্ষাৎ কী ধরনের ছিলো তার বর্ণনা পেলাম এখানে অনেকের কাছ থেকে—এখন যাদের মাঝবয়স পার হয়ে গেছে, তখন যারা ছিলো শিশু কিংবা বালক-বালিকা। সমুদ্রের কাছে একটি শহরে যে হল ঘরে আমরা সম্মেলন করলাম সেটি নাকি আসলে ছিলো একটি লবণ গুদাম, কারণ এলাকাটি লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত। ওরা লবণের গুদামকে কী চমৎকার শব্দ-গুণ সম্পন্ন সুন্দর অডিটোরিয়ামে রূপান্তরিত করেছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। নর্মান্ডি থেকে উপকূল এলাকা ধরে কিছু পশ্চিমে এগিয়ে যখন অন্যান্য শহরে গিয়েছি পথে পড়েছে স্যাঁ মালো যার সাগরের তীর ঘেঁষেই রয়েছে মধ্য যুগের কামান সাগরের দিকে তাক করা দুর্গ। কাছে আরো অদ্ভুত একটি জায়গা হলো বিখ্যাত মোঁ স্যাঁ মিশেল—একটি পাহাড়কে আশ্রয় করে উপরের দিকে সূঁচালো হয়ে ওঠে যাওয়া মধ্য যুগের একটি মঠ-আশ্রয়ী শহর। গির্জা-মঠ, সন্ন্যাসিদের থাকার জায়গা নিয়েই গড়ে ওঠেছিলো নানা চড়াই উৎরাই গিঞ্জি অলিগলিতে ভরা মূল শহর। এখনো ওভাবেই আছে, মঠের যাজকরা আছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে দোকানপাট, পর্যটক-প্রিয় ব্যবস্থাদি নিয়ে আধুনিক এক শহরও। পুরো ব্যাপারটি সমুদ্র তীরে পানির একেবারে গা ঘেঁষে—জোয়ারের সময় দেখলাম এর পাদদেশে সমুদ্র পৌঁছে গিয়ে একে একটি দ্বীপের মতো মনে হচ্ছে।

ঐ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে ফ্রান্সে যে স্বল্পাকার কৃষিরও যে একটি বড় গুরুত্ব আছে তা টের পেলাম। অনেকের সঙ্গে কথা হলো যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে একটি তরুণ কৃষক দম্পতির খামারে গেলাম ছাগলের দুধের পনির তৈরি দেখতে—ফ্রান্সে ছাগলের দুধের পনিরকে আলাদা একটি গুরুত্ব দেয়া হয়। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই দম্পতি নিজেরাই নিজেদের কৃষির কাজ করেন, খামার সংলগ্ন ছোট্ট বাসাতে থাকেন। সময় হলে একটি ঘন্টার মতো বাজিয়ে ডেকে একত্র করে ত্রিশ-চল্লিশটা বড় বড় ছাগলকে দুধ দোয়াবার জায়গায় লাইন করে খাড়া করে দিলেন। দুধ দোয়াবার যন্ত্রটাই শুধু আধুনিক, বাকি বেশির ভাগ কাজ হাতেই করছেন। ঐ দুধ থেকে ছানা কাটা হলো, তাতে পনির তৈরির এনজাইম মেশানো হলো। পনির দানা বাঁধার পর তাঁরা দু'জন ক্রমান্বয়ে একে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে পানি বিযুক্ত করলেন, এবং বার বার কাপড়ের ছাকনির মধ্যে নিয়ে টিপে টিপে পানি বের করে দিলেন। অবশেষে সাইজ করে করে শেলফে রেখে দিলেন পনিরকে পাকতে দেয়ার জন্য। আমরা যারা গেলাম সবাইকে খামারের

টাটকা খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়ে প্রচুর ছাগলের পনির সঙ্গে দিয়ে দেয়া হলো। এর মধ্যে ওদের এক শিশু পুত্র ও কন্যা স্কুল থেকে এসে পড়েছিলো, এইই তাদের সংসার। বল্‌লেন সারাদিন অনেক কাজ—কাছের আলফা আলফা ঘাসের খেত থেকে ঘাস কেটে এনে ছাগলকে খাওয়াতে হয়, সেই ঘাষ চাষ করতে হয়, দু'বেলা ছাগলকে দুধ দোয়াতে হয়, তারপর পনির বানিয়ে, প্যাকেজিং করে বিক্রির জন্য তৈরি করতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম এ কাজ থেকে তো একদিনের জন্যও ছুটি নেবার জো নেই—তা হলে অবসর মেলে কেমন করে? তাঁরা বল্‌লেন 'দু এক জন বন্ধু আছে, অনুরোধ করলে ঠেকার কাজ সেরে দেয়, ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাইরে যেতে পারি'।

আর একবার যে বাড়িতে ছিলাম (সব সময় সদস্যদের কারো না কারো বাড়িতে থাকতাম), তাঁরা নিয়ে গেলেন গ্রামের রোববার সকালের কৃষি বাজারে। ছোট বাজার—কাছের কৃষকরা তাঁদের খামার থেকে নানা টাটকা পণ্য এবং নিজেরদের হাতে তৈরি প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার নিয়ে এই অস্থায়ী বাজারে এসেছেন। গ্রামের মানুষ বেশ ভীড় করেই কেনাকাটা করছেন, আমরাও কিনলাম। যাঁরা বিক্রি করছেন তাঁদের পরণে মলিন এপ্রন, মোটামুটি ব্যস্ত খেটে খাওয়া কৃষকেরই ধরন ধারণ। ওমা সন্ধ্যায় একটি ক্লাব ঘরে যখন টেরে ডেস হোম্‌সের মিটিং বসলো তখন দেখে অবাক হয়ে গেলাম ওতে যাঁরা বড় বড় তাত্ত্বিক বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সকালের সেই কৃষকদেরই কয়েকজন। তখন অবশ্য বেশভূষা বদলে গেছে রীতিমত বুদ্ধিজীবীর মতোই মনে হচ্ছে, সকালে ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে পরিচয় হয়েছিলো, এবার সমাজসেবী হিসেবে।

জিলের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের এসব ভ্রমণ ছাড়াও ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চলেও বেশ কিছু জায়গায় একই কাজে গিয়েছি যে সবের অবশ্য অন্য রকম বৈশিষ্ট্য। যেমন বিশেষভাবে মনে পড়ে মধ্য-পূর্ব ফ্রান্সের প্রোভেন্স এলাকার কথা যা ল্যাভেন্ডার ফুলের জন্য বিখ্যাত। যে সময় আমি গিয়েছি ওখানে তখন ল্যাভেন্ডারের মৌসুম—পাহাড়ের ঢালে খেতগুলো বেগুণি ল্যাভেন্ডারের শোভা আর ঘ্রাণে অপূর্ব আবহ তৈরি করেছে। এই ল্যাভেন্ডার থেকে বিখ্যাত সুগন্ধি তৈরি হয়; তা ছাড়া ল্যাভেন্ডার মধু, ল্যাভেন্ডার আইসক্রিম এসবও রয়েছে। ঐ খেতের মধ্যেই বেশ দূরে এক একটি ল্যাভেন্ডার চাষী পরিবারের বাসা—আর সেখানেই ছিলো ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার আমার আর একটি ক্ষেত্র।

প্যারিসের খুব কাছেই আর একটি গন্তব্যে অনেক বার গিয়েছি—তা হলো জোসিয়ানের বাড়িতে। জোসিয়ান বয়স্কা মহিলা, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, নাতি নাতনিও বেশ ক'জন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের বড় কারণ তিনি বাংলা জানেন, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েই শিখেছিলেন। টেরে ডেস হোম্‌সের পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ম্যাস এডুকেশনের' সঙ্গে খুব জড়িয়ে গেছেন, এখন নতুন করে কিছুটা সিএমইএসের সঙ্গেও। জোসিয়ানের সে সময়কার একটি

কাজ দেখলাম বাংলাদেশে এরশাদের সামরিক শাসন জারির পর এখানকার অনেক ছেলে ফ্রান্সে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছিলো, জোসিয়ান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের কথাগুলো শুনে, বা তাদের বাংলা বা ইংরেজি দরখাস্ত পড়ে, তা ফরাসিতে লিখে দিচ্ছিলেন। একবার কথা ছিল আমি প্যারিস থেকে লোকাল ট্রেন নিয়ে জোসিয়ানদের ছোট্ট শহরটির স্টেশনে গিয়ে নামবো—জোসিয়ান সেখানে থাকবেন আমাকে নিয়ে যেতে। স্টেশন থেকে জোসিয়ান আমাকে সরাসরি বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে তাঁদের ছোট্ট টাউন হলে নিয়ে গেলেন। বললেন 'গতকাল আমরা এখানে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে জিতেছি, আমিও একজন বিজয়ী সদস্য; কিছু সমর্থক নাগরিক আসবেন, উদযাপন হবে আর আমাদের নীতি নিয়ে আলোচনা হবে'। ওখানে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে দারুণ তোলপাড় করা আলাপ শুনলাম, মাঝে মাঝে মনে হলো রীতিমতো ঝগড়া হচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছিলামনা, তবে বেশ উপভোগ করছিলাম। পরে ফেরার পথে জোসিয়ান বুঝিয়ে দিলেন বিষয়গুলো কী। বললেন 'এখানেও ডান-বামের ব্যাপার প্রচুর, আমাদের সমর্থকদের মধ্যেই নানা মত-বিরোধ রয়েছে শহরকে কোন পথে নিয়ে যাব, রাস্তা কোনটির সংস্কার আগে হবে, ট্যাক্সে কী পরিবর্তন আসবে, এ সব কত কি? অথচ সব মিলে শহরটিতে পাঁচশ পরিবারও নেই—তাদেরই এতো স্বাধীনতা।

জোসিয়ানের বাড়িতে পশ্চিম বঙ্গের ঐ প্রতিষ্ঠানটির হাতের কাজের বিরাট সংগ্রহ দেখতাম—পোড়ামাটির পুতুল, হাতপাখা, মেলার বাঁশি আরো কত কি। বাইরে জায়গা না হওয়ায় বিছানার তলায় তার অনেকগুলো রাখা আছে। জানলাম এগুলো এখানকার নানা অর্থ সংগ্রহ উদ্যোগে চড়া দামে বিক্রি করা হবে—প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়ার জন্য। এসব কাজের সহযোগীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, সভা হলো। জোসিয়ানের সঙ্গে এখন থাকে তাঁর ছোট মেয়ে যে ভিয়েতনামিজ বংশোদ্ভূত, কয়েক মাস বয়সের সময় তিনি পালক নিয়েছিলেন—অসহায় অবস্থায় যুদ্ধের সময় ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে আসা অভিবাসীরা যাকে নিয়ে এসেছিলো। সে টিন-এজার, খানিকটা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী যা তার চেহারায়ও কিছুটা স্পষ্ট। জোসিয়ান যখন পালক নিয়েছিলেন তখন নাকি বাঁচবে কিনা সন্দেহ ছিলো। এখন সে তাঁর ঘর মাতিয়ে রেখেছে, প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও খুব হাসিখুশি, কথায় বার্তায় এবং কাজে চটপটে। স্কুলে সে মোটামুটি ভাল করেছে, ইংরেজিও বলার ভাল চেষ্টা করে। মনে রাখার ক্ষমতা তার চমৎকার—গত বছর এখানে এসে আমি কী কী করেছিলাম, তার দেয়া সুন্দর ব্যাগটিই যে ব্যবহার করতে নিয়ে এসেছি, এসব কথা খুব মজা করে বললো। সেই ছোট্টকাল থেকে আদর-যত্নে ও অসম্ভব ধৈর্য দিয়ে জোসিয়ান তাকে বড় করেছে, এখনো তাকে খুব চোখে চোখে রাখে, তার প্রতিবন্ধিতার কারণে।

তার বহুদিন পর সাম্প্রতিক কালে ঢাকায় এক ফরাসি মেয়ের ফোন পেলাম—বললো সে জোসিয়ানের নাতনি, কলকাতায় এসেছিলো, সেখান থেকে

ঢাকায়ও এসেছে। তার দাদী আমার কথা বলে দিয়েছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভাল লেগেছিলো, দাদীর মতোই এই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েটির আমাদের দেশ নিয়ে অনেক আগ্রহ।

ফরাসি জীবনে খুব উদার ও সহমর্মী দিকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে। তবে সাধারণ ভাবে অফিসে, আসরে, পথেঘাটে বৃহত্তর ফরাসি জীবনের কিছু কিছু ছোঁয়াও পেয়েছি। সেখানে তাদের কতগুলো দুর্বলতাও আমার কাছে ধরা পড়েছে। সাধারণ ফরাসিদের ইংরেজি জানা সত্ত্বেও সেটি বলতে অনীহাতো প্রবাদতুল্য। তার পরিচয় এখানে ঘাটে ঘাটে পেলাম। তার চেয়েও বড় কথা হলো যে ফরাসি জানেনা তার জন্য সাধারণভাবে ওদের কোন সহানুভূতি নেই। ঘরোয়া আলোচনার আসরে আমি থাকলেও আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা নিজেদের ফরাসি আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে, যদিও জানি যে এদের প্রত্যেকে ভাল ইংরেজি জানে। অনেক সময় মনে হয়েছে ওরা নিজেকে নিয়েই নিজেরা খুব আত্মমগ্ন হয়ে আছে। এদিক থেকে অন্য যে কোন ইউরোপীয় থেকে ওরা ভিন্ন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও বোধ হয় এখানে তুলনামূলক ভাবে বেশি। অবশ্য এই ব্যাপারে ইতালীয়ানরাও কম যায়না। একবার জিলের সঙ্গে তার গাড়িতে উত্তর ফ্রান্সে যখন ভ্রমণ করছি পথের এক রেস্টিং স্টেশনে গাড়ি পার্ক করে আমরা ক্যাফেতে কফি খেতে গিয়েছি। দেখলাম গাড়ির পেছনের বুট ভেঙ্গে ব্যাগ ইত্যাদি কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার ক্যামেরাটিও ছিল সেখানে। পাসপোর্টটি অবশ্য কাঁধের ছোট ব্যাগে সঙ্গে ছিলো বলে রক্ষা। আমাদের দুজনকে থানায় গিয়ে পুলিশে রিপোর্ট করতে হয়েছিলো—সে এক ভীষণ ঝকমারি ব্যাপার। মনে হলো জিনিসপত্র হারানোর কষ্টের চেয়ে ঐ পুলিশী কষ্টটি বেশি ছিলো। দেখলাম জিল মোটেই আশা করেনি যে পুলিশ এগুলো উদ্ধার করতে পারবে। এর পর পর বিভিন্ন গন্তব্যে গিয়ে জিল যখনই বন্ধু বান্ধবকে এই কাহিনী বলে পুলিশের কথা বলেছে, সবাই মুচকি হেসে বলেছে—ওহ পুলিশ, তবেই সেরেছে!

ত্রিয়েস্ত-ভেনিস, ত্রিয়েস্ত-মিলান, ত্রিয়েস্ত-মিলান-প্যারিস, ত্রিয়েস্ত-রোম এমনি ভাবে নানা দিকে গিয়েছি আবার ত্রিয়েস্তেই ফেরত এসেছি। ঐ গ্যালিলিও বিল্ডিং আর আইসিটিপিতে ফেরত এলে মনে হয়েছে বাড়ি ফিরে এসেছি। নিজের শহরের মতই হয়ে পড়েছিলো এটি। এখানে অনেকের সঙ্গে, এমনকি কোন কোন দোকানদারদের সঙ্গেও, এমন পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো যে দু'এক বছর পর আবার ফিরলে ইতোমধ্যে জমে যাওয়া অনেক কথা বলে আবার স্বাগত জানাতো। যখনই ওখানে আবার ফিরেছি, ছুটে গিয়ে মীরামারে পার্কের ভেতর দিয়ে সেই ক্যাসেলের কাছে সমুদ্র তীরে গিয়ে গভীর একটি দম নিলেই যেন আমি আবার আমার অন্য-বিশ্বে ফেরত যেতে পারতাম। এত দেশের বিজ্ঞানীরা আইসিটিপিতে, এত সংস্কৃতির মিলন-মেলা এটি, অথচ একেবারেই শান্ত, সমাহিত একটি পরিবেশ।

স্মৃতিকথার ইতি

দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কার্যক্রম

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কখনো বেশিদিন রাজনৈতিক শান্তি বিরাজ করেনি। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই দেশ এগিয়ে গেছে, যখন যে ভাবে পারে। উদ্যোগী মানুষের এই দেশে মানুষ নিজের সৃজনশীলতা দিয়েই দেশকে বদলে দিয়েছে, রাষ্ট্রীয় নানা সংঘাত ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। যে সব কাজের মধ্যে আমি ডুবে ছিলাম সত্তর ও আশির দশকে তা ঐ সময়কার সংঘাতগুলোর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে পারতো। তাই খবরের কাগজ পড়লে ও রাস্তাঘাটে চললে দেশের যে অবস্থাকে মোটেই স্বাভাবিক বলা যাবেনা, তার মধ্যেও আমরা দেশের জন্য স্বপ্ন দেখেছি, সে স্বপ্নগুলো নিজেদের কাজে একটুখানি হলেও বাস্তবে আনতে পারলে পুলকিত হয়েছি। আমাদের সিএমইএসে মেয়েদের ক্ষমতায়ন আমরা যারা এর মধ্যে আছি তাদেরকেও বিস্মিত করেছে; একেবারেই সাধারণ অবয়বে আমাদের অসাধারণ মৌলিক বিদ্যালয়গুলো এবং গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রগুলোতে আত্মবিশ্বাসের জয়গান দেখে তৃপ্তি বোধ করেছি। পারিপার্শ্বিক সব অঘটন ভুলে বিজ্ঞান সাময়িকীর পাঠকরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন এলাকা নিয়ে তাঁদের আগ্রহগুলো যখন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন বুঝতে পেরেছি শত সংঘাতেও মানুষ বৃহতের প্রত্যাশী। তবে ওভাবে তৃণমূলে কাজ করেও বৃহতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলেও আমার মূল কর্মক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংঘাতগুলোকে অগ্রাহ্য করতে দিচ্ছিলোনা।

জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন আর একটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। কিন্তু সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালেই একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সামরিক আইন জারী করেছিলেন এবং অনেকটা জিয়াউর রহমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রথমে একজন বিচারপতিকে কিছুদিন

প্রেসিডেন্ট রেখে পরে নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেছিলেন। জিয়াকে অনুসরণের বাকিটাও পূর্ণ করে তিনি পরে একটি রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টিও গঠন করেন এবং প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এভাবে নানা পর্যায়ে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রায় একচ্ছত্র শাসন চালিয়ে অবশেষে ১৯৯০ এর শেষে এসে গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলো ছাত্ররা এবং শেষ পর্যন্ত একে সফল করতে তারাই রেখেছিলো বড় অবদান। ছাত্রদের আন্দোলন দিনে দিনে প্রবল হয়েছে, সরকারের পুলিশী দমননীতির জবাবে তারা সহিংসও হয়েছে দিন দিন—শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সহিংসতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ চিরতরে বদলে দিয়েছিলো।

জিয়াউর রহমানের সময় তাঁর দল বিএনপি'র সঙ্গে সংযুক্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব এবং সাধারণ কর্মীর একটি বড় সমাবেশ ছিল। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও চেষ্টা করছিলো তাদের নিজ নিজ আদর্শের ভাবমূর্তিতে এগিয়ে যেতে যার মধ্যে ছিলো জাসদ-ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, বাকশাল সমর্থিত ছাত্রলীগ (প্রাক্তন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক বাকশাল নামেই একটি দল জিইয়ে রেখেছিলেন), ছাত্র ইউনিয়ন, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবার খান রনোর ওয়ার্কাস পার্টির সমর্থিত ছাত্রদের দল তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এরা সবাই একত্রিত হয়েছিলো, কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে বড় ছাত্র দলগুলোর নেতৃত্বের একাংশ চলে গিয়েছিলো প্রধানত অস্ত্র চালাতে ও হিংসাত্মক আয়োজনে পারদর্শীদের হাতে, দিন দিন তাদের নাম সেভাবেই শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়ে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়েও পড়ছিলো। বি এন পি'র ছাত্র দল, জাসদ ছাত্রলীগ, আওয়ামী ছাত্রলীগ এদিক থেকে বেশ এগিয়ে গিয়েছিলো। সেই যে প্রবণতা তখন শুরু হয়েছিলো তা পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতিকে প্রায় পুরোপুরি গিলে খেয়েছে—যেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম তার ছিটেফোটাও আর অবশিষ্ট থাকেনি—অন্তত বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সংশ্লিষ্ট ছাত্র দলের ক্ষেত্রে নয়। এই প্রক্রিয়াটি পরে গণতান্ত্রিক সরকারের সময়েই সবচেয়ে করুণ রূপ লাভ করেছে, কিন্তু এরশাদের সময় থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়েছিলো সরকার ও তার গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিরোধী দল উভয়েরই অবদানে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আশির দশকের শেষার্ধে জোরদার হলে একদিকে যেমন ছাত্র আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেবার প্রবণতা বেড়েছে অন্যদিকে ছাত্রদের বড় দলগুলোর মধ্যে সন্দেহ ও সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। এই বিভক্তিগুলোতে স্পষ্টভাবে সরকারের ইন্ধনও অনেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাস করে দিনের পর দিন আমরা আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছি। কাছে থেকে দেখেছি বলে যা বাইরে থেকে অনেক

সময় দেখা যায় না তা আমাদের দেখতে হয়েছে। ইউনিফর্মে বা সাদা পোষাকে থাকা পুলিশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সহিংস ছাত্র আন্দোলনকারীরা অস্ত্র ব্যবহার করেছে, আবার কখনো অনেকটা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থে বা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় ছাত্রদের মধ্যে গোলাগুলি চলেছে। ইতোমধ্যে পি ডব্লুডি বাংলো-তিনের বাড়ি থেকে আমরা ফুলার রোডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলাম একটি ভবনের চার তলায়। একাধিকবার এরকম ছাত্র সংঘর্ষের সময় দরজা খুলেই আমাদের চোখাচোখি হয়েছি পিস্তলে গুলি ভরতে রত তরুণের সঙ্গে—যারা শিক্ষকদের বিভিন্ন ভবনের ছাদে, কার্ণিশে পজিশন নিয়ে গোলাগুলি করছিল। আমাদের ভবনটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের একেবারে সংলগ্ন। রাতে এরকম গোলাগুলির সময় বাড়ির বাতিগুলো নিভিয়ে রাখতে হতো। একবার কোন কারণে বারান্দায় বাতিটি ক্ষণিকের জন্য অন্ করতেই তার যেটুকু আলো নিচে ভূমিতে গিয়ে পড়লো সেই আবছা আলোতে দেখলাম বন্দুক হাতে মাটিতে ক্রলিং করে কয়েকজন তরুণ রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। বাতি জ্বালতেই চীৎকার করে হুকুমের ভঙ্গিতে ওদের একজন বল্লো 'বাতি নেভা'। আমাদের উপস্থিতিতে যখন সংঘর্ষ হতো তখন আমাদের দুই ছেলে বালক কুশল ও শিশু উজলকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারতাম। দিনের বেলায় আমরা না থাকা অবস্থায় বাসায় গৃহকর্মীর উপর নির্দেশ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি দেয়াল ঘেরা সুনির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় যেন কুশল ও উজলকে অবস্থান করায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু রকম অভিজ্ঞতার একটি হলো এগুলো। কিন্তু এর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছিল অদ্ভুত এক রাজনীতি কেমন করে ছাত্রদের স্বাভাবিক অগ্রগতি গ্রাস করছিলো।

চিরকাল শহীদ মিনারের এলাকায় আমরা আবেগে আপ্লুত হয়েছি। বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে অথবা আগের মধ্য রাতে এই আবেগ, এ গাম্ভীর্যের সৌন্দর্যের তুলনা হয়না। অথচ আশির দশকের সেই বছরগুলোতে এমন অনুষ্ঠানেও এক একবার হিংসাত্মক দৃশ্য সৃষ্টি হচ্ছিলো। বিরোধী দলের কর্মীরা মন্ত্রীর পাঞ্জাবী ছিড়ে তাকে মারধোর করছে, পুলিশ ওখানে হামলে পড়েছে। শহীদ মিনারের গা বেয়ে এক জনের পর আর একজন ওঠে সেখানে নিজ নিজ নেত্রীর ছবি টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। এই সব কিছু ঘটেছে একুশের প্রথম প্রহরে। একবার সরকারী দলের মস্তানরা বিরাট বিরাট গাছের লাঠি হাতে বিরোধীদের এমন ভাবে আক্রমণ করলো যে অনুষ্ঠানে তদারকীতে রত বায়োক্যামিষ্ট্রির খ্যাতনামা শিক্ষক আমার সহপাঠী বন্ধু খায়রুল বাশার মাথায় এমন গুরুতর আহত হলো যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বহু বছরের জন্য বিদেশে চলে যেতে হলো—চিকিৎসার জন্যও বটে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হতাশ হয়েও বটে।

এরশাদের ঐ সময়টিকে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতির কারণে, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টার জন্য, অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি স্বার্থ বিবর্জিত ন্যায়-নৈতিক ও উদার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ইত্যাদির দিক থেকে ইতিবাচক ভাবে

দেখার সুযোগ আছে। কিন্তু টিকে থাকার জন্য যেভাবে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার চালানো হয়েছে, রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, বলপ্রয়োগে ও লোভ দেখিয়ে ছাত্র রাজনীতিকে দূষিত করে চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী ফল খুবই ক্ষতিকর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন সফল হয়েছিলো, ছাত্ররা তাতে প্রচুর অবদান রেখেছে ও চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে; কিন্তু উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে বিরাট স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে। এই ক্ষতিটি আমাদের ছাত্র ও তরুণ সমাজকে দিয়ে শুরু হয়ে পুরো রাজনীতিকেই ব্যক্তিগত আর্থিক লাভালাভের সহিংস প্রতিযোগিতায় গিলে খাওয়ার উপক্রম করেছে পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সময় ক্রম বর্দ্ধমান হারে। তবে তা আমার এই স্মৃতিকথার কালের বেশ কিছু পরের কথা।

এরশাদের ভাল কাজগুলোর সুযোগ অবশ্য সিএমইএসের কার্যক্রমে আমরা পুরোপুরি পেয়েছি। আশির দশকের একেবারে শুরুতে আমরা যখন সিএমইএসের প্রথম দুই একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে দূর গ্রামাঞ্চলগুলোতে কাজ শুরু করেছি ওসব জায়গায় পৌছা অত্যন্ত কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষে ছিলো। মূল সড়কগুলোতে কোন রকমে বাসে যথেষ্ট সময় লাগিয়ে চলে যেতে পারলেও এরপর কেমন করে গিয়ে ইউনিটে পৌছবো সেটি ছিলো একটি অ্যাডভেঞ্চারের মতো, তা সেটি টাঙ্গাইলেই হোক, রংপুরেই হোক আর চট্টগ্রামেই হোক। অন্যদিকে আশির দশকের একেবারে শেষে এসে প্রায় সব জায়গায় ভাল রাস্তা পৌছে গিয়েছিলো, অনেক জায়গায় ভাল বাস সার্ভিসও চালু হয়ে গেছে। এর পর পর আমরা যখন টাঙ্গাইলের সখিপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলার আরো দুর্গম জায়গাগুলোতে গিয়েছি সেখানেও আগের দিনগুলোর মত এতো কষ্ট করে যেতে হয়নি। আবার আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রেই হোক আর আমাদের কর্মক্ষেত্র গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা-বিন্যাসেই হোক স্বেচ্ছাসেবী কাজগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বাইরে রেখে উৎসাহিত করার ব্যাপারে এরশাদের এক রকম উদারতা ছিলো পরবর্তীকালে যা ক্রমাগত দুর্লভ হয়েছে। এরশাদের নিজের রাজনীতিতে যদিও প্রচুর চালাকি ও মেকিপনা নিয়ে অনেকের অভিযোগ ছিল তাঁর প্রশাসনিক নীতি নিয়ে কিন্তু তেমনটি ছিলনা। যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করতে চাচ্ছে তাদেরকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেবার ও সহায়তা দেবার একটি স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান ছিলো যা আমাদের মতো মানুষদের কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিলো। যেমন ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর প্রস্তাবিত ওষুধ নীতিতে অনেকের বাধা সত্ত্বেও এরশাদ প্রশাসনের সমর্থন এই নীতিকে ভারতের রাজীব গান্ধী সরকারের কাছেও অনুকরণীয় করেছিলো। ইউনূস ভাই যখন গ্রামীণ ব্যাংককে প্রধানত গরীব মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের মালিকানায় একটি বিশেষায়িত ব্যাংক করার প্রস্তাব করেছিলেন আমলাতন্ত্রের আপত্তি সত্ত্বেও এরশাদ সোৎসাহে তাকে সমর্থন-সহায়তা দিয়েছিলেন। এরশাদের উপজেলা সিস্টেম যখন চালু হয়েছিলো তখন

রাজনীতিবিদদের অনেকেই একে ক্ষমতা স্থায়ী করার আর একটি চালাকি হিসেবে দেখলেও স্থানীয় মানুষরা কিন্তু এর মধ্যে সরকারকে ও উন্নয়ন উদ্যোগকে তৃণমূলের আরো কাছাকাছি নেবার সদিচ্ছা লক্ষ্য করে আশান্বিত হয়েছিলো। সিএমইএসে আমাদের কাছেও এই বিকেন্দ্রীকরণ যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছে।

পদার্থবিদ্যায় আমি

বরাবরের মতো প্রতি বছর আমার খুব আনন্দের দিনগুলোর কয়েকটি হতো যখন পদার্থবিদ্যার নতুন ছেলে মেয়েরা ভর্তি হয়ে আসতো। ওসময় তাদেরকে বিভাগে স্বাগত জানিয়ে এখানকার সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য যে ওরিয়েন্টেশন বক্তৃতাগুলো হতো তাতে বড় ভূমিকাটি আমি সব সময় চেয়েই নিতাম। পদার্থবিদ্যায় আমি যে আনন্দ পেয়েছি তেমনি আনন্দ পাওয়াটিই যেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার বছরগুলোর মূল লক্ষ্য হয় সেটিই আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম। পদার্থবিদ্যা কেন নিখাদ আনন্দের জিনিস নানা নমুনা দিয়ে তাও স্পষ্ট করতাম। পরে আমার ক্লাসেও আমি সেই ধারাটি বজায় রাখার চেষ্টা করতাম। নতুন ছাত্রদের কাছে এভাবে বক্তৃতা করার মাধ্যমেই এবং এ নিয়ে তাদের আগ্রহ ভরা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেই আমি এ সময় প্রথম পাবলিক বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিভিন্ন কলেজ, স্কুল, বিজ্ঞান ক্লাব, ইত্যাদিতে এরকম বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিতে আমার ডাক পড়তো। তরুণদের সঙ্গে এভাবে বিজ্ঞান নিয়ে, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা নিয়ে, কথা বলতে ও তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছি সব সময়। পরে এই অভ্যাসকেই আরো কেন্দ্রীয় ভাবে এমনকি টেলিভিশনের ধারণকৃত ভাবে বিজ্ঞানের নানা শাখার সর্বাধুনিক বিষয়গুলো সর্ব সাধারণের কাছে সহজ ভাবে বলার উৎসাহে পরিণত করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সলিড ষ্টেট ফিজিক্স গবেষণা ল্যাবোরেটরির জন্যও আশির দশকের শেষের দিকটি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে ওঠেছিলো। ১৯৮৬ সালে সুইজারল্যান্ডে ম্যুলার ও বেদর্নজ একটি বড় আবিস্কার করেছিলেন। বহু বছর ধরে জানা ছিল যে সুপারকন্ডাকটিভ অর্থাৎ অতিপরিবাহী বস্তু বলে পরিচিত কিছু জিনিসের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করলে বিদ্যুৎ প্রবাহ মোটেই ক্ষয় হয়না বা বাধাগ্রস্ত হয়না কারণ এতে বৈদ্যুতিক রেজিষ্ট্যান্স (রোধ) শূন্যতে নেমে আসে। এর মানে একবার চালু করে দিলে সেখানে বৈদ্যুতিক কারেন্ট নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতেই থাকে—এর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা প্রায় অসীম। এই অদ্ভুত ঘটনাটিকে এমন দারুণ সব প্রয়োগে লাগানো সম্ভব ছিল যে তা প্রযুক্তির চেহারা বদলে দিতে পারতো। ১৯১১ সন থেকেই বিষয়টি পরিচিত—কিন্তু এতে সমস্যা ছিল যে এরকম বস্তু অতিপরিবাহী হতে পারে খুবই নিম্ন উত্তাপে, পরম শূন্য উত্তাপের (তাত্ত্বিক ভাবে সম্ভব সবচেয়ে নিম্নতম উত্তাপ) কাছাকাছি অবস্থায়

থাকলে। ওই ১৯৮৬ সালের আগে সর্বোচ্চ যে উত্তাপে ওটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হলো ২৩ ডিগ্রি কেলভিন অর্থাৎ পরম শূন্য উত্তাপ থেকে মাত্র ২৩ ডিগ্রি ওপরে। এজন্য ঐ অতিপরিবাহিতাকে বড় ধরনের কাজে লাগানো ব্যয়সাশ্রয়ী হচ্ছিলো না। ১৯৮৬ সালের সেই বড় আবিষ্কারে ম্যুলার ও বেদর্নজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বস্তু এক রকম সিরামিকে (ল্যান্থনাম-বেরিয়াম যুক্ত কপার অক্সাইড) এক লাফে ৩৫ ডিগ্রি কেলভিন উত্তাপে অতিপরিবাহিতা দেখতে পেলেন—এর স্বীকৃত তত্ত্ব অনুযায়ী ৩০ ডিগ্রির ওপরে এমনটি দেখা যাবারই কথা নয়। এ আবিষ্কারে দারুণ আশার সঞ্চার হলো যে এর থেকে অনেক ওপরের উত্তাপেও হয়তো অতিপরিবাহিতা পাওয়া যাবে। এভাবে 'উচ্চ উত্তাপ' অতিপরিবাহিতার দুয়ার খোলার জন্য ম্যুলার ও বেদর্নজ পরের বছর ১৯৮৭ সালেই পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন। এখানে 'উচ্চ উত্তাপ' বলতে অবশ্য তুলনামূলক ভাবেই তা বুঝানো হচ্ছে, আসলে স্বাভাবিকের চেয়ে এটিও খুবই নিচের উত্তাপ।

এরপর সারা দুনিয়ায় দ্রুত এর ওপর এতো গবেষণা হলো যে শিগ্‌গির অতিপরিবাহিতার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ ৭৭ ডিগ্রি কেলভিনের উপর চলে গেলো যা কিনা খুব সহজে সৃষ্টি সম্ভব কারণ এটি তরল নাইট্রোজেন বা তরল বাতাসের উত্তাপ। ঢাকাতে কার্জন হলের কারখানাতেই এখন এই শীতল তরল পাওয়া যাচ্ছিলো, পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে তো আমরা অনেকদিন আগে থেকেই তরল বাতাস ব্যবহার করছিলাম, আমি ওটা টেলিভিশন দর্শকদেরকে দেখিয়েছিও। তাই সুলতান স্যার ও আমি ঠিক করলাম আমাদের ল্যাবোরেটরিতে আমরা এরকম 'উচ্চ উত্তাপ' অতিপরিবাহী বস্তু তৈরি করবো; ছাত্রদের থিসিসের কাজ এর উপর হবে।

সে সময় সবচেয়ে সুবিধাজনক এরকম সিরামিক বস্তু ছিলো ইয়েট্রিয়াম বেরিয়াম কপার অক্সাইড (ওয়াই বি সি ও)। এতে ইয়েট্রিয়াম, বেরিয়াম, ও কপারের পরিমাণের অনুপাত ১:২:৩ এই রকমে থাকে বলে একে ওয়ান-টু-থ্রি বস্তুও বলা হয়। খুব যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে এখানকার সাদামাটা আয়োজনে তা তৈরি করতে। মূলত কাজটিকে কিছুটা অতিসরলীকরণ করে বলা হয় 'শেইক অ্যান্ড বেইক' (নাড়ো আর ভাজ)। আসলে ইয়াট্রিয়াম অক্সাইড, বেরিয়াম কার্বনেট এবং কপার অক্সাইড এই তিন রকমের যে কঠিন যৌগ বেশ বিশুদ্ধ অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায় এদেরকে সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে হামানদিস্তায় তাদেরকে গুড়ো করে পাউডারে পরিণত করে খুব ভাল করে পিষে মেশাতে হয়—এটিই হলো 'শেইক' করা। এরপর একটি উত্তাপ-সহনীয় কোয়ার্টজ কাচের নলের মধ্যে মিশ্রণটি রেখে বৈদ্যুতিক কয়েলের মাধ্যমে ৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপে কয়েক ঘন্টা একে ভাজতে হয় (ক্যালসিনেশন)। এটিই বেইক করা। এক দফা ভাজার পর ঠান্ডা করে আবার হামানদিস্তায় পেষা (শেইক), তারপর আবার ভাজা (বেইক), এভাবে বহুবার করতে হয়। উদ্দেশ্য হলো

মিশ্রণটি যেন একবারেই মসৃণ ও সমসত্ত্ব হয়, সব উপাদানের সূক্ষ্ম কণাগুলো যেন পরস্পরের অতি সংলগ্ন হয়। এরপর যা করতে হয়েছিল তা আর আমাদের ল্যাবোরেটরিতে সম্ভব ছিলো না। ওষুধের বড় ট্যাবলেটের আকারে একটি লোহার ডাইস কারখানা থেকে বানিয়ে নিয়ে মিশ্রণটি ওর মধ্যে রেখে প্রচন্ড চাপ প্রয়োগে ভাল করে শক্ত আঁটোসাঁটো ট্যাবলেট তৈরি করতে হয়েছে। ওটি করা সম্ভব হয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এরকম চাপ দেয়ার মেশিনে নিয়ে গিয়ে।

এই ট্যাবলেটকে আবার ঐ কাচের নলের মধ্যে ৯৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অনেকক্ষণ উত্তপ্ত করতে হবে; তবে এবার খোলা বাতাসে রেখে নয় বরং নলের মধ্য দিয়ে অক্সিজেনের প্রবাহ বজায় রেখে সে অবস্থায় উত্তপ্ত রাখতে হবে (সিনটারিং)। এভাবে উত্তপ্ত রাখার পর খুব ধীরে দফায় দফায় একটু একটু করে উত্তাপ কমিয়ে কমিয়ে অনেকক্ষণ লাগিয়ে একে ঘরের সাধারণ উত্তাপে নিয়ে আসতে হবে (এনীলিং)। ঐ উচ্চ উত্তাপে কতক্ষণ রাখবো, কী হারে উত্তাপ কমিয়ে স্বাভাবিক উত্তাপে আনবো, তার ওপরেই নির্ভর করে সঠিক ওয়াইবিসিও বস্তুর রূপ এটি নেবে কিনা, সন্তোষজনক অতিপরিবাহী বস্তু তৈরি হবে কিনা। বার বার চেষ্টা করে করে আমাদেরকে সর্বোত্তমটি বের করতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমরা ও আমাদের ছাত্ররা নিয়মিত ভাবেই এই অতি আধুনিক কাজটি করতে পেরেছিলাম। এটি যে অতিপরিবাহী হয়েছে তা দেখাবার সবচেয়ে নাটকীয় ও সহজ পদ্ধতি হলো ট্যাবলেটটিকে আলগোছে একটি স্লাইডের উপর রেখে তা তরল নাইট্রোজেন ভর্তি ফ্লাস্কের মুখের খুব কাছে আনা, যেই জায়গাটি কিনা একটি বেশ জোরালো একটি চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে রয়েছে। বাষ্পীভূত তরল নাইট্রোজেনের সংস্পর্শে যেই ট্যাবলেটটির উত্তাপ সঠিক মাত্রায় নেমে যাবে অমনি তা অতিপরিবাহী বস্তুতে পরিণত হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক ক্ষেত্রের কারণে ট্যাবলেটটি শূন্যে ভেসে ওঠবে। অতিপরিবাহিতা কোন বস্তুকে বিশেষ ধরনের চুম্বকে (ডাইম্যাগনেটিক) পরিণত করে বলেই দুই চুম্বকের বিকর্ষণে ওটি শূন্যে ভেসে ওঠবে। ঐ মুহূর্তে ফটো তুলে রাখলে প্রমাণ হয়ে যায় যে আমরা সুপারকন্ডাক্টিভিটি অর্থাৎ অতিপরিবাহিতা সৃষ্টি করতে পেরেছি। ঠিক এভাবেই উচ্চ উত্তাপ অতিপরিবাহী বস্তুর একটি চমৎকার ব্যবহার চিন্তা করা হচ্ছে। যদি ট্যাবলেট না হয়ে অতিপরিবাহী বস্তুটি হয় ট্রেনের চাকা আর রেল রাস্তাটি হয় চুম্বক তা হলে ট্রেনসহ চাকাগুলো শূন্যে খানিকটা ভেসে ওঠবে এবং ঘর্ষণহীন ভাবে প্রচণ্ড বেগে চলতে পারবে। যে বিদ্যুৎ-চুম্বক এই বেগ সৃষ্টি করবে অতিপরিবাহিতার ফলে তাতেও কোন শক্তিক্ষয় হবেনা। ভবিষ্যতে আরো ওপরের উত্তাপে এমনকি বাইরের স্বাভাবিক উত্তাপেই অতিপরিবহিতা সৃষ্টি করা যাবে ফলে প্রচণ্ড বেগের খুবই ব্যয় সাশ্রয়ী ট্রেন সম্ভব হবে। আমাদের সাধারণ আয়োজনে সলিড স্টেট ফিজিক্সের একেবারেই সাম্প্রতিক এক্সপেরিমেন্ট করতে যে পেরেছিলাম সেটি আমাদের জন্য দারুণ গর্ব ও সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিলো।

পদার্থবিদ্যার অন্য কিছু ক্ষেত্রে ওই সময় আমাকে ভিন্ন ধরনের কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বিভাগের সব শিক্ষকের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাকৃত সিনিয়র শিক্ষকদের যে সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে আমাকে বহু দিন তার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। সিএমইএসের মতো ইতোমধ্যে বেশ বড় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন নিত্য চালাতে হতো বলে এ কাজ আমার জন্য বেশ সহজে ও ভালভাবে করা সম্ভব হয়েছে। অনেকটা রুটিন প্রকৃতির হলেও এতে অভিজ্ঞতা লাভের বিষয়টি কম ছিলো না—বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দেয়ার সুযোগ সেখানে ছিলো যা পরবর্তীতে নিজে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় খুব কাজে এসেছে।

১৯৮৪ সালে দু বছরের জন্য আমি বাংলাদেশ পদার্থবিদ্যা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হই। সেবার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আনোয়ার হোসেন। সম্পাদকের এই দায়িত্বটিও আমি খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলাম। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে পদার্থবিদরা কাজ করেন তাঁদের সংগঠন এই সমিতি। সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেবার মূল দায়িত্বই থাকে সম্পাদকের উপর। আমি ঠিক করলাম পদার্থবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য স্কুল-কলেজে বিষয়টি শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনা উচিত এবং এজন্য এদের কারিকুলামগুলোর সংস্কার প্রস্তাব দেয়া প্রয়োজন। এটি সমিতির আওতায় করলে প্রস্তাবটি গুরুত্ব পাবে বেশি। প্রফেসর হারুণ অর রশীদকে প্রধান করে এবং আমি নিজেও থেকে একটি কমিটি করলাম কাজটি এগিয়ে নেয়ার জন্য। বেশ কিছুদিন কাজ করে আমরা আধুনিক পদার্থবিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত একটি প্রস্তাবিত কারিকুলাম খাড়া করতে পেরেছিলাম যেটি পরে মুদ্রিত আকারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এবং কারিকুলাম কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। সমিতির সম্পাদক হিসেবে এসময় আমাকে একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে হয়েছিলো। এর জন্য অর্থ যোগাড়ে ত্রিয়েস্তের পদার্থবিদ্যা সেন্টারের সঙ্গে আমার নিয়মিত সম্পর্কটি বেশ কাজে এসেছিলো। এ ধরনের সম্মেলনের জন্য তাদের একটি ভাল অনুদানের ব্যবস্থা ছিলো। আমি ত্রিয়েস্তে থাকা অবস্থাতেই সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলে সময়মত এর জন্য দরখাস্ত করতে পেরেছিলাম। সেই দরখাস্তে সম্ভাব্য বক্তাদের একটি তালিকা দিতে হয়। যেহেতু ওখান থেকে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং সরাসরি তাঁদের সম্মতি পাওয়া সহজ ছিলো পুরো আয়োজনটি সহজে অনেকখানি এগিয়ে নিতে পেরেছিলাম। পরে দেশে ফেরার পর অন্যান্যদের সহায়তায় বেশ সমৃদ্ধ একটি সম্মেলন করতে পেরেছিলাম। পদার্থবিদ্যা সমিতিতে আমার সম্পাদক থাকার

কাল শেষ হলে সমিতির পরবর্তী সাধারণ সভায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া।

এর কয়েক বছর পর বাংলাদেশ সৌর শক্তি সমিতি গঠিত হলে সেখানেও প্রথম থেকে বহু বছর আমি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। তখন প্রায় প্রতি দু'বছরে একবার করে সৌর শক্তির ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে হয়েছে। ত্রিয়েস্তের পদার্থবিদ্যা সেন্টার, ইউনেস্কো, থার্ড ওয়াল্ড একাডেমি অব সায়েন্স, সুইডেনের উপসালার আন্তর্জাতিক সেমিনার ইত্যাদি নানা উৎস থেকে এর জন্য অর্থ যোগাড় করতে হয়েছে। সৌরশক্তি ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি তখন দ্রুত অগ্রসরমান একটি বিষয় হয়ে উঠেছিলো। এ ধরনের সম্মেলনের একটি বিরাট লাভ হতো আমাদের ছাত্ররা এই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারতো, সম্মেলনের বক্তব্য ও আবহের মাধ্যমে নিজেদের দিগন্তকে বড় করতে পারতো। আরো বড় কথা ওদের অনেকের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে করতে পারতো। এ সব সম্মেলনের একজন আয়োজক হিসেবেও আমিও একটি ব্যাপক বিজ্ঞানী মহলের ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে পেরেছি।

আশির দশকের প্রথমার্ধে আমি কয়েক বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার মাধ্যমে। ওই সময়টায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে মোটামুটি একটি ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনচেতা আবহ বিরাজ করছিলো যদিও এটি তখনো গোলাপী দল ও নীল দল এই দুটি ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত ছিলো। নীল দল ঐতিহ্যগত ভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক, স্বাধীনতার পর পর শিক্ষক রাজনীতিতে তাদের প্রাধান্য ছিল। আমাদের বিভাগের অধিকাংশ সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন এই দলে—প্রফেসর একেএম সিদ্দিক, প্রফেসর শামসুল হক, ড. অজয় রায় এবং আরো অনেকে। এ দল থেকে প্রফেসর শামসুল হক পরে উপাচার্য হয়েছেন। গোলাপী দল ছিল প্রধানত বামপন্থী ও বিএনপিপন্থীদের সমন্বয়ে গড়া—প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর সরোয়ার মোর্শেদ, ড. আহসানুল হক, ড. সাদ উদ্দীন, ড. মনিরুজ্জামান মিয়া ছিলেন এতে নেতৃস্থানীয়। এরশাদ পতনের আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্যায়ে যখন বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলো আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলো তখন এ দল থেকেই শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমদ (পরে রাষ্ট্রপতি)—ফলে ওই মুহূর্তে পরিস্থিতি তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছিলো। প্রধানত এই সুবাদে এরশাদ পতনের পর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিনি একজন উপদেষ্টাও হয়েছিলেন। গোলাপী দল থেকে প্রফেসর আবদুল মান্নান উপাচার্য হয়েছিলেন। আমি গোলাপী দলের সমর্থক ছিলাম; সলিমুল্লাহ হলে আমার এপসুর

সহকর্মী যারা শিক্ষক ছিলো তারাও এরই সমর্থক ছিল—যেমন অনুজ প্রতিম আহমদ কামাল গোলাপী দল থেকে লেকচারার প্রতিনিধি হিসেবে সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো। গোলাপী দলের নীতি নির্ধারণী ও নির্বাচনী সভাগুলোতে অংশগ্রহণের সুবাদে আমি উল্লিখিত বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলাম।

সেনেটে আমি কয়েকবার বক্তৃতা করেছি বটে, কিন্তু এর সদস্য থাকা কালে আমার সামান্য অবদান শুধু একটি বিষয়ে। আমি একটি প্রস্তাব এনেছিলাম যে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা লেখাপড়া শেষে বিদায় নেবার সময় একটি উৎসব করতে চায় এবং সেটি করতে গিয়ে সাধারণত 'র‍্যাগ ডে' নাম দিয়ে অনিচ্ছুক অন্যদের বিরক্তি ঘটায়, এমনকি তাদের উপর চড়াও হয়—যা প্রায়ই শান্তি নষ্ট করে। আমি এই বিদায়ী উৎসবকে একটি দিনে সবাই এক সঙ্গে পালন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি কার্যকর প্রস্তাব করেছিলাম—একই দিন বর্তমান ও ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রদের অভিভাবকদের জন্য সকল বিভাগ একটি 'ওপেন ডে' পালন করবে। সেনেটররা প্রস্তাবটি পছন্দ করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে পরে প্রতি বছর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো।

আমার জানা মতে এরশাদ শিক্ষক রাজনীতির মধ্যে এমন কোন হস্তপেক্ষ করেননি যাতে দলীয়করণের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এমনকি একটি পর্যায় পর্যন্ত স্বাভাবিক ছাত্র রাজনীতিও চালু ছিল ডাকসু নির্বাচন, ডাকসু কার্যক্রম সব। আমি সেনেটে থাকার সময় উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী। তাঁর কাজ-কর্মে কোন দিকে দলীয়করণের অথবা সরকারকে তোয়াজ করার লেশমাত্র চেষ্টা অন্তত আমার চোখে পড়েনি। আমাদের সেনেট কর্তৃক পরবর্তী উপাচার্য নির্বাচনের সময় সব পক্ষের সব প্রার্থীই সরকারের বিপক্ষেই ছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বড় জোর যেটুকু করতে পেরেছেন সেনেটে নির্বাচিত তিন জন সম্ভাব্য উপাচার্যের মধ্যে ভোটের সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সংগ্রামী প্রার্থীকেই উপাচার্য নিয়োগ করেছেন—কিন্তু তাতে তাঁর খুব লাভ কিছু হয়নি, বা লাভ করার চেষ্টাও তেমন হয়নি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলো এইটুকু হস্তক্ষেপে সন্তুষ্ট থাকেনি; তারা উপাচার্য ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত শিক্ষকদেরকে তাদের বশংবদে পরিণত করে ছেড়েছে এবং এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছুতে প্রবল দলীয়করণ সৃষ্টি করেছে। এ এমন দলীয়করণ যে আমাদের চির চেনা গৌরব করার বিশ্ববিদ্যালয় ও হল জীবনের বদলে সেখানে সাধারণ ছাত্রদের অনির্বাচিত 'ছাত্র নেতাদের' দৌরাত্ম্যের কাছে ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে, বিশেষ করে সরকার দলীয় ছাত্র নেতাদের কাছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক, বিভাগীয় এবং হলের সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। সাধারণ ছাত্ররা হয়ে পড়েছে অসহায়, সাধারণ

শিক্ষকরাও তাই। এমনটি হতে পারে আগে আমরা কখনো ভাবিনি। কিন্তু সেই আশির দশক এবং তারপরও কিছুদিন অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একাডেমিক আবহে মৌলিক সুস্থতা অনেকখানি বজায় ছিলো।

সিএমইএসের নানা মাত্রা

সিএমইএসের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো আশির দশকের শুরুতে; এ দশক শেষ হয়ে নব্বই দশকের দু এক বছর যেতে যেতে দেশের একটি ব্যতিক্রমী এনজিও হিসেবে এটি সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। এর ক্রমবিবর্তিত মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা ও কিশোরী কর্মসূচি এনজিও আন্দোলনে সিএমইএসকে তার বিশিষ্ট জায়গাটি করে নিতে সক্ষম করেছিল। এসময় এনজিওগুলোর শীর্ষ সংস্থা এডাবে সিএমইএসের পক্ষ থেকে আমি আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে আরম্ভ করি। এই সমিতিটি বহু আগে সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস অব বাংলাদেশ (এডাব) নাম নিয়ে, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য। সে সময় তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের অনেকটাই কৃষিকে কেন্দ্র করে চলছিলো বলেই এই নাম দেয়া হয়। পরে কৃষি একমাত্র গুরুত্বের বিষয় ছিল না, তাছাড়া বিদেশী সংস্থার তুলনায় দেশী এনজিওগুলোর গুরুত্ব বেড়েছিলো এবং তাদের সমন্বয়টিই বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। ক্রমে এটি দেশের সকল এনজিওগুলোর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রথম দিকে চেয়ারপারসন হিসেবে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন আবেদ ভাই (ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার ফজলে হাসান আবেদ)। আশির দশকের শেষের দিকে চেয়ারপারসন ছিলেন ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এর পরে পরে ছিলেন কাজী ফারুক আহমদ। শুধু তাঁরাই নয় এনজিও জগতের অনেক বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে এবং এ আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে ছোট বড় এনজিও'র মাধ্যমে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন এরকম অনেক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এখানে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার স্কুল জীবনে চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড স্কুলের শিক্ষক ও সেখানকার স্কাউট টিচার হিসেবে যাঁকে চিনতাম সেই জেফরি প্যারাইরা—তখন কারিতাস বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো তখন সিএমইএসকে দাঁড় করাবার কাজে ব্যস্ত আমার কল্পনায়ও আসেনি যে বছর দশেক পরে এমন শক্তিশালী সংগঠন এডাব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার পাল্লায় পরে নাস্তানাবুদ হবে এবং তার বিকল্প হিসেবে বাধ্য হয়ে গড়ে ওঠা এনজিও ফেডারেশনের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব তারও পরে একদিন আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

ঐ আশির দশকের আগাগোড়া সিএমইএস আকারের দিক থেকে খুব বড় একটি প্রতিষ্ঠান ছিলোনা, কিন্তু ব্যতিক্রমী অবশ্যই ছিলো। এর ব্যতিক্রমী

বৈশিষ্টের একটি ছিলো আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন নতুন দিকে অনুসন্ধান ও চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। নতুন নতুন প্রযুক্তিকে বাজারে নিয়ে এসে, জনপ্রিয় করে, সুবিধাবঞ্চিত তরুণরা যেন এতে দক্ষ হয়ে ব্যবসা করতে পারে সেই ব্যাপারে যেমন তৎপর ছিলাম, তেমনি সাধারণ মানুষ যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহজ প্রযুক্তি জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে সে জন্য কিছু সাধারণ প্রযুক্তি তাদের কাছে পৌঁছে দেয়াটাও একটি বড় কাজ হিসেবে নিয়েছিলাম। এই শেষের কাজটিতে একটি কৌশল হিসেবে সিএমইএস গড়ে তুল্‌লো তার বিভিন্ন ইউনিটে—'গণবিজ্ঞান চারণ দল'। আইডিয়া হিসেবে এটি আমাদের পাড়াগাঁয়ের একটি সনাতন ঐতিহ্যবাহী জিনিস—অভিনব পণ্যের বিক্রেতারা ঢাকঢোল পিঠিয়ে, নেচেগেয়ে এবং বক্তৃতা দিয়ে যেভাবে ক্যানভাস করে বেড়াতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পণ্য বিক্রয় করতো সেখান থেকেই তার উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের চেষ্টাটি হলো ওই ঐতিহ্যের মধ্যেই একে আধুনিকীকরণ করে উপস্থাপন করা এবং 'পণ্য' হিসেবে প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা। আইডিয়াটিকে বাস্তবে কাজে লাগাবার জন্য আমরা পারফরমিং আর্টের বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেছে নিলাম গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক বিখ্যাত এস এম সোলায়মানকে।

সোলায়মান নিজে একজন নাট্য সংগঠক (পদাতিক, ঢাকা পদাতিক ইত্যাদি বেশ কয়েকটি নাট্যসংঘের জনক), নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা—দেশে আধুনিক নাটকে গানের ধারাকে তিনি নতুন করে সংস্থাপিত করেছিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের গ্রাম বাথুয়া তাঁরও গ্রাম। তাছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের আদি থেকে এর একজন বড় ব্যক্তিত্ব নূরজাহানের (পরে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ভাই হিসেবেও যোগাযোগ সহজ হলো। সেসময় সোলায়মানের নাটকগুলো দেখার জন্য আমি মাঝে মাঝে নাটক পাড়ায় যেতাম, এবং তাঁর সৃজনশীলতায় মুগ্ধ ছিলাম। এই নতুন কাজে বিভিন্ন সময় সোলায়মানের সঙ্গে আমার ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠকের মাধ্যমে তিনি আমাদের উদ্যোগটি বুঝে নিলেন। ধীরে ধীরে হাতে পেয়ে গেলাম গণবিজ্ঞান চারণ দলের গান, পথ-থিয়েটার ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানগুলোর লিখিত রূপ। চারণ দলগুলো গড়ার কাজে এবং তাদেরকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতেও সোলায়মান সাহায্য করেছিলেন। এ কাজ দ্রুত এগিয়েছিলো—কারণ আমরা গ্রামে ইতোমধ্যে চারণ গায়ক হিসেবে অভিজ্ঞ বেশ ক'জনকে এর জন্য পেয়ে গিয়েছিলাম।

গণবিজ্ঞান চারণ দলের বিষয়বস্তুগুলো ছিলো সেদিনের জন্য জরুরি কিছু প্রযুক্তি—যেমন রাতকানা রোগের বিরুদ্ধে ভিটামিন এ'র জন্য কচুশাক, ডাইরিয়াতে খাবার স্যালাইন, পানি বিশোধনে ফিটকারি, উন্নত চুলার ব্যবহার, বাঁশকে টেকসই করে দীর্ঘস্থায়ী করা—ইত্যাদি বহু কিছু। সোলায়মান প্রত্যেকটির জন্য ছোট ছোট এমন সব নাটিকা লিখেছিলেন এবং তার জন্য এমন সুন্দর গান লিখেছিলেন যা পল্লীর কথা ও সুরে ঐতিহ্য ধরে রেখেও হয়েছিলো খুব আধুনিক।

প্রত্যেকটির জন্য নাটকের গল্পের প্লটগুলোও ছিলো চমৎকার—কোনটি রূপকথা থেকে, কোনটি সাংসারিক খিটিমিটিকে কেন্দ্র করে, কোনটি বিবাগি তরুণের আর্তনাদের মতো করে ইত্যাদি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই গণবিজ্ঞান চারণ দল অনুষ্ঠান করতো আর মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখতো। এক একটি নাটিকা দেখার পর ঐ প্রযুক্তিটির গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে উপায় থাকতো না। পরে প্রশ্ন করে আরো বিস্তারিত জেনে নেয়া যেতো, যে রকম কথাবার্তার সময় চারণ দলের সদস্যরাই কোন কোন জিনিস হাতে কলমে দেখিয়েও দিতো—যেমন খাবার স্যালাইন তৈরি, ফিটকারি দিয়ে পানি পরিস্কার (ফিটকারি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিও করতো), উন্নত চুলার ব্যবহার, কিংবা বাঁশের প্রক্রিয়াকরণ (ওরা বলতো 'ক্যামিকাল বাঁশ')। গণবিজ্ঞান চারণ দলের অনুষ্ঠানের ফলে এক একটি অঞ্চলে সিএমইএসের অন্যান্য কাজগুলোও যথেষ্ট প্রচার পাচ্ছিলো। আমাদের গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র, মৌলিক বিদ্যালয়, এতে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবসা—এগুলো চারিদিকে বেশ প্রচারিত হয়ে যাচ্ছিলো।

সিএমইএসে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণটিতে আমি খুব তৃপ্তি পেতাম। এটি এমন নয় যে আমরা বাইরে থেকে গিয়ে তাদের ওপর বিশেষ ধরনের কোন কিছু চাপিয়ে দিয়েছি। মৌলিক বিদ্যালয়ের মূল নীতি নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। তাদের নিয়ে কম্যুনিটি ওয়ার্কিং কমিটি করে তার ওপর দিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক দায়িত্ব। স্কুলের জায়গাগুলো তো তাদেরই, মৌলিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঘরগুলোও। এর কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তায়। তারপর কোন প্রযুক্তির প্রতি বাজারের ঝোঁক রয়েছে, কোন্‌টিতে ঝোঁক বাড়তে পারে তা স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ভাল জানে। আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দিতে স্থানীয় ছোট ছোট কারখানা ইত্যাদির সহায়তাও আমরা প্রচুর নিয়েছি। অন্যদিকে কিশোরী কর্মসূচিতে মেয়েদেরকে ক্ষমতায়নের পথে নিয়ে যেতে বাবা মা ও পুরো পরিবারকেই একভাবে ক্ষমতায়নের দিকে নিয়ে যাবার দরকার ছিলো। কাজেই তাঁরাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছেন আমাদের কাজের সঙ্গে। সব মিলে স্থানীয় সমাজের এই সিএমইএস 'পরিবার' গড়ে উঠতে দেখাটি খুবই তৃপ্তিকর বিষয় বৈকি।

পরের বছরগুলোতে আমরা দেশের আরো বহু আনাচে কানাচে আমাদের কাজ শুরু করতে পেরেছি; সিএমইএস পরিবার ক্রমে বড় হয়েছে। এর মধ্যে আমাকে সব চেয়ে বেশি কাজ করতে হয়েছে সিএমইএসের কর্মীদের নিয়ে। প্রতিষ্ঠানের আওতা যত বড় হয়েছে কর্মীর সংখ্যা তত বেড়েছে। দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এনজিওগুলো ইতোমধ্যে একটি বড় কর্মদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। ফলে যে কোন জায়গায় কর্মী চাইলেই বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে এর জন্য প্রার্থী হতো। ওদের মধ্য থেকে আমাদের কাজের জন্য সত্যিকারের উপযুক্ত ও উৎসাহী ছেলেমেয়েদের বেছে নেয়া সহজ কাজ ছিলোনা।

অথচ সিএমইএসের লক্ষ্য ও কাজ এমন যে নিবেদিত হয়ে মনের আনন্দে না করতে পারলে মামুলি বেতনে পাড়া গাঁয়ে থেকে এ কাজ করা কারো পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হতো না। ঢাকায় সার্ভিস সেন্টারে কেন্দ্রীয়ভাবে যারা কাজ করে তাদেরকেও অধিকাংশ সময় দূর দূর জেলায় এসব গ্রামাঞ্চলের ইউনিটে গিয়ে কাজের ব্যবস্থাপনা করতে হতো। উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে এ কাজকে ভাল না বাসলে এটি সম্ভব হতো না। মাঠ পর্যায়ের ও কেন্দ্রের সব কর্মীকে নির্বাচনের কাজে আমি উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম যাতে সঠিক মানুষ আমরা পাই। এর জন্য শত শত প্রার্থীর পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি নেয়া মোটেই সহজ কাজ না হলেও আনন্দদায়ক নয় এমনটি বলা যাবেনা। কারণ এই বিপুল সংখ্যক তরুণ তরুণীর সঙ্গে কথা বলার এই সুযোগে আমি দেশের সাধারণ তরুণ সমাজকে অনেক ভাল ভাবে জানতে পেরেছি। দেখেছি আমাকে কিছুটা চেনে বলে ওদের অনেকে আমার সঙ্গে কাজ করতে বিশেষ ভাবে উৎসাহী হয়েছে। নির্বাচিত কর্মীদেরকে সময় সময় প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দানের জন্য যে আয়োজনগুলো হতো তাতে বহু ক্ষেত্রেই আমি মুখ্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা করতাম। এ কাজ আমি এতটা উপভোগ করেছি যে আমার অন্য সহকর্মীরাও যেন কার্যকর ভাবে এরকম প্রশিক্ষণ দিতে পারে সে জন্য একটি বইও লিখেছিলাম সিএমইএস কর্মীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে। এভাবেই গড়ে ওঠেছিলো সিএমইএসের কর্মী পরিবার; অনেকেই রয়ে গেছে সেই প্রথম দশকের নিবেদিত কর্মীদের মধ্য থেকে। তারাই আজ সিএমইএসের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করার কাজে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।

সিএমইএসে কাজ করার মূল আনন্দটাই হলো গ্রামের তৃণমূলের ছেলেমেয়েদের জীবনটা বদলে দিতে অবদান রাখার আনন্দ। এ কাজটি করার জন্য সব সময় যে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা ও কৌশল সিএমইএস নিয়ে এসেছে সে সব শিখতে পারার আনন্দটাও তাদের কম ছিলনা। শুরুতে নিজে যে রকম পটভূমি থেকেই আসুক না কেন এখানকার প্রায় সব নিবেদিত কর্মী শিগ্‌গির একজন প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক, সমাজকর্মী, নারী ক্ষমতায়নের অগ্রণী, ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা, এবং সব অর্থে আমাদের কিশোর কিশোরীদের ফ্রেন্ড, ফিলসফার ও গাইডে পরিণত হয়। এই কর্মীদের সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক আর একটি বৃহত্তর কর্মী বাহিনী—যাদেরকে ওভাবে নিযুক্ত করা হয়নি, বরং যারা প্রথমে সিএমইএস এ ছাত্র ছাত্রী অথবা কিশোরী সমিতির সদস্য ছিল, কিন্তু নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে ও নিজেরা ক্ষমতায়িত হয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পিয়ার লিডারে (বন্ধু নেতা) উন্নীত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সিএমইএসের সব কার্যক্রমে বিশেষ করে কিশোরী কার্যক্রমে এই পিয়ার লিডারদের ভূমিকা অপরিসীম। ওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওদের মতো আরো অনেককে পথ দেখিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, সবাইকে সংগঠিত করেছে। ওদের অনেকের ভূমিকা হলো

অভিভাবকরাসহ সমাজের নানা স্তরের নেতৃস্থানীয় মানুষদেরকে আমাদের কাজের স্বপক্ষে নিয়ে আসা এবং গ্রামে ও আশপাশে একটি শক্তিশালী 'সমর্থক গোষ্ঠি' গড়ে তোলা। তা ছাড়া কার্যক্রমে যখন যা তাদেরকে করতে দেয়া হয়েছে বন্ধু নেতা হিসেবে তখনই তারা তা করেছে। তাদের নিয়ে 'বন্ধু নেতা' নামে একটি বই প্রকাশ করেছি। এখন ওসব জায়গায় গিয়ে অনেক সময় নানা মহিলার সঙ্গে নানা কাজে যখন দেখা হয় এবং তাদের কেউ কেউ খুব গর্ব ভরে বলে 'আমি সিএমইএসের পিয়ার লিডার ছিলাম'—তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গর্ব অনুভব করি বৈ কি।

দৈনন্দিন প্রযুক্তিতে মোড়

সত্তর ও আশির দশকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তিগুলো একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিলো। এটি আমি দুই জায়গা থেকে দু'রকম ভাবে টের পেয়েছি। যেহেতু এই সময়ের প্রথম দিকে বৃটেন ও সুইডেনে এবং পরের দিকে ইতালির ত্রিয়েস্তে নিয়মিত প্রযুক্তি পরিবেষ্টিত ভাবে থেকেছি, তাই এক দিক থেকে এরকমের প্রযুক্তির একেবারে সামনের সীমান্তে ছিলাম—বাজারে প্রচলিত হওয়া মাত্র দেখতে পেয়েছি। দেশে আমাদের নিজের কাজে লাগতে অবশ্য এর প্রত্যেকটি আরো যথেষ্ট সময় নিয়েছিলো।

১৯৬৯ সালে মানুষ যখন প্রথম চাঁদে গিয়েছিলো তার কিছুটা আগে আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারের টেলিভিশন চিত্র টেলি-কম্যুনিকেশন ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সরাসরি দেখানো সম্ভব হচ্ছিলো। এ কারণে চাঁদে অতরণের দৃশ্য আমেরিকায় হিউস্টনে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইউরোপ থেকে দেখতে পেয়েছি। আমাদের দেশে সে সময় সেটি সম্ভব ছিলো না ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের অভাবে। ১৯৭৫ সালে রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় এরকম প্রথম স্টেশন স্থাপিত হবার পর থেকে আমাদের টেলিভিশনে এরকম অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা সরাসরি দেখতে পারছিলাম। সে সময় দেশের টেলিভিশন সেটগুলো প্রায় সবই ছিল সাদা কালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯৮০ সালেই রঙিন ব্রডকাস্টিং শুরু করে দিয়েছে; কারণ আধুনিক যে যন্ত্রপাতি টেলিভিশনের উন্নয়নের জন্য কিনতে হচ্ছিলো তার সবই শুধু রঙিন ব্রডকাস্টিঙের জন্যই পাওয়া যাচ্ছিলো। এরপর দেশে ধীরে ধীরে রঙিন টেলিভিশনের চল শুরু হয়েছিলো, যদিও তখন তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। টেলিফোনের ক্ষেত্রে আশির দশকের শুরুতে কয়েন বক্স টেলিফোনগুলো দেশে প্রথম আসে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এমন একটি কয়েন বক্স বসানো হয়েছিলো। সিএমইএসের প্রথম দিনগুলোতে বাসায় (সিএমইএস অফিসও বটে) টেলিফোন আসার আগে পর্যন্ত পয়সা দিয়ে এর সুযোগ নিতাম। অল্প দূরত্বে ক্লাবে গিয়ে দিনে রাতে ফোনের কাজ সারা যেতো—বেশ কিছু সিকি আধুলি যদিও হাতে করে নিয়ে যেতে হতো।

ইংল্যান্ডে যখন পড়াশুনা করছি তখন পর্যন্ত চিঠির একমাত্র দ্রুততর লিখিত বিকল্প ছিলো টেলিগ্রাম করা। এতে শব্দ-সংখ্যা খুব সীমিত রাখতে হতো এর ব্যয় বহুলতার কারণে। এর পরে পরে সর্বসাধারণের জন্য টেলেক্স প্রচলন হওয়াতে আরো একটু খোলাসা করে জরুরি বার্তা তাৎক্ষণিক ভাবে পাঠানো সম্ভব হয়েছিলো। টেলেক্স জিনিসটি অবশ্য টেলিপ্রিন্টার রূপে সংবাদপত্র অফিস ইত্যাদির জন্য বহুদিন ধরেই ছিলো। এতে এক অফিসে খবর টাইপ রাইটারের মত যন্ত্রে টাইপ করে গেলে দূরবর্তী অফিসেও তা টাইপ হয়ে যেতো। আশির দশকে বাংলাদেশ পোস্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ সার্ভিস সাধারণ মানুষের জন্য টেলেক্স পাঠানো ও গ্রহণ করার ব্যবস্থা চালু করে। ইতালির ত্রিয়েস্তে পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রে একটি টেলেক্স এক্সচেঞ্জ ছিলো যেখান থেকে আমরা বিনা খরচে যেকোন দৈর্ঘের টেলেক্স পাঠাতে পারতাম। সেই ইমেইল যুগের আগে আমরা এমন সুবিধাকে বিরাট একটা সুযোগ হিসেবে মনে করতাম।

ডেস্কটপ কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের প্রথম দর্শনও পেয়েছিলাম ঐ ত্রিয়েস্তের কেন্দ্রেই। বাংলাদেশে আশির দশকের মাঝামাঝি ডেস্ক কম্পিউটার আত্মপ্রকাশ করেছে কোন কোন জায়গায়। বিভিন্ন মেলায় এরকম কম্পিউটার দেখানো হতো, সবাই খুব উৎসাহ ভরে দেখতো! এগুলোর ব্যবহার শেখার জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলো ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিলো। আমাদের সিএমইএসে প্রথম আমরা এ রকম একটি পুরানো কম্পিউটার উপহার পাই নব্বই দশকের শুরুতে। আর অনেকটা সে কারণেই উৎসাহিত হয়ে আমরা 'কম্পিউটার জগতের' সম্পাদক আবদুল কাদেরের (তার স্কুল জীবন থেকে আমার অনুজ প্রতিম) বাসার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার কেন্দ্রে রীতিমত এক মাস ক্লাস করলাম এর প্রশিক্ষণ নিতে। খুব মনোযোগ দিয়ে 'ওয়ার্ড পারফেক্ট' এবং 'লোটাস-১২৩' (তখনকার জনপ্রিয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম) শিখলাম সি এম ই এসের কাজ এর মাধ্যমে করবো বলে। বড় ফ্লপি ডিস্কের মধ্যেই মূল ডস (ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম) এবং ইউটিলিটি প্রোগ্রামগুলো থাকতো, ওখানকার কোন কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক ছিলোনা। সিএমইএসের সিনিয়র কর্মকর্তাদের পাঁচজন সহ এক সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ নিলাম। এর পর পর টেক ভ্যালি নামক নতুন কম্পিউটার দোকান থেকে একটি কিনেই ফেল্‌লাম—দোকানটি আমার এক প্রাক্তন ছাত্র চালাচ্ছিলো। ত্রিয়েস্তে যে বিজ্ঞানীরা আমেরিকা থেকে আসতেন (তাদের মধ্যে বাঙালিও ছিলেন) তাঁরা দেখতাম নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে কম্পিউটার থেকেই নিজেদের অফিসের ও বাড়ির জন্য খবরাখবর পাঠাতেন। মাঝখানে কোন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন নেই, সরাসরি খবর আদান প্রদান করতে পারছেন—শুধু উভয় দিকে কম্পিউটার রয়েছে বলে। এভাবেই প্রথম ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হলাম যা তখনো সামরিক ব্যবহারের বাইরে শুধু আমেরিকার একাডেমিক মহলের ব্যবহারেই চালু ছিলো। তখন পর্যন্ত কোথাও এটি সর্বসাধারণের কাছে ব্যবহারে আসেনি। ঢাকায় নব্বই

দশকের একেবারে শুরুতে কে একজন খবর দিলো 'দৃক গ্যালারির' প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার শহীদুল আলম সাহেব ওখানে অফ্ লাইন ইমেইল সেবা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এর মানে হলো আমরা একটি ইমেইল প্রাপকের ঠিকানা সহ দৃকের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তাঁরা যত শিগ্‌গির সম্ভব এগুলোকে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হবার মাধ্যমে প্রাপককে পাঠিয়ে দেবেন। এভাবেই আমরা অফ্ লাইন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথম ইমেইলের সুবিধা নিতে আরম্ভ করলাম। এই সুযোগ পেয়ে আনন্দে এমন আত্মহারা হয়েছিলাম যে কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করবো তা নিয়ে শিশুসুলভ রকমে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। যে গুটি কতেক ইমেইল ঠিকানা তখন আমার হাতে ছিলো বিনা কারণে তাদেরকে নানা বিষয়ে লিখে তাদের থেকে উত্তর আনার ব্যবস্থা করছিলাম—শুধু এভাবে একান্তে প্রায় তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মজা পাওয়ার জন্য। তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করার মুহূর্তগুলো আমাদের জন্য এমনই ভীষণ উত্তেজনা বহন করে এনেছিলো। তখন কিন্তু দেশে অফিস মহলে ফ্যাক্স ব্যবস্থাটি বেশ জাকিয়ে বসেছে। বিভিন্ন অফিসে টেলিফোনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্স নেবার রীতি চালু হয়ে গিয়েছিলো। এতে ছবি, গ্রাফিক্স, লেটারহেড সহ পুরো ডকুমেন্টের প্রতিচ্ছবিই ফ্যাক্স থাকা অন্য যে কাউকে দুনিয়ার যে কোন জায়গায় পাঠানো সম্ভব হচ্ছিলো। কেমন করে জানি আমরা সিএমইএসে ফ্যাক্সের ব্যবস্থা না করেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। যখন হুবহু ডকুমেন্ট আদান প্রদান জরুরি হয়ে পড়েছে ততদিনে এটি ইন্টারনেটে বেশ সহজ হয়ে পড়েছিলো। এর আগে পর্যন্ত যখন ফ্যাক্স দরকার হয়েছে—আমাদের অফিসের কাছেই এক ফ্যাক্সের দোকানের সঙ্গে চুক্তি করে সে কাজ সেরেছি।

সিএমইএসের জন্য এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার জন্য কম্পিউটার ভিত্তিক যে প্রযুক্তিটি ওসময় আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তা হলো ডেস্কটপ পাবলিকেশন্স। আমি সব সময় মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে উপভোগ করেছি। এর যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণের কাজ নিজের হাতে রাখার জন্য অতীতে কী ই না করেছি—টাইপ কিনে বাড়িতে তা কম্পোজ করিয়েছি, প্রেসের মেইক আপ- ম্যানের পাশে বসে থেকেছি তাকে নির্দেশনা দেবার জন্য; এসব তো বলতে গেলে ছোটবেলা থেকে ধারাবাহিক ভাবে করে গেছি। ঢাকায় কোন কোন প্রেসে লাইনো টাইপের (যান্ত্রিক ভাবে সীসার টাইপ তৈরি) অতি সুন্দর অক্ষর যখন চালু হয়েছে তার পেছনে ঘোরেছি। এরপর কম্পিউটার কম্পোজড অফসেট মুদ্রণ যখন এসেছে শুধু কিছু বড় বড় প্রেসের আওতায়—সেখানে চলে গিয়েছি। ডেস্কটপ পাবলিকেশন্স ছোট ডেস্কটপ কম্পিউটারেই মুদ্রণের প্রাথমিক কাজ অনেকখানি সেরে ফেলার সুযোগ করে দিলো। ধীরে ধীরে তার বেশ কিছুটা সিএমইএস অফিসের কম্পিউটারের আওতায় নিয়ে আসতে পারলাম। এখানে থেকেই আমি প্রেসের মুদ্রণ কাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী হয়ে যেতে পারলাম। প্রথম দিকে বাংলা ফন্ট যা পাওয়া গেল তা সুন্দর ছিলনা, ব্যবহারও সহজ ছিলনা। ইতোমধ্যে কিছু বাংলা

ফন্ট এতো সুন্দর রূপে আসলো যে দেখলে মন ভরে যায়। সেই সঙ্গে পাবলিকেশন্সের সফ্‌টওয়্যারগুলো সব কিছু সাজাবার কাজটিকে সহজ ও সুন্দর করে তুলেছিলো। কিন্তু এর কোনটিই রাতারাতি হয়নি। প্রথম দিকের কম সন্তোষজনক ব্যবস্থাগুলো নিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে বৈ কি! সিএমইএসের কাজে প্রযুক্তির দিক থেকে সব থেকে বড় অসুবিধা যেটি ভোগ করতাম তা হলো দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের ইউনিটগুলোর সঙ্গে টেলিফোন সংযোগের অভাব। নিজেদেরকে এদিক থেকে খুব বিচ্ছিন্ন মনে হতো। কিন্তু আমার এই জীবনস্মৃতির কালটি কিছুটা অতিক্রম করে এক সময় এর চমৎকার সমাধান হয়ে গিয়েছিলো সব ইউনিটে মোবাইল ফোন থাকা যখন সম্ভব হয়েছে তখন। চোখের সামনে সেই বিপ্লবটি দেখাও আমাদের জীবনে একটি বিরাট ঘটনা। গ্রামীণ ফোনের টাওয়ার তখন চলে গিয়েছিলো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। চাঁপাই নবাবগঞ্জের অথবা একেবারে দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল পাথরঘাটার বিদ্যুৎহীন, রাস্তাহীন গ্রামের গভীরে সভা করছি, সেখানেই মোবাইল বেজে উঠলো, কথা বল্‌লাম ঢাকার সঙ্গে—এমন ঘটনা যখন প্রথম প্রথম ঘটেছে তখন মনে হয়েছে আমাদের পারস্পরিক সংযোগ তখন পূর্ণ বৃত্তে এলো বলে।

বাংলো-তিনের আবহ

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের অধিকাংশ জুড়ে বেশ বড় একটি সময় আমি কাটিয়েছি সেই 'পিডব্লুডি বাংলো-তিন নামের সেই লাল ইটের প্রায় পোড়োবাড়ির মতো শতবর্ষী এক দালানে—তার নিচের তলার একাংশে। এটিই ছিলো আমার আবাস, একই সঙ্গে বিজ্ঞান সাময়িকীর এবং পরে সিএমইএসের অফিস। ১৯৮৪ সালে ঢাকায় সিএমইএসের সার্ভিস সেন্টার (মোহাম্মদপুরের আসাদ এভেন্যুতে) শুরু হলে অফিসগুলো ওখানে চলে যায়। তবুও এই বাড়িটি আমাদের অনেক কাজের কেন্দ্রবিন্দু থেকে যায়। উঁচু ছাদ আর বড় বারান্দা ছাড়া ছোট্ট বাড়িটির মধ্যে না ছিল খুব একটা কাজের জায়গা, না সুবিধাজনক কোন পরিবেশ। তারপরও অনেকের জন্য এখানে এসে যোগাযোগ করা, আলাপ করা সুবিধাজনক মনে হতো। এর একটি কারণ ছিলো বলতে গেলে এটি ছিমছাম হাঁটার পথের উপর একেবারে উন্মুক্ত একটি বাড়ি। বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের ফুলার রোড ও শামসুন্নাহার হলের মাঝখানে তখন বেশ বড় একটি মাঠ ছিলো যার অনেকখানি এখন উদয়ন স্কুলের ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নব নির্মিত আবাসিক ভবনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ঐ মাঠের কোনাকুনি হেঁটে কেউ কেউ তখন যাত্রা শর্টকাট করতেন এবং আমাদের বাড়িটি সামনেই পড়তো। এভাবে কিছু হাঁটাচলা ছাড়া ও দু'একটি গরু চরা ছাড়া মাঠটি প্রায় উন্মুক্ত খালিই থাকতো।

বাড়িটি ছিলো বেশ ঐতিহ্যবাহী। শ'খানেক বছর আগে যখন এটি তৈরি হয়েছিলো তখন খুব সম্ভব কোন ইংরেজ রাজকর্মচারীর জন্যই তা করা হয়েছিলো। এতে শীতের দিনে ঘর গরম করার জন্য বৃটিশ কায়দার ফায়ার প্লেস, চিমনি ইত্যাদি দেখেই তা আন্দাজ করছি—যেগুলো এখন মাঝে মাঝে মেঠো ইঁদুরের যাতায়াত ছাড়া আর কোন কাজে লাগতোনা। সুদূর পূর্ববর্তী কারো উদ্যোগে লাগানো সামনের গাড়ি বারান্দায় বেশ সুন্দর বোগেন ভেলিয়ার ঝাড় তখনো ছিলো। যদিও ঝাড় দেখে এক কালে তার যতটা জমকালো বেগুনি রঙের প্রস্ফুটন ছিল বলে আন্দাজ করছি আমাদের সময়ে ততটা আর ছিলোনা তবুও এই ফুল বাড়িটিকে আরো কিছু মায়াময় করে তুলতো। বাড়িটি অনেক চিত্র-শিল্পীকে আকৃষ্ট করতো। হয়তো এর প্রাচীনত্ব, পোড়োবাড়ির মত চেহারা, আবার একই সঙ্গে বিশেষ স্থাপত্যের নিদর্শন হবার কারণেই এই আকর্ষণ। প্রায়ই দেখতাম আর্ট কলেজের দু'চার জন ছাত্র ছাত্রী তাদের আঁকার সরঞ্জামাদি নিয়ে অনেক্ষণ ধরে বসে বিভিন্ন কোণ থেকে বাড়িটির স্কেচ করতো। আমার দুই ছেলে কুশল আর উজলের শৈশব এখানে কেটেছে, তারা খুবই কৌতূহলী হয়ে ওদের আঁকা দেখতো। ছোট্ট উজলের নিজের কিছুটা স্বভাবজাত আঁকার হাত ছিলো; পরে এক সময় সে নিজেও চেষ্টা করেছে এ বাড়ি স্কেচ করার। সামনের বিরাট মাঠটি ছিলো কুশলের জন্য এক অবারিত জগত—ইচ্ছে মতো ছুটাছুটি করার জন্য। আমার ছাত্র ছাত্রীরা যারা বিজ্ঞান সাময়িকীতে লেখালেখি করতো বলে অথবা সিএমইএসের সঙ্গে জড়িত ছিলো বলে এ বাসায় প্রায়ই আসতো তাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিলো কুশলের। স্বপন গায়েন, নাদিরা মজুমদার, বিষ্ণু দাস (সবাই পরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য)—ওদের সঙ্গে।

আমার সব চেয়ে ছোট ভাই মইনু (মইনুল আনাম) ওসময় এ বাড়িতে আমাদের সঙ্গে থাকতো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে পড়তো বলে। তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে নাট্য জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলো। ওদের কয়েক জন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান অক্ষর চক্করের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলো—যার মধ্যে ওয়াকার, মনির, ছন্দা ওদের কথা খুব মনে পড়ে। অক্ষর চক্করের রিহার্সেলেই হোক, আর এমনিতেই হোক, ওরা বাড়িটিকে মাতিয়ে রাখতো আর কুশলের রোল মডেল হতো। তবে এ বাড়িতে আমাদের ওপর সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ ছিলো আমাদের পাশের বাসার প্রতিবেশীরা। এই ভবনের নিচের তলায় ঠিক একই রকমের অন্য অংশে থাকতেন একজন নিবেদিত শিক্ষক দরবেশ আলী খান। তিনি এক সময় পিরোজপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সেখানেই তাঁর বিভিন্ন সময়ের অসংখ্য ভক্ত ছাত্রছাত্রী ছিলো। একটু বেশি বয়সেই তিনি তখন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় এসেছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ও দুই মেয়ে তখন নানা পর্যায়ে লেখাপড়া করছিলো। আমাদের সঙ্গে বিশেষ রকমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো দুই মেয়ে এশা আর পাশার সঙ্গে। এশা তখন

কলেজে আর পাশা হাইস্কুলে, দুজনে কেমন করে জানি ছোট্ট কুশলকে একেবারে আপন করে নিয়েছিলো, এবং অনেকটা তাদের মা আমাদের 'খালাম্মাও' তাই করেছিলেন। আমরা অনায়াসে কুশলকে তাদের বাসায় দিয়ে যার যার কাজে চলে যেতাম। ওদের বাসায় কুশল শুধু কয়েক জন অন্তরঙ্গ মানুষই পেতোনা বরং সেখানে পেয়েছে ছোটদের প্রতিও খুবই বন্ধুসুলভ একটি লাইব্রেরি, একটি অত্যন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, যার প্রভাব যে কোন বাচ্চার জন্যই চমৎকার হতে বাধ্য। দরবেশ সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র যারা সেখানে আসতো, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সবার গৌরাঙ্গদা—একাধারে বাঁশি বাজাতে ও যাদু দেখাতে অনন্য। তিনিই পরে সারা দেশে ও বিদেশে জুয়েল আইচ নামে পরিচিত হয়েছিলেন, আর ওই বাড়ির পাশাও এক সময় তাঁকে বিয়ে করে তাঁর সহযোগী হয়ে বিপাশা আইচ নামে নিজেও কম বিখ্যাত হয়নি। সে সব অবশ্য বেশ খানিকটা পরের কথা। কুশল নিজেও ঐ বাঁশি আর যাদু বিদ্যার অধিকারীর স্নেহধন্য ও ভক্ত হয়ে পড়েছিলো।

বড় বোন এশা পরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে বেশ নাম করা একজন মানসিক চিকিৎসাবিদ হয়েছে। এখন মাঝে মাঝে দেশে আসলে বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেলে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে পরামর্শ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত ব্যস্ত এই চিকিৎসককে দেখেছি কুশল আর উজল নিউজার্সিতে এসেছে শোনে (ওরা তখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে) গভীর রাতে একটু সময় পেয়ে কয়েক শ' মাইল ড্রাইভ করে এসে দীর্ঘক্ষণ ওদের সঙ্গে গল্প করে গেছে—এখনো ওরা তার এতই আপন। দরবেশ সাহেবের বড় ছেলে সবুজ (নসরত আলী) তার কর্ম জীবন একজন ব্যাংকার হিসেবে শুরু করলেও এখন সে একটি বিরাট ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের একজন—সেটি হলো বিউটি পার্লারের জগতে অনন্য নাম 'পারসোনার'। এর মূল কর্ণধার অবশ্য সবুজের স্ত্রী বিখ্যাত কানিজ আলমাস খান—পার্সোনার প্রতিষ্ঠাতা। সবুজের বৌ হয়ে প্রথম যখন এ পরিবারে কানিজ এসেছিলো তখন আমরা চিন্তাই করতে পারিনি তার অন্তর্নিহিত বিউটিশিয়ানের গুণ একদিন তাকে এতদূর নিয়ে যাবে, আর শুধুই লেখাপড়া, গান বাজনা, যাদু নিয়ে হাসিখুশি থাকা সাধারণ এই পরিবারটি বড় ব্যবসায়ী পরিবারে পরিণত হবে। অবশ্য খালাম্মা, সবুজ, কানিজ ওঁরা প্রত্যেকে এখনো ঐ পরিবারের ভেতরে সেই লাল পোড়োবাড়ির মানুষটিই হয়ে আছেন। যখনই তাদের পারিবারিক পুনর্মিলন হয়, তখন এর বাড়তি অংশ হিসেবে আমাদেরো ডাক পড়ে। দুঃখের বিষয় হলো এর বহু আগে ওই লাল বাড়িতে আমরা সবাই থাকতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে দরবেশ আলী সাহেব মারা গিয়েছিলেন।

আমাদের এই লাল বাড়িটির খুব কাছেই ছিল উদয়ন বিদ্যালয়। কুশল যখন এখানে ভর্তি হলো তখন থেকে এই স্কুলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেড়ে গেলো অনেকখানি। সে সময় স্কুলটির খুব সুনাম ছিলো, অথচ ক্যাম্পাস ও অবয়বের

দিক থেকে সেটি ছিলো খুবই টানাটানির মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সীমানা ঘেঁষে সামান্য একটু জায়গায় খুব সাধারণ একটি দোতলা ভবনে কোন রকমে এর কাজ চলতো—সামনে লম্বাটে এক চিলতে জায়গার মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সামান্য খোলামেলা পরিবেশ ছিল। আমি যখন সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র তখন স্কুলটির নাম ছিল ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল, তখন এটি ছোটদের স্কুল ছিলো। ১৯৬৯ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলটিকে দোতলা ভবনে পরিণত করে উদয়ন বিদ্যালয় নামে পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে পরিণত করার অনুমতি দেয়। আসলে ১৯৫৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহেই উপাচার্য ভবনের কর্মীদের থাকার কিছু আবাস অন্যত্র সরিয়ে সে জায়গায় আধ পাকা এক তলা করার সুযোগ দিয়ে ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলটি প্রথম স্থাপন করা হয়েছিলো। তখন থেকেই শিক্ষা দানের ব্যতিক্রমী পদ্ধতির কারণে ছোটদের স্কুলটি নাম করেছিলো। উদয়ন বিদ্যালয় হবার পর সেই সুনাম আরো বেড়েছিলো। কতগুলো দিক থেকে এটি ছিলো ব্যতিক্রমী। এখানে সব সময় ছেলে মেয়ে সহ-শিক্ষা চালু ছিলো। যথারীতি বাংলা মাধ্যম স্কুল হয়েও সেই ইংলিশ প্রিপারেরটরির ঐতিহ্যে গোড়া থেকেই ইংরেজি পড়তে লিখতে ও বলতে পারার উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। এখানকার শিক্ষা পরিবেশ সেই সীমিত ক্যাম্পাসের মধ্যেই যে ছাত্র ছাত্রীরা খুব উপভোগ করতো তা স্কুলের সঙ্গে কুশলের দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েই বুঝতে পেরেছি। এখানকার অনুষ্ঠানাদি, স্পোর্টস, স্কাউটিং এবং তারো চেয়ে বেশি স্কুলের প্রকাশিত ম্যাগাজিনে ইংরেজি বাংলা লেখাগুলো পড়েও তা বেশ বোঝা যেতো।

উদয়ন বিদ্যালয়ের একটিই বড় অসুবিধা ছিল তা হলো খেলার মাঠের অভাব। সে অভাব মেটাতে এখানকার ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বড় নানা মাঠে সুযোগ মত ছড়িয়ে পড়তো খেলার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকাগুলোর ভেতরে যে সামান্য মাঠ, তাও কাজে লাগতো। এমন একটি এলাকাতে পরে আমরা থাকতাম বলে এটি খুব লক্ষ্য করতাম। কুশল আর উজল দু'জনেই এখানে দিনে রাতে খেলে খেলেই এমন অভ্যাস পেয়েছিলো যা আমি কখনো পাইনি। এ অভ্যাস হলো কিছুটা দক্ষ ভাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার, এসব খেলা সম্পর্কে নিত্য খবর রাখা ও খেলা উপভোগ করা; আরো বড় কথা হলো খেলার উপলক্ষে বন্ধুত্বের গণ্ডিকে অনেক বাড়িয়ে নেয়া।

কুশলের ও পরে উজলের বন্ধু ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উদয়নে পড়ার জন্য একটি বিশেষ গর্ব ও আত্মবিশ্বাস সব সময় লক্ষ্য করেছি, বহুদিন পর ওরা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনো। এর বড় কৃতিত্ব দিতে হবে স্কুলের বেশ ব্যতিক্রমী কিছু শিক্ষকদেরকে যাদের কাউকে কাউকে আমি নিজেও চিনতাম এবং তাঁদের কোন কোন কাজে অংশ গ্রহণেরও সুযোগ ঘটেছে। বিশেষ করে প্রথম দিকে মমতাজ বেগম (প্রখ্যাত টেলিভিশন নাট্যকার) এবং শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী প্রমুখ পর পর কয়েক জন প্রধান শিক্ষিকাদের উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতার ছাপ স্কুলের উপর

নানা ভাবে পড়ছিলো। সেই তখন থেকে স্কুলের মধ্যে একটি আকাঙ্খা ছিলো একটি বড় যথাযথ ক্যাম্পাসে এটি যাবে। ১৯৯২ সালে সেটি সম্ভব হয়েছিলো, কারণ ইতোমধ্যে বৃটিশ কাউন্সিলের বিপরীতে এর সুন্দর পাঁচ তলা লাল ইটের ভবনটি গড়ে ওঠেছিলো। কিন্তু স্কুল যে শুধু ভবন নয়, বরং স্কুলের প্রাণ-ভোমরা যে অন্য কিছু যেটি বিভিন্ন রকমের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে বজায় রাখা যায় তা উদয়ন স্কুল দেখিয়ে দিয়েছে—ইংলিশ প্রিপারেটরি, পুরানো ক্যাম্পাসে উদয়ন বিদ্যালয়, নতুন সুদৃশ্য ভবনে তা, সব ক্ষেত্রেই সেটি বজায় রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আবাসিক ভবন এখানে হয়ে অবশেষে সেই শতবর্ষী বাংলো-তিনের অবলুপ্তি ঘটেছিলো এবং তার সামনের খোলা মাঠ, হাঁটা পথ ইত্যাদিও হারিয়ে গেছে।

'নিরিবিলিতে' ঘরে ফেরা

১৯৬২ সালের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম কলেজের পাট চুকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকে আমার একটানা চট্টগ্রামে থাকার দিনগুলোরও অবসান হয়েছিল। আমার দুই ভাই ইউনূস ভাই ও জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রেও এভাবে চট্টগ্রাম ত্যাগটি স্থায়ী হয়ে পড়েছিলো। অন্য ভাইবোনেরা লেখাপড়ার জন্য কয়েক বছর বাদ দিলে বাকি সব সময় চট্টগ্রামবাসী হয়েই কাটিয়েছে। তবে যে যেখানে থাকি আমাদের সব ভাইবোনের জন্য পৈতৃক বাড়ি চট্টগ্রামের 'নিরিবিলিই' থেকে গিয়েছিলো সত্যিকারের বাড়ি, যখনই সুযোগ হয় ফেরার জন্য। সেই সঙ্গে শৈশবের সেই বক্সীর হাটের মায়াও ছাড়তে পারিনি—যদিও বহুদিন আর সেখানে থাকা হচ্ছিলনা। নিরিবিলির আসল টানটি হলো মা ও আব্বার কাছে যাওয়ার এবং সব ভাইবোনের একত্র হওয়ার। ওখানে প্রধান কাজ হলো পুরানো দিনের গল্প করা আর সামনের দিনগুলোতে কার কী প্রজেক্ট আছে সেগুলো নিয়ে ভাইবোনদের মন্তব্য নেয়া। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের কেউ কেউও এ আলোচনায় যোগ দিতো। নিরিবিলির দোতলায় এক পাশে আইয়ুবরা যেখানে থাকে তার খুবই প্রশস্ত বারান্দায় চলতো (এবং এখনো চলে) আমাদের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সেমিনার। আব্বা এই হৈ চৈ এর সেমিনারে যোগ দিতেন না বটে তবে আমরাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করতাম। আমরা অনেকে আমাদের নানা কাজকর্মের প্রজেক্ট আব্বাকে বোঝাতে খুব উৎসাহী হতামনা, কিন্তু ইউনূস ভাই ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। তিনি গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে তাঁরা কী করছেন তার নানা খুঁটিনাটি এবং দেশে বিদেশে তার কী প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি আব্বাকে সময় নিয়ে বোঝাতেন। আব্বা খুব খুশি হতেন।

সাধারণত দুই ঈদে আমাদের এভাবে চট্টগ্রাম অবশ্যই যাওয়া হতো, অন্য নানা উপলক্ষেও হতো। যখনই এরকম এক সঙ্গে চট্টগ্রাম যাওয়ার সুযোগ পেতাম আমরা সাধারণত এক সঙ্গে ট্রেনে যাওয়াই পছন্দ করতাম, আর আমাদের সেই

সেমিনারটি ট্রেন থেকেই শুরু হয়ে যেতো। ট্রেনে কেমন করে যে সময়টি কেটে যেতো তা আমরা টেরই পেতামনা। সব ভাইবোনদের বয়স বাড়ছিলো, কারো কারো কাজের ও পরিচয়ের পরিধিও বাড়ছিলো, বিশেষ করে ইউনূস ভাইয়েরতো সে পরিধি দ্রুত বিশ্ব পরিধিতে গিয়ে ঠেকেছিলো; কিন্তু নিরিবিলিতে গেলে আমরা কৈশোরে বা তারো আগে বক্সীর হাটে যেমনটি ছিলাম ঠিক তেমন দিনগুলোই ফিরে পেতাম। আমাদের পরিবারটির পরিধিও ইতোমধ্যে যথেষ্ট বড় হয়েছে। ছোটবেলা থেকে বুবুর ছেলেমেয়েদের কারো কারো সঙ্গে বড় হয়েছি। তারপরেই বড়দার বড় মেয়ে স্বাতীই পরের প্রজন্মে সবার বড়। নিরিবিলিতে সে আসার পর বহুদিন সবার মধ্যমণি ছিলো। স্বাতী নামটিও আমরাই খুব উৎসাহ ভরে দিয়েছিলাম। আজ সে বহু বছর কানাডায় ডাক্তার (ডাঃ রুবিনা রুকাইয়া)। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর স্বাতীর সদ্যজাত বোন নাতাশাকে (জেবা জয়নাব) নিয়ে লেগে পড়েছিলাম। বছর পুরোবার আগেই সে টিকটিকি ডেকে উঠলে তার জবাব দেবার চেষ্টা করতো তাক্ তাক্ তাক্ শব্দ করে। পরে সে বড় হয়ে যখন জীব বিজ্ঞান পড়েছে আমরা তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতাম যে একেবারেই ছোট থাকা অবস্থাতেই তার সঙ্গে জীব জগতের সখ্যতা ছিলো।

নিরিবিলিতে যারা একেবারে শিশু বয়সের থাকতো আমার মায়ের সঙ্গে কী ভাবে চলতে হবে তা তারা শিগ্‌গির বুঝে ফেলতো। মা তাঁর অসুস্থতার পর থেকে নিজের এক আলাদা মানসিক জগতে বাস করে আসছিলেন—সেখানে তিনি আমাদের বড় হয়ে যাওয়া ভাইবোনদের চিনতেন নিজের মত করে। আমরা যাঁরা বাইরে থেকে নিরিবিলিতে যেতাম, গিয়েই তাঁর কাছে চলে যেতাম। আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব যে ধারণা তার কিছু কিছু বাস্তবতার সঙ্গে মিলতো, কিছু কিছু আবার মিলতোনা। তাতে কিন্তু আমাদের আলাপে কোন বাধা হতোনা। তবে কারো কারো প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকতো। যেমন তাঁর কনিষ্ঠতম সন্তান হলো মইনু। ঐ যে শিশু অবস্থায় তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিলো সে, বড় হয়ে যাওয়ার পরও সেই পক্ষপাত অক্ষুণ্ন ছিলো। আমরা ওকে মইনু ডাকলেও, মা ডাকতেন তাঁর নিজস্ব নামে—শাহেন শা মুজিবুদ্দৌল্লাহ। তেমনি পরবর্তী প্রজন্মে নাতাশার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিলো। তাঁর মেজাজ যখন খারাপ থাকতো তখন আমরা ছোট্ট নাতাশাকে পাঠিয়ে দিতাম তাঁর কাছে, তাতেই তাঁর মেজাজ ভাল হয়ে যেতো। নিরিবিলির সব চেয়ে ছোট্ট শিশু যে যখন ছিলো, আব্বার সঙ্গে তার থাকতো একটি বিশেষ সম্পর্ক। আব্বা সেই যে আমাদের ছোট বেলায় আমাদেরকে যেভাবে নিজের হাতে লালন পালন করেছেন, এখন এই শিশুকে নিয়েও তাই করতেন। বিশেষ করে কোলের শিশুর সঙ্গে তাঁর যে 'বেবিটক্' সেটি কিন্তু একেবারেই বদলায়নি। যখনই পারতেন তিনি নিজেও একেবারে শিশুর মতো হয়ে ওর সঙ্গে এই বেবিটক্ করতেন, এবং তাকে নানা ভাবে হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বয়স পর্যন্ত তাদের গোসল, খাওয়া,

পড়াশুনা, আরবি পড়া এসব নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার সীমা ছিলনা। কুশল যখন একটু বড় হয়ে নিয়ম করে লেখাপড়া করছে তখন তার সঙ্গে মিলে আমি তার সারাদিনের জন্য একটি রুটিন তৈরি করতাম। এই রুটিন তৈরির সমঝোতা বৈঠকে কুশলের সঙ্গে আব্বাও যোগ দিয়েছিলেন এবং তাতে হুজুর এসে তাকে আরবি পড়াটা যেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কুশল যখন দেখলো আব্বার এদিকেই উৎসাহ বেশি তখন সে ঐ অন্তর্ভুক্তির বিনিময়ে খেলার সময়টি একটু বাড়িয়ে নেবার জন্য আমার ও আব্বার সঙ্গে দর কষাকষি করেছিলো খুব মনে পড়ে।

ইউনূস ভাইয়ের বড় মেয়ে মনিকার জন্ম চট্টগ্রামে হলেও সে বেড়ে ওঠেছে কিন্তু আমেরিকার নিউজার্সিতে। স্কুলে থাকা অবস্থাতেই সে সংগীতে আশ্চর্য প্রতিভা দেখিয়ে নিউইয়র্কের বিখ্যাত সংগীত শিক্ষায়তন জুলিয়ার্ড থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছিলো। পরে সে অপেরা গায়িকা (সোপ্রানো) হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। কুশল প্রথম পড়াশুনা করতে আমেরিকা গেলে নিউয়র্কে মনিকার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তাদের কাজিনদের সবার একটি পরিচিতি তাকে দেয়া চেষ্টা করেছিলো, সেই কাজিন তালিকাটি বেশ দীর্ঘই হয়েছিলো বটে। পরে মনিকা দেশে আসলে এই সব কাজিনদের হৈচৈ এর মধ্যে সেও যোগ দিতে পেরেছিলো। তারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো নিরিবিলিতে এসব ছুটির দিনে বারান্দার কোন জায়গাটিতে বসে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সেমিনার চালিয়ে যাই। আমরা যখন ঈদ বা অন্য কোন উপলক্ষে নিরিবিলিতে সবাই একত্রিত হই তখন বাড়িটি সত্যিই উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। যারা আসতে পারেনি, বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে থাকছে ফোনের মাধ্যমে তাদের সবার সঙ্গে নিরিবিলির আসরের সবার কথা হয়, যাতে তারাও এর থেকে একেবারে বাদ না পড়ে।

আমার একেবারে ছোটবেলা থেকে শুরু করে সব কিছুতে পথ প্রদর্শক হিসেবে পেয়েছিলাম ইউনূস ভাইকে। আমাদের সব ভাইবোনদের ক্ষেত্রেই কথাটি সত্যি। তিনি তাঁর জগতকে যতই বিস্তৃত করুন না কেন পরিবারে তাঁর এই ভূমিকাটি কিন্তু কখনোই সংকোচিত হয়নি। বরং তাঁর জগত যতই বড় হয়েছে আমাদের কাছেও তাঁর বৃহত্তর জগতটি অনেকটা বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে, আমরাও গৌরবের আঁচ অনুভব করেছি। আগেই বলেছি আব্বাকে তিনি তাঁর কাজকর্ম, এ নিয়ে বিশ্বের উৎসাহ, এসব বিষয়ে অবহিত রাখতেন। আমাদেরকেও রাখতেন; গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আমরা কী ভাবছি সেটিও তিনি জানার চেস্টা করেছেন। সেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জোবরায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রথম সাফল্যগুলো, সেই টাঙ্গাইলের আকুর টাকুর পাড়ায় বৃহত্তর গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প, তারপর ব্যাংক হিসেবে দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা এর সবগুলো পর্যায়ের খুঁটিনাটিগুলো আমি অনুসরণ করে গেছি। দেশের বাইরে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনে গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের বিস্তার, ১৯৮৪ সালে ইউনূস ভাইয়ের ম্যাগসাইসাই পুরস্কার লাভ এবং

এরপর থেকে তাঁর একের পর এক বড় স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ আমাদেরকেও দারুণ ভাবে উদ্বেলিত করে চলেছিলো। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ছিলেন তরুণ বিল ক্লিনটন। তাঁর আগ্রহে ওখানেও গ্রামীণ মডেল প্রচলনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো। সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। এর পর থেকে তাঁর এই পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুনেছি। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি দেশে দেশে এমন খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে উন্নত, উন্নয়নশীল অনেক দেশে এমনকি সে সব দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও তার নাম ম্যাজিকের মত কাজ করছিলো। আমি তাই ভেবে পেতামনা যে নোবেল পুরস্কার পেলেও এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে।

নিরিবিলিতে আমাদের ঐ বারান্দার আড্ডার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি তাই ঐ আশির দশকেই খুবই বিচিত্র রকমের হতে বাধ্য ছিলো। যে সব অভিজ্ঞতার গল্প করার সুযোগ অত্যন্ত ব্যস্ত ইউনূস ভাইয়ের সাধারণত খুব বেশি হতোনা, দেশে দেশে—এমন কি ওখানকার এয়ারপোর্টে, রাস্তাঘাটে, ট্যাক্সিতে তাঁকে চিনে ফেলে যে মজার মজার কাণ্ড হতো সেই গল্প আমরা এই আড্ডায় শোনতে পেতাম। আর নানা দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, রাজা-রাণীদের কথা তো বটেই। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মহিলা বেলজিয়ামে গিয়ে ওখানকার রাজার কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে, গ্রামীণের অভিজ্ঞতা নিতে রাজকুমার এসে বাংলাদেশের গ্রামে থাকছে, এসবতো নিত্য ঘটছিলো। দুনিয়ার মিডিয়াগুলোও আমাদের কাছে বেশ ঘরোয়া ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো, সিএনএন, এনএইচকে, ইত্যাকার মিডিয়ার কাছে ইউনূস ভাইয়ের আগের জীবন সম্পর্কে বলার অনুরোধ পেয়ে পুলকিত হতাম। তবে ওসময় আমরা সব চেয়ে বেশি উপভোগ করেছি চট্টগ্রামে ইউনূস ভাইকে ও আব্বাকে ১৯৯৩ সালে দেয়া নাগরিক সংবর্ধনাটিকে। বিশেষ ভাবে ভাল লেগেছিলো এ সংবর্ধনা আব্বাকেও দেয়া হয়েছিলো বলে। আব্বা চিরকাল ইউনূস ভাইয়ের গর্বে গর্বিত ছিলেন—সেই ইউনূস ভাইয়ের পনরো বছর বয়সে কানাডায় জাম্বুরীতে গিয়ে অন্য স্কাউটদের সঙ্গে গাড়িতে বিশ্বভ্রমণ করার কাল থেকেই। সে সময়ের প্রত্যেকটি কাজে আব্বা তাঁকে সাহস ও সমর্থন যুগিয়ে গেছেন।

সংবর্ধনায় সব জগতের মানুষেরই সমাবেশ ঘটেছিলো ইউনূস ভাই ও আব্বাকে সাধুবাদ দেয়ার জন্য। এটি আব্বার জন্য ছিলো খুবই পরিতৃপ্তির একটি দিন। এরপর ইউনূস ভাইয়ের বিস্তৃত অর্জনের আরো কিছুটা দেখলেও তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি ও তার পর দেশ-বিদেশে এ নিয়ে উচ্ছাসটি তিনি দেখে যেতে পারেননি, কারণ তার আগে ২০০১ সালে তিনি মারা গিয়েছেন। আমার ছোট বোন টুনু মারা গেলো আরথ্রাইটিসের অবক্ষয় জনিত রোগে। তার বড় মেয়ে বীথিও মাষ্টার্স পাশ করে সাংবাদিকতা করার সময় মারা গেল আর এক ক্ষয়ী রোগ

মালটিপল স্কেলেরোসিসে। এ সব ছিলো আমাদের জন্য হৃদয় বিদারক। তবে এসবের অনেক আগে আব্বা ও ইউনূস ভাইকে দেয়া চট্টগ্রামের সেই নাগরিক সংবর্ধনাটি পুরো নিরিবিলিকেও বেশ উৎসব মুখর করে তুলেছিলো আমাদের সবার সমাগমে—শুধু ভাই বোনেরা নয়, পুরানো সব বন্ধু বান্ধবরাও বটে। বাহাদুর (শামসুল হোসাইন) তার নিজের স্বভাবজাত প্রতিভা দেখিয়ে চট্টগ্রাম ক্লাবে একটি চমৎকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলো—গ্রামীণ ব্যাংক ও ইউনূসকে নিয়ে। সেটিও শহরে বেশ সাড়া ফেলেছিলো।

আম্মা আরো আগে ১৯৮৩ সালেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যখন ছিলেন তখনো তাঁর অসুস্থতার কারণে কখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি আমরা কে কী করছি। ওটিই ছিল আমাদের বড় দুঃখ। নইলে আমরা শেষ সময়টি পর্যন্ত আম্মার সান্নিধ্যে থেকে ছোট ছোট দৈনিন্দিন সবকিছুতে কথা হলে, ভাব-বিনিময় করে তাঁর ভাল লাগা, খারাপ লাগাতে উপযুক্ত সাড়া দিয়ে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে গেছি।

আশির দশকের একেবারে শুরুর দিক থেকে আমি নিজেও যখন গ্রামমুখী হয়েছি সিএমইএসের কাজ নিয়ে, তখন ভাইদেরকে ও বন্ধুবান্ধবদেরকেও এর নানা দিকে আগ্রহ দেখাতে উৎসাহিত করেছি। চট্টগ্রাম গেলে আমার একটি কাজ হতো চন্দনাইশে সিএমইএসের সাতবাড়িয়া ইউনিট দেখে আসা। কক্সবাজারের বাসে ওঠে দক্ষিণ চট্টগ্রামে চলে যেতাম এবং বাগিচার হাট নামের বাস স্টপে নামতাম। নেমেই রিক্সাওয়ালাকে বলতে হতো টেকনিক্যাল স্কুল যাবো—গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘন্টা আধেকের মত ঝাঁকুনির পথে তারা নিয়ে যেতো। সিএমইএস, অথবা গ্রামীণ প্রযুক্তি এসব বল্‌লে কিন্তু হতোনা, ঐ টেকনিক্যাল স্কুল নামেই আমরা পরিচিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রায়ই সঙ্গে নিরিবিলির ছোট বড়দের কাউকে নিয়ে যেতাম, তাছাড়া সিএমইএসের সহকর্মীরাও থাকতো কখনো কখনো। একবার বাসের মধ্যে আমরা সাতবাড়িয়া ইউনিটের নানা প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে এমন আলাপ জুড়ে দিয়েছিলাম যে এক যাত্রী বল্‌লেন 'আপনারা কি বিসিকে (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা) কাজ করেন'? তাতে এইটুকু বুঝলাম যে বিসিকের কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে মানুষ খোঁজ রাখে।

আপন আনন্দে

মধ্য-শতকে স্কুল-কলেজের দিনগুলো থেকে শুরু করে শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছে যাবার পরও দেখলাম একটি বিষয়ে আমি খুব তৃপ্তি অনুভব করতে পারি; সেটি হলো ঐ সবটুকু সময় আমার পুরো ব্যস্ততাটাই হলো নিখাদ আনন্দের ব্যস্ততা। সপ্তম শ্রেণীতে থাকতে বিজ্ঞানের সাধারণ কলকব্জা তৈরির আনন্দটি যেমন ছিলো, তেমনি বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য লিখে এমনকি তার প্রুফ দেখে আনন্দ কলেজ জীবন থেকে পেয়ে এসেছি। আবার ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে যেমন আনন্দ, তেমনি

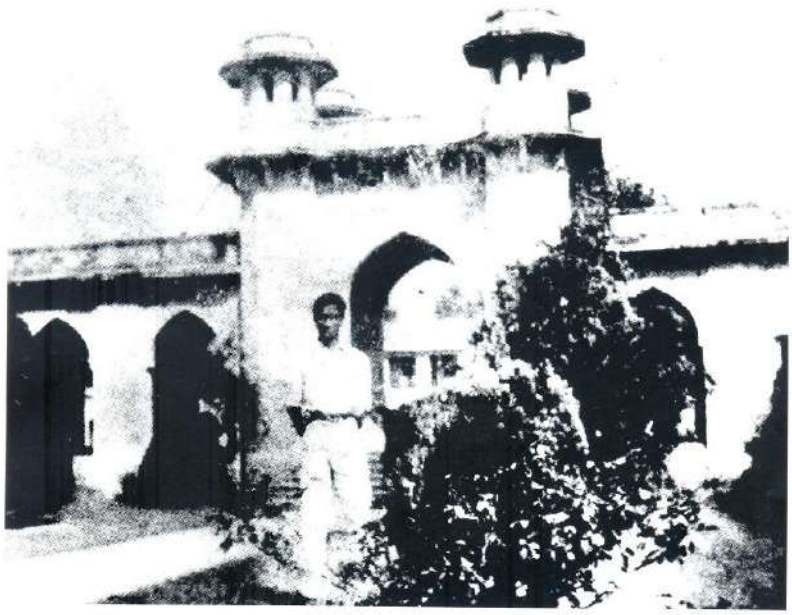
সিএমইএসের গ্রামেগঞ্জে গিয়ে রাতের খোলা আকাশের নিচে সভা করার আনন্দ—কোনটিকে ছেড়ে কোনটির কথা স্মরণ করবো? সে ছোট বেলাতেই হোক আর বড় বেলাতেই হোক এসব কাজের প্রত্যেকটির একটি বড় লক্ষ্য ছিলো, একটি বড় ক্যানভাস ছিলো—অন্তত সেভাবেই আমি সবকিছু দেখতে ভালবাসতাম। তাই বিজ্ঞান সাময়িকী চেয়েছে দেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ হতে, সিএমইএস চেয়েছে শিক্ষা জগতটিকেই বদলে দিতে। এতটা পথ পেরিয়ে সেদিক থেকে সাফল্য, স্বীকৃতি যা এসেছে তা তুচ্ছ করার মতো নয়। কিন্তু আনন্দের সবকিছু ওই বড় ক্যানভাস থেকে আসতোনা, আসতো এর মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য আটপৌরে কাজের থেকেও।

এই ছোট ছোট কাজগুলো একদিকে যেমন কাজের মধ্যে নিজের আনন্দে নিজেকে বিভোর করে রাখার সুযোগ আমাকে দিয়েছে, তেমনি অসংখ্য স্বপ্নভরা মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে দিয়ে আনন্দকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এসবের বাইরে সামাজিকতার বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্বাভাবিক আড্ডার আনন্দ, পারিবারিক ছুটি কাটাবার আনন্দ, এমন কি সপ্তাহান্তে ছুটিতে একটু অন্যভাবে দিন কাটাবার আনন্দ এসব বহু আগে থেকেই আমার জন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এসবের অভাব অনুভব করিনি কারণ ঐ আনন্দের কাজের মধ্যেই এগুলো খুঁজে পেয়েছি। তাই যদি সিএমইএসের কথাই শুধু বলি, তা আমাকে গত তিন দশক আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে—আমার সামাজিকতা হয়ে পড়েছে সিএমইএসের সামাজিকতা, আমার ভ্রমণের স্বাদ সিএমইএসের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণে বা তার কারণে বিদেশের ছোট বড় জায়গায় ভ্রমণে, আমার বিনোদন সিএমইএসের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে বিনোদনে। আমার মজাটি ছিলো অন্যদেরকে এসবের স্বাদ দেয়াতে ও এর গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করাতে। যখন তাতে সফল হয়েছি তখন অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি। অন্যদিকে আমার আর একটি বড় আনন্দের কাজ বিশ্ব-বিজ্ঞানকে নিয়ে—এখানে পড়ার, লেখার আর বলার কারবার। আর এই পড়া ও এই লেখা হলো ছোটবেলা থেকে আমার সবচেয়ে সহজাত গভীর আনন্দ। বিশ্বের সব কিছু নিয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র নিয়ে জানতে ও বুঝতে পারার যে আনন্দ সেটি কোনদিন ছেড়ে যাবে এমন দুঃসময়ের কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনা। শুধু জানার আনন্দ নয় সেটি আবার অন্যকে বোঝাতে পারার আনন্দ এসবই ঘুরে ফিরে আমাকে ঘিরে রয়েছে।

সেই ছাত্র জীবন থেকে এসবের মধ্য দিয়ে যতই দিন গিয়েছে একটি বিষয়ে ততই বেশি নিশ্চিত হয়েছি, তা হলো প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছে করলে নিজেই নিজের আনন্দে অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে, নিজের মত করে কিছু অবদান রাখতে পারে, যদিও সেই সৃষ্টি বা সেই অবদান তাকে পুরোপুরি তৃপ্ত নাও করে। এর জন্য বড় রাজনৈতিক নেতা হবার দরকার হয়না, বিশাল সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়না, স্বীকৃতির জন্য ব্যস্ত হতে হয় না। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে এক

একটি শক্তি উৎস হিসেবে বিবেচনা করে কাজ করে যেতে পারি। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে, অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—এমনও নয়। কারণ যদিও সব কাজ সামাল দেবার জন্য চব্বিশ ঘন্টাকে ক্রমাগত যথাসম্ভব টেনে টেনে লম্বা করতে হয়েছে, যে আনন্দের কথা বলছি সেটি থাকলে পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনে হয়না, নিজের জীবনের স্বাভাবিক গতি মনে হয়। অন্তত আমার কাছে বরাবর এরকমটিই মনে হয়েছে। শতাব্দীর দশকগুলোকে একে একে পার করে নতুন শতাব্দীরও বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে গিয়েও অন্য রকম কিছু মনে হবার কোন কারণ এখনো খুঁজে পাচ্ছিনা।

আলোকচিত্র



সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভর্তি হবার পর পর হলের মধ্যে মোগল গার্ডেন্স সদৃশ বাগানে লেখক (১৯৬২)



পদার্থবিদ্যা বিভাগের পিকনিকে কয়েকজন সহপাঠী (১৯৬৪)। বাম থেকেঃ ১ম ফারুক (পরে পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী), ৫ম আহমদ শফী (পরে অধ্যাপক, উপাচার্য), ৬ষ্ঠ ফজলুর রহমান (পরে সচিব), ৭ম লেখক, ৮ম শাহ আবু নঈম (পরে সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের বিচারপতি, আমিনুর রশীদ (পরে অধ্যাপক, উপাচার্য)।

আজাদ

Phone : Editor & Manager—46413 News & Advertisement—46616 Managi

ঢাকা : ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৭২ Thursday December 23 1965 : মঙ্গলবার : ৮ই



বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রাক্কালে ছাত্ররা নিজ নিজ দলের পক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। —আজাদ

'আজাদ' পত্রিকার ২৩ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সংখ্যায় কলা ভবনে সলিমুল্লাহ হল নির্বাচনী মিছিলেঃ সামনে ভিপি প্রার্থী লেখক (× চিহ্নিত) রাশেদ খান মেনন ভাইয়ের পাশে।

PAKISTAN OBSERVER (1st Page)

DACCA THURSDAY MAY 5 1966 BAISAKH 21 1373 (BS)



Md. Ibrahim, newly elected V.P. and his cabinet taking oath on the occasion of S.M. Hall installation ceremony on Wednesday.—OBSERVER.

'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান (১৯৬৬)। ডানে দণ্ডায়মান লেখক উত্তোলিত হাতে সহ-সভাপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করছেন, বামে সংসদের বাকি সদস্যরা।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ ১৯৬৫-৬৬



সলিমুল্লাহ হল সংসদের (১৯৬৫-৬৬) আনুষ্ঠানিক ছবি। উপবিষ্ট বাম থেকে আনোয়ারুল বার চৌধুরী (জি এস), লেখক (ভি পি), ড. মফিজউদ্দিন আহমদ (প্রভোষ্ট ও সভাপতি), অধ্যাপক কে এ মুনিম (কোষাধ্যক্ষ), ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ (সহ-সাধারণ সম্পাদক)। মাঝের সারি দণ্ডায়মান: বাম থেকে ২য় ফখরুল ইসলাম মুনশি (পাঠাগার সম্পাদক), ৪র্থ মোহসীন (সংস্কৃতি সম্পাদক), ৫ম নিজামউদ্দিন (সহ-ক্রীড়া সম্পাদক), আরবাব আহমেদ (ক্রীড়া সম্পাদক), পেছনের সারি: সংসদের কর্মীবৃন্দ– মাঝখানে বিখ্যাত নাজ্জু দারোয়ান।



খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভ্রমণের পর পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে ছাত্র প্রতিনিধি দল।
লেখক বাম থেকে চতুর্থ (১৯৬৬)



লেখকের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক থাকাকালীন আবাসে (১৯৬৮) বন্ধু ভূঁইয়া ইকবাল (বামে), এবং সহকর্মী ও বন্ধু আবদুল খালেক। সামনে, হল ছাড়ার পর থেকে কয়েক বছর লেখকের সব আবাসে গৃহ কর্মের সঙ্গী করিম (পরে পাকিস্তান প্যাকেজেসে মেশিনম্যান)।



ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে সুদৃশ্য ডেভন অঞ্চলে ছোট ছোট নানা জায়গায় ইয়ুথ হোষ্টেলিং করে বেড়াবার সময় লেখক ও মণি (১৯৭০)।



লন্ডনের হাইগেইট সমাধিতে কার্ল মার্ক্সের কবরে লেখক ও মণি (১৯৭০)।



আমেরিকায় ন্যাশভিল টেনেসি বিমান বন্দরে মণি আর লেখককে
অভ্যর্থনা করার সময় ইউনূস ভাই (১৯৭০)।



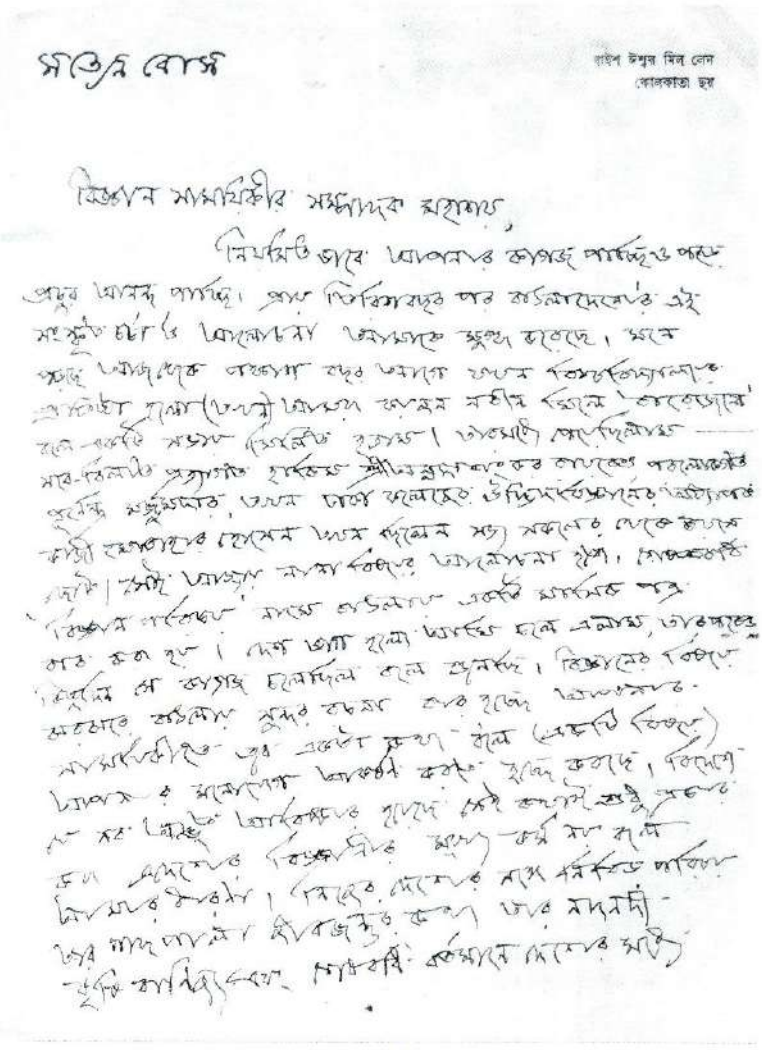
একাত্তরের মার্চে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কয়েক বছর আগে (১৯৬৯) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর
তরুণ লেফট্যানেন্ট আকবর হোসেন (মণির ভাই)।



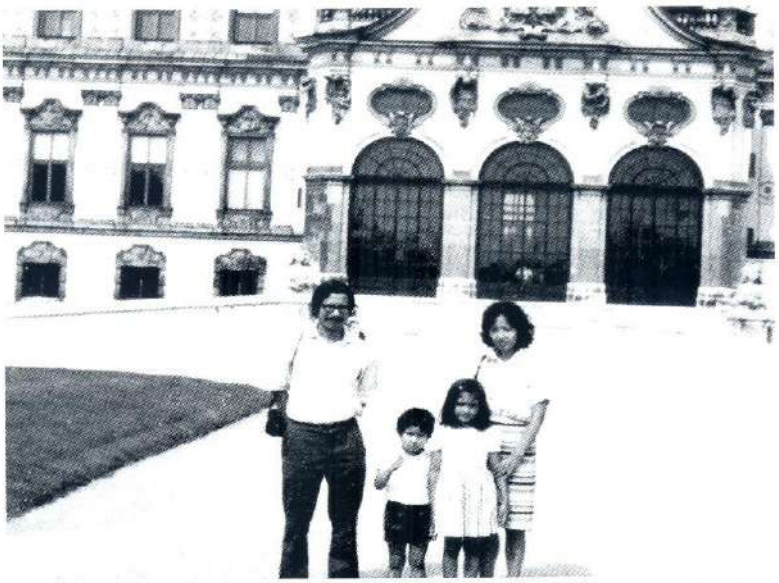
১৯৭২ এ আমেরিকায় অধ্যাপনায় পদত্যাগ করে দেশে ফেরার পথে সাউদাম্পটনে কয়েকদিন লেখকের সঙ্গে কাটান ইউনূস ভাই (মধ্যখানে)। সঙ্গে সেখানে লেখকের দুই বন্ধু পি এইচ ডি ছাত্র বামে মোমিনুল হক (পরে বুয়েটে অধ্যাপক) ডানে গোলাম মাওলা চৌধুরি (পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক)।



বাংলা একাডেমিতে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৭৪) একটি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। পাশে অন্য তিন জন আমন্ত্রিত বক্তা বাম থেকে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী (পরে রাষ্ট্রপতি), ড. আলী আসগর ও লেখক।



বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে লেখককে লেখা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সেই চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা (১৯৭৪)। তাঁর মৃত্যুর মাত্র মাস খানেক আগে লেখা এই চিঠি খুব সম্ভব আচার্য বসুর লেখা শেষ চিঠি।



পরমাণুবিদ ফাত্তাহ ভাইয়ের স্ত্রী হিরোকো সান ও তাঁদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে লেখক– ভিয়েনায় সম্রাট প্রাসাদের সামনে (১৯৭৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় লেখকের সিনিয়র ফাত্তাহ ভাই ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সীতে বিভিন্ন দেশের পরমাণু কার্যক্রমের পরিবীক্ষক ছিলেন।



সুইডেনে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর তুভের ল্যাবোরেটরিতে তাঁর দুই পোষ্ট ডক্টরাল ছাত্র– তানজানিয়ার কাশিনজে এবং লেখক (১৯৭৭)।



উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে 'টাউন' আর 'গাউনের' সাক্ষাত (১৯৭৭)। পশ্চাদভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উপসালা ক্যাসেল।



হেলিকপ্টারে করে সুইডেনের একেবারে উত্তরে বরফ ঢাকা গহীন পর্বতের রাজ্য টারফালায় হিমবাহ গবেষণা কেন্দ্রে অবতরণ। বাম থেকেঃ ড. মশিহুজ্জামান, লেখক, কিউবার তরুণী বিজ্ঞানী এলা, হেলিকপ্টার পাইলট, এবং ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের প্রতিনিধি।



সুইডেনের একেবারে উত্তরে কিরুনায় মিড সামার নাইটে গভীর রাতে আবছা সূর্যের বিপরীতে লেখক ও সহযাত্রীদের সিলুহেট ছবি (১৯৭৮)।



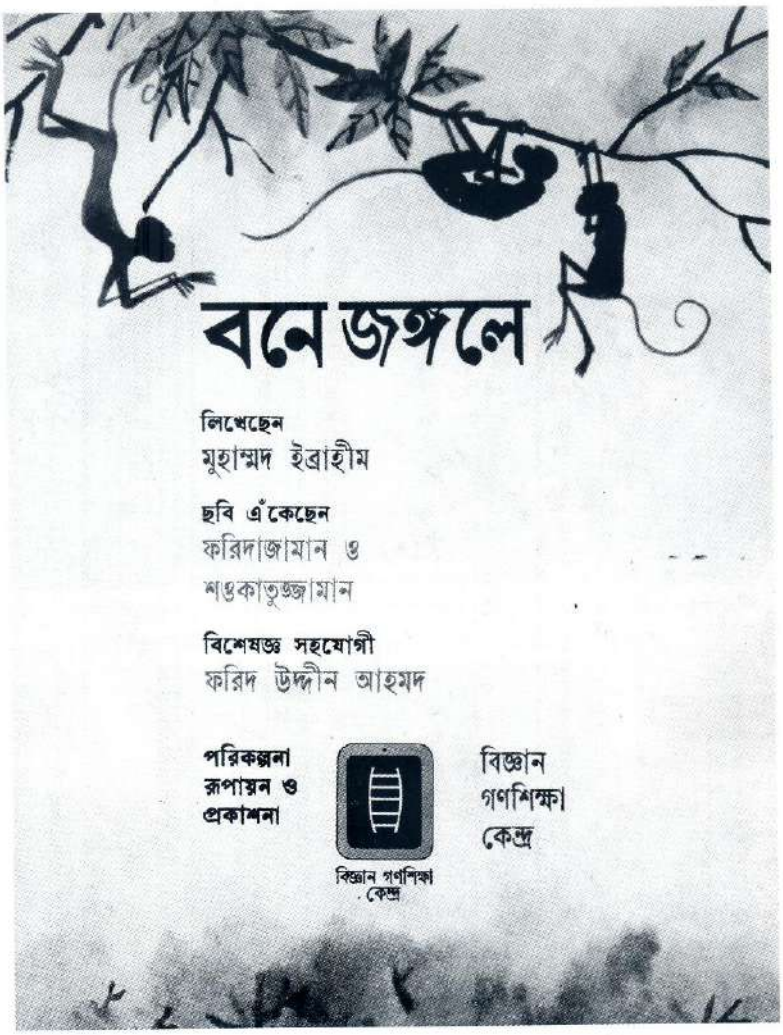
টেরে ডেস হোম্‌স- ফ্রান্সের প্রতিনিধি জিল ডেনিলে্সর সঙ্গে লেখক- ফ্রান্সের উত্তর উপকূল নর্মান্ডি বীচে।



ফ্রান্সের নর্মান্ডি অঞ্চলে টেরে ডেস হোম্‌সের সমর্থক একটি পরিবারের সঙ্গে লেখক, যাঁরা অনেক পুতুল তৈরি করেছেন বিক্রি করে সিএমইএসকে সহায়তা দেবেন বলে।



লেখক সম্পাদিত ও সিএমইএস প্রকাশিত 'পরিবেশ বিজ্ঞান সিরিজে'র একটি বই 'বনে জঙ্গলে'র প্রচ্ছদ (১৯৮০)।



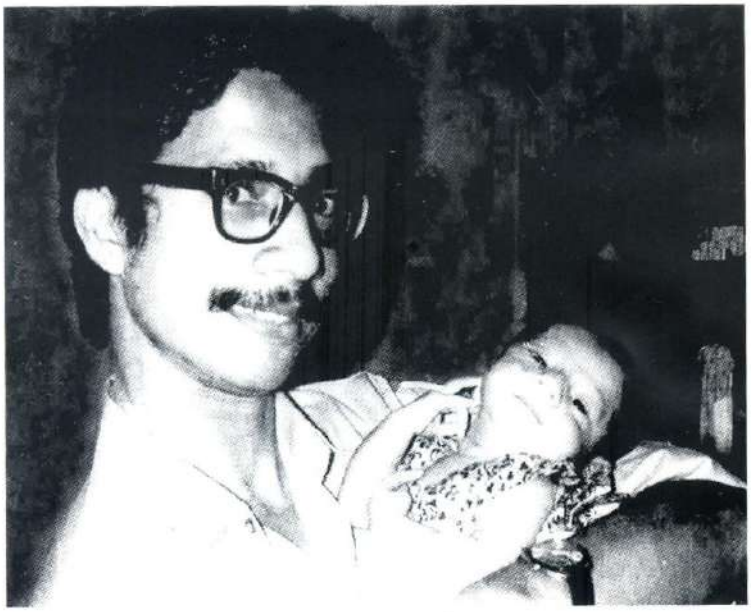
'বনে জঙ্গলের' দ্বিতীয় প্রচ্ছদ। এতে বোঝা যাচ্ছে এই সিরিজের এক একটি বইয়ে কত জনের অবদান রয়েছে।



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে (১৯৮১) বক্তৃতা দিচ্ছেন লেখক।
পাশে উপবিষ্ট ড. আলী আসগর।



একেবারে প্রথম দিকের একটি মৌলিক বিদ্যালয়– সুরুজ টাঙ্গাইলের একটি পাড়ায় (১৯৮২)।



নবজাত প্রথম সন্তান কুশলকে নিয়ে লেখক।



নাতি কুশলকে কোলে নিয়ে লেখকের আব্বা।



এশা (মাঝে) ও পাশার (ডানে) সঙ্গে কুশল। পরে এশা আমেরিকায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, পাশা (বিপাশা আইচ) যাদু-শিল্পী।



দুই ছেলে কুশল (বামে) ও উজলের সঙ্গে লেখক।



ভারতের রাঁচীর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ইন্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন (এস আর আই) থেকে আগত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সিএমইএসের সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে আলাপ। বাম থেকে ৩য় লেখক, ৪র্থ প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ দে, ৫ম ড. সুমনা দত্ত চক্রবর্তী।



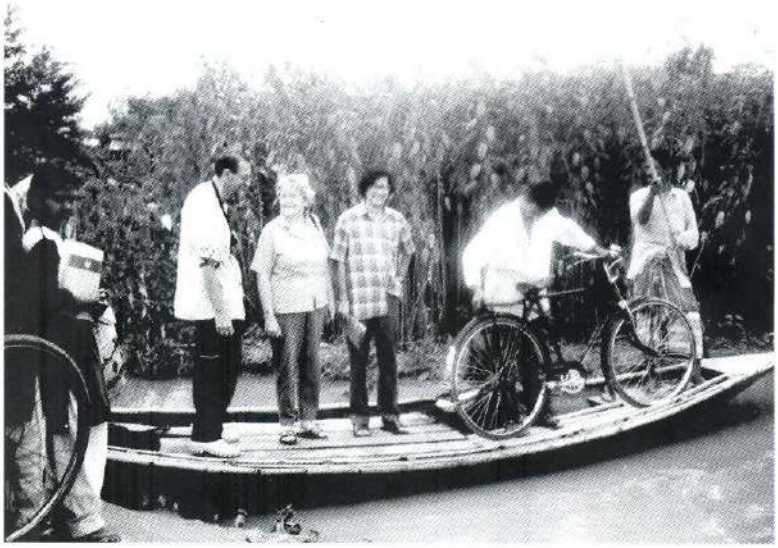
একটি প্রত্যন্ত ইউনিটের মৌলিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে লেখক। তাঁর ডান পাশে শিশুপুত্র উজ্জল।



লেখকের দুই বোন– বামে ছোট বোন টুনু (উম্মে কুলসুম), ডানে সবার বড় বোন 'বুবু' (মমতাজ বেগম) ।



লেখকের ছোট ভাই মইনুল আনামের (বাম থেকে ১ম) নাট্যকর্মী বন্ধুদের উৎসাহে শিশু কুশল বক্তৃতা দিচ্ছে ।



দেখতে ইচ্ছুক বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে সুরুজ, টাঙ্গাইলে মৌলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন লেখক (নৌকায় মধ্যখানে)।



শ্রীলংকার বাদক দলের সঙ্গে করমর্দন রত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে ক্যামেরা বন্দী করেছেন লেখক।



ফ্রান্সের বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী বার্নার্ড কুশনারের সিএমইএসের সুরুজ, টাঙ্গাইলে গ্রামীণ প্রযুক্তি ও মৌলিক বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন (১৯৮৭)ঃ বাম থেকে ৩য় লেখক, ৫ম বার্নার্ড কুশনার।



সিএমইএসে মাশরুম প্রশিক্ষণ।



১৯৯৩ সালে চট্টগ্রামে ইউনূস ভাই ও আব্বাকে দেয়া নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে সমবেত পরিবারের সদস্যরা। সামনে উপবিষ্ট একেবারে ছোটদের সারি (বাম থেকে)ঃ রিদয় (মইনুর ছেলে), ইমন (টুনুর ছেলে), নাজিয়া (আইয়ুবের মেয়ে), দীনা (ইউনূস ভাইয়ের মেয়ে)। উপবিষ্ট দ্বিতীয় সারি (বাম থেকে)ঃ কান্তা (টুনুর মেয়ে), শাওন (টুনুর ছেলে), কুশল লেখকের ছেলে), লেখকের আব্বা, জিয়ন (আজমের ছেলে)– তার সামনে উজল (লেখকের ছেলে), তিষা (আজমের মেয়ে), শান্তা (টুনুর মেয়ে)। দণ্ডায়মান (বাম থেকে)ঃ তানি (মইনুর স্ত্রী), রওশন (আইয়ুবের স্ত্রী), বুবু-মমতাজ, জাহাঙ্গীর, আফরোজী ভাবী (ইউনূস ভাইয়ের স্ত্রী), ইউনূস ভাই, শামসুল হুদা (টুনুর স্বামী), টুনু, বড়দা সালাম ভাই, আজম, বীথি (টুনুর মেয়ে), লেখক, আইয়ুব।



বিজ্ঞান-লেখক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য খ্যাতনামা ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তিনি চট্টগ্রামে ১৯৪৫ সালের ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর স্কুলজীবন থেকেই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজের পদক্ষেপ নেন তাঁর একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী করার মাধ্যমে। কলেজে পড়ার সময় তিনি দেশের প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ 'বিজ্ঞান সাময়িকী' প্রকাশ শুরু করেন, আজ অবধি তাঁর সম্পাদনায় যার প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠা করেন যা তাঁর নেতৃত্বে দেশের একটি ব্যতিক্রমী ও মুখ্য এনজিও হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানত বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা তাঁর রচিত পুস্তকসংখ্যা অর্ধশত; ওই বিষয়ে একজন টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সৌর শক্তি সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ এনজিও ফেডারেশনের সভাপতি; ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল এডুকেশনে বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক।

ISBN : 978 984 91858 1 9